ISSN 2227-1635

বাঙলা সাহিত্যিকী

সাহিত্য • সংস্কৃতি • ইতিহাস • ঐতিহ্য

বিষয়ক ষাণ্মাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলা বিভাগ

রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

ISSN 2227-1635
নব পর্যায়: প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

বাঙলা সাহিত্যিকী

সাহিত্য ● সংস্কৃতি ● ইতিহাস ● ঐতিহ্য
বিষয়ক ষাণ্মাসিক গবেষণা পত্রিকা

সম্পাদক
ড. মোঃ ইব্রাহিম আলী

সহযোগী সম্পাদক
মোঃ ইকবাল হোসেন

বাংলা বিভাগ
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী, বাংলাদেশ

বাঙলা সাহিত্যিকী
নব পর্যায়ঃ প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রকাশকালঃ
ফাল্গুন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)ঃ
মোহাঃ ওলিউর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)ঃ
আহম্মদ শরীফ, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

বর্ণবিন্যাসঃ
মঈন উদ্দীন আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মোঃ রবিউল ইসলাম, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
মোঃ আবদুর রহিম, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

© প্রকাশনায়ঃ
বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

এই পত্রিকার কোন প্রবন্ধ পূর্বানুমতি
ব্যতিরেকে পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

প্রচ্ছদঃ
পলিন, রাজশাহী
মুঠোফোনঃ ০১৭১৯-৭১১৩০০

মূল্যঃ ৳ ১০০.০০
US $ 10.00

Bangla Shahittiki *(Bengali Research Journal)*
Edited by: Dr. Md. Ibrahim Ali, Printed by: Shahpir Chisti Printing Press
Kadirgonj, Rajshahi, Published by: Department of Bengali
Rajshahi College, Rajshahi, Bangladesh.
e-mail: bangladepartment1959@gmail.com

বাঙলা সাহিত্যিকী

প্রধান উপদেষ্টা

প্রফেসর ড. আলী রেজা মুহম্মদ আব্দুল মজিদ

অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

উপদেষ্টা

প্রফেসর মহাঃ হবিবুর রহমান

উপাধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

প্রফেসর ড. মোসাম্মাৎ রোকেয়া বেগম

বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি বিভাগ

প্রফেসর মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন

বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

প্রফেসর আল-ফারুক চৌধুরী

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

সদস্য

মোঃ কামরুজ্জামান

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মোহা: ওলিউর রহমান

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ড. মোঃ কামাল হোসেন

সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

ড. মোসাঃ ইয়াসমীন আক্তার শারমিন

সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ড. মোঃ ইব্রাহিম আলী

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ড. ফাল্গুনী রানী চক্রবর্তী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মো: ইকবাল হোসেন

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

পুলক কুমার সরকার

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

(প্রবন্ধের বক্তব্য ও অভিমতের দায়বদ্ধতা সম্পাদনা পরিষদ বহন করে না)

সম্পাদকীয়

উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের প্রবাদ-প্রতিম ব্যক্তিত্ব রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁদের যে অবদান ও অক্ষয়কীর্তি তা আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মানবমন্ত্রে দীক্ষিত রাজা রামমোহন রায়-এর সতীদাহপ্রথা (১৮২৯) বিলোপ আইন পাশ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা ও সামাজিক আন্দোলনের উপযোগিতা সমকালীন বাঙালি সমাজকে যেভাবে আলোড়িত ও আদর্শায়িত করেছিল, বর্তমানের তরুণপ্রজন্মকেও তাঁদের শিক্ষা ও কর্মজীবন সুস্থ ও সুষ্ঠু শিক্ষা এবং প্রত্যাশিত কল্যাণকামী সমাজ গঠনে সেভাবেই উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করবে- এ আমাদের বিশ্বাস। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের দু'জন দিকপাল সাহিত্যস্রষ্টা। ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মিথ ও ইতিহাসের সাথে পাশ্চাত্যের মনন-মনীষার অপূর্ব সংমিশ্রণে রচিত মধুসূদনের কাব্যপ্রতিমা ও বঙ্কিম-সাহিত্য হয়ে উঠেছে অনবদ্য রসগ্রাহী। তাঁদের পরম্পরা ও উত্তরাধিকারিক ঐতিহ্যে বাংলাসাহিত্য নানা গতি-প্রকৃতির মধ্যে লাভ করেছে বর্তমানের ঋদ্ধ রূপ। রবীন্দ্র-পূর্ব ও উত্তর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ সন্ধান ও 'বাঙলা সহিত্যিকী'র মূল চেতনা 'সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য' বিষয়ক গবেষণা পত্রিকার চারিত্র অক্ষুণ্ন রাখতে বিবিধ বিষয়ের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ এতে হয়েছে অন্তর্ভুক্ত। রাজশাহী কলেজের বাংলা বিভাগের শুভ উদ্যোগে প্রকাশিত 'বাঙলা সাহিত্যিকী' সৃজনশীল ও মননশীল লেখক-পাঠকদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হবে–এ আমাদের প্রত্যাশা। সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে মৌলিক মানসম্মত প্রবন্ধে পত্রিকাটির অবয়ব ঋদ্ধ করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সুদীর্ঘ কালপরিক্রমায় প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক রাজশাহী কলেজের (১৮৭৩) শিক্ষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস প্রবহমান। বাংলা বিভাগের *বাঙলা সাহিত্য মজলিস* (১৯৪৮) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। ভাষা-আন্দোলনসহ নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তাই বাঙালির গর্ব ভাষা-আন্দোলনের মাসে রাজশাহী কলেজের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রবিন্দু গবেষণা পত্রিকা *বাঙলা সাহিত্যিকী* নবপর্যায়-প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত, গর্বিত। রাজশাহী কলেজের বর্তমান প্রশাসনের নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং বাংলা বিভাগের উদ্যোগে *বাঙলা সাহিত্য মজলিস*-এর মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হল *বাঙলা সাহিত্যিকী।* পত্রিকাটি প্রকাশে যাঁদের নিরলস শ্রমনিষ্ঠা ও অকুণ্ঠ সমর্থন–তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও বিনম্র শ্রদ্ধা।

প্রাবন্ধিকগণের জন্য জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীঃ

রাজশাহী কলেজ, বাংলা বিভাগ থেকে ষাণ্মাসিক রূপে প্রকাশিত *বাঙলা সাহিত্যিকী* একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা পত্রিকা। আগ্রহী লেখক-প্রাবন্ধিক 'সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য' বিষয়ক বাংলা ভাষায় লিখিত যে কোন প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। পূর্বে প্রকাশিত বা অন্যকোন প্রতিষ্ঠান/ পত্রিকায় দাখিলকৃত প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। *বাঙলা সাহিত্যিকী*'র সম্পাদনা পরিষদ গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য প্রত্যাশা করে তা নিম্নরূপঃ

১. প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে মৌলিকত্ব বজায় রাখা।
২. গবেষণা প্রবন্ধের প্রচলিত রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করা।
৩. ফুটনোট ব্যবহার ও যথাযথ প্রয়োগ করা।
৪. গ্রন্থপঞ্জি, টীকা ও তথ্যনির্দেশের যতিচিহ্ন ও সংকেত প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য রীতি অনুসরণ করা।
৫. প্রবন্ধের শুরুতে বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় অনূর্ধ্ব ১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ সংযোজন করা।
৬. **প্রবন্ধের বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একডেমী প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ করা। (তবে উদ্ধৃতিমূলের বানান অবিকৃত থাকবে)।**
৭. প্রবন্ধের পরিসর যথাসম্ভব পাঁচ থেকে দশ হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।

পরবর্তী সংখ্যায় প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য লেখা জমাদানের
শেষ তারিখঃ ৩১ জুলাই ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

♦ প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য সম্মানী প্রদান করা হয় ♦

'বিজয়' সফটওয়্যারে 'SutonnyMJ' ফন্টে কম্পোজ করে প্রবন্ধের দুই সেট প্রিন্ট কপি সিডিসহ জমা দানের জন্য অনুরোধ করা হল। এছাড়াও নিম্নোক্ত ঠিকানায় লেখা প্রেরণ করা যাবে bangladepartment1959@gmail.com। প্রবন্ধের সঙ্গে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) যোগাযোগের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে।

যোগযোগের ঠিকানাঃ

ড. মোঃ ইব্রাহিম আলী
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।
মুঠোফোনঃ ০১৭২০-৫৩৮৮০৩
ফোনঃ ০৭২১-৭৭২৬২৩

মোঃ ইকবাল হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫-৭১৫০৭১
ফোনঃ ০৭২১-৭৭২৬২৩

ফজলুর রহমান খান
ও
মোঃ শাহাদাত হোসায়েন
সম্পাদিত

সাহিত্যিকী

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা
মাঘ-চৈত্র ১৩৬৪

বাঙলা সাহিত্য মজলিস
রাজশাহী কলেজ

১৩৬৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 'সাহিত্যিকী'র প্রচ্ছদ

সূচিপত্র

মোঃ মতিউর রহমান
ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম
রাজা রামমোহন রায় এর সমাজ সংস্কারে উপযোগবাদী চিন্তাধারা ১১

মঈন উদ্দীন আহমেদ
শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর ২৪

ড. ফজলুল হক সৈকত
মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা: মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা ৩৭

মোঃ রবিউল ইসলাম
বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা: রোমান্স ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ৪৮

ড. সাইফুল আলম
কাজী আবদুল ওদুদের সৃজনশীলতা: রাজশাহী পর্ব ৭৫

আহম্মদ শরীফ
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র সাহিত্যকর্ম: প্রসঙ্গ পীর-দরবেশ ৮৪

নাজিব ওয়াদুদ
উত্তর-ঔপনিবেশিক নিসর্গতত্ত্ব ও আধুনিক বাংলা কবিতা ৯৪

গোলাম কবির
হার না মানা বিদ্যাসাগর ১১১

ড. ফাল্গুনী রানী চক্রবর্তী
মধুসূদনের জীবনে জননী ও ভার্যা ১১৮

মোঃ শহিদুল ইসলাম
প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র: প্রসঙ্গ কমলাকান্তের দপ্তর ১৩২

ড. আলী রেজা মুহম্মদ আব্দুল মজিদ
সুলতানি আমলে বাংলার মুসলমানদের সামাজিক জীবন ১৫৫

আল ফারুক চৌধুরী
মধুসূদন পরম্পরা ১৭৮

মোহা: ওলিউর রহমান
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারীসত্তার বিকাশ ১৯২

গাজী মাহমুদ হাসান
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উজানে মৃত্যু: বিষয় ও প্রকরণ ২০৫

ড. মোঃ ইব্রাহিম আলী
আধুনিকতা ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত ২১৩

মোঃ শফিকুল আলম
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কার আন্দোলন ২৩১

চন্দন আনোয়ার
আক্তারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পের বিষয়বৈভব ২৪৫

ড. মাযহারুল ইসলাম তরু
রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকসাহিত্য ২৬৭

ড. মোঃ মোস্তফা কামাল
অসহযোগ আন্দোলনে রাজশাহীর সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ২৮৭

মো. সুলতান মাহ্‌মুদ
কাশ্মীর সংকট: প্রেক্ষাপট ও অগ্রগতি পর্যালোচনা ২৯৭

মোঃ তানভিরুল হক
শামীম আহম্মেদ
মিথ: একটি ইতিবৃত্তিক আবেক্ষণ ৩১০

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

রাজা রামমোহন রায়-এর সমাজ সংস্কারে উপযোগবাদী চিন্তাধারা

মোঃ মতিউর রহমান*
ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম**

সারসংক্ষেপ: উপযোগবাদ একটি নৈতিক মতবাদ। যে মতবাদে সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ কামনা করা হয় তাকে উপযোগবাদ বলে। এ মতবাদে দুঃখকে পরিহার করে সুখ আনয়নের কথা বলা হয়ে থাকে। উপযোগবাদে কতকগুলো শ্রেণিবিভাগ পরিলক্ষিত হয়। যথা- ক) উদ্দেশ্যমূলক উপযোগবাদ খ) সাধারণ উপযোগবাদ গ) কর্মভিত্তিক আর কর্মনীতিভিত্তিক উপযোগবাদ ঘ) সুখবাদী ও অসুখবাদী উপযোগবাদ ঙ) নেতিবাচক উপযোগবাদ। এই সকল উপযোগবাদের প্রয়োগের মাধ্যমেই সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ কামনা করা হয়ে থাকে। রাজা রামমোহন রায় বিভিন্ন প্রকার উপযোগবাদের উপযোগিতা বা কার্যকারিতার মাধ্যমে কিভাবে সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ কামনা করেছেন তা অতি সংক্ষেপে আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

কোন প্রগতিশীল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের প্রধান শর্ত হলো মুক্ত বুদ্ধি বা মুক্ত চিন্তা। স্বাধীন চিন্তার বিকাশ সাধন না হলে কোন কিছুর নবজাগরণ আশা করা বৃথা। তাই নবজাগরণের প্রধান শর্ত হলো চিন্তাধারার মুক্তি। সবকিছু যদি গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত হয়, তাহলে নতুনের আশা করা যায় না। তাই গতানুগতিকতার স্থলে অনুসন্ধানী সন্দেহপ্রবণ মনোভাব ব্যক্ত না করলে খাঁটি জিনিস বেছে বের করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন আত্মচেতনার কুসংস্কার মুক্ত যুক্তিতর্কের যা সবকিছুর মূল্য নির্ধারণ করতে না পারলেও প্রকৃত সহায়ক হিসেবে কাজ করে; তবেই তার মধ্যে নবজাগরণের অনুভূতি খুঁজে পাওয়া যাবে। আর নবজাগরণ বলতে আমরা বুঝি,

> ষোল শতকের বিভিন্ন লেখনিতে মধ্যযুগীয় নানা রকম প্রতিবন্ধকতা থেকে মানব মনের স্বাধীনতা অর্থাৎ মানুষের মুক্ত চিন্তা-চেতনা ও কর্মের স্বাধীনতা যা তার নিজস্ব ভাগ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।[১]

রোমান দার্শনিক বিথিয়াস (৪৭০-৫২৬) *The Consolation of Philosophy* নামক গ্রন্থে লিখেছিলেন, জ্ঞান, সত্য ও সুনীতির চর্চা তথা যথার্থ মানবোচিত জীবন যাপনের সচেতন প্রয়াসই দর্শন। সেকালের দার্শনিক সক্রেটিস (৪৭০-৪০০ খ্রি.পূ.) বিথিয়াস থেকে বিশ শতকের ব্রার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) ও জ্যা পল সাঁত্রে (১৯০৫-১৯৮৫) পর্যন্ত প্রখ্যাত দার্শনিকদের অনেকেই সুখ, শান্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন একজন দার্শনিকের কাছে জ্ঞান, সত্য ও সুনীতির চেয়ে বেশি কিছু প্রিয় নেই। আসলে এধরনের সত্যাশ্রয়ী, ন্যায়নিষ্ঠ, নীতিবাদী ও জীবনমুখী বাঙালিকে খুঁজে পাওয়া বেশ মুশকিল মনে হলেও বাস্তবে যে আছে তা গৌড়ীয় নৈয়ায়িকদের চিন্তা চেতনার আলোকে তা বলা যায়। বাঙালির ঐতিহ্য যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণধর্মী। উনিশ শতক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাঙালি চিন্তাবিদদের মধ্যে আবেগ ও আধ্যাত্মিক ভাববাদের পাশাপাশি বাঙালি ঐতিহ্যের যুক্তিবাদী ও জীবনবাদী ধারাটিও সমান্তরালভাবে প্রবহমান। উনিশ শতকের রেনেসাঁসের সূর্য-সন্তানরা তাঁদের জীবন ও কর্মে এই বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। তাঁরা বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাংলায় নবজাগরণের সৃষ্টি করে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা, একাডেমিক কমিটি, আর্টস গ্রুপ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে পুনর্জাগরণের অগ্রদূত। শিক্ষা-সংস্কার, রাজনীতি ও দেশপ্রেম সকল ক্ষেত্রেই তিনি নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন। তাঁর চরিত্রে অনুসন্ধিৎসা, সংস্কার সুলভ মনোবল এবং ঋষি সুলভ প্রজ্ঞা তাঁকে যুগ প্রবর্তনের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে। তার মধ্যে ঘটেছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অপূর্ব সমন্বয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় রেনেসাঁর সঙ্গে যেমন পেত্রাকের নাম গভীরভাবে জড়িত তেমনি ভারতীয় উপমহাদেশে নবজাগরণের প্রবর্তক হিসেবে রাজা রামমোহন রায়ের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। ইউরোপীয় রেনেসাঁস শুরু হয়েছিল ইতালি থেকে আর ঊনিশ শতকে উপযোগবাদের আলোকে উপমহাদেশীয় রেনেসাঁসের সুত্রপাত ঘটেছিল এই বাংলাদেশে। আমরা যে বাঙালি রেনেসাঁসের কথা বলছি তার সূত্রপাত হয় রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) মাধ্যমে। বাংলাদেশের দর্শনের ইতিহাসে রামমোহন আধুনিক যুগের অন্যতম স্রষ্টা ও নব্য বাংলার পথ-প্রদর্শক। বাংলার নব জাগরণে তিনি এক মহাবিস্ময়। হিন্দু চিত্তের গভীরতা, ইসলামের আধ্যাত্মিকতা এবং জীবনমুখিতা ও খ্রিস্টধর্মের সহৃদয়তার এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটে তার চিন্তাধারায়। এ এক সৌভাগ্য যে নব্য বাঙালি ও নব্য ভারতবাসী তাঁকে লাভ করে উনিশ শতকের নব-জাগরণের কাণ্ডারিরূপে। রামমোহনের যুগে রামমোহনই ছিলেন সবচেয়ে বেশি প্রগতিবাদী ও সংস্কারমুক্ত। তাছাড়া জ্ঞানের প্রতি তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। তাঁর এ জ্ঞানস্পৃহা স্বধর্মে ও স্বজাতিতে সীমিত ছিল না। সারা বিশ্বের এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ ছড়িয়ে দেয়ার মধ্যে দিয়ে এর বিস্তার লক্ষ্য করার যায়।

> তিনি সমস্ত মানুষকে মানুষের মূল্যায়নে বিচার বিবেচনা করে তার দায়ভার সমাজের আপামর জনসাধারণের মাঝে উৎসর্গ করেছেন এবং তাদের মাঝেই বেঁচে আছেন যাঁরা সর্বাধিক মানুষকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অন্বেষণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে একাকার হতে সদা তৎপর।[২]

পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামের এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর পিতা ছিলেন রামকান্ত রায় ও মাতা তারিনী দেবী। তারিনী দেবী তেজস্বিনী, প্রখর বুদ্ধিশালিনী ও নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। তাঁকে সবাই ফুল ঠাকুরানী বলে ডাকত। তাঁর পিতা তাঁকে সমসাময়িক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। রামমোহন এক মৌলভীর কাছে ফার্সী ভাষা শেখার পর আল-কোরআন ও ইসলামী ধর্ম তত্ত্বের উপর পড়াশোনা করেন। 'এ সময়ই তিনি আল-কোরআনের গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।'[৩]

তাঁর অসাধারণ প্রতিভার কারণেই শৈশব থেকেই সংস্কৃত, বাংলা, ফার্সি ও আরবি ভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি মূল কোরান শরীফ পাঠসহ আরবি ও ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যে, বেদান্ত উপনিষদসহ প্রাচ্য বিদ্যায়ও ব্যাপক পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ফার্সি ভাষায় তিনি *মনাজেরাতুল আদিয়ান* (অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'এই গ্রন্থে তিনি প্রচলিত সংস্কার বিরোধী মত পোষণ করেন এবং ধর্মক্ষেত্রে পরমত সহিষ্ণুতা ও বিভিন্ন ধর্মের গুরুত্বের উপর জোর দেন। রংপুর থেকে কলকাতায় আসার পর রামমোহন বিশেষত বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর রচনাবলির মাধ্যমে সংস্কারকর্ম চালিয়ে যান। এভাবে সেদিন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃত তথা সামগ্রিক জাতীয় জীবন ধারায় যেসব সংস্কার সাধন করেন এবং মুক্তবুদ্ধির পরিচয় দেন, তাতে উনিশ শতকের হিন্দু সমাজ বিভিন্ন দিকে লাভবান হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।'[৪] তাঁর কাছে ভারতীয় দর্শন প্রগতি পরিপন্থী ও বিজ্ঞানবিমুখ মনে হলে এই জরাজীর্ণ ধারণার ব্যাপক পরিবর্তন এবং নতুন নতুন

ধারণার উন্নয়ন ও সংস্কার সাধন কল্পে ব্রাহ্ম আন্দোলন উপস্থিত করেন এবং বেদান্ত ও উপনিষদের নতুন ব্যাখ্যা ও ভাষ্য প্রদান করেন। শাস্ত্র থেকে উপযুক্ত উদ্ধৃতি দিয়েই তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ধর্ম ও ধর্মীয় অনুশাসনের তথা নির্বিচারে বিশ্বাস ও সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে। ইংরেজ শাসনের আওতায় থেকেই তিনি আদায় করতে চাইলেন সামাজিক ন্যায়বিচার এবং প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন এদেশের জনগণের স্বাধিকার। এখানে কর্মনীতিভিত্তিক উপযোগবাদের উপযোগিতা বা কার্যকারিতা বাস্তব ফলাফলে সচেষ্ট হয়েছিল।[৫]

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন অসাধারণ পৌরুষ প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, প্রয়োগবাদী ও যুক্তিবাদী মানুষ। প্রাচীন গতানুগতিক হিন্দু সাধনার সঙ্গে যে ঐন্দ্রিক মরমিবাদ যুক্ত, তার আভাসমাত্র নেই এই মনীষীর ধ্যান ধারণায়। 'আরবি ভাষার মাধ্যমে প্রাচীন গ্রিক দর্শন শাস্ত্র ও বিজ্ঞান যেমন অ্যারিষ্টটলের যুক্তিবিদ্যা ও ইউক্লিডের মূলনীতি সমূহের প্রাথমিক পর্যায়ের সাথে রামমোহনের পরিচয় ঘটে।'[৬] তাঁর সুচিন্তিত অভিমত এই যে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যেভাবে বাঙালির জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে দেশ ও জাতির কল্যাণে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার সংকল্পে ব্রতী হয়ে এক সুকঠিন সংস্কার কর্মে আত্মনিয়োগ একান্ত আবশ্যক। দার্শনিক জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে তিনি বাঙালিকে দিতে চাইলেন প্রগতি ও সার্বিক কল্যাণের পথে এক সঠিক দিগদর্শন। তিনি হিন্দুধর্মের প্রাচীন পুরাণের ঐতিহাসিক সংস্কার ও বিশ্বাসকে পুনর্ব্যাখ্যা করলেন আধুনিক যুক্তিবাদ ও একেশ্বরবাদী ধর্ম বিশ্বাসের আলোকে এবং আন্ত রিকভাবে চেষ্টা করলেন প্রাচীন আর্য ধর্মকে নবরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে, তাতে উপমহাদেশের সঙ্গে বহির্জগতের এবং প্রাচীনকালের সাথে সমকালের সমন্বয় সাধনের পথ অনেকটা সুগম হল, একই সঙ্গে সে যুগের প্রগতিশীল মনে পরিচিত হল যুক্তিনিষ্ঠার, জাতীয় চেতনার, স্বদেশপ্রেমের আন্দোলন রূপেও। ধর্মকে আচার বন্ধন থেকে মুক্ত করে বাঙালি তথা বিশ্বমানবতার কল্যাণের বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং জীবনসাধনা। তাই সর্বপ্রকার তন্ত্র মন্ত্র বা অলৌকিক অনুভূতির চর্চা বন্ধ করে, 'তিনি চেয়েছিলেন একটি যুক্তিসঙ্গত নীতিবোধক ধর্মের উদ্বোধন ও বিকাশ ঘটাতে। তাঁর লক্ষ্য ছিল যাদের শক্তি নেই যারা নানা কারণে বঞ্চিত, অনগ্রসর তাদের উৎসাহ দিয়ে উদ্দীপনা দিয়ে আত্মপ্রত্যয়ী ও শক্তিশালী করা।'[৭] তিনি আধুনিক যুগের উপযোগী সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। 'তাঁর (রামমোহন) প্রতিভার মধ্যে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও মনকে মুক্ত রাখবার শক্তি।'[৮]

রাজা রামমোহন রায় জগৎ ও জীবন ভাবনায় উদ্ভাসিত হয়ে নবযুগের আলোকবর্তিকায় বাঙালি জাতিকে তমসার ধূম্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। 'মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনার আদর্শ তিনি বেনথামের (১৭৪৮-১৮৩২) উপযোগবাদী দর্শন থেকে লাভ করেছিলেন।'[৯] আজকে আমরা যে শাসন ক্ষমতার পৃথকীকরণে সুফল পাচ্ছি এটা সমাজের প্রগতির জন্য রাজা রামমোহন রায় শাসন ক্ষমতার পৃথকীকরণ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রামমোহন মনে করতেন মানুষকে দ্রুত প্রগতির গোড়ায় নিয়ে যেতে হলে সর্বাগ্রে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি আইন ও নৈতিকতাকে পরস্পর পৃথক বলে মনে করতেন। কারণ আইন একটি রাষ্ট্রীয় সংবিধানভিত্তিক নিয়মকানুন যা মানুষের কল্যাণে নিবেদিত আর নৈতিকতা হচ্ছে নিয়ম কানুনের ঊর্ধ্বে যা উদার মনের সুদৃঢ় আর্শীবাদ, এটা সুফল ছাড়া কোনকিছু আশা করা যায় না। তিনি মনে করতেন পৃথিবীর সকল মানুষের জীবনধারা একই আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে না। তাঁর মতে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রত্যেক দেশের লোকের জন্য পৃথক আইন থাকা বাঞ্ছনীয়। 'তিনি প্রশাসনের সুবিধার্থে তত্ত্বাবধান ও

ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ ও বোর্ড অব কন্ট্রোলের যুগপৎ অস্তিত্বের পক্ষপাতী ছিলেন, যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বৈরাচার না ঘটে। তিনিই প্রথম ভারতীয় হিসেবে ভারতীয় শিক্ষার ব্যবহার যথার্থ আধুনিকীকরণের মৌল প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।'[১০] তিনি বিচারবাদ ও পূর্ণতাবাদের আলোকে সমাজ সংস্কারমূলক কাজে এগিয়ে আসেন- যাকে আমরা অসুখবাদী ও নেতিবাচক উপযোগবাদ বলতে পারি।[১১]

মূলত রামমোহন ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। তাই পাটনা থেকে ফিরে সব সময় ধর্ম নিয়েই চিন্তা চেতনায় ব্যস্ত থাকতেন। ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ এবং হিন্দু শাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচলিত ধর্ম সম্বন্ধে তার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে তখন থেকেই তিনি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের কথা ভাবেন।

পলাশীর রণক্ষেত্রে সামরিক জয়লাভের পর এদেশে স্থায়ী প্রভুত্ব লাভ করার জন্য ইংরেজরা মিশনারিদের সহায়তায় এদেশের হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে তাদের সামাজিক ভেদবুদ্ধি জনিত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে শুরু করে। পরকালের মুক্তির জন্য না হলেও ইহকালের আর্থিক ও রাজনৈতিক মোহকর প্রলোভনে উনিশ শতকের গোড়াতেই অনেক হিন্দু খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। এ সময়ে এদেশের মুসলমানদের ক্ষেত্রে ইংরেজদের এ প্রলুব্ধকর আবেদন নানা কারণে ফলপ্রসূ হয়নি। বাঙালি তথা ভারতীয় হিন্দুদের জীবনেও এ ধর্মান্তরিতকরণ রীতিমতো একটা সংকটের সৃষ্টি করেছিল। রামমোহন তা যথাযথভাবে উত্তরণ করার মানসে নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি শুধু খ্রিস্টানদের প্রতিই বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন নি, হিন্দুদের ধর্মের সংস্কার কাজেও মনোনিবেশ করেন। তিনি হিন্দুদের পৌত্তলিক ধর্ম প্রণালী নামক গ্রন্থে মূর্তিপূজার নানা রকম ধর্মীয় কুসংস্কার তুলে ধরেন। এতে পরিবারের তথা পিতামাতার বিরাগভাজন হলে তিনি গৃহত্যাগ করে তিব্বতে গমন করেন। সেখানেও বৌদ্ধদের মূর্তিপূজার সমালোচনা করেন। তিনি একেশ্বরবাদের সমর্থনে *তুহ্‌ফৎ-উল-মোহাহিদীন* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বলেন, আমি দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করেছি, সমতল পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চলে নানান দেশে সব জায়গার মানুষ সেই একের অস্তিত্বে বিশ্বাসী যিনি স্রষ্টা এবং সৃষ্টির রক্ষাকর্তা। রামমোহন হিন্দু ধর্মকে কুসংস্কারমুক্ত একেশ্বরবাদে পরিণত করতে লাগলে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে একটি বিরোধী দল গঠিত হয় যারা তাঁর তীব্র সমালোচনা করেন। আরেক দল রামমোহনের সাথে যোগ দেয়। রাজা রামমোহন ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার জন্য ১৮১৫ সনে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি আলোচনা সভা গঠন করেছিলেন যার উদ্দেশ্য সাধনে তিনি চারটি পন্থা অবলম্বন করেন। যথা- (ক) তর্ক বির্তক ও আলোচনা (খ) সভা সংস্থাপন (গ) বিদ্যালয় সংস্থাপন ও শিক্ষাবিস্তার (ঘ) বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশ ও বিনামূল্যে তা বিতরণ। তিনি সকল মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করাবার জন্য ধর্মীয় সংস্কারে মনোনিবেশ করেন এবং উইলিয়াম এডাম এর সহযোগিতায় ১৮২১ সনে *ইউনিট্যারিয়ান* কমিটি নামে আরেকটি কমিটি স্থাপন করেন। তিনি ধর্মীয় ভাল দিকগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের উপর অধ্যয়ন করেন। ১৮২০-১৮২৩ সাল পর্যন্ত তিনি মিশনারিদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ত্রিঈশ্বরবাদের ধারণার অবসান ঘটান। এখানে তিনি সাধারণ উপযোগবাদের উপযোগিতা বা কার্যকারিতাকে কাজে লাগান।[১২] কাজেই এটা বলা যায় যে,

> প্রকৃত অর্থে রামমোহন রায় আধুনিক ভারতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি (রামমোহন) বিশ্বধর্মে হিন্দু মুসলমান, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলীদের বিশ্বাসের সাধারণ ভিত্তি

> অনুসন্ধান করেন। তিনি আরও লক্ষ্য করেন প্রত্যেক জাতির ধর্ম তার নিজস্ব কতগুলো ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক রূপায়ণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এই সাধারণ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।[১৩]

১৮২৯ সালে রামমোহন হিন্দু সমাজের সংস্কারের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) লিখেছেন,

> পৃথিবীর অন্য সব মহাপুরুষের মতো তিনি টাকা-পয়সা, বিদ্যা, খ্যাতি কোনকিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করেননি। তাঁর সমস্ত জীবন দিয়েই সেই একক সত্যকেই চেয়েছিলেন। ১৮৩০ সনে ৮ জানুয়ারী ব্রাহ্ম সমাজের নিজস্ব বাড়ীর অর্পণ নামা স্বাক্ষরিত হয় আর ৩০ জানুয়ারী উৎসব অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন ঐ ভবন জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত এবং সেখানে একমাত্র নিরাকার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা স্বীকৃত, কোন দেবতার পূজা নয়।[১৪]

তিনি বলেন, জগতের কর্মকাণ্ড ও গতিপ্রকৃতি থেকে বোঝা যায় যে, সমগ্র বিবর্তন প্রক্রিয়া একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার, একটি সুচিন্তিত উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন স্বরূপ। সুতরাং বিশ্বসৃষ্টির কলা কৌশল বিষয়ে একটু ভালভাবে চিন্তা করলেই জগতের মূলে যে একজন পরমেশ্বর আছেন তা বুঝতে আর কষ্ট হয়না। এ জ্ঞান কোন ধর্ম বিশ্বাসের বা কল্পনার ব্যাপার নয়, এটা পুরোপুরি বুদ্ধির দেয়া সুনিশ্চিত জ্ঞান। '১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকো বাসগৃহে তত্ত্বরঞ্জনি নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে 'তত্ত্ববোধিনী' সভা রাখা হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বিদ্যার প্রচার।'[১৫]

ধর্মকে আচার আচরণের বন্ধন থেকে মুক্ত করে বাঙালি তথা বিশ্বমানবতার যথার্থ কল্যাণ সাধনে বহন করাই ছিল তাঁর জীবন সাধনা। তাঁর মতে, সত্য ও যথার্থ জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পথ প্রার্থনা বা উপাসনাই নয় এর জন্য চাই অক্লান্ত পরিশ্রম ও সঠিক পদ্ধতির অনুশীলন। ধর্মের মানবিক দিকটাকে তিনি মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য যুগোপযোগী করে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানব মুক্তির পথ সুদৃঢ় করেছিলেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'অভিজ্ঞতা থেকে দূরবর্তী এবং যুক্তিবিরোধী বিষয়সমূহে আস্থা স্থাপন বিচক্ষণ লোকদের উপযোগী নয়।'[১৬] এ সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার বলেন,

> তিনি (রামমোহন) ভক্তমণ্ডলীর অনুকরণীয় আদর্শরূপে জীবনযাপন করেন নাই। সেখানেও তিনি বুদ্ধিমান ও শক্তিমান পুরুষের মত অটল অবিচলিতভাবে নিজের মনের মত জীবন যাপন করেছিলেন। এই বীরমূর্তি কোন সাধু দরবেশ বা ভক্ত সন্ন্যাসীর মূর্তি নহে।[১৭]

আল-কোরআনের সকল ধারায় যৌক্তিকতা রামমোহন বিশেষভাবে অধ্যয়ন করে চিন্তা-ভাবনায় মনোনিবেশ করলে তিনি একেশ্বরবাদে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁর মতে, জগৎ সৃষ্টি ও পরিচালনার মূলে যে এ ধরনের একজন বিধাতা আছেন, এ ধারণা অনেকের মধ্যেই বিদ্যমান। কিন্তু মানুষের আচার আচরণ সম্পর্কিত নানা মুনির নানা মত এ সম্পর্কে খ্রিষ্টধর্মে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা পাওয়া যায়। যীশুখ্রিস্টের প্রতি রামমোহন শ্রদ্ধাশীল থাকলেও যীশুর অলৌকিকতায় আশ্রয় নেননি বরং তিনি যীশুর নৈতিক শিক্ষার জন্য তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সেক্যুলার বলতে যদি ধর্মহীনতাকে না বুঝিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে এবং ধর্মতান্ত্রিক

বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াসকে বুঝানো হয় তাহলে নিঃসন্দেহে রামমোহনকে সেক্যুলার ভাবাপন্ন ভাবা যায়। কারণ তিনি ধর্মকে দেখেছেন,

> মানব মুক্তির উপায় হিসেবে, ধর্মে অনুসৃত প্রেম ও মানবতার অবলম্বনেই তিনি অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন মানব জীবনকে, প্রেমের পথেই তিনি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান প্রভৃতি বিশেষ ধর্মের সংকীর্ণতাকে, প্রেমের পথেই তিনি উন্নীত করেছিলেন বিশ্বমানবতাবোধকে।[১৮]

হিন্দু ধর্মে, সংস্কৃতিতে এবং জাতীয় জীবন ধারায় নানা প্রকার সংস্কার সাধনের জন্য সেদিন রামমোহন যে মুক্তবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, উনিশ শতকে ভারতীয় হিন্দু সমাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার জন্য লাভবান হয়েছে।

১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর তারিখে রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত চিঠিতে ইংরেজি শিক্ষা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন ফ্রান্সিস বেকনের পরে ইংল্যান্ডে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে। যে শিক্ষার অর্থ দাঁড়ায় মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ শিক্ষার পরিবর্তে যুগোপযোগী বিজ্ঞানভিত্তিক কুসংস্কারমুক্ত শিক্ষা। মার্কিন ইংরেজ গবেষক মন্তব্য করেছেন,

> রামমোহনের প্রস্তাব ছিল যে, ভারতীয় অপদার্থবিদ্যা (বা হিন্দু মেটাফিজিকস) আর সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ্যা শেখাবার দরকার নেই। দরকার পশ্চিমা বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত। তিনি ইংরেজিতে পারদর্শী ছিলেন বলে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণকে মাতৃভাষা বাংলা পরিত্যাগ করে ইংরেজি শেখার পক্ষে মত দেন নি বরং সার্বিক জ্ঞান অর্জন করার তাগিদে ইংরেজি শিক্ষার উপর মত দেন। তিনি ইউরোপ মহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এশিয়া মহাদেশের জনসাধারণের কাছে বোধগম্য করার জন্য শিল্পকলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং যে শিক্ষা ব্যবস্থা বোধগম্য নয় তা পরিত্যাগ করার কথা বলেন।[১৯]

তিনি সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করেন। কারণ তা সর্বসাধারণের বোধগম্য নয় আর ধর্মীয় মাদ্রাসা বা টোলের শিক্ষার জায়গায় বেকনের দর্শন লাভ করে উন্নতি বিধানের কথা বলেন। তিনি বৃটেনের আইন সভায় যুক্তিবিদ্যা চালু করার কথা বলেন। রাজা রামমোহন রায় নানা ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। ইচ্ছামত আরবি, ফারসি, হিন্দি, উর্দু ও ইংরেজি লিখতে, পড়তে ও বলতে পারতেন। গৌড়ীয় বাংলা ব্যাকরণই তাঁর বড় অবদান। তিনি মতামত দিয়েছিলেন আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা একপ্রকার ভাষাবিহীন বৈকি। 'এর সূত্রপাত হয়েছিল পরাধীনতার যুগে, ইংরেজি ভাষায় বিদ্যাদান করার ফলে এমন অবস্থা দেখা যায় এজন্য রাজা রামমোহন রায় দায়ী নয়।'[২০] ভারতবাসীর উন্নতির জন্যই রামমোহন রায় ইংরেজি শিক্ষার কথা মাথায় আনেন। তিনি ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় ইংরেজি স্কুল সংস্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এখানে তিনি উদ্দেশ্যমূলক উপযোগবাদের স্মরণাপন্ন হন।[২১] যার ফলশ্রুতিতে ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দু কলেজ যা পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ নামকরণ করা হয়। রাজা রামমোহন রায় শিক্ষা সংস্কারের জন্য কুসংস্কার মুক্ত হয়ে তিনি যে কাজটি করেছিলেন তা হল-

> ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে তিনি এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে, তিনি নিজেই ১৮২২ সালে এ্যাংলো হিন্দু স্কুল স্থাপন করেন। এছাড়া ১৮২৬ সালে বেদান্ত কলেজ নামে একটি কলেজ স্থাপন করে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারেরও চেষ্টা করেছিলেন।[২২]

বাংলা গদ্যের বিকাশের পথে রামমোহন রায়ের কৃতিত্ব কম নয়। তিনিই ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্যের প্রথম প্রচলন করেন। ইংরেজ বিজয়ের ফলে সেকালের ভারতবর্ষ রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নানাবিধ সংকটের সম্মুখীন হয়। '...রামমোহনের গদ্য-রচনাভঙ্গীর ভিতরে আত্মশক্তিতে এবং আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত প্রশান্ত সুগভীর মননশীল ও ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছে। রামমোহনে এসেই আমরা দেখতে পাই বাংলা গদ্য একটা বলিষ্ঠ চিন্তা ও যুক্তিতর্কের ধারণক্ষম বাহন হয়ে উঠেছে। রাজা রামমোহন রায় *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* নামক বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এটাকেই বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল প্রথম ব্যাকরণ বলা যেতে পারে। রামমোহন সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি প্রচলন নিয়ে আলোচনা না করে বাংলা ভাষার নিজস্ব রীতি প্রকরণ নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছিলেন।'[২৩] ভাষা কি রকম হওয়া উচিত সেদিকে লক্ষ্য না দিয়ে ভাষাকে যেভাবে তিনি পেয়েছিলেন তার একটি পরিচয় দেবার চেষ্টা এই ব্যাকরণে করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর আরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল সতীদাহ প্রথা, জাতিভেদ, কন্যা বিক্রয়, বহুবিবাহ প্রথা রোধের মাধ্যমে সমাজসংস্কার করা।

সতীদাহ ছিল হিন্দু সমাজের প্রচলিত প্রথা যা নিঃসন্দেহে ধর্মীয় কুসংস্কার। মৃত স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক দাহ করবার অমানুষিক রীতি দূর করবার চেষ্টা সম্রাট আকবরের আমল থেকেই চলে আসছিল। শৈশব থেকেই রামমোহন হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক সহমরণ প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু ১৮১১ সালে তার বড় ভাইয়ের স্ত্রী সহমরণের পর তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি এ ভয়ঙ্কর অমানবিক কুসংস্কার সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে যাবেন। ১৮১৮ সাল থেকেই রামমোহন এই প্রাচীন ও নিষ্ঠুর কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গ্রহণে ব্রতী হন। একদল উদারপন্থীদের সাহায্যে এই প্রথার বিরুদ্ধে ঘোর প্রচারকার্য চালিয়ে যান। তিনি সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে ৩টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মতে,

> বিত্তলোভই সহমরণের একমাত্র অভিসন্ধি। ১৮২৯ সালে তৎকালীন ভারতের গর্ভনর জেনারেল লর্ড বেন্টিংক রামমোহনকে সমর্থন পূর্বক একটি রেজুলেশন পাশ করে সহমরণ নিষিদ্ধ করেন। গোঁড়া হিন্দু এতে প্রতিবাদ জানালে ১৮২৯ সালে ৪ ডিসেম্বর বড়লাট বেন্টিংক আইনের দ্বারা সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধন করেন।[২৪]

কন্যা বিক্রয় করার প্রথা ভারত উপমহাদেশ তথা সারা বিশ্বে কম বেশি ছিল। কন্যার পিতারা অর্থলোভেও অতি কষ্টের কারণে অল্প বয়সী মেয়েদের বিবাহ দানে বাধ্য হত যা আজকাল পত্রিকার পাতায় এমনকি প্রথম পৃষ্ঠায় অহরহ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া অনেক সময় যে ব্যক্তি অধিক অর্থ দিতে পারে তার সাথেই মেয়ের বিবাহকার্য সম্পন্ন করা হয় যার ফলে অর্থের লালসায় বৃদ্ধ, রুগ্ন, অঙ্গহীন, কুৎসিত, অসামাজিক ও নেশাগ্রস্থ ব্যক্তির সঙ্গেও কন্যার বিবাহ দেয়া হতো। ফলে স্বভাবতই অনেক কন্যা অকারণে বিধবা হয়ে যেত অথবা সারাজীবন অত্যন্ত কষ্টে দিনযাপন করতে হতো। রাজা রামমোহন রায় এই প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন এবং তাঁর প্রতিবাদের ফলে তা কার্যকর হয়।

রাজা রামমোহনের সময় বাংলাদেশে হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম ও খ্রিস্ট ধর্ম এবং কৃষ্টির সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। জাতিভেদ পীড়িত সমাজব্যবস্থার চাপ থেকে আপাত মোহনীয় খ্রিস্টধর্মের আকর্ষণে সাধারণ হিন্দু স্বাভাবিকভাবেই মুগ্ধ হয়েছিল:

> জাতীয় জীবনের এই মর্মান্তিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করেই হিন্দু, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের সার সংকলন করে রামমোহন ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।...তাঁর প্রতিটি কর্মেই মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার ছাপ ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট।[২৫]

রাজা রামমোহন তাঁর সংস্কারমূলক কাজ হিসেবে জাতিভেদ প্রথার বিলুপ্তি সাধন করেন। তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে জাতিভেদ প্রথা সমাজ কল্যাণে মারাত্মক অন্তরায় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বিভিন্ন জাতি তো আছেই, বিশেষ করে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগ বিভিন্ন অহমিকার সৃষ্টি করে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। সমাজ বা রাষ্ট্রের এসব জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে উন্নতির উচ্চ শিখরে মিলন মেলায় পৌঁছানো সম্ভব। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি তাঁর জীবনকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন। একদিকে তিনি যেমন বেদান্তের প্রচলিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা স্বীকার না করে নিজেই তার একেশ্বরবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করেন, অন্যদিকে তেমনি জাতিভেদ প্রথার তত্ত্বগত জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করে জাতিভেদ প্রথা সমাজের জন্য ক্ষতিকর তা সর্বাগ্রে দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন। সংস্কারক রাজা রামমোহনকে রক্ষণশীল ভারতীয় হিন্দু সমাজ সহ্য করতে পারুক বা না পারুক ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে তিনি যে চিন্তা তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিলেন তার কল্যাণময় ফল আজও সমাজদেহে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বেদ, বেদান্ত, আল-কোরআন ও বাইবেল প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থ মন্থন করে তিনি তাঁর জীবনদর্শন সন্নিবেশিত করেছিলেন। তাঁর ধর্মের ভিত্তি ছিল মুক্তবুদ্ধি ও যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষণের উপর। তার দর্শন হচ্ছে উপযোগবাদী তথা মানবকল্যাণ।

রাজা রামমোহন বহু বিবাহ প্রথারও বিরোধী ছিলেন। তিনি অসহায় রমণীকুলের নিশ্চিত আশ্রয়ের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন যে, কোন ব্যক্তি এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করতে চাইলে তাকে ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোন রাজ কর্মচারীর নিকট প্রমাণ করতে হবে যে তার স্ত্রীর নির্দিষ্ট কোন দোষ বা দুর্বলতা রয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রী যদি দুরাসক্তা, দুশ্চরিত্রা, স্বামীর প্রতি বিদ্বেষী কিংবা রোগগ্রস্ত হয় তাহলে স্বামী পুনরায় বিবাহ করতে পারবেন। তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষে সমর্থনপূর্বক পুস্তক প্রকাশ করেন যাতে বিধবা নারীর পুনঃবিবাহকে সমাজের জন্য শান্তিকামী উল্লেখ করা হয়। এখানে তিনি কর্মনীতিভিত্তিক উপযোগবাদের উপযোগিতা বা কার্যকারিতাকে যথার্থভাবে কাজে লাগান।[২৬]

রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ছিল প্রগতিশীল। তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তাঁকে জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক বলা হয়। প্রধানত রামমোহন রায়ের উদ্যোগে বিদেশী সরকারের নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদ সমূহের মধ্যেই জাতির চেতনাবোধের প্রাথমিক প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর সময়ে সংঘটিত ইংল্যান্ডের সংস্কার আন্দোলন এবং ইউরোপের উদারবাদী ও জাতীয়তাবাদী বিপ্লবসমূহের অগ্রগতি রামমোহন গভীর আগ্রহের সাথে পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতেন যে, 'স্বাধীনতার শত্রুরা ও স্বৈরতন্ত্রের বন্ধুরা কখনও সাফল্য মণ্ডিত হয়নি এবং কখনও হবেও না।'[২৭] তাঁরই আদর্শে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেস অনুসৃত হয়েছিল। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের উপর সরকারি বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহন ব্রিটিশ সরকারের কাছে জোরালো দাবি উত্থাপন করেছিলেন–যাতে ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও দেশপ্রেমের

অভিব্যক্তি। ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবি জানাতে গিয়ে রামমোহন বলেছিলেন যে,

> এই স্বাধীনতা (সংবাদপত্রের) দরকার কারণ তা না হলে জনসাধারণ নিজেদের অভাব অভিযোগ স্বাধীনভাবে সরকারের কাছে জানাতে পারবে না এবং তার ফলে সরকারের পক্ষে দেশের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে যদি স্বাধীনতার মতামত ব্যক্ত করার অধিকার জনগণের না থাকে তাহলে এদেশে ইংরেজ শাসন বিরোধী বিপ্লবী শক্তি (মূলত কৃষকশক্তি) জোরদার হবে এবং পরিণতিতে তা হয়ে দাঁড়াবে বৃটিশ শাসনের পক্ষে বিপদজনক। এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রয়োজন।[২৮]

রামমোহন ১৮২২ খ্রিঃ ‘মীরাতুল আখবার’ নামে ফরাসী ভাষায় একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় কৃষকের অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিলেতে যাত্রা করেন এবং সেখানে তিনি কোম্পানির শাসন, অত্যাচার নিপীড়নে ভারতীয়দের দুরবস্থার কথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তুলে ধরেন। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের সুপারিশ করেন। তিনি মতামত পেশ করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া উচিত কৃষকদের সঙ্গে জমিদারদের সঙ্গে নয়। তাছাড়া তিনি সমর বিভাগের ভারতীয়করণ, জুরী প্রথার প্রবর্তন দিওয়ানি ও ফৌজদারি আইন সংকলন, নতুন আইন প্রবর্তনের পূর্বে ভারতীয়দের পরামর্শ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে সুপারিশ করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, সারা জীবন এই অবিস্মরণীয় মানুষটি এক সুনির্দিষ্ট, মহৎ আদর্শ স্থাপনের লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তার জন্য প্রচুর নির্যাতন ভোগ করেছেন, দুঃখ বরণ করেছেন, কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র আদর্শচ্যুত হন নি। তিনি ছিলেন চিন্তায় তাঁর যুগের অনেক অগ্রগামী, তাঁর কালে সামগ্রিকভাবে তাঁর আদর্শের মর্ম বুঝবার মতো মানুষ আশেপাশে তিনি কমই পেয়েছিলেন। এমনকি তুলনা করলে দেখা যায় এ দেশে তাঁর অনুকূলে মিত্র গোষ্ঠীর মধ্যেও তাঁর মনীষী ও মহত্ত্ব বিষয়ে পূর্ণ ধারণার অধিকারী মানুষ প্রায় ছিলেন না বললেই হয়। রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে,

> রাজা রামমোহন রায় সেই সময়ের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন, যিনি আধুনিক যুগের তাৎপর্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর চিন্তা ও কর্মের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল মানব সভ্যতার ধারণা শুধু স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে পাওয়া যায় না, বরং ব্যক্তি এবং জাতির পরস্পর সম্পর্কের উপর নির্ভর করে ‘মানব সভ্যতা’ গড়ে উঠেছে।[২৯]

এরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজা রামমোহন অনুসারীরা সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে, দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত সংস্কারকে যতদূর সম্ভব বিসর্জন না দিয়ে যেটুকু রামমোহনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা যায় তার বেশি এরা বাস্তব জীবনে অগ্রসর হতে সচরাচর প্রস্তুত ছিলেন না। আত্মীয় সভার অধিবেশনে সতীদাহ প্রথার আলোচনাও এ বিষয়ে রামমোহনের প্রকাশ্য প্রতিবাদ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু সদস্য এর সঙ্গে সংস্রব বর্জন করেন। রামমোহনের বিলাতযাত্রার অব্যবহিত পরেই এক দ্বারকানাথ ঠাকুর ভিন্ন তাঁর

বন্ধুমণ্ডলির প্রায় সকলেই একে একে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তারপরেও–

> যখন তিনি ব্রাহ্ম সমাজে আত্মনিয়োগ করেন তখন দ্বারকানাথও তাঁকে বিলাত থেকে পত্র লিখে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন (বিষয়কর্ম উপেক্ষা করে তিনি ধর্ম চর্চায় মেতে উঠেছেন বলে)। দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ চর্চাতেও তাঁর পিতার আপত্তি ছিল ওই একই কারণে। সুতরাং মানসিকভাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুমণ্ডলির সঙ্গেও রামমোহনের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল। কিন্তু এই দূরত্ব ও তজ্জনিত ক্লান্তি ও নিঃসঙ্গতাবোধ জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারে নি।[৩০]

বাংলাদেশ দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায়, রামমোহনই প্রথম ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি বাঙালি তথা ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ড. আব্দুল হাই তালুকদার তাঁর *Humanism in Bengal থিসিস*-এ বলেন,

> তাঁর (রামমোহন) ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি বাঙালিদের ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা, সাহিত্য এবং রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন অথবা তিনি দেশবাসীদের মনে এই সমস্যাগুলো সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৩১]

তিনিই ইউরোপীয় ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬), জেরেমি বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২) ও জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) প্রমুখের উপযোগবাদী দর্শন ও প্রত্যক্ষবাদী বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও যুক্তিবাদী সমাজ সংস্কারে বিচারবুদ্ধিসম্মত সংস্কৃতি গ্রহণের জন্য এদেশের মানুষের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করেন। বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই তিনি ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হন; শুধু ভাষায় নয়, উপযোগবাদী দর্শন, ইতিহাস ও কালচারে তিনি বিশেষজ্ঞ হন। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এই নব পদ্ধতি দ্বারা তিনি বাঙালি জাতির গতানুগতিক স্থিতিশীল মনের উপর পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের যুক্তিবাদী তথা বিচার-বিশ্লেষণবাদী কার্যকর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করেন। তিনি স্বয়ং অতীতের কুসংস্কার ও ধারণা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে বাঙালি তথা ভারতবাসীকে এই নবশিক্ষায় আহ্বান জানান। রামমোহনের সময় পর্যন্ত তাঁর মতো পাশ্চাত্য জ্ঞানদীপ্ত প্রতিভার আবির্ভাব হয় নি। 'রামমোহনের কথা ছিল 'জ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হও' ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনকে আয়ত্ত কর, অতীতের সকল মোহ থেকে মুক্ত হয়ে সকল বন্ধনকে ডিঙিয়ে চল, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনের নানা সত্য আবিষ্কার করে নব নব সৃষ্টির ভিতর তার পূর্ণতার সন্ধান কর, ইত্যাদি।'[২৮] তিনি ইসলাম ধর্মের কোরআন, মুতাজিলা দর্শনের যুক্তিবাদ, সুফি দর্শনের সাম্য, প্রেম ও মানবতাবাদ, খ্রিস্টান ধর্মের বাইবেল ও প্রেম-দর্শন শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব দর্শনের শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র ও পুরাণ-দর্শন, বিশেষভাবে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদী দর্শনের মধ্য হতে যুগোপযোগী প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে উপযোগবাদী চিন্তা চেতনায় বিশ্বমানের উদ্যানে সার্বভৌমিক এক মিলনভূমি আবিষ্কারে সচেষ্ট হন। তিনি অবশ্য ভারতের হিন্দু জাতির বিচিত্র ঐতিহাসিক সভ্যতাগুলির বিশিষ্টতা রক্ষা করেই সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃত ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন। সতীদাহ নিবারণ রামমোহনের সর্বপ্রধান সমাজ সংস্কারমূলক কাজ হলেও তাঁর সংস্কার কাজ এই একটি মাত্র ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। স্ত্রী শিক্ষা, বাংলা গদ্যের সংস্কার, বিজ্ঞানের চর্চা, সংবাদপত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি উৎসাহী ছিলেন এবং তার জন্য অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করেছিলেন।

তৎকালীন সামাজিক কাঠামোর মধ্যে এইসব প্রচেষ্টার ভূমিকা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রগতিশীল ও উপযোগবাদী চিন্তাধারার ফলশ্রুতি ।

তথ্যসূচি:

১. Joarder, Safiuddin, *Introduction in David Kopf and Safiuddin Joarder*, eds., *Reflections of the Bengal Renaissance,* Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1977, p. 18. "In some sixteenth century writings, we come across the renascent of art, ***Renaissance*** in the sense of the liberation of human mind from the trammels of medievalism, of the outburst of individualism, of the freedom of thought and action, of the establishment of man as the arbiter of his own destiny of himself".

২. শরীফ হারুন, *বাংলাদেশ দর্শন ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান* (তৃতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৮১

৩. ইয়াসমিন আহম্মেদ, *উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*, ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, ১৯৯৪, পৃ. ২০

৪. ড. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন: প্রাচীনকাল থেকে সমকাল*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ-১০৭

৫. কর্মনীতি ভিত্তিক উপযোগবাদ বা নিয়ম-উপযোগবাদ হচ্ছে কোন বিশেষ কর্ম যদি সুনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় তবে তা সৎ, আর নিয়ম-নীতিটি যদি বহুজনের উপকার সাধন করে তবেই তাকে সুনীতি বলা হয় । এই নিয়মের সাথে নীতির সু-সম্পর্কের ফলে যখন সর্বসাধারণের সুখ অনুভব হয় তখন তাকে নিয়ম-উপযোগবাদ বলা হয় । উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিস্কার করা যায় । যেমন-কারো সাথে বিকেল চারটায় দেখা করব বলে কথা দিয়েছি । পথিমধ্যে দুর্ঘটনায় আহত বালককে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে গিয়ে কথামত চারটায় সাক্ষাৎ করতে দেরি হলেও দোষ হয় না । কারণ এখানে নিয়মের চেয়ে জীবন রক্ষা করার কাজে এগিয়ে যাওয়াই জরুরী, এখানে আরো স্পষ্ট যে, প্রত্যেকের নিয়মের একটি নীতি আছে আর এই কাজের মধ্যে উপযোগিতা আছে । কেননা দুর্ঘটনায় আহত বালক সুস্থ হলে অনেকেরই আত্মা শান্তি বা সুখ লাভ করবে ।

৬. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলা পিডিয়া*, এসিয়াটিক সোসাইটি, (৯ম খণ্ড), ২০০৪, পৃ. ৭৩

৭. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন: প্রাচীন কাল থেকে সমকাল*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১০৯

৮. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪, পৃ. ১৮

৯. মোঃ মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন, মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৫৫৯

১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬১

১১. সর্বাধিক লোকের জন্য সর্বাধিক কল্যাণ হচ্ছে সুখবাদী উপযোগবাদ । কিন্তু এমনও হতে পারে, সুখ বহির্ভূত সর্বাধিক কল্যাণ, তাহলে তা হবে অসুখবাদী উপযোগবাদ । যেমন- বিচারবাদ ও পূর্ণতাবাদের মাধ্যমেও সর্বাধিক মানুষের কল্যাণ সাধিত হতে পারে । আর 'সুখবাদ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সার্বিক কল্যাণ হলে তা হবে অসুখবাদী উপযোগবাদ ।' নেতিবাচক উপযোগবাদ (negative utilitarianism) এই মতবাদ অনুসারে সর্বাধিক মানুষের দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা, বেদনা ও যন্ত্রণা দূর করে সর্বাধিক কল্যাণ আনয়ন করে । এখানে স্পষ্টত: বলা যায় যে, "যা মানুষের দুঃখ কষ্টের লাঘব ঘটায় এবং সর্বাধিক মানুষের কল্যাণ সাধন করে তাকে নেতিবাচক উপযোগবাদ বলে ।"

১২. সাধারণ উপযোগবাদ (general utilitarianism) কোন পরিস্থিতিতে কোন নিয়মে ভাল কাজ হয় এগুলো না জেনে শুনে বরং এটাই যথেষ্ট যে, একই পরিবেশে একই কাজ যদি একজনের কাছে ভাল হয় তাহলে অন্য যে কেউ ঠিক ঐ পরিবেশে একই কাজ ভাল করবে। অর্থাৎ পরিবেশ ও কাজ ঠিক থাকলে জনসাধারণের পরিবর্তন হলেও তাতে সমস্যা হবে না। ফলে ভাল কাজটি সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। সাধারণ উপযোগবাদকে সার্বিক উপযোগবাদও বলা যায়।

১৩. Quoted from sister Nivedita, *Master as I saw him in Saumyndranath Togores Rommohon Roy His Role in Indian Renaissance*, 1964, p. 99. "Rommohon Roy, the processor and in a very real sense the father of the modern India, Sought the universal Religion, the common bases of the Hindu, Moslim, Christian and other faiths. He found that each of the national religions was based on this common faith with a certain distinctive historical and cultural embodiment."

১৪. ইয়াসমিন আহমেদ, *উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২৬

১৫. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৬১

১৬. ভুদেব চৌধুরী, *বাঙলা সাহিত্যের নবজাগরণ ও রামমোহন*, কলিকাতা, ১৩৮৪, পৃ. ১১

১৭. মোহিতলাল মজুমদার, *বিবিধ কথা*, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৯২

১৮. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন: প্রাচীনকাল থেকে সমকাল*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১১০

১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ২১

২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

২২. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৮

২৩. ইয়াসমিন আহমেদ, *উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২৬

২৪. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৭

২৫. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলা পিডিয়া* (৯ম খণ্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪, পৃ. ৭৪

২৬. কর্মনীতি ভিত্তিক উপযোগবাদ বা নিয়ম-উপযোগবাদ হচ্ছে কোন বিশেষ কর্ম যদি সুনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় তবে তা সৎ, আর নিয়ম-নীতিটি যদি বহুজনের উপকার সাধন করে তবেই তাকে সুনীতি বলা হয়। এই নিয়মের সাথে নীতির সু-সম্পর্কের ফলে যখন সর্বসাধারণের সুখ অনুভব হয় তখন তাকে নিয়ম-উপযোগবাদ বলা হয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিস্কার করা যায়। যেমন-কারো সাথে বিকেল চারটায় দেখা করব বলে কথা দিয়েছি। পথিমধ্যে দুর্ঘটনায় আহত বালককে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে গিয়ে কথামত চারটায় সাক্ষাৎ করতে দেরি হলেও দোষ হয় না। কারণ এখানে নিয়মের চেয়ে জীবন রক্ষা করার কাজে এগিয়ে যাওয়াই জরুরী, এখানে আরো স্পষ্ট যে, প্রত্যেকের নিয়মের একটি নীতি আছে আর এই কাজের মধ্যে উপযোগিতা আছে। কেননা দুর্ঘটনায় আহত বালক সুস্থ্য হলে অনেকেরই আত্মা শান্তি বা সুখ লাভ করবে।

২৭. বদর রুদ্দীন উমর, *ঈশ্ব চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২৬

২৮. Quoted from *Rabindranath Tagore, Rammohan Roy, His Role in Indian Renaisance, by Saumendranath Tagore,* Asiatic society, Calcatta, 1975, p. 98. "Rammohan was the only person in his time in the whole world of men to realise completely the significance of the modern Age. He knew that the ideal of human civilization did not lie in the isolation of independence, but in the brotherhood of interdependence of individuals as well as nations in all spheres of thought and activity."

২৯. শরীফ হারুন, *বাংলাদেশ দর্শন ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান* (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৬৯

৩০. Talukder, Abdul Haye, *Humanism in Bengal (1815-1891): A study in Philosophical Thought (unpublished thesis),* Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1991, p. 48.

৩১. শরীফ হারুন, *বাংলাদেশ দর্শন ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান* (তৃতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৮৫, ৮৬

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর

মঈন উদ্দীন আহমেদ*

সারসংক্ষেপ: উনিশ শতকের বাংলাদেশে যে সমস্ত কীর্তিমান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'বীরসিংহের সিংহপুরুষ' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) ছিলেন অন্যতম। বাঙালি জাতির আশীর্বাদরূপেই যেন তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। একদিকে আধুনিক শিক্ষা ও বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান যেমন মাইলফলক হয়ে রয়েছে, অন্যদিকে সমাজসংস্কারক হিসেবেও তিনি স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। মৃত্যুবরণের শতাব্দীকাল পেরিয়ে গেছে, তবুও এই কৃতীপুরুষের ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য নিষ্কম্প প্রদীপের মতো আজও দীপ্তিমান রয়েছে বাঙালির হৃদয়ে। বস্তুত ধর্ম ও শাস্ত্রাচারের মোড়কে আবৃত, অসত্য ও অশুভ প্রভাবে আচ্ছন্ন সমসাময়িক বাঙালি হিন্দু সমাজকে বিদ্যাসাগর মানবতাবাদে উজ্জীবিত করে সত্য-সুন্দরের দিকে আবাহন জানিয়েছিলেন। নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, অসাধারণ মেধা-দক্ষতা, আর কর্মবহুল জীবন তিনি উৎসর্গ করেছিলেন মানবকল্যাণে। সমাজে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ কিংবা বাল্যবিবাহ নিবারণ, আধুনিক শিক্ষার প্রসারণ, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, শিল্পসম্মত বাংলা গদ্যের উদ্ভাবন প্রভৃতি শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারকমূলক কাজের মধ্যদিয়ে মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা ও কল্যাণকামী চেতনারই প্রতিফলন ঘটেছে। উল্লেখ্য, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সুচিন্তিত মতামত এ কালেও প্রাসঙ্গিক। তাঁর মানবতাবাদী দর্শন নাগরিক জীবনে বিদ্যমান অস্থিরতা দূর করে কল্যাণময় সমাজ গঠনে সহায়ক হতে পারে এখনও। ক্রমক্ষয়িষ্ণু মানবীয় মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাঁর জীবনেতিহাস থেকে আমরা খুঁজে পেতে পারি যথাযথ নির্দেশনা। স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতাপূর্ণ আজকের সমাজে বিদ্যাসাগরের উদারতা-পরার্থপরতার দৃষ্টান্ত আমাদের মানসিক সমৃদ্ধি ঘটাবে, বর্তমান তরুণ প্রজন্ম নিজেদের মনন গঠনে তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কল্যাণের পথে এগিয়ে যাবে, এমন প্রত্যাশায় আলোচ্য নিবন্ধে বিদ্যাসাগরের মানবপ্রেমসঞ্জাত বর্ণময় কীর্তিগাথা থেকে সংক্ষেপে কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

একসময় সমগ্র ইউরোপে রেনেসাঁসের মধ্যদিয়ে সামাজিক বিপ্লব সংঘটনের পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির যে নবরূপায়ণ ঘটেছিল, তার মূলে ছিল উদার মানবতাবাদ। সামন্তবাদের বিরোধিতা, বিজ্ঞানের অনুশীলন, অভিজাততন্ত্রের পরিবর্তে কৃষক-শ্রমিক ও বুর্জোয়া শক্তিকে সংহত করা, জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কারণে পরিচালিত সেই রেনেসাঁস আন্দোলন সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে মানবতাবাদী সেক্যুলার সংস্কৃতির বিকাশেও সহায়ক হয়েছিল। উল্লেখ্য, সেই রেনেসাঁসের সঙ্গে কোনো ধর্মীয় আন্দোলন যুক্ত ছিল না। উনিশ শতকের তথাকথিত ভারতীয় রেনেসাঁসের মাধ্যমে বাঙালি মধ্যশ্রেণীর উত্থান ঘটে। সেই নবজাগরণের নেতা হিসেবে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, ডিরোজিও, কৃষ্ণমোহন, রামগোপাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ব্যক্তির নাম ঢালাওভাবে উল্লেখ করা হয়। লক্ষণীয় বিষয়, এরা চিন্তায়-চেতনায় কিন্তু একই রকম নন, পৃথক বৈশিষ্ট্যের ছিলেন। এদের কেউ কেউ সামন্তবাদী চেতনা ধারণ করেই ধর্মীয় সংস্কার-আন্দোলনে নিযুক্ত হয়েছিলেন, আবার কেউ কেউ সেই আন্দোলন থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ বিযুক্ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর নির্ভরতার সুবাদে সামন্তবাদী রক্ষণশীল চেতনায় আচ্ছন্ন ছিল সমাজের একটি বৃহৎ অংশ। সেখান থেকে বাঙালি মধ্যশ্রেণীর সেই উত্থান কেবল ধর্মীয় সংস্কার-আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল বলে ধর্মীয় চিন্তা-সংস্কার দ্বারা প্রবলভাবে আচ্ছন্ন জাতিকে মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধকরণে সহায়ক হয় নি। তবে

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

প্রগতিশীল একটি পক্ষ মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠায় সেক্যুলার সংস্কৃতির বিকাশে নানা সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীল অন্য পক্ষটি বিরুদ্ধ অবস্থান নিয়েছিল তার। 'হিন্দু সমাজের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে প্রতিটি বর্ণের লোকের জীবন এমন কঠিনভাবে নির্দিষ্ট ছিল যে, তার মধ্যে কোনো নতুন ধরনের মানবীয় সম্পর্ক গড়ে তোলা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার ব্যতীত সম্ভব ছিল না।'[১] শ্রেণীগত বিকাশের প্রয়োজনে মধ্যশ্রেণীর প্রগতিবাদী অংশটি সামন্তবাদী চেতনা ধারণ করেও নানাবিধ সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সেই সংস্কার আন্দোলনে আবির্ভূত হয়েছিল। মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ কিংবা সামাজিক সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিল। 'কিন্তু ইউরোপীয় মানবতাবাদের মতো কোনো মানবতাবাদের বিকাশ বাঙলাদেশে না ঘটলেও মানবতাবাদের একটা খণ্ডিত রূপ এখানে অবশ্য দেখা গিয়েছিল এবং সেই খণ্ডিত মানবতাবাদের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি ঘটেছিল ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে।'[২] মূলত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রগতিবাদের মহামন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সেক্যুলার সংস্কৃতির বিকাশে মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষায়, সাহিত্যে, সমাজে মানবতার উন্মেষ ও বিকাশে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছিলেন। অপার্থিব থেকে পার্থিবের প্রতি, স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যের মানুষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। শাস্ত্রকে বড় করে না দেখে বড় করেছিলেন মানুষকে। মানুষের কল্যাণই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান ও অভিজ্ঞান। তাই মানবতার আদর্শ আত্মস্থ করে সমাজদেহে তার প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতিকে তিনি মানবপ্রেম ও কল্যাণে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। মানবতার সেবায় উৎসর্গিতপ্রাণ এই মহানুভব মানুষটি স্বীয় বদান্যতা, পরদুঃখকাতরতা ও পরার্থপরতার জন্য পরিচিতি পেয়েছিলেন 'দয়ার সাগর' হিসেবে। তিনি ছিলেন অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চারকণ্ঠ, কুসংস্কার আর নীচতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামীপুরুষ। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণতনয় ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃতজ্ঞ, সংস্কৃতের অধ্যাপক হয়েও রক্ষণশীলতার মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। ইংরেজ সান্নিধ্যে, ইংরেজি শিক্ষায় ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে তাঁর চেতনায় উদার মানবতাবোধ বিকশিত হয়েছিল। ঈড়হংবৎধঃরংস রং ঃযব মৎধাব ড়ভ রহঃবষষরমবহপব এই সত্যটিও গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাইতো স্বীয় চেতনায় লালিত প্রগতিশীল উদার মানসিকতা দিয়ে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দুর্দশাগ্রস্ত বিকলাঙ্গ হিন্দু সমাজকে সুস্থ-সুগঠিত করে ধাবিত করতে চেয়েছিলেন কল্যাণের পথে।

বাংলাদেশে পৌত্তলিকতা, সহমরণ প্রথা, ধর্মের নামে চিরাচরিত নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সংগ্রামে নেমেছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। শত-শতাব্দীর কুসংস্কার ও জীর্ণতার অচলায়তন গুঁড়িয়ে দিতে আঘাত হেনেছিলেন ধর্মের দুর্গে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধর্মের বৈদান্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি স্বীয় প্রচেষ্টার সফলতা কামনা করেছিলেন। পৌত্তলিকতার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে একেশ্বরবাদে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বৈদিক শাস্ত্রে একেশ্বরবাদের মহিমা উপলব্ধি করে হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এর উপর ভিত্তি করে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম মতের প্রতিষ্ঠা করে আচারিক ধর্মকে বোধের জগতে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে যদিও তাঁর প্রত্যক্ষ সাফল্য তেমন ছিল না, তবে রক্ষণশীল হিন্দুদের শত আপত্তি, বিরুদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সহমরণ প্রথার মতো মানবতাবিরোধী অতিবর্বর একটি নিয়মের উচ্ছেদ করতে পেরেছিলেন। রামমোহনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিংক 'সতীদাহ নিবারণ আইন' (১৮২৯) প্রণয়ন করেছিলেন, সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়েছিল। সতীদাহ নিবারণ রামমোহনের সর্বপ্রধান সমাজসংস্কারমূলক কাজ হলেও স্ত্রীশিক্ষা, বাংলা গদ্যের সংস্কার, বিজ্ঞানের চর্চা, সংবাদপত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়েও মনোনিবেশ করেছিলেন। বিশেষত বাংলা গদ্যে

প্রাঞ্জল ভাষারীতি ব্যবহার করে ভাষাকে সর্বজনবোধ্য করে তোলা রামমোহনের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। তিনি ধর্ম ও দর্শনের নানাবিধ জটিল বিষয় বাংলা গদ্যে সাবলীলভাবে আলোচনা করে গদ্যের অন্তর্নিহিত শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর হাতেই প্রথম বাংলা গদ্য গুরুতর বিষয়, উচ্চতর চিন্তাধারা প্রকাশের বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। বিপুল মনীষা ও লোকোত্তর প্রতিভা দ্বারা রামমোহন একদিকে যেমন বাঙালি সমাজে জাগরণের সৃষ্টি করেছিলেন, অন্যদিকে সাহিত্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে আধুনিক যুগের সূচনা করেছিলেন। এটা সত্য, বাংলা গদ্যের অতি শৈশব কালের লেখক হিসেবে তাঁর লেখায় শব্দের পারিপাট্য, বাক্য ব্যবহারে কুশলতা কিংবা আলঙ্কারিক সৌন্দর্যের ঘাটতি ছিল। রচনায় যুক্তির তীক্ষ্ণতা, বুদ্ধির দীপ্তি থাকলেও শৈল্পিক সাহিত্যগুণ ছিল না। তবে উত্তরকালের বিকশিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন তাঁর দ্বারাই হয়েছিল। সুতরাং শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের অবদান প্রথমেই স্মরণ করতে হয়।

রামমোহনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। রামমোহনের আরব্ধ সংস্কারকর্মে সাফল্য প্রদানের ব্রত নিয়েই মাঠে নেমেছিলেন। অবশ্য উভয়ের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের ধরনে স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। রামমোহনের সংস্কারচিন্তা ছিল মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। বেদান্তকে তিনি সত্যদর্শন হিসেবে স্বীকার করেছেন। তবে বেদান্তের প্রচলিত ব্যাখ্যা অস্বীকার করে নিজেই তার একেশ্বরবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। আবার বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েও প্রথাসিদ্ধ সংস্কার মেনে চলতেন। ব্রাহ্মণের জন্য নিষিদ্ধ কোনো খাদ্য গ্রহণ করতেন না, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার সঙ্গে আহারে বসতেন না, এমনকি ব্রাহ্মণের পবিত্র উপবীতও ধারণ করতেন। রামমোহনের বাংলা রচনার প্রায় সবই ছিল ধর্মবিষয়ক। সেসব বেদান্ত-উপনিষদের গণ্ডিতেই আবর্তিত হয়েছিল। ফলে তাঁর ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও ব্রাহ্মধর্ম রক্ষণশীলতার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে নি। কিন্তু বিদ্যাসাগর সবরকম ধর্মীয় অনুশাসনের ঊর্ধ্বে উঠে নানা সামাজিক বিষয় সংস্কারে সচেষ্ট হয়েছেন। মানবহিতবাদী দর্শনে আস্থাশীল বিদ্যাসাগর সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ কিংবা বাল্যবিবাহ রোধের আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি ধর্ম কিংবা শাস্ত্রের পরোয়া করেন নি। আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের শত আপত্তি সত্ত্বেও বিধবার সঙ্গে নিজ পুত্রের বিবাহ দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন মানবতাবাদী সংস্কারের চেতনা তাঁর হৃদয়ের কত গভীরে প্রথিত হয়েছিল। তিনি দেশি ন্যায়শাস্ত্রকে অকেজো বলেছেন, বেদান্তকে ভ্রান্ত মনে করেছেন এবং সেই ভ্রান্ত দর্শনের প্রভাব থেকে দেশ ও সমাজকে মুক্ত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। বিদ্যাসাগরের পূর্বেই অবশ্য উক্ত বিষয়গুলি নিয়ে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর (১৮০৯-৩১) নেতৃত্বে সূচিত হওয়া এবং ডিরোজিওর অকালমৃত্যুর পর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ ব্যক্তির দ্বারা মৌখিক ও লিখিত আলোচনার মাধ্যমে কোলকাতায় তথাকথিত 'ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন' পরিচালিত হয়েছিল। ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল সমস্ত জীর্ণতা দূর করে নবরূপে আলোকোজ্জ্বল সমাজ বিনির্মাণের দৃপ্ত শপথ। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই আন্দোলন তাঁদের সুরুচি ও সৌখিন সংস্কৃতিসম্পৃক্ত অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক বিষয়ে পর্যবসিত হয়। তাঁদের মধ্যে ক্রমশ নানারকম বিপরীতমুখী চিন্তা, এমনকি রক্ষণশীল চিন্তারও অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে কুসংস্কারের পর্বতপ্রমাণ উচ্চতা ডিঙিয়ে এবং শ্রেণীগত কারণে তাঁরা সেই বাঁধা অপসারণে কোনো সুসংগঠিত প্রত্যক্ষ আন্দোলনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এদের আন্দোলনও বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। শেষপর্যন্ত তাদের একাংশ সমাজের মূলধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, আরেক অংশ সনাতনী ধর্মের সেই রক্ষণশীলতার নিকটই

আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু প্রগতিবাদী বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারকে ধর্মসংস্কারের আবর্তে নিক্ষেপ করে রক্ষণশীলতাকে কখনও প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা নিজের অস্তিত্বের মতোই সত্য ছিল। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজের সিদ্ধান্তে তিনি অবিচল থেকেছেন। হিউম্যানিস্ট বিদ্যাসাগর মানবকল্যাণে প্রয়োজনবোধে আত্মবিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। এখানেই বিদ্যাসাগরের অনন্যতা।

শিক্ষা কুসংস্কার বিনাশের ও মোহমুক্তির একমাত্র উপায়। শিক্ষিত মানুষই পারে হাজারো কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করে পশ্চাদপদ জাতিকে অগ্রগতি ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে। মানুষ অশিক্ষিত রয়ে গেলে কোনো রকম সমাজসংস্কারও সম্ভব নয়। এমন উপলব্ধি থেকেই বিদ্যাসাগর শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সর্বস্তরে বাংলা শিক্ষার প্রচলন, মডেল স্কুল স্থাপন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতি কাজে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ছিলেন সম্পূর্ণরূপে আধুনিক মননের। তাঁর শিক্ষাদর্শের ভিত্তি ছিল হিউম্যানিজম, আর শিক্ষা সংস্কারের একমাত্র মানদণ্ড ছিল মানুষ। ফলে প্রাচীন ক্ল্যাসিকাল বিদ্যার অসাধারণ পণ্ডিত নবযুগের মানবিক আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। *'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব'* (১৮৫৩) এ বিদ্যাসাগর প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ের ভ্রান্ত, সারশূন্য ও অপ্রয়োজনীয় দিকগুলি নির্ভয়ে নিঃসংকোচে তুলে ধরেছেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার সময় কলেজের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী ও বিধি-ব্যবস্থা সংস্কারে প্রস্তুত রিপোর্ট এবং ১৮৫৩ সালে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন বারানসি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালান্টাইনের কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন শেষে পাঠ্যসূচিসংক্রান্ত রিপোর্টের উত্তরে যে সমালোচনা তিনি শিক্ষাসংসদে দাখিল করেন, তা বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে দুটি যুগান্তকারী দলিল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। প্রথম রিপোর্টটিতে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের পুনচর্চার প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার না করলেও সেগুলি চর্চার রীতি ও পদ্ধতি পরিবর্তনের কথা বলেছেন। পাঠ্যভুক্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। অবৈজ্ঞানিক ও অহেতুক জটিলতা পরিহার করে বিষয়বস্তুকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সহজ-সাবলীল করতে পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যটিতে ন্যায়শাস্ত্র প্রসঙ্গে আলোচনায় ভারতীয় দর্শনকে ইউরোপীয় দর্শনের সঙ্গে পরিচিত করাতে চেয়েছেন। তবে ব্যালান্টাইনের পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনের ঐক্যের লক্ষ্যে জনৈক ইউরোপীয় ভাববাদী দার্শনিক বিশপ বার্কলে'র গ্রন্থ পাঠ্যভুক্ত করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইউরোপেও সঠিক দর্শন বলে বিবেচিত না-হওয়া বার্কলে পড়ানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই এবং শিক্ষার চাইতে বৃটিশ শাসনের স্বার্থেই যে ব্যালান্টাইনের এমন প্রস্তাব তা দূরদর্শী বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেবল যুক্তিযুক্ত, আদর্শিক ও প্রগতিশীল দিকগুলি এদেশের শিক্ষণীয় বিষয় হতে পারে, পাঠ্যভুক্ত হতে পারে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অযৌক্তিকভাবে কোনো কিছু নয়। বৃটিশ উপনিবেশে বাস করে তাদের মতামত যুক্তিহীন বলে উপেক্ষা করার মতো দুঃসাহস কেবল বিদ্যাসাগরই দেখাতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিদ্যা ও ভারতীয় শাস্ত্রের সমন্বয় সাধন কিংবা ঐক্যের সন্ধানও তিনি করতে চান নি। আসলে, উভয় বিদ্যার যতখানি সম্ভব আদর্শগত যোগসূত্র কেবল স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষাদর্শের উৎসমূলে রাখতে চেয়েছিলেন যে হিউম্যানিজমকে, তা বহুকাল থেকে এ দেশীয় জ্ঞানভাণ্ডারেই বিদ্যমান ছিল।

> নবযুগের ইয়োরোপের 'হিউম্যানিস্ট' আদর্শের প্রবাহের পথ যাঁরা আমাদের দেশে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, সেই ইংরেজরাই সেই আদর্শকে, রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের স্বার্থে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিকৃত করতে কুণ্ঠিত হননি। বিদ্যাসাগর সেই হিউম্যানিজমের আদর্শের বীজ শিক্ষার ক্ষেত্রে বপন করতে চেয়েছিলেন। তার জন্য সর্বপ্রথম দেশীয় বিদ্যার ঐতিহ্য থেকে এই আদর্শের পুষ্টির উপযোগী সার সংগ্রহ করার আবশ্যকতা তিনি যেমন

> বোধ করেছিলেন, তাঁর সমকালে আর কেউ তা করেননি। কিন্তু সেই ঐতিহ্যের চারিদিকে যুগ-যুগ ধরে গজিয়ে-ওঠা বিষাক্ত আগাছা ও আবর্জনার প্রতি, কেবল ঐতিহ্যের মোহে তিনি আকৃষ্ট হননি। নির্মমভাবে তা ছাঁটাই করেছেন, নির্মূল করারও চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্ত্য আদর্শের স্বর্ণকান্তিতে তিনি মুগ্ধ হননি, হিউম্যানিজমের কষ্টিপাথরে তাকে যাচাই করে এদেশের মাটিতে transplant করতে চেষ্টা করেছেন।[৩]

প্রাচীনপন্থী শাস্ত্রজ্ঞ আধিপত্যবাদী পণ্ডিতদের বিরাগভাজন হয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে তিনি গ্রামে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছেন। এসব প্রতিষ্ঠানে সর্বপ্রথম মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করবে। উত্তরকালে এমন একদল মানুষ বেরিয়ে আসবেন, যাঁরা শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করবেন, মাতৃভাষায় পারদর্শী হয়ে বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন করবেন এবং সবরকম কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে থেকে মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবেন। বিদ্যাসাগর মনে-প্রাণে যা চেয়েছিলেন তা হলো, দৃঢ় ভিত্তিমূলে স্থাপিত মাতৃভাষা বাংলা ও সাহিত্যের সুসমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠা। তাঁর সমস্ত শিক্ষাচিন্তার এটিই প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। আর এজন্য তিনি সংস্কৃতবিদ্যা ও ইংরেজিবিদ্যা তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবিদ্যা উভয়ের আন্তরিক অনুশীলনের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ দেশীয় ক্ল্যাসিকাল ঐতিহ্যের প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে বাংলা ভাষা যাতে বিদেশি জ্ঞানভাণ্ডারের সূক্ষ্ম ও জটিল ভাবানুভাবের প্রকৃত বাহন হয়ে উঠার শক্তি অর্জন করতে পারে, নিজের শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনায় এমন প্রস্তাব তুলে ধরেছেন। একদিন বাংলা ভাষার ভিত্তির উপর নবযুগের বাংলা সাহিত্য তার বিচিত্র সম্ভার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, এমনটিই ছিল বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন। শিক্ষাকে তিনি ধর্মের আবর্ত থেকে মুক্ত করে মানবমুখি করতে চেয়েছিলেন:

> ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার প্রভাব থেকে তিনি যতদূর সম্ভব এদেশের শিক্ষাকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। মানুষই ছিল তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রেরণাকেন্দ্র। শাস্ত্রকার নয়, পুরোহিত নয়, গুরু নয়, পণ্ডিত নয়, সবার উপরে 'মানুষ' গড়ে তোলাই ছিল তাঁর শিক্ষা সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য। এই সর্বাঙ্গীণ মানবমুখিন শিক্ষানীতির প্রবর্তকরূপে বিদ্যাসাগর আজো শিক্ষা ক্ষেত্রে 'একক' স্থান অধিকার করে আছেন। শিক্ষায়তনকে তিনি মানবধর্মের 'নার্সারি' করে তুলতে চেয়েছিলেন, সেকালের চতুষ্পাঠী, আশ্রম বা সাম্প্রতিক কালের ডিগ্রি উৎপাদনের কারখানা করতে চাননি।[৪]

মূলত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা কুসংস্কারমুক্ত, মানবতাবোধসম্পন্ন, কল্যাণকামী, প্রগতিবাদী প্রকৃত মানুষ হিসেবে তৈরি হোক বিদ্যাসাগর এমনটিই চেয়েছেন। তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। তদানীন্তন পাঠশালায় শিক্ষকগণ ছাত্রদের সঙ্গে যে নিষ্ঠুর আচরণ করতেন তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শিক্ষকগণ শিশুদের সামান্য বালসুলভ চাপল্যেও উত্তেজিত হতেন। কোনো কঠিন বিষয় কারো বোধগম্য না হলে সহজভাবে তা বুঝানোর চেষ্টা না করে বরং রাগান্বিত হতেন। পাঠগ্রহণে অপারগতায় কাউকে কটূক্তি অপমান তো বটেই, নির্মমভাবে প্রহার করতেও লজ্জাবোধ করতেন না। গুরুমশায়ের রক্তবরণ চোখ আর হাতের বেতের সঙ্গে ছাত্রদের ছিল নিত্য পরিচয়। ছাত্ররা শিক্ষককে যমের মতো ভয় করত। বিদ্যাসাগর শিক্ষকদের এমন রুচিহীন আচরণের পরিবর্তে ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ স্নেহময় মানবিক সম্পর্ক কামনা করেছিলেন। ছাত্রদের আত্মমর্যাদায় লাগতে পারে, তাদের ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত করতে পারে, শিক্ষকের এমন কোনো দুর্ব্যবহার কিংবা নিষ্ঠুর আচরণের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। জনৈক ছাত্রকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে রাখার অপরাধে নিজের মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশনের প্রধান শিক্ষককে পদচ্যুত করেছিলেন বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকর্মও সংস্কারমূলক। বাংলা গদ্যের সুষ্ঠু-সুন্দর রূপায়ণের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সংস্কৃত-হিন্দি-ইংরেজির ভাণ্ডার থেকে উপকরণ নিয়ে নতুন সাহিত্যের ভিত নির্মাণের প্রচেষ্টা তাঁর সংস্কার প্রয়াসেরই নামান্তর। ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশনে বাংলা গদ্যের প্রথম অনুশীলন শুরু হয়। সেখানকার মিশনারিগণ বাইবেল বাংলায় অনুবাদ করে খৃস্টধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ সিভিলিয়ানদের প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাংলা শিক্ষার জন্য ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। সেখানে বাংলা বিভাগ চালু হলে (১৮০১) শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রি বাংলায় পারদর্শী উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) এ দেশীয় কতিপয় পণ্ডিতের সহযোগিতায় পাঠ্যপুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই লেখকগোষ্ঠী দ্বারা বাংলা গদ্যের পত্তন হয়েছিল সত্য, তবে তাঁরা বাংলা গদ্যকে অহেতুক সংস্কৃতঘেঁষা করে তুলেছিলেন। দৈনন্দিন কথাবার্তায় তদ্ভব, আরবি-ফারসিসহ দেশজ শব্দসমৃদ্ধ যে সহজবোধ্য ভাষা প্রচলিত ছিল তার পরিবর্তে তাঁরা রচনা দুর্বোধ্য, সংস্কৃত শব্দবহুল করে তোলেন এবং গদ্যরীতির মধ্যে কৃত্রিম গাম্ভীর্য আনয়ন করেন। ফলে বাংলা গদ্যের প্রাঞ্জলতা ক্ষুণ্ন হয়। জড়তা ও দুর্বোধ্যতামুক্ত সরল-সাবলীল বাংলা গদ্যের অবয়ব নির্মাণে বিদ্যাসাগরের অবদানকেই সর্বোপরে স্থান দিতে হয়। সমসাময়িক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ লেখক গদ্যকে জটিলতামুক্ত করেছেন। তবে বাংলা গদ্যের উৎকর্ষ সাধনে বিদ্যাসাগর ছাড়িয়ে গেছেন সবাইকে। বাংলা গদ্যের উদ্ভবের প্রায় চার যুগ পরে লেখনী ধারণ করলেও শিল্পসম্মত পরিশীলিত 'বাংলা গদ্যের জনক' অভিধা তাঁকেই দিতে হয়েছে। বস্তুত, বাংলা গদ্যের প্রাথমিক কালের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুশীলন পর্যায়ে বিদ্যাসাগর সুশৃঙ্খলতা, পরিমিতিবোধ ও ধ্বনিপ্রবাহে অবিচ্ছিন্নতা সঞ্চার করে গদ্যরীতিকে উচ্চতর অবস্থানে উন্নীত করেন। গদ্যের সুসংহত কাঠামো গঠনে, ভারসাম্যপূর্ণ বাক্য সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি বাংলা সাধুভাষার গদ্যরীতিকে পূর্ণাঙ্গতা দান করেছেন। প্রবাদ-প্রবচনের সুষ্ঠু ব্যবহার তাঁর ব্যঙ্গরচনাগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। তিনি স্বাভাবিক যতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ইংরেজি ভাষার আদলে সর্বপ্রথম দাঁড়ি-কমা, কোলন-সেমিকোলন, জিজ্ঞাসাচিহ্ন, উদ্ধৃতিচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন প্রভৃতির সঠিক ব্যবহার করে বাংলা গদ্যে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিলেন। সাহিত্যের বাহন হিসেবে পদ্যের সরস উপযোগিতা ও ছন্দবদ্ধতা তাঁর রচনাতে প্রথম লক্ষ্য করা যায়। 'পদ্যের মতো গদ্যেরও যে একটা নিজস্ব তাল বা ছন্দ আছে বিদ্যাসাগর তা আবিষ্কার করেন। তিনি সুষম বাক্যগঠন রীতির প্রবর্তন করে তাতে উপযুক্ত স্থানে সুললিত তৎসম শব্দ এবং তদ্ভব ক্রিয়াপদ ও বাগধারা ব্যবহারপূর্বক বিশেষ শব্দকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বাংলা গদ্যের বিশৃঙ্খলতা ও নিয়মহীনতাকে কমা চিহ্নের দ্বারা সুবিভক্ত এবং উপবাক্যের দ্বারা সুবিন্যস্ত ও অন্বয়ীভুক্ত করে, ভাবানুসারে বাক্যের বহর বাড়িয়ে কমিয়ে গদ্যরীতির অঙ্গে লাবণ্য এবং চলনে সুসামঞ্জস্য ছন্দের পরিমিতি নির্দেশ করেছেন।'[৫] বিদ্যাসাগরই প্রথম ভাষাকে অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরতা থেকে মুক্ত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যাসাগরের অনেক পূর্বে বাংলা গদ্যের সূচনা হলেও নিতান্ত শ্রীবর্জিত, অবিন্যস্ত, ভারসাম্যহীন বাংলা গদ্যকে তিনিই সর্বপ্রথম মার্জিত, পরিশীলিত ও অনবদ্য রূপ দান করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন, শিশুদের ভেতর সর্বপ্রথম মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার ভিত তৈরি হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে পরবর্তীকালে তাদের মননশীলতার বিকাশ সম্ভব নয়। অথচ বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা শিক্ষার উপযোগী পুস্তক তেমন নেই। বিদ্যাসাগর শিশু-কিশোরদের পাঠ্যোপযোগী পুস্তক রচনায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। মৌলিক চিন্তাশক্তির অধিকারী হয়েও তিনি মৌলিক সৃষ্টির ভাবাকাশসঞ্চারী কল্পলোকের সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন নি বরং শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রয়োজনে এবং তাদের নীতিবোধ

জাগরণ ও চরিত্র গঠনে সহায়ক উপদেশমূলক পাঠ্যপুস্তক রচনাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। নিছক সাহিত্য সৃষ্টির চেয়ে লোকহিতকর সাহিত্যের ব্যবহারকে লক্ষ্যবস্তু করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তকগুলি হলো: *বেতালপঞ্চবিংশতি* (১৮৪৭), *বাঙ্গালার ইতিহাস* (১৮৪৮), *জীবনচরিত* (১৮৪৯), *বোধোদয়* (১৮৫১), *সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা* (১৮৫১), *ঋজুপাঠ* (১৮৫১), *ব্যাকরণ কৌমুদী* (১৮৫৩), *শকুন্তলা* (১৮৫৪), *বর্ণপরিচয়* (১৮৫৫), *কথামালা* (১৮৫৬), *চরিতাবলী* (১৮৫৬), *সীতার বনবাস* (১৮৬০), *আখ্যানমঞ্জরী* (১৮৬৩), *ভ্রান্তিবিলাস* (১৮৬৯) ইত্যাদি। এসবের মধ্যে বেতালপঞ্চবিংশতি ফুল্লজা লালের 'বৈতালপচ্চীসী' নামক প্রসিদ্ধ হিন্দি পুস্তক অবলম্বনে রচিত। শকুন্তলা সংস্কৃত কবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটক থেকে অনূদিত। অনুবাদ হলেও এটি একটি অনুপম রচনা এবং লেখকের মৌলিক সৃষ্টির দাবীদার। সীতার বনবাস ভবভূতি প্রণীত 'উত্তর চরিত' নাটকের প্রথম অঙ্ক ও রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে লঙ্কা বিজয়োত্তর রামের পরবর্তী জীবন এবং সীতার জীবনের পরিসমাপ্তি নিয়ে অনুবাদমূলক রচনা। এখানে পৌরাণিক সীতাকে আধুকি যুগের মানবী সীতায় পরিণত করেছেন বিদ্যাসাগর। গ্রন্থটি হৃদয়গ্রাহী, সুখপাঠ্য এবং ক্লাসিক গাম্ভীর্য ও রোমান্সের অপূর্ব সমন্বয়মণ্ডিত, যাতে লেখকের মৌলিকত্ব বিদ্যমান। কতিপয় বৈজ্ঞানিক মনীষীকে নিয়ে উইলিয়াম চেম্বার্স কর্তৃক সংকলিত জীবনচরিত বিদ্যাসাগর বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন ছাত্রদের মনন গঠনের উদ্দেশ্যে। বোধোদয়ও চেম্বার্স-এর গ্রন্থের অনুবাদ। এটি সাধারণ জ্ঞানের বই, যা অতি সহজবোধ্য করে লেখা হয়েছে। রেবেরেন্ড টমাস জেমস ইসপ রচিত নানা উপদেশমূলক ইংরেজি গল্পের অনুবাদ কথামালা। শেক্সপিয়ারের *ÔThe comedy of ErrorsÕ* এর বাংলা অনুবাদ ভ্রান্তি বিলাস। অনুবাদ হলেও এতে সম্পূর্ণ বাঙালি পরিবেশের প্রতিফলন ঘটেছে। বিদেশি কাহিনী, চরিত্র পাঠকের নিকট একেবারেই এদেশীয় বলে মনে হয়। আসলে, হিন্দি সংস্কৃত কিংবা ইংরেজি থেকে অনূদিত কোনো গ্রন্থই আক্ষরিক অনুবাদ নয়; সবই স্বাধীন রূপান্তর, ভাবানুবাদ। সুকুমারমতি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যোপযোগী মৌলিক রচনার পাশাপাশি অনুবাদমূলক রচনাগুলিও ছন্দের গতি, ভাবের সঙ্গতি, ভাষার ওজস্বিতা ও ব্যঞ্জনাময় শব্দপ্রবাহে, সৌন্দর্যে-সৌকর্যে লেখকের মৌলিক সৃজনশীলতা ও শিল্পী সত্তার পরিচয় বহন করে।

মানবমুখি সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক হলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ। এমন সাহিত্যে প্রতিবাদ একটি গুরুত্ববহ অনুষঙ্গ। আমরা বিদ্যাসাগরের রচনাতেই প্রতিবাদের প্রথম সাক্ষাত পাই। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ কিংবা বাল্যবিবাহ নিরোধের বিপক্ষে প্রতিপক্ষ যেসব ব্যক্তি পুস্তক লিখে তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন, তাঁদের মূঢ়তাকে তুলে ধরে বিদ্যাসাগর পরিচয় গোপন করে রসিকতাপূর্ণ ছদ্মনাম দিয়ে কয়খানি লঘু ও কৌতুকাবহ অথচ প্রতিবাদমূলক পুস্তিকা রচনা করেন, যেগুলি তাঁর 'বেনামী রচনা' হিসেবে পরিচিত। *'অতি অল্প হইল'* (১৮৭৩), *'আবার অতি অল্প হইল'* (১৮৭৩) এবং *'ব্রজবিলাস'* (১৮৮৪) নামক পুস্তিকা তিনটি 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' অর্থাৎ যেমন চাচা তেমন ভাতিজা নামে রচিত। *'বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা'* (১৮৮৪) 'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষীণ' নামে প্রকাশিত হয় বিনয় পত্রিকায় এবং *'রত্নপরীক্ষা'* প্রকাশিত হয় (১৮৮৬) 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য' অর্থাৎ যেমন চাচা তেমন ভাতিজা ও তার বন্ধু নামে। পুস্তিকাগুলিতে বিদ্যাসাগর প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে শাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে খণ্ডন করে নিজের মতামত অভ্রান্ত বলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার প্রচলন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নসহ আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিদ্যার সঙ্গে এদেশের ক্ল্যাসিকাল বিদ্যার যোগসূত্র স্থাপন প্রচেষ্টার পাশাপাশি বিদ্যাসাগরের আরেকটি অনন্য কীর্তি হলো সমাজে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের প্রচেষ্টা। পূর্বসূরী রাজা রামমোহন, ইয়ংবেঙ্গল

গোষ্ঠীসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ও খৃস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার সামাজিক অন্তরায় বিদ্যমান ছিল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত (১৮১৭) হবার পর দীর্ঘদিন থেকে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের অনুশীলন হয়েছে। তবুও সাধারণ মানুষের কথা বলাই বাহুল্য, সমাজের উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর ভেতরও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কুসংস্কার বদ্ধমূল ছিল। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের শত কুসংস্কার মানুষের অনুভবে এতোই দৃঢ়তর ছিল যে, এক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়েছিল না। কোলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের অনেকে কেবল সম্ভ্রান্ত মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু পর্দাপ্রথার নিগড় ভেঙ্গে ঘরের বাইরে গিয়ে মেয়েরা স্কুলে পড়ালেখা করবে- তা চান নি। ফলকথা, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে গৃহশিক্ষার গণ্ডির মধ্যে নীতিগতভাবে তাঁরা শ্রেণীবিশেষের স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করলেও আধুনিক যুগের দৃষ্টি দিয়ে সার্বজনীন স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা স্বীকার করেন নি। এমনকি উনিশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন ব্যাপকতর হওয়ার সময়ও সনাতনবাদী মানুষেরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। পত্র-পত্রিকায় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক রচনা প্রকাশ করেছিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষার উদ্যোগীদের বিরুদ্ধে সর্বত্র সমাজচ্যুতির আন্দেলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ১৮৫০ সালের দিকে শিক্ষাসংসদের সভাপতি ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের অন্যতম সহযোগীরূপে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করেন এবং বেথুন প্রতিষ্ঠিত 'বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে' যুক্ত হন। এ সময় ভারতসরকারের সেক্রেটারি হ্যালিডে বাংলাসরকারকে স্ত্রীশিক্ষায় সরকারি অনুদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৮৫৪ সালে বাংলার প্রথম ছোটলাট হয়ে তিনি বাংলা শিক্ষার প্রসারে মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং ১৮৫৭ সালের দিকে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছিলেন। উল্লেখ্য, হ্যালিডের শিক্ষাসংস্কার কিংবা স্ত্রীশিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ের প্রধান পরামর্শক ছিলেন বিদ্যাসাগর। হ্যালিডের সমর্থনে এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পাবার সম্ভাবনায় বিদ্যাসাগর নিজ এলাকাভুক্ত জেলাগুলিতে কয়েক মাসে (নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে ১৮৫৮) অন্তত ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। বর্তমান যুগের মতো একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মেয়েদের পড়ালেখা অবৈতনিক করারও প্রস্তাব ছিল তাঁর। যদিও তখন সিপাহীবিদ্রোহের দুশ্চিন্তায় অস্থির ভারতসরকার স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে অর্থব্যয়ে তেমন আগ্রহ দেখায় নি, সহযোগিতা করে নি; হোঁচট খেয়েছিল বিদ্যাসাগরের মহান পরিকল্পনা। কিন্তু পরবর্তীকালের ক্রমবিকশিত সর্বজনীন স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্র যে বিদ্যাসাগরই প্রথম প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন, তা স্বীকার্য।

স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন ও প্রসারণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেই বিদ্যাসাগর হিন্দু নারীসমাজের দুর্গতি মোচনে অন্য একটি দুঃসাহসিক সমাজ-সংস্কারে নিয়োজিত হয়েছিলেন। সেটি হলো বিধবাবিবাহ। মূলত বিধবাবিবাহ প্রচলনের মধ্যদিয়ে পরিচালিত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের মূল সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা। উনিশ শতকের বাংলাদেশে নারীর আত্মমুক্তির ব্যাপারে সামাজিক চিন্তার অন্যতম অনুষঙ্গ করা এবং হিন্দুসমাজের চিরাচরিত শক্তিশালী আচার-সংস্কারের ভিত্তিমূলে আঘাত করে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর অনুভবে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করা- এ দুই কারণে তাঁর বিধবাবিবাহের প্রচেষ্টা ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত সমাজে প্রচলিত অবাঞ্ছিত বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে কিংবা আকস্মিক-অনিবার্য কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে নারীদের অকালবৈধব্যবরণ স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু এই বালবিধবাদের নিরামিষাশী হয়ে, সর্বপ্রকার সৌন্দর্যচর্চা থেকে বিরত থেকে, শুভ্রবসনে আচার-সংস্কার মেনে মৃতস্বামীর স্মৃতি বুকে ধারণ করে আজীবন নির্মোহ-নিরানন্দ হয়ে কাটাতে হবে- শাস্ত্রের এমন বিধান অনেকের সঙ্গে বিদ্যাসাগরকেও ভাবিত করেছিল গভীরভাবে। সতীত্বকে আদর্শ হিসেবে স্থাপন করে নারীদের উপর চিরবৈধব্যের নামে যে নিদারুণ মানসিক নির্যাতন,

মানবিক বঞ্চনা বহুযুগ থেকে চলে আসছিল তার অবসানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তিনি।

> কৌলীন্য প্রথার চূড়ান্ত বিকৃতিজনিত অভিশাপ নারীর জীবনকে করে তুলেছিল দুর্বহ ও অমানবিক। তাকে দুর্গতির মুখে ঠেলে দিয়ে সমাজেরও মঙ্গল হয়নি। বহুবিবাহ বাল্যবিবাহজনিত অকাল বৈধব্যের অভিশাপ সমাজে বয়ে এনেছিল ব্যভিচারের স্রোত। সমাজপতিরা শাস্ত্র ও দেশাচারের দোহাই পেড়ে চিরাচরিত নিয়মে নারীর সতীত্ব রক্ষার আবশ্যকতার কথা আউড়িয়ে অপরিসীম ঔদাসীন্য নিয়ে এর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। সমাজদেহ বিনির্গত ক্লেদ জমে জমে যে পল্বলের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সমাজের যাবতীয় নীতিধর্ম যে ডুবে যেতে বসেছিল, সমাজের যে নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়েছিল একথা তারা ভেবে দেখবার গরজ বোধ করেননি।[৬]

রামমোহনের সতীদাহ বিলুপ্তির পর জ্বলন্ত চিতার আগুন থেকে মুক্তি পেলেও সমাজদেহের তুষের আগুন থেকে বিধবারা মুক্তি পায় নি। তারা শ্বশুরবাড়ি, বাবার বাড়ি সর্বত্রই যেন অবাঞ্ছিত। সামাজিক লাঞ্ছনা আর মনোদৈহিক যন্ত্রণা থেকে সুখ খুঁজতে অনেকে পা বাড়ায় অসামাজিক পথে। ঠাঁই নেয় পতিতাপল্লিতে। কেউবা সমাজের কামলোলুপ মানুষের নিকট আত্মসমর্পণ করে বেগবান করে ব্যভিচারের প্রবাহকে। চিরাচরিত জীর্ণসংস্কারের প্রাচীরান্তরে নির্বাসিত এমন অভিশাপক্লিষ্ট হীনদশাগ্রস্ত নারীদের প্রতি নিতান্তই মানবীয় কারুণ্য থেকে বিদ্যাসাগর তাদের পুনর্বিবাহের যৌক্তিকতা নির্দেশ করলেন। *'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'* (জানুয়ারি ১৮৫৫) শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধপুস্তিকা প্রকাশ করেন। গোঁড়া হিন্দুসমাজের মানস-প্রকৃতি ও প্রবল প্রতিপক্ষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগোষ্ঠীর বিষয়টি মাথায় রেখে পুস্তিকাটিতে তিনি শাস্ত্রাদি মন্থন করে, অকাট্য যুক্তি দিয়ে বিধবাবিবাহের পক্ষে মত তুলে ধরেন। প্রথম পুস্তিকা বের হবার পর প্রতিপক্ষ পণ্ডিতগণ তীব্র প্রতিবাদ করে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে মত পোষণ করে পুস্তিকা প্রচার করলে 'পরাশর সংহিতা' থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে তাঁদের মতামত খণ্ডন করে বিদ্যাসাগর একই শিরোনামে দ্বিতীয় পুস্তক (অক্টোবর ১৮৫৫) প্রকাশ করলেন। বিধবাবিবাহ কখনোই অশাস্ত্রীয় নয়, বরং সম্পূর্ণ বৈধ ও শাস্ত্রসম্মত এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে অতীব প্রয়োজনীয়। এরই প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হলো। সমগ্র দেশ যেন বিধবাবিবাহের পক্ষে বিপক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়লো। যুক্তির পথে বিদ্যাসাগরের নিকট পরাস্ত হয়ে ধর্মের ধ্বজাধারী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীবিশেষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, বিদ্যাসাগরকে তাঁরা গালাগালি করতেও ছাড়লেন না। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিধবাবিবাহের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বিদ্রুপাত্মক লেখা লিখেছিলেন। তবে অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কবিয়াল দাশরথি রায়সহ অনেকে বিদ্যাসাগরের পক্ষ নিয়েছিলেন। ইয়ংবেঙ্গল, ব্রাহ্মসমাজ, আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিদ্যাসাগরের পক্ষে ছিলেন। তাঁর চরিত্রমহিমা, পাণ্ডিত্য ও যুক্তিবাদে অভিভূত হয়ে বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও শেষাবধি তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। এসময় ইংরেজ শাসকশ্রেণী যদিও বিষয়টির যৌক্তিকতা অনুধাবন করেছিলেন, কিন্তু সরকারের দিক থেকে জনসমাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ হবে- এমনটি ভেবে ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এদেশের সামাজিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ থেকে বিরত ছিলেন। অবশ্য বিধবাবিবাহের পক্ষে-বিপক্ষে বহু বাদানুবাদ, আবেদন-নিবেদন এবং ব্যবস্থাপকসভার অনেক তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে ভারতসরকার বিদ্যাসাগরের এই সংস্কার আন্দোলনকে সমর্থন করে বিধবাবিবাহ আইন (১৬ জুলাই ১৮৫৬) পাশ করেন ।

বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ প্রথা বন্ধের জন্যও সরকারের নিকট আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের পরে রাজনৈতিক কারণে এ দেশীয়

সমাজসংস্কার বিষয়ে সরকার ঔদাসীন্য প্রকাশ করায় সেটি আর সম্ভব হয় নি। উল্লেখ্য, প্রত্যক্ষ উৎপাদনশীল কোনো কাজের দায়িত্ব না থাকায় ব্রাহ্মণদের কেবল কুলবৃত্তি শাস্ত্রব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়ে। তাঁরা অনেক বিবাহ করে আর্থিক সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হন। মূলত দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন থেকে সাময়িক মুক্তিলাভের অতি সহজ পন্থা হয়ে উঠে বহুবিবাহ। ভঙ্গকুলীনেরা ব্যবসায়ের মতো বিবাহ করতে শুরু করেন। এদের নৈতিকতা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন,

> এদেশের ভঙ্গকুলীনদের মত পাষণ্ড ও পাতকী ভূমণ্ডলে আর নাই। তাঁহারা দয়া, ধর্ম্ম, চক্ষুলজ্জা ও লোকলজ্জায় একেবারে বর্জ্জিত। তাঁহাদের চরিত্র অতি বিচিত্র। চরিত্র-বিষয়ে তাঁহাদের উপমা দিবার স্থান নাই। তাঁহারাই তাঁহাদের একমাত্র উপমাস্থল। কোন অতিপ্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয়! আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া হয় কি? তিনি অম্লানমুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট পাই, সেখানেই যাই। গত দুর্ভিক্ষের সময় একজন ভঙ্গকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন। তিনি লোকের নিকট আস্ফালন করিয়াছিলেন, এই দুর্ভিক্ষে কত লোক অন্নাভাবে মারা পড়িয়াছে, কিন্তু আমি কিছুই টের পাই নাই; বিবাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছি।[৭]

অন্যদিকে, কুলীনসমাজে আত্মমর্যাদার বিষয় হিসেবে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এমনকি বৃদ্ধবয়সেও কুলীন ব্যক্তিরা অনেক বিবাহ করত। এই কুলীন ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত এমন রুচিহীন অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ তুলে ধরে *'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'* (১৮৭১) নামক বই লিখলেন বিদ্যাসাগর। বইটি প্রকাশের পর বিরুদ্ধবাদীরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে। তাদের মূঢ়তাকে তুলে ধরে নিজের শাণিত যুক্তি দিয়ে বিদ্যাসাগর *'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার'* (১৮৭৩) নামে আরেকটি বই প্রকাশ করেছিলেন। সরকারি আইন প্রণয়নের চেষ্টা ব্যর্থ হলেও তাঁর বহুবিবাহ নিবারণ আন্দোলন শিক্ষিত বাঙালি সমাজকে প্রভাবিত করেছিল দারুণভাবে। বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে যাঁরা বিতর্ক করেছিলেন এবং এ বিষয়ে যাঁরা সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন তাঁদের অনেকে সমাজের জন্য এমন বিবাহ যে অকল্যাণকর তা উপলব্ধি করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর সনাতন হিন্দুসমাজে বিদ্যমান বাল্যবিবাহের মতো আরেকটি ভয়ানক ক্ষতিকর প্রথার বিরুদ্ধে *'বাল্যবিবাহের দোষ'* (১৮৫০) নামক আরেকটি বই লিখেছিলেন। ধর্মীয় অনুভূতি থেকে কিংবা নিতান্ত শখের বশে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই ছেলে-মেয়েদের বিবাহ যে তাদের শারীরিক-মানসিক ক্ষতি এবং অকালমৃত্যুর বড় কারণ তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে বইটিতে। উল্লেখ্য, এটিই বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারমূলক প্রথম রচনা। বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিবারণের মতো মানব কল্যাণকর বিষয়গুলি নিয়ে বিদ্যাসাগর গণস্বাক্ষর নিয়ে জনমত তৈরি করে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন, কখনো বা পুস্তক প্রকাশ করে, পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে এবং প্রতিপক্ষের মতামতকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি, উদ্বাহতত্ত্ব, বীরমিত্রোদয়, পরাশর সংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ক্ষুরধার যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করে নামে-বেনামে রচনা লিখে সামজিক আন্দোলন সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়েছেন। উল্লেখ্য, বিদ্যাসাগরের আয়ুষ্কালের শেষের দিকে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার তাঁর বাল্যবিবাহ রোধ আন্দোলনকে মূল্যায়ন করেছিলেন। ১৮৯১ সালের ১৯ মার্চ পাস হয়েছিল 'সহবাস সম্মতি সূচক' (Age of Consent to Marriage) বিল।

বিধবাবিবাহ প্রচলন আন্দোলনই ছিল বিদ্যাসাগরের সর্বপ্রধান সমাজসংস্কারমূলক কাজ। যাকে তিনি নিজের জীবনের 'সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম' হিসেবে মনে করতেন। অবশ্য বিদ্যাসাগরের পূর্বেও বিচ্ছিন্নভাবে বিধবাবিবাহ নিয়ে লেখালেখি হয়েছে, আন্দোলন হয়েছে, এমনকি বিধবাদের বিবাহ দেবার প্রত্যক্ষ চেষ্টা করা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের বছর দশেক পূর্বে কলকাতার বউবাজার এলাকার নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে একটি বিধবাবিবাহ দেবার আয়োজন করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। পটলডাঙ্গা নিবাসী শ্যামাচরণ দাস কর্মকার নিজের বালবিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দেবার জন্য পণ্ডিতদের নিকট থেকে ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেন। ব্যবস্থাপত্রে বেশ কয়েকজন পণ্ডিত স্বাক্ষরও করেছিলেন, কিন্তু দেশাচারের ভয়ে শেষপর্যন্ত তাঁরা এর বিরোধিতা করে পিছিয়ে এসেছিলেন। ১৮৫১-৫২ সালের দিকে বারাসতের কালীকৃষ্ণ মিত্র ও ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় তরুণ সম্প্রদায়কে নিয়ে নিজ এলাকায় সভাসমিতি করে বিধবাবিবাহের আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৪২ সালে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রে ইয়ংবেঙ্গল দল বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য যে কর্তব্য নির্দেশ করেছিলেন বিদ্যাসাগর সেই মহৎ কর্তব্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছিলেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝির দিকে বিধবাবিবাহ নিয়ে অগ্রসরমান অথচ পরিচালকহীন বিশৃঙ্খল আন্দোলনের ধারাকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে বিদ্যাসাগরের মতো একজন দৃঢ়প্রত্যয়ী, নির্ভিক ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। বিদ্যাসাগর আন্দোলনে যুক্ত হয়ে ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইন পাস করালেন। আইন পাসের ছয় মাসের মধ্যে ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় খাটুরা নিবাসী শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বর্ধমানের পলাশডাঙ্গা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বিধবাকন্যা কালীমতীর বিবাহ দিলেন। প্রথম আইনসম্মত বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত করে বাংলা-ভারতের সমাজসংস্কারের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখলেন দিনটি। কোলকাতায় প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠানের পরদিন পানিহাটি গ্রামে কুলীন কায়স্থ বংশের কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে কোলকাতার ঈশানচন্দ্র মিত্রের এক বিধবা মেয়ের বিবাহ হলো। সূচিত হলো বহুযুগের নিষিদ্ধ অথচ অতি বাঞ্ছিত, অতি মানবিক একটি বিষয়ের শুভযাত্রা। অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় পর পর দুইটি বিবাহ অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে 'আমাদিগের চিরবাঞ্ছিত বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে' উল্লেখ করে এমন শুভকাজের বর্ণনা দিয়ে তার উত্তরোত্তর প্রসার কামনা করে সম্পাদকীয় লিখলেন। অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এমন বিবাহের বিরুদ্ধে কটাক্ষমূলক লেখা প্রকাশ করলেন নিজের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়। বিরুদ্ধবাদীদের শত বাঁধা-বিপত্তি, কটাক্ষ-কটুক্তি সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর অবিচলিত চিত্তে নিজের সংকল্প কাজে পরিণত করলেন। বিদ্যাসাগরকে বিধবাবিবাহ আন্দোলন থেকে বিরত করতে ব্যর্থ হয়ে এবং পরিশেষে বিধবাবিবাহ বাস্তবে সংঘটিত হয়ে গেলে প্রতিক্রিয়াশীল পক্ষ থেকে তাঁকে প্রাণনাশের চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়েছিল। একদিন প্রায় মধ্যরাত্রিতে সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি বাসায় ফিরছিলেন। ঠনঠনিয়া কালীতলা এলাকায় পৌঁছলে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁকে আক্রমণে এগিয়ে আসে। সঙ্গে দুর্দান্ত লেঠেলসর্দার শ্রীমন্ত দেহরক্ষী হিসেবে ছিল বলে রক্ষা। শ্রীমন্তের লাঠির ঘূর্ণি প্রত্যক্ষ করে তারা আক্রমণে সাহস পায় নি। উল্লেখ্য, পুত্রের নিরাপত্তার বিষয়টি চিন্তা করেই ঠাকুরদাস বীরসিংহ গ্রাম থেকে শ্রীমন্তকে কোলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। প্রাণনাশের হুমকি তাঁকে অনেকবারই দেয়া হয়েছিল, কিন্তু অকুতোভয় বিদ্যাসাগর মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে বীরচিত্তে এগিয়ে গেছেন স্বীয় কর্তব্য সাধনে। বিধবাবিবাহের মানবিক বিষয়টি বিদ্যাসাগর হৃদয়ের কত গভীরে লালন করতেন, তা সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে লেখা পত্র থেকে জানা যায়। আত্মীয়-কুটুম্ব কিংবা পরিজনদের অকৃত্রিম সম্পর্কের চাইতেও বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন বিধবাবিবাহকে। নিজের একমাত্র পুত্র

নারায়ণচন্দ্র বিবাহ করেন (১৮৭০) খানাকুল কৃষ্ণনগরের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীকে। নারায়ণের বিবাহে আত্মীয়-কুটুম্বের অনুপস্থিত থাকা বা অসহযোগিতা করার বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন,

> নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। কুটুম্বমহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত রাখিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। ...সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না। ...সমাজের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহার-ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সেজন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবে এরূপ বোধ হয় না, এবং আমিও তজ্জন্য বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না।[৮]

তৎকালীন হিন্দুসমাজের অন্তহীন কুসংস্কার ও হাজারো শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের যূপকাষ্ঠে মানবতার বলিদান হচ্ছিল নিয়তই। বিরূপ প্রতিবেশে তাই বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা আইনের বলে বলীয়ান হয়েও তাঁর জীবদ্দশাতেই অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছিল। আইন করে কোনো একটি প্রথা বন্ধ করা সহজ হলেও কোনো একটি প্রথা প্রবর্তন করা শতগুণে কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। সতীদাহ বেআইনি ঘোষিত হবার পর তা নিবারণ হয়েছিল, কিন্তু বিধবাবিবাহ আইনসম্মত হবার পরও তার প্রচলন আশানুরূপ হয় নি। লোকমানসে সংস্কারমুক্ত মানবতাবোধের যে স্বাভাবিক উদ্বোধন প্রয়োজন ছিল, তা ঘটে নি। বিধবাকে বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের নৈতিক কর্তব্যবোধের সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরি হয় নি। এমন বিবাহ সমাজদেহে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি হয় নি। বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতা নিয়েও সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসে নি। বিদ্যাসাগর যেসব সঙ্গতিহীন বিধবার বিবাহ দেবার ব্যবস্থা করতেন, তাদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন, আয়োজনে কোনো ত্রুটি রাখতেন না। বিধবা বলে যেনতেনভাবে বিবাহ হলে পাত্রী মনঃকষ্ট পেতে পারে, এমন আশঙ্কা ছিল তাঁর। বন্ধু-বান্ধব ও সমর্থকদের নিকট থেকে ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন। কেউ কেউ প্রতিমাসে সাহায্য করতেন, আবার এককালীন টাকাও দিতেন অনেকে। এমন অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি বহু পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, কিন্তু পরবর্তীকালে সেই প্রতিশ্রুতি অনেকেই রক্ষা করেন নি। প্রথম দিকে যারা উৎসাহ দিয়েছিলেন, সহযোগিতা করেছিলেন, পরবর্তীকালে তারা পিছিয়ে গিয়েছিলেন। বস্তুত বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য বিদ্যাসাগর প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য বহু দেনা হয়ে গিয়েছিল, যা তিনি নিজের সর্বস্ব বিক্রি করে পরিশোধের অঙ্গীকার করেছিলেন। আশাহত বিদ্যাসাগর আক্ষেপ করে বলেছিলেন,

> আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্ম্মোৎসাহী

> মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনে প্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক কেহ ভুলিয়াও এ বিষয়ে সংবাদ লয়েন না।[৯]

বিধবাবিবাহ নিয়ে বিদ্যাসাগরের হতাশাব্যঞ্জক এমন মন্তব্য দৃশ্যত তাঁর আন্দোলনের ব্যর্থতা প্রকাশ করে। কিংবা তাঁর সমসাময়িক কালে তো বটেই, আধুনিক যুগেও হিন্দুসমাজে তেমন প্রচলন না থাকায় বিধবাবিবাহ আইনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। 'হিন্দু মেয়েদের বিবাহ একবারই হয়' চিরাচরিত এমন সংস্কারের বশে হিন্দু বিধবারা হয়তো এখনো পুনর্বিবাহ কাম্য মনে করে না। কিন্তু এ কথাও তো সত্য, কোনো বিধবা মেয়ে যদি সমস্ত সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে নিতান্ত মানবিক প্রয়োজনে নিজের পুনর্বিবাহ প্রত্যাশা করে, তাহলে সমাজ তার সম্মুখে কখনোই বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না, আইন সহায়ক হবে তার প্রত্যাশা পূরণের। বিদ্যাসাগর সেই সুযোগটি তৈরি করে গেছেন। সুতরাং বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন দৃশ্যত ব্যর্থ মনে হলেও আসলে তা কিন্তু ব্যর্থ নয়। তাঁর উদ্যোগে বিধবাবিবাহ আইন হয়েছে, বাস্তবে সংঘটন হয়েছে- প্রকৃত সাফল্য তো সেখানেই। তাছাড়া গতিশীল কোনো সামাজিক আদর্শের সংগ্রামের ব্যর্থতা সমসাময়িক ফলাফল দিয়ে মূল্যায়ন করা সঙ্গত নয়।

পরিশেষে বলব, বিদ্যাসাগরের শিক্ষার আদর্শ সম্পূর্ণ সত্য হয় নি কিংবা পরিকল্পনাও হয়তো সমকালে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু তাঁর শিক্ষাদর্শের বা শিক্ষাপদ্ধতির সামাজিক সুফল ছিল সুদূরপ্রসারী। বিগত এক-দেড়শত বছরের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের যে বিস্ময়কর অগ্রগতি, তা শিক্ষার প্রসারের ফলেই সম্ভব হয়েছে। আর সেই শিক্ষা যে উনিশ শতকে বিদ্যাসাগরের মতো শিক্ষাব্রতী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নেরই বাস্তব প্রতিফলন, তা স্বীকার করতে হয়। শিক্ষা সংস্কারের নানা কলাকৌশল নিয়ে চিন্তা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। শত বাঁধা-বিপত্তি সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সংঘাতই ঘটেছে শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে। এ নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল স্বদেশিদের সঙ্গে তো বটেই, বৃটিশ রাজপুরুষদের সঙ্গেও তাঁর বিবাদ কম হয় নি। তবুও স্বীয় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে তিনি একাকী এগিয়ে গেছেন বীরচিত্তে। শিক্ষাক্ষেত্রে সম্ভবপর সংস্কারে, প্রসারে সমর্থও হয়েছেন। এ কথা অত্যুক্তি হয় না যে, বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির বিষয়টি বিদ্যাসাগরের মাধ্যমেই প্রথম সূচিত হয়েছিল। তাঁকে বাংলা ভাষার শিল্পসম্মত গদ্যরীতির উদ্ভাবক বলা যায়। ড. আহমদ শরীফ বিদ্যাসাগরকে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে বাংলা গদ্যের জনকত্বই দিতে চেয়েছেন, 'সেই যে বাংলা গদ্যরীতির 'জনক' বলে তাঁর এক খ্যাতি আছে, সেই জনকত্বই তাঁর স্থিতি। তিনি নতুন চেতনার জনক, সংস্কারমুক্তির জনক, জীবন-জিজ্ঞাসার জনক, বিদ্রোহের জনক, শিক্ষা ও সংস্কারের জনক, সংগ্রামীর জনক, ত্যাগ-তিতিক্ষার জনক। জনকত্বই তাঁর কৃতি ও কীর্তি। সমকালীন বাংলার সব নতুনেরই জনক ছিলেন তিনি। তিনিই ছিলেন ঈশ্বর।'[১০] বঙ্কিমচন্দ্র সেই সামন্তবাদী রক্ষণশীল মানসিকতার জন্য বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার নীতি, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করেছেন। তাঁর শিক্ষা-সমাজ সংস্কারমূলক মহান কর্মগুলিকে খাটো করে দেখেছেন। বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে 'যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?' (বিষবৃক্ষ, ১৮৭৩) বলে– অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের শিক্ষা ও সমাজ দর্শনের যাথার্থ্য উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলা ভাষা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বিদ্যাসাগর বাঙলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাঙলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাঙলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।'[১১] তিনি বিদ্যাসাগরের প্রগতিশীলতা, মহানুভবতা, আত্মপ্রত্যয় ইত্যাদির মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, 'ঈশ্বরচন্দ্র বনস্পতির মতো আপনার

চতুর্দিকের ক্ষুদ্রতাকে ছাড়িয়ে উঠেছিলেন ঊর্ধ্বাকাশের দিকে, চলার পথে তাঁর সোদর অথবা সহযাত্রী কেউই ছিল না, কালের বিচারে তিনি ছিলেন আত্যন্তিকভাবে আধুনিক।' বিদ্যাসাগরের প্রজ্ঞা, কর্মনিষ্ঠা, মানবহিতৈষণা প্রসঙ্গে মধুসূদন বলেছেন, ÔThe man ...has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother.Õ[১২] বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলন ছিল মুখ্যত নারীর আত্মমুক্তির আন্দোলন। নারীর উন্নতি ব্যতীত সামাজিক উন্নয়ন কিংবা জাতীয় অগ্রগতি কখনোই সম্ভব নয়- এ সত্য বিদ্যাসাগর গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাই তিনি অধিকারবঞ্চিত নারীদের ন্যায্য অধিকার দিয়ে এবং স্ত্রীশিক্ষার মাধ্যমে সর্বস্তরের নারীদের আত্মচেতনা জাগ্রত করে যুগান্তরের প্রথাবদ্ধ গণ্ডি থেকে মুক্তি দিয়ে নারীদের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, আত্মশক্তিতে বলীয়ান স্বাধীন মানুষ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা সমসাময়িক কালে তেমন সফল হয় নি যদিও, কিন্তু পরবর্তীকালের আধুনিক নারীসমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছিল, নারী-পুরুষের ভারসাম্যপূর্ণ সুসম্পর্ক আনয়নে সহায়ক হয়েছিল, এমনকি সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠা ও সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব করে তুলেছিল। বিদ্যাসাগরের মানবমুখিন আদর্শ সাহিত্যকর্মে, শিক্ষাসংস্কারে এবং সমাজকল্যাণের গণতান্ত্রিক কর্মক্ষেত্রের সর্বত্র বিকাশমান থেকেছে বলেই আমরা বহুদূর অগ্রসর হতে পেরেছি। বস্তুত বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে শিক্ষা-সাহিত্যের সংস্কারক এবং নারীর আত্মমুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অগ্রদূত ও প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে সবার আগে বিদ্যাসাগরের নামই উল্লেখ করতে হয়।

তথ্যসূচি:

---

১. বদরুদ্দীন উমর, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ*, কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, মার্চ ১৯৮০, পৃ. ২৬

২. তদেব, পৃ. ২৪

৩. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮৪, পৃ. ৪০৯

৪. তদেব, পৃ. ৪০২

৫. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৭, পৃ. ৩৯৬

৬. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, *বিদ্যাসাগর: সংস্কারক এবং শিল্পী* প্রবন্ধ, দ্র: গোলাম মুরশিদ, *বিদ্যাসাগর*, ঢাকা, শোভা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ৪২

৭. বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

৮. তদেব, (বিদ্যাসাগর কর্তৃক সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে লেখা পত্রের অংশবিশেষ) পৃ. ২৩৯

৯. তদেব, (ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যাসাগরের লিখিত পত্রের অংশবিশেষ) পৃ. ৪৫৩

১০. আহমদ শরীফ, *বিদ্যাসাগর* প্রবন্ধ, দ্র: গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

১১. বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

১২. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), *মধুসূদন-নাট্য-গ্রন্থাবলী*, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৯, (মধুসূদনের Letters from Europe, To pandit Iswar Chandra Vidyasagar †_‡K) c,,. 852

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা: মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা

ড. ফজলুল হক সৈকত*

সারসংক্ষেপ: মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো, তিনি বাংলাভাষাকে অবজ্ঞা করেছিলেন। আর তাঁর বিরাট-ব্যাপক অর্জন, তিনি বাংলাভাষায় প্রথম সফল আধুনিক কবিতার নির্মাতা। কবিতার কাঠামোর রূপান্তরে তিনি যে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছেন, সেই জন্য তাঁর নাম এখনও অবশ্য উচ্চার্য। সমকালে সারা দুনিয়ায় ইংরেজিই ছিল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক যোগাযোগের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। এখনও পর্যন্ত ইংরেজি ভাষার ওই জায়গাটায় পৃথিবীর আর কোনো ভাষা প্রবেশ করতে পারে নি। আর যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন ততটা উন্নত হয়ে ওঠে নি। আজকের বিশ্বের মতো তখন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রবল প্রবাহ ছিল না। কাজেই নিজেকে, নিজের ভাষার ভাবসম্পদকে, নিজের মাতৃভূমিকে বিশ্বদরবারে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে তখনকার সময়ে ইংরেজির ওপর ভর করা ছাড়া কোনো গতি ছিল না। তার ওপর আবার ভারতবর্ষে সেই সময় বিরাজ করছে ব্রিটিশ উপনিবেশ। বাংলাভাষা এবং মাতৃভূমির জন্য মধুসূদন যে কাজটি করে গেছেন, শৈল্পিক পথের বাঁকে বাঁকে, তার তুলনা আজ অবধি বাংলাসাহিত্যে তৈরি হয় নি। নিজের বেড়ে ওঠার জমিন, তার প্রতিবেশ, মনের ভাবপ্রকাশের ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য মাইকেল মধুসূদনের মতো করে আর কেউ প্রকাশ-প্রচার করতে পারে নি। বিশ্বদুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা ভাষাপ্রেমি মানুষেরা, তাদের ভাষাপ্রসঙ্গ সামনে এলে, পূর্বকবিপুরুষ মধুসূদন দত্তের ভাষাপ্রেম ও দেশপ্রেম নিয়ে অনায়াসে গর্ব করতে পারেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সফল আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (জন্ম: ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪; মৃত্যু: ২৯ জুন ১৮৭৩)। কবিতার বিষয় ও শৈলীতে তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনাকারী কবি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণার ভারতীয় সংস্করণ, দেশমাতার প্রতি অমিত ভালোবাসা, মহাকাব্য রচনা, অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি ও তার যথার্থ প্রয়োগ, সনেট রচনা, পত্রকাব্য রচনা– প্রভৃতি বিষয়ে ও ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার প্রতিফলন এবং সৃজন-প্রয়াস বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারকে দান করেছে অভূতপূর্ব মর্যাদা ও সৌন্দর্য। এছাড়া বাংলা সাহিত্যে প্রথম সফল ঐতিহাসিক ও ট্র্যাজেডি নাটক এবং প্রথম মঞ্চসফল নাটক রচনার জন্যও তিনি সবিশেষ পরিচিত। তাঁর *মেঘনাদবধ কাব্য* বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং এক অর্থে একমাত্র মহাকাব্যের মর্যাদায় আসীন; বাংলা ভাষায় সনেট সৃষ্টি ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত মধুসূদন অবিকল্প ব্যক্তিত্ব! পত্রকাব্য রচনায়ও তিনি দেখিয়েছেন পথপ্রদর্শকের প্রণোদনা। শেষ বয়সে আর্থিক প্রয়োজনে রচিত ফরমায়েসি নাটক 'মায়াকানন' ছাড়া তাঁর সাহিত্যকৃতির কোথাও কোনো দুর্বলতার ছাপ আজও চিহ্নিত হয় নি:

> স্বনামধন্য কবি মধুসূদনের হাতে কেবল ছন্দেরই যুগান্তর ঘটে নাই, কবি-ভাষাতেও যুগান্তর ঘটিয়াছে। প্রতিভাবান এই সার্থকস্রষ্টা আপন কাব্যের উপযোগী ভাষা তৈয়ারী না পাইয়া সৃষ্টব্যাপারে কোন অন্তরায় বোধ করেন নাই, বরং কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন ভাষাকেও তৈয়ার করিয়া লইবার তাগিদে তাঁহার সৃজনীপ্রতিভা নবতর উৎসাহে উল্লসিত হইয়া উঠে। কাব্যসৃষ্টি ও ভাষাসৃষ্টি যুগপৎ চলিত থাকায় কবি একবার প্রাণ ভরিয়া স্রষ্টার গৌরব উপভোগ করিয়া লইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।[১]

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা, একাডেমিক কমিটি, আর্টস গ্রুপ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

বাংলাভাষার ভাবসম্পদ এবং সৌকর্য সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান ও ভালোবাসা ছিল বলেই মধুকবি তাঁর কবিতার গায়ে জড়াতে পেরেছিলেন ভাষাবোধের রঙিন-শোভনীয় চাদর। ভাষার প্রতি মমতা, প্রবল নিষ্ঠা মধুসূদনকে পৌঁছে দিয়েছে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে। ভাষাকে আর দেশকে তিনি যেন এক সরল রেখায় দাঁড় করিয়ে পাঠকের সামনে হাজির করেছিলেন সমূহ প্রাণ-প্রাচুর্য সমেত। এই যে অভিনিবেশ ও অনুভবের অভিজ্ঞান, তা বাংলাসাহিত্যে বিরল। বাংলাভাষাকে দেশের পাটাতনে রেখে এতটা সম্মান এবং শোভা আর কেউ প্রদান করেন নি।

মধুসূদনের জন্ম বাংলার ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে। উনিশ শতকের শুরুতে এ ভূখণ্ডে ঘটে নানান পরিবর্তন; বাংলার নবজাগরণের সে এক বিরাট শুভসময়! ইউরোপ-আমেরিকার শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ধর্ম-দর্শন-মানবতা-ইতিহাস প্রভৃতির প্রভাব ভারতবাসীর জীবনে সামগ্রিকভাবে আমূল পরিবর্তনের আবহাওয়া প্রবাহিত করলো। আত্মমুক্তির আবাহন আর সংস্কারমুক্তির চিন্তা তখন ভারতকে আন্দোলিত করেছিল। মধুসূদন সে জল-বাতাসে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন; সে সব প্রবণতা আত্মস্থ করেছিলেন বেশ দ্রুত। এছাড়া উনিশ শতকি দেশপ্রেম আর স্বাধীনতা স্পৃহাও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল প্রবলভাবে। শত শত বছরের ইতিহাসের গতি ও পাঠ থেকে আমরা জানতে পেরেছি, বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে ভাষার আধিপত্যের ক্ষেত্রে অপ্রিয় নির্মম সত্যটি হলো কোনো রাষ্ট্রশক্তির একচ্ছত্র ক্ষমতায়ন। ইংরেজি, চাইনিজ, স্প্যানিশ, ফ্রেন্স, আরবি, রুশ প্রভৃতি ভাষার প্রসার ও প্রচারে সাম্রাজ্যবাদী কিংবা ঔপনিবেশিক আগ্রাসন গুরুদায়িত্ব পালন করেছে। ফিশম্যানের ভাষ্যানুযায়ী,

> দুই শতকের ব্রিটিশ ও মার্কিন ঔপনিবেশিক কল-কারখানা-শিল্প, বৈজ্ঞানিক ও মুদ্রাবণ্টনের ক্ষমতার প্রয়োগ উচ্চশিক্ষায়, শাসনতন্ত্রে, বিপণনে ও প্রযুক্তিতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব বিছিয়ে গেছে।[২]

বিশ্বায়নের ধারণার মাধ্যমে ভাষাভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদের ছদ্মাবরণে ইংরেজি ভাষা বিশ্বে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। বিশ্বব্যাপী ইংরেজি যেন এক আদিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ভাষার নাম। ভাষার ভুবনে সৃষ্ট একাধিপত্য এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যহীনতার কারণে তৃতীয় বিশ্বের ভাষাসমূহের ওপর প্রবল চাপ পড়ে। ভাষা ব্যবহারকারীরা খুব স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজির আধিপত্যের কাছে নতি স্বীকার করে বসে। ভাষার অস্তিত্বের ওপরতো আঘাত এখনও চলমান রয়েছে। যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা ‘গার্ডিয়ান’ প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়– ‘পৃথিবীতে প্রচলিত ৬০০০ ভাষার মধ্যে আগামী একশ’ বছরে অর্ধেক ভাষা অর্থাৎ ৩০০০ ভাষা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।’[৩]

ইউরোপের প্রতি মাইকেল মদুসূদন দত্তের প্রবল এবং আপাত অস্বাভাবিক ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়েছে; তিনি যে-কোনো উপায়ে এশিয়া পরিত্যাগ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য তাঁর এ মানসিক অবস্থার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল সাহিত্যশিল্প চর্চায় ইউরোপের সামাজিক-রাষ্ট্রীয় অনুকূল আবহাওয়া। ইংরেজি ভাষাদক্ষতা ছিল মাইকেলের বিশেষ যোগ্যতা। অল্পবয়সে– কলেজে পড়ার সময়ে এ বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি পরিচিত ও পণ্ডিতজনদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কলকাতা বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য রামনারায়ণ তর্করত্নের *রত্নবতী* নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে তিনি সবিশেষ প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। ÔI sing for Albion’ sdistant shore/ Its valleys green, its mountains high’Ñ ইংল্যান্ডের সাহিত্য-সংস্কৃতি জীনবচর্চার প্রতি এক

দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে এরকম দেশবিমুখ কথা লিখেছিলেন তরুণ মধুসূদন দত্ত। তাঁর কাব্যচর্চা তখন ইংরেজিতেই। চেয়েছিলেন ইংরেজি ভাষার এক অন্যতম কবি হতে। ঘটনাচক্রে তিনি হয়ে উঠলেন বাংলাভাষার এক বিস্ময়কর সাহিত্যস্রষ্টা। রবীন্দ্র-সার্ধশতবর্ষেই তাঁর *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর দেড়শো বছর পূর্ণ হয়েছে, যদিও সে-পূর্তি থেকে গিয়েছে প্রায় অন্তরালেই। সম্প্রতি, এক বিরল সম্মান লাভ করলেন মধুকবি। '*অক্সফোর্ড ডিকশনারি অফ ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি*-তে স্থান পেল তাঁর জীবনী, বঙ্গভাষার কবি হিসেবেই। ব্রিটিশ ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নানা সময়ে যে-অসংখ্য মানুষ তাঁদের অবদান রেখেছেন, তারই স্বীকৃতি এই অভিধানে তাঁদের নামের অন্তর্ভুক্তি।'[৪] অনেকে মনে করেন, বিশেষত ইংল্যান্ডপ্রীতির কারণেই কবি মধুসূদন ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টানধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন; বিয়েও করেছিলেন খ্রিস্টান মহিলাকে। ধর্ম পরিবর্তন করে তিনি নামের আগে মাইকেল শব্দটি যুক্ত করেন। আসলে ভারতের গণ্ডি পেরিয়ে সারা পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে ও শিল্পভুবনে নিজেকে হাজির করা এবং খ্যাতি অর্জনের নেশা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল এই বাঙালি নাট্যকার-কবি শ্রী মধুসূদন দত্তকে। তিনি গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু, সংস্কৃত, তেলেগু, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয় ভাষাও শিখেছিলেন এবং পাশ্চাত্য চিয়ায়ত সাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলেন। মধুসূদনের যখন জন্ম, তখন ভারতে সরকারি কাজকর্মের ভাষা ছিলো ফারসি। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে আদালত এবং সরকারি কাজকর্মের ভাষা হিসেবে চালু হয় ইংরেজি। তখন স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজি শেখার চাহিদা বাড়তে লাগলো! এই সহজ সত্যটি, মধুসূদনের সাহিত্যপাঠের সময়, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। আর এও ভুলে গেলে চলবে না যে, 'তিনি যখন কবিতা লেখেন, তখন বাংলাভাষা এবং সাহিত্যের এত উন্নতি হয়নি। সেই ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি আধুনিক চেহারা দিয়েছিলেন। কবিতা লিখেছিলেন নানা ধরনের। কেবল কবিতা নয়, বাংলাভাষায় প্রথম আধুনিক নাটকও লেখেন তিনি।'[৫] মধুসূদনের কাব্যভাষা বিষয়ে বাংলাভাষার ভিনদেশি গবেষক উইলিয়ম রাদিচের মন্তব্য থেকে খানিকটা পাঠ নেওয়া যাক:

> মধুসূদনের সব কবিতায় ভারসাম্য বা সামঞ্জস্য থাকে না। তাঁর যে ব্যক্তিত্বের উচ্ছৃঙ্খলতা অনেক সমালোচক বা জীবনীকার লক্ষ্য করেছেন, মাঝে-মাঝে তাঁর রচনায় তাঁর প্রতিফলন দেখা যায়। 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে' কৃত্রিমতা আছে অনেক বেশী; কবিতাটির অত্যন্ত জাটিল কাব্যালঙ্কার আর আভিধানিক ভাষার সঙ্গে লড়াই করে আধুনিক পাঠক আনন্দ পাবেন না। (আমার তো কবিতাটি খুব ভালো লাগে, তবে বোধ হয় আমার রুচি একটু অন্য রকম।) কিন্তু মধুসূদনের সবচেয়ে ভালো কবিতায়– 'বীরাঙ্গনা কাব্যে', 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে', 'মেঘনাদবধ কাব্যে' আমার মতে এই ধরনের ত্রুটি নেই। অনেকে একমত নন; 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশের সময় অনেক পণ্ডিত আর সমালোচক খুব আপত্তি করেছিলেন; হয়তো এখনও কেউ কেউ আছেন যাঁরা মধুসূদনের অদ্ভুত ভাষা আর ব্যাকরণ পছন্দ করেন না।[৬]

তাঁর রচিত সাহিত্য: নাটক– *শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, মায়াকানন;* কাব্যনাট্য: *রিজিয়া* (অসমাপ্ত) মহাকাব্য: *মেঘনাদবধ কাব্য;* কবিতাগ্রন্থ: *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী*। এছাড়া তিনি ইংরেজিতে গ্রন্থ রচনা করেছেন। মাদ্রাজে থাকাকালে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন তিনি। তাঁর প্রথম কাব্য *ক্যাপটিভ লেডি*; গ্রন্থটি বাজারসাফল্য বা পাঠকপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। ১৮৪২ সালে বিলেতের পত্রিকায় প্রকাশের জন্য কবিতা পাঠানোর আগেই কলকাতার পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপা হয়েছিল; অবশ্য সেগুলোতে বায়রন-শেলি-

ওয়ার্ডসওয়ার্থ-রিচার্ডসন-কীটসের প্রভাবে রোম্যান্টিক ভাবধারাই প্রকাশ পেয়েছিল; পাশ্চাত্যপ্রেম আর নীলনয়না নারীর প্রতি আকর্ষণই ছিল তাঁর তখনকার সৃজন-কল্পনার মূল ভিত্তি! ১৯৪৬ সালের পর, মাদ্রাজে থাকাকালে (একটি বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে চাকুরিসূত্রে; অবশ্য ওই বিদ্যাপীঠে কোনো প্রধান শিক্ষক ছিলেন না এবং পদও ছিল মাত্র একটি) প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নে।

বাংলাকে উপেক্ষা করে সে সময় তিনি ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চার যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন, তা যে পরবর্তীকালে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে– সে কথা তিনি এবং তাঁর পাঠক আজ ভালোভাবেই অবগত! ইংল্যান্ড যাবার পথে তাঁর স্বপ্নের দেশের কাছাকাছি পৌঁছে যাবার আবেগময় অনুভূতির কথা আমরা জানতে পারি বন্ধু গৌরদাস বসাককে ১১ জুলাই ১৮৬২-তে লেখা চিঠি থেকে। কবি লিখেছেন:

> হে আমার প্রিয় ও পুরনো বন্ধু। আমি 'সীলোন' নামক একটা জাহাজে চলেছি। এখন তোমাকে কয়েক ছত্র লিখব বুঝলে বৎস!... এ মুহূর্তে আমি ভেসে যাচ্ছি বিখ্যাত সেই ভূমধ্যসাগরের মাঝ দিয়ে, এখান থেকে উত্তর আফ্রিকার পর্বতাকীর্ণ উপকূল দেখা যায়। গতকাল ছিলাম মলটায়, গত রোববারে আলেকজান্দ্রিয়ায়। আর মাত্র কয়েকদিনের ভেতরেই ইংল্যান্ডে পৌঁছে যাব আশা করি। আজ থেকে বাইশ দিন আগে আমি কলকাতায় ছিলাম। বেশ দ্রুতগতিতেই আমরা চলেছি কী বল? কিন্তু এ ভ্রমণের একটা দুঃখজনক বিষয়ও রয়েছে। সব জানতে পারবে, ধৈর্য ধারণ কর ধৈর্য, বন্ধু।[৭]

মধুসূদন বাংলায় সনেট লেখার আগে ইংরেজিতে আঠারটি সনেট রচনা করেছেন। তিনি অবশ্য ভার্সাই থেকে গৌরদাসকে লেখা এক চিঠিতে সনেট রচনার ক্ষেত্রে পেত্রার্ককে অনুসরণ করবেন বলে জানিয়েছিলেন। ১৮৬৫ সালে লেখা একটি চিঠির কিছু অংশ তুলে ধরছি:

> I have been lately reading petrarca- the Italian poet, and scribbling some sennets after his manner. There is one addressed to this very river (কপোতাক্ষ নদ)... I hope to come out what you all think of this new style of poetry.

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কবি মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, তিনি বাংলাভাষায় সনেট রচনা আরম্ভ করেছেন এবং *কবি-মাতৃভাষা* নামে একটি সনেট লেখার কাজ সমাপ্ত করেছেন। পরবর্তীকালে ওই সনেটটি *বঙ্গভাষা* নাম ধারণ করে তাঁর *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। *বঙ্গভাষা* বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট। কবিতাটির বিষয়ভাবনা এবং পরিবেশনশৈলী মার্জিত-পরিশীলিত ও সংহত। ভুলের জন্য মনোবেদনা এবং ধারাপরিবর্তন করে সিদ্ধি অর্জনের পরিতৃপ্তি কবিতাটির মূল কথা! চতুর্দশপদী কবিতা লিখতে গিয়ে মধুসূদন ইতালির কবি– জগৎখ্যাত সনেট-রচয়িতা পেত্রার্ক এবং ইংরেজ কবি মিল্টনের কলাকৃতি বিশেষভাবে অনুসরণ করেছেন। *'বঙ্গভাষা'* কবিতার শুরুতে লেখকের মানসিক বেদনাবোধ আর আত্ম-উপলব্ধির বিবরণ সাজানো হয়েছে এভাবে:

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;–
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিণু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!

অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;–
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!
(বঙ্গভাষা)[৮]

কবি বঙ্গ বলতে বাংলাভাষাকে বুঝিয়েছেন; তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য-ভাণ্ডার অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এবং উৎকর্ষমণ্ডিত। তবে তিনি নির্বোধের মতো অন্যের ভাষা-সাহিত্য আয়ত্ত করার এবং তার অনুকরণে সৃজনচর্চার আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করেছিলেন। একবার বলেছিলেন– ÔIt is the language of fishermen, unless you import largely from Sanskrit'| আর তখন থেকেই তাঁকে আঁকড়ে ধরে ইংরেজিপ্রীতি; এই যে পরের চিন্তাভাণ্ডরের মোহে আকৃষ্ট হবার প্রবণতা– একে তিনি পরের ধনের প্রতি লোভমত্ততা বলে অভিহিত করেছেন! নিজের ভাষা বাংলাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার শৈল্পিক প্রকাশ তিনিই প্রথম প্রদর্শন করেছিলেন; আজও আমরা হয়তো অনেকেই মাতৃভাষাকে যথার্থ মর্যাদা দেই না, কিন্তু তা তেমনভাবে অর্থাৎ দালিলিকভাবে ব্যক্ত করার প্রবণতা খুব কম লোকেরই রয়েছে! কিন্তু মধুসূদন সে কাজটি করেছেন নিঃসঙ্কোচে এবং তাঁর জন্য নিজেকে নির্বোধও ভেবেছেন বিনা দ্বিধায়! এই বৈশিষ্ট্যটি তাঁর সারল্যকে, মহত্ত্বকে প্রকাশ করে। কবিতাটিতে খুব স্পষ্টত কবির ব্যক্তিজীবনের প্রভাব পড়েছে। কবি মধুসূদন সাহিত্য সাধনার সূচনাই করেছিলেন ইংরেজি ভাষায়; পরে সে পথ পরিবর্তন করে বাংলা ভাষা মাধ্যমে শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করেন। এক সময় তিনি অনুধাবন করেছেন– অন্যের ভাষায় সাহিত্যসাধনা করা কিংবা কল্পনারাজি বিকাশের পথ অন্বেষণ করা এক ধরনের ভিক্ষাবৃত্তিমাত্র! মাতৃভাষার মাহাত্ম্যকে অবহেলা করার অপরাধে নিজেকে অপরাধী মেনেছেন তিনি; অনুশোচনায় কাতরও হয়েছেন! তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় চিন্তার প্রকাশ ও বিকাশ দুরুহও বটে; এবং সে অভিপ্রায় অনভিপ্রেত, অশুভ এবং অগ্রহণযোগ্য!– যাকে তিনি অভিহিত করেছেন 'অবরেণ্য' বলে। বিভিন্ন ভাষায় দখল অর্জনকারী এই সাহিত্যিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন– মাতৃভাষার চেয়ে বড়ো কিছু হতে পারে না। লঙ্গিনাস[৯] মনে করেছেন, মহৎ আত্মা থেকে উৎসারিত হবে সাহিত্য এবং তা হবে মহিমামণ্ডিত। চমৎকার রচনাশৈলীর জন্য প্রয়োজন হবে চমকপ্রদ শব্দভাণ্ডারের। মাইকেলের অনুভব এবং রচনাবলীর দিকে তীক্ষ্ণ-পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি এবং শ্রবণযন্ত্র নিবদ্ধ রাখলে আমরা দার্শনিক লঙ্গিনাসের বক্তব্যের প্রতিফলন দেখতে পাই এবং অনুরণন শুনতে পাই।

মাতৃভাষায় শিল্পসাধনার প্রেরণাদাত্রীকে কবি মধুসূদন কুললক্ষ্মী বলে বিবেচনা করেছেন; তাঁর ধারণা শিল্পী-সাহিত্যিকরা ওই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নির্দেশে বা অনুকম্পায় অথবা স্বপ্নাদেশ বলে সৃজনশীল প্রতিভার প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়ে থাকেন। তাঁর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি বলেই কবির বিশ্বাস! বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য যে ভাবসম্পদ এবং স্মরণীয় ব্যক্তিত্বে সমৃদ্ধ, তা মধুকবির বুঝতে অসুবিধা হয় নি; রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ বাংলাভাষার অমর সব কীর্তি এবং অসাধারণ সব প্রতিভার কথা মনে করেছেন। তিনি জানতেন এবং মানতেন– চর্চাপদ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্য-মঙ্গলকাব্য-মহাভারত-রামায়ণ-মেঘদূত-গীতগোবিন্দ আর এসবের রচয়িতারা তো আমাদের বাংলা ভাষারই অমূল্য সম্পদ!

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,–
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,

এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে॥
(বঙ্গভাষা)

মধুসূদনের কোনো কোনো পাঠক-সমালোচক এমন ধারণা পোষণ করেন যে, মধুকবিকে তাঁর সমূহ আবেগ-উপলব্ধিসহ ধরতে চাইলে অবশ্যই সনেটকে অবলম্বন করতে হবে। তাঁদের চিন্তায় মাইকেলের কবিতা-নির্মাণকৌশল, জগৎ-জীবন সম্বন্ধে তাঁর অনুভব, বাংলাদেশের [তৎকালীন ভারতবর্ষ] প্রকৃতির মনোরম শোভা, এ মাটির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিস্তৃত চেতনা, তাঁর সৃষ্টির বিষয়-বৈচিত্র্য, গীতিসুষমা এবং আত্মভাবনিষ্ঠা– এ সবকিছুর সরল সাক্ষাৎ মিলবে কবির এসব কবিতায়। প্রকৃত অর্থে সনেটকে তিনি কেবল মানবিক প্রেম বা দেশপ্রেমের বিবরণভূমি না বানিয়ে বহুভাবসম্পদের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মাইকেল তাঁর কাব্যপ্রেরণায় অনুভব করেছেন পূর্বসূরি বাল্মিকী-কাশিরাম-কালিদাসের চেতনা আর ভারতীয় পুরাণের অনুপ্রেরণা; তাঁর ভাবনায় কবি যেন আনন্দ-আসরে কোনো বন্দি, যে কিনা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে পূর্বপুরুষ কিংবা পূর্বমহিলার যাবতীয় অর্জনের গৌরব! আর তাই হয়তো তিনি ভিনদেশি কবিতাকানন থেকে উপকরণ ও কৌশল ধার করে আপন সংস্কৃতির আলোয় সাজাতে সক্ষম হয়েছেন অভিনব কবিতামালা। কবিতা রচনা আর কাব্যের স্বাদ আস্বাদনে চিত্তের প্রসন্নতাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মেনেছেন কবি মধুসূদন। 'তাঁকে বলা যায়, কবিকুলের কবি। গ্রীক সাহিত্যে হোমার, লাটিন সাহিত্যে ভার্জিল, ইতালীয় পেত্রার্ক, ইংরেজি সাহিত্যে শেক্সপীয়র, জার্মান সাহিত্যে গ্যেটে, রুশ সাহিত্যে পুশকিনের যে স্থান, বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের সেই আসন। তাই অনাগতকাল ধরে তিনি বাঙালি ও বাংলাভাষীর হৃদয়ে চির জাগরূক হয়ে থাকবেন এবং আমাদের আত্মোপলব্ধির জন্যে তাঁকে প্রতি যুগে নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে।'[১০] মাইকেল কল্পনাপ্রবণতাকেও মান্য করেছেন। যেমন লিখছেন– 'কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে/কালিদহে।' সুখ-দুঃখের সম্মিলনে কবিতার ক্যানভাস নির্মাণের পক্ষপাতি ছিলেন তিনি। 'কি দুখে, হে পাখি, তুমি শাখার উপরে/বসি, বউ কথা কও, কও এ কাননে?' অন্যত্র লিখেছেন: 'কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে,/কুসুমের দাস যথা মারুত, সুন্দরি,/ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে/এ বৃথা সংশয় কেন?' [চতুর্দশপদী কবিতা: ১৪] কবির কাজ হচ্ছে শব্দের সাথে শব্দের জোড়া দিয়ে অনিন্দ্য শোভা সৃষ্টি করা; পার্থিব সংসার-সাগরে সোনার কিরণ ছড়ানোও সম্ভবত কবিতার একটি দায়িত্ব– অন্তত মাইকেল এমনটি ভাবতে কৃপণতা বোধ করেন না। তাঁর কল্পনায় কবি এমন এক ব্যক্তি:

আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা বলে:
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে:
মরুভূমে– তুষ্ট হবে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে!
(কবি)

শিল্পের চর্চায় মধুসূদন মানেন– 'কবিতা-অমৃত-রসে'। দেশমাতা-পরিচিত ভুবন আর ফেলে আসা দিনের-পথের রেখাকে কবিতায় আঁকতে ভালোবাসেন তিনি। শৈশব-কৈশরের স্মৃতিবিজড়িত নদীর প্রতি মাইকেলের বিশেষ আকর্ষণের খবর আমরা পাই তাঁর 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায়। তাঁর জন্মস্থান বাংলাদেশ আজ যখন নদীর বাঁচা-না-বাঁচা জটিলতায় আক্রান্ত, তখন তাঁর নদীর প্রতি মমতার কথা আমাদেরকে নতুন করে চিন্তার দরোজায় পৌঁছে দেয়। বর্তমানে একদিকে প্রতিবেশী ভারতের [অবশ্য মধুসূদনের সমকালে ভারত ছিল অখণ্ড; দেশবিভাগের ধারণাও ছিল কলাপনাতীত] ফারাক্কা বাঁধের মরণকামড় এবং টিপাইমুখ বাঁধের অমিত পরিকল্পনা, অন্যদিকে চীনের পানিবিষয়ক পররাষ্ট্রকৌশল বাংলাদেশের পানিস্থিতি এবং পানিপ্রবাহের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নদীর জন্য মাইকেলের আকুলতা বাংলা সাহিত্যে একরকম প্রবাদ হয়ে উঠেছে। আজ কেবল মনে হতে পারে, তবে কি মধুসূদনের ভাবনার অতলে অনাগত দিনের নদীর কান্না লুকিয়ে ছিল; তিনি কি টের পেয়েছিলেন তাঁর দেশের নদীর ভবিষ্যৎ অসহায়তা। প্রবাসজীবনের যাতনা আর দেশমাতাকে ভালোবাসার অনন্য উদাহরণ তাঁর 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি। কবি জানাচ্ছেন:

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
(কপোতাক্ষ নদ)

নদীর– শৈশবের প্রিয় বিচরণক্ষেত্রের দৃষ্টিসীমার বাইরে অবস্থান করে কবি স্মৃতির নরম রুমালের স্পর্শ পেতে চাইছেন; যেন কান পাতলে শুনতে পাচ্ছেন সেই চেনা কলকল ধ্বনি। পৃথিবীর বহুদেশের বহু নদ-নদী-সমুদ্র-মহাসাগর পার করে জীবনের পরিভ্রমণকালে ক্লান্ত কবি অনুভব করছেন দেশের সেই ছোট্ট নদীটির জন্য মনোযন্ত্রণা; তার কাছে ফিরে যাবার জন্য কেমন যেন এক অবোধ্য তাড়না। তিনি লিখছেন– 'জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!/ বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,/কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মেটে কার জলে?/দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে!' (কপোতাক্ষ নদ) মা যেমন আমাদেরকে স্তন দেন; দেন মমতার অশেষ প্রলেপ, তেমনি দেশের মাটি-জল-বাতাস থেকে আমরা পাই স্নেহের পরশ। হয়তো মায়ের ঋণ আর মাটির ঋণ কোনোদিন শোধ করা যায় না; হয়তো কেবল শ্রদ্ধা আর অমিত ভালোবাসা দেবার চেষ্টা করছি আমরা! যার কথা বলার শক্তি নেই কিংবা যে গলাখুলে কথা প্রকাশ করতে পারে না, তার কষ্ট অনেক– ঋণ শোধের দায় থেকে তার মুক্তির পথও নিশ্চয়ই অনেক কঠিন; তবে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা যে অসুবিধা থেকে মুক্ত। বিধাতার করুণায় সৃজনশীল মানুষ বলতে পারেন তাদের সমূহ দায় ও দায়িত্বের ব্যাপারাদি। মাইকেল মধুসূদনের কাব্যভাবনায় আমরা দেখি দেশমাতার প্রতি অমিত শ্রদ্ধার বহিপ্রকাশ। তিনি বারবার তাঁর সেই আকুলতা ব্যক্ত করেছেন কবিতার কথামালায়। যেমন লিখেছেন 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায়:

আর কি হে হবে দেখা?– যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে

লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে!
(কপোতাক্ষ নদ)

জল-নদী-নদীতীর আর কূলের পারিপার্শ্বিকতায় মাইকেলের আকর্ষণ আমরা টের পাই তাঁর কাব্যভাবনার বিচিত্র অলিগলিতে; ধর্ম-আরাধনা অথবা সমকালীন সমাজ-সংকটের আড়ালে তিনি জলের বিচরণ-আনন্দে আচ্ছন্ন থেকেছেন চিন্তা আর স্বপ্নের দোলনাদোলায়। নদীর মমতায় মানুষের পরমার্থভাবনার সমন্বয়-অন্বেষাও আমরা পাঠ করি তাঁর কবিতা-কথায়। কবি লিখছেন:

এ মন্দির-বৃন্দ হেথা কে নির্ম্মিল কবে?
কোন্ জন? কোন্ কালে? জিজ্ঞাসিব কারে?
কহ মোরে কহ তুমি কল কল রবে,
ভুলে যদি, কল্লোলিনি, না থাক লো তারে।
(নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির)

'বৃথা ভাব, প্রবাহিণী, দেখ ভাবি মনে।' কিংবা 'হায়, গত, যথা বিম্ব তব চল জলে!' অথবা 'রে দুরন্ত, নিরন্তর যেমত সাগরে/চলে জল, জীব-কুলে চালাস্ সে মত।' প্রভৃতি কথারাজিতে পাঠক বোধকরি সেই মধুকবিকে পেতে পারেন, যিনি কপোতাক্ষ নদের জন্য আকুলতায় নিমগ্ন হয়েছিলেন।

ভাষার প্রতি মধুসূদনের মমত্ববোধের আরেকটি নিদর্শন তাঁর 'ভাষা' শীর্ষক কবিতা। ভাষাকে রূপময় মায়ের অধিক রূপবতী কন্যা হিসেবে বিবেচনা করে তিনি যে অভিনব চিন্তার প্রকাশ ঘটালেন, তা নিশ্চয়ই বাংলা কাব্যপরিসরে নতুনতর সংযোজন। 'বাংলা কবিতায় সর্বপ্রথম সজ্ঞানভাবে শব্দের ব্যবহার এবং শব্দের অর্থগত নয়, ধ্বনিগত বিশ্লেষণ করলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এর আগে বাংলা কবিতা ছিল একটা প্রথাবদ্ধতার মধ্যে সীমাবদ্ধ; হয় তা অতি সরলায়িত ভাষায় নয়ত জটিল তৎসম ভাষায় রচিত হত। কিন্তু ভাষার শব্দগুচ্ছ যেমনই হোক না কেন– তৎসমই হোক বা তদ্ভবই হোক অথবা দেশজই হোক, কাব্যে তার ব্যবহার-রীতির ক্ষেত্রে একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন আনলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এ সম্পর্কে তাঁর কিছু কিছু মন্তব্য তাঁর গ্রন্থের মধ্যেই আছে; আবার কিছু কিছু মন্তব্য আছে তাঁর লিখিত চিঠিপত্রের মধ্যে। চিঠিপত্র ছাড়াও তাঁর কবিতায় বিভিন্ন সূত্রে স্বগতোক্তিরূপে প্রসঙ্গটি ফিরে ফিরে এসেছে।'[১১]

বাঁশির সুরের মোহময়তা বা সময়ের সৌন্দর্যের লাভ-ক্ষতির বিবেচনার বাইরে ভাষার অপরূপতা কবিকে মুগ্ধ করেছিল, তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না; ভাষার আলোক যেন তাঁর চোখে দেশমাতার আকাশে শোভমান চাঁদের লাবণ্য! তাঁর অভিমত:

মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরি
ভাষা!– শত ধিক্ তারে!
(ভাষা)

মাতৃভাষা চর্চা, এর সৌকর্য বৃদ্ধি ও প্রচারের তাৎপর্য এবং স্বদেশভাবনা সম্বন্ধে মধুকবির অনুভব ও মন্তব্যও আমাদের জন্য প্রেরণা হয়ে আছে। 'কোনো এক ভাষা, যে ভাষা

সকলের ব্যবহার্য তা নির্বিশেষ, তাকে রচয়িতা কিভাবে তাঁর সংস্কৃতিবশে পরিস্থিতিবশে থেকে বিশিষ্ট ও একক রূপ দেন, সেই সমর্থ শিল্পায়াসের মূল্যাঙ্কন আর বিবেচনাও সমালোচনার এক দিক।'[১২] প্রসঙ্গত, ১৮৬৫ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখে ফ্রান্সের ভার্সাই-এ লেখা মধুসূদনের একটি পত্রের খানিকটা পাঠ নেওয়া যাক:

> মাতৃভাষা চর্চায় আত্মনিয়োগ করা ও একে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলার চেয়ে বড় কাজ আর কিছু নেই। তুমি কী ভাবতে পার, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স বা জার্মানি কোন কবি-লেখকদের মূল্যায়ন করে? যাঁরা তাঁর মাতৃভাষা ও স্বদেশের জন্য কিছু করতে পারে তাঁদের। ...আমরা যখন পৃথিবীর মানুষের কাছে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরে কথা বলব, তখন যেন আমাদের মাতৃভাষাতেই বলি। যাদের ভেতর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তাঁরা যেন তাঁদের মাতৃভাষার কাছে আশ্রয় খোঁজে।...মাতৃভাষায় যাদের কোন অধিকার নেই, সে সমস্ত লোকদের নিজেদেরকে শিক্ষিত বলে পরিচয় দেয়াটাকে আমি ঘৃণাবোধ করি।[১৩]

দেশমাতা আর নিজভাষার প্রতি মাইকেলের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যাবে 'বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে', 'দ্বেষ', 'সাংসারিক জ্ঞান', 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত', 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', 'ভারত-ভূমি' কবিতাবলিতে। শেষোক্ত কবিতাটিতে তাঁর বক্তব্য যেন প্রবাসে যন্ত্রণাকাতর কবির স্বদেশভূমির জন্য অনেক আর্তির সমাবেশ; তাঁর স্বাজাত্যবোধক অনুভূতি ইতালীয় কবি ফিলিকেইয়ার কণ্ঠের সাথে মিলিয়ে দেখলে এমনটা দাঁড়ায়: 'কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি! ইতালি!/এ দুঃখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি।' 'ভারত-ভূমি' কবিতাটির শেষ দুটি পংক্তি উদ্ধৃত হলো: 'কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি,/ চন্দন হইল বিষ; সুধা তিত অতি?' প্রবাস-অসুবিধা থেকে মুক্তির জন্য মাইকেলের যে কান্না, তা বোধকরি আজও শেষ হয় নি; বাংলাদেশের বাইরে যেসব বাঙালি জীবিকার জন্য, জাগতিক সাফল্য অর্জনের জন্য অবস্থান করছেন, [কিংবা কে জানে হয়তো অন্য কোনো মোহে আটকে আছেন প্রবাসের আঠালো জড়তায়!] তারাও আজ ভেতরে ভেতরে কাঁদছেন কবি মধুসূদনের মতো! কতক খবর আমরা কাগজের পাতায় পাই আর অনেকটাই থাকে অপ্রকাশ! এমনকি পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো প্রবাসীর জন্যও হয়তো এসব কান্নার আওয়াজ সত্য, তাও হয়তো অনুভব করা যায়! হৃদয়ের অন্ধকার অলিন্দে মধুকবি বিস্মৃতির জলে আপন অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে মাতৃভূমি আর মাতৃভাষার মর্যাদা আর অধিকার আদায়ের জন্য শেষত সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। আলোচনাটি শেষ করবার আগে একবার দেখে নিতে পারি মধুসূদনের ভ্রান্তিমোচনের প্রান্তিক আরতি:

শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে?)
এবে– ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে!
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,–
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ– ভারত-রতনে!

(সমাপ্তে)

মাইকেল মধুসূদন ছিলেন অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ী। বাংলাদেশের কবি আবিদ আজাদ (১৯৫২–২০০৮) একবার তাঁর একটি কবিতায় বলেছিলেন বাংলা কবিতার মাথায় না-কি অসংখ্য উকুন বাসা বেঁধেছে– সে উকুনাদি নির্মূল করার জন্য একটি উকুননিবারক চিরুনি আর সেই চিরুনি চালাবার দক্ষ কারিগরের প্রয়োজনও অনুভব করতে ভুল করেন নি তিনি;

তবে কারিগর লোকটি যে মাইকেল মধুসূদনের বিকল্প হবে না, সে ব্যাপারে আবিদ ছিলেন নিঃসংশয়! আমার মনে হয় আবিদের ধারণা বা চিন্তা আমাদের ভাবনায় যতো দ্রুত সংক্রমিত হবে, ততোই বাংলা কবিতার জন্য কল্যাণকর!

মধুসূদন দত্তের মহিমা কিংবদন্তী অথবা সংস্কাররূপে আমরা মেনে নিই। কেননা, সত্য আর আবেগের আড়ালে সত্যি সত্যিই মাইকেল বাংলাভাষার জন্য এক বড় কবির মর্যাদা ধারণ করে আছেন। তিনি স্বপ্নময় কবিতা আর কর্মময় গদ্যের শক্ত দেয়ালে এঁকে দিয়েছেন বাংলা ভাষার অমোচনীয় দাগ। স্বদেশি সম্পদ আর বিদেশি ঋণের সমন্বয়ে তিনি তৈরি করেছেন সাহিত্যের বিরাট অটল পাটাতন। বাংলাভাষায় তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই; সহযাত্রীও না। তাঁর নির্মাণের কল্পনা ও পরিকল্পনার আভিজাত্যে আঞ্চলিক-ক্ষুদ্র-গোত্রীয় এবং এক অর্থে কৃষকের ভাষা– বাংলাভাষা, মানভাষার কাতারে সামিল হয়েছে। ব্যক্তিতা-আঞ্চলিকতার খোলস থেকে মধুকবি বাংলাকে বহির্জগতের উদার দরোজায় কিংবা আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর বুনে-যাওয়া বীজ বাংলাভাষায় পরবর্তীকালে উত্তরাধিকারের আলো নিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় শব্দ তৈরির জন্য নবশব্দরূপতত্ত্ব আবিষ্কার, আভিধানিক দরকারিত্বের হাতছানির সত্যতাকে মেনে নিয়ে মধুসূদন বানিয়েছেন বিনাশের বিপরীতে শুভর পদচারণা এবং সৃজনশীলতার ব্যাপকত্ব:

> ঠাণ্ডা, ঢেউশূন্য, অন্ধকার ও আঞ্চলিক বাঙলা ভাষায় তিনি সঞ্চার করে দিয়েছিলেন অভাবিত তাপ, তরঙ্গ, আলো ও আন্তর্জাতিকতা, যা প্রায় তুলনাহীন। বাঙলা ভাষার প্রথাগতভাবে বিনয়ী ভক্ত কবিদের মধ্যে প্রথম অবিনয়ী, দ্রোহী ও সংস্কারহীন তিনি; এবং একই সঙ্গে তিনি এক দুঃখী বিশ্বভিখারি, যিনি আপন ভাণ্ডার ভরার জন্যে ভিক্ষা করে ফিরেছেন দেশে দেশে, ও রত্নে ভরেছেন বাঙলা ভাষার শূন্য ভাঁড়ার।... তিনি বুঝেছিলেন, বিশশতকি আধুনিকতা উন্মেষের অনেক আগেই, যে মরুভূমির মতো আধুনিক কালে দেশদেশান্তর থেকে কবিতার বীজ সংগ্রহ না করলে কবিতার কল্পতরু জন্মানো অসম্ভব।[১৪]

ভাষিক আপেক্ষিকতাবাদ (linguistic relativity hypothesis) বা ভাষিক নির্বাচন (linguistic determinism) ভাষা ও চিন্তন প্রক্রিয়ার সম্পর্ক বিষয়ক একটি মতবাদ। এ মতবাদ অনুযায়ী,

> আমরা যে উপায়ে আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎকে দেখি বা চিন্তা করি তার উপর ভাষার একটি বিরাট প্রভাব রয়েছে অর্থাৎ ভাষাই নির্ধারণ করে দেয় আমরা আমাদের চারপাশের জগৎকে কীভাবে প্রত্যক্ষণ করব। অবশ্য তাত্ত্বিকভাবে এ বিষয়টিকে আমরা বিপরীতভাবেও চিন্তা করতে পারি। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে আমরা কীভাবে কথাবার্তা বলব অথবা কী বাচনিক কাঠামোতে কথা বলব তা নির্ধারণ করে আমাদের চিন্তন প্রক্রিয়া। এ অর্থে চিন্তন প্রক্রিয়া ভাষার সাথে আপেক্ষিকভাবে সম্পর্কিত।[১৫]

মাইকেল মধুসূদন দত্তের শিল্প-সাহিত্য চর্চা এবং ভাষা-প্রয়োগের চিন্তন-বিলোড়নকে আমরা ভাষিক আপেক্ষিকতাবাদের সাথে মিলিয়ে পাঠ করতে পারি। তখন হয়তো দেখব তাঁর বেড়ে ওঠার প্রতিবেশের ভাষা কীভাবে কবি-কল্পনাকে প্রভাবিত করেছে; বিস্তার করেছে তাঁর ব্যক্তিগত সৃজনভাবনা ও প্রকাশভুবনকে। প্রতিভা আর কর্মপ্রেরণার সাথে মাইকেলের উচ্চাভিলাষী চিন্তাধারা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য এক বড় পাওয়া। বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য পাঠ করে সে সবের ঐশ্বর্য দিয়ে সাজাবেন বাংলা কবিতাকে– এমন একটা ধারণা তিনি লালন

করতে শুরু করেছিলেন শিল্পচর্চা আরম্ভের অল্পকাল পর থেকেই। বাংলা সাহিত্য উন্নততর করা আর এর সামর্থ্য বৃদ্ধি করার প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। কাজেই, মধুসূদন আমাদের জন্য অনেক গর্বের। তাঁর মতো সৃজনশীল ও সাহসী ব্যক্তি সব সময় সব সমাজে আসেন না। কালে কালে কোনো জাতি হয়তো লাভ করতে পারে এমন ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ ও সহযোগিতা। তাঁর জীবনবোধ আর আধুনিকতা-সংলগ্নতা আজও আমাদের পাথেয়।

তথ্যসূচি:

১. সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভূমিকা', *মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য* (সম্পাদিত), মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অষ্টাদশ সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ), ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ৩৫

২. সৌভিক রায়চৌধুরী, 'বিনে স্বদেশী ভাষা..., রূপে মনিজাণে', *রবিশস্য*, বইমেলা সংখ্যা, বর্ষ ৪, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৬৫

৩. বিস্তারিত জানতে দেখুন: মাসুদুজ্জামান ও ফেরদৌস হোসেন (সম্পাদিত), *বিশ্বায়ন: সংকট ও সম্ভাবনা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১৩৯

৪. 'অক্সফোর্ড অভিধানে মধুসূদন', *দেশ*, সম্পাদক: হর্ষ দত্ত, ৭৯ বর্ষ ২৩ সংখ্যা; ২ অক্টোবর ২০১২, এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৮৩

৫. গোলাম মুরশিদ, *ছোটো-বড়ো সবার মাইকেল*, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৯, অবসর, ঢাকা, পৃ. ১১

৬. উইলিয়ম রাদিচে, *চারটি বক্তৃতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ১৯

৭. *মধুসূদনের চিঠি*, অনুবাদ: খসরু পারভেজ, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০০৭, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৫১

৮. *মধুসূদন রচনাবলী*, ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ ১৯৯৬, (বর্তমান প্রবন্ধে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতার উদ্ধৃতিসমূহ উল্লিখিত সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে) পৃ. ১৫৯

৯. প্রথম খিস্টাব্দের রোমান লঙ্গিনাস এক বিশাল ও বহুমুখী প্রতিভা। তিনি দার্শনিক ও সমালোচক। এবং সাত্যিতত্ত্ব আলোচনায় ও নিরূপণে সুগভীর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ঙহ ঃযব ঝঁনষরসব সাহিত্য সম্পর্কিত ও সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থরূপে প্রায় দুহাজার বছর ধরে অমূল্য বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।

১০. মোবাশ্বের আলী, *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: ইংরেজি গদ্যরচনা ও স্মৃতিকথা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৯৮, পৃ. ৩

১১. সৈয়দ আলী আহসান, *কবি মধুসূদন: কবি-কৃতি ও কাব্যাদর্শ*, পঞ্চম সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ) অক্টোবর ২০০৪, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃ. ১৫০

১২. বীতশোক ভট্টাচার্য, *কবিতার ভাষা কবিতায় ভাষা*, বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ২০০৪, পৃ. ৫

১৩. গৌরদাস বসাককে লেখা চিঠি, *মধুসূদনের চিঠি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭

১৪. হুমায়ুন আজাদ, 'মাইকেল মধুসূদন: প্রথম বিশ্বভিখারি ও ত্রাতা', *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ২৬৬

১৫. এ. বি এম. রেজাউল করিম ফকির, 'ভাষা ও চিন্তনপ্রক্রিয়া', *নিবন্ধমালা* (একাদশ খণ্ড), মার্চ ২০০২, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৭১

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলাঃ রোমান্স ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

মোঃ রবিউল ইসলাম*

সারসংক্ষেপঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) বাংলা সাহিত্যের সম্রাট এবং এ ক্ষেত্রে তিনি একক ও অদ্বিতীয়। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রদ্ধার যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আসন তৈরি করেছেন তার মূলে রয়েছে তাঁর অসামান্য শিল্পীমানস ও রোমান্স রচনার অসাধারণ দক্ষতা। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদানটি হল, মানুষের ভিতরে মহৎ কাজের যে অনুপ্রেরণা রয়েছে, অন্তরের অপরিসীম নিঃসঙ্গতা সত্ত্বেও তাকে জয়ের পথে চালিত করার নিরলস প্রচেষ্টা এবং মানুষকে তিনি যথার্থরূপে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তাঁর রোমান্স উপন্যাসে আমরা এই মানুষের সঙ্গে পরিচিত হই। জীবনের বিচিত্র ঝংকার ও দীপ্ত সমারোহ মূলত রোমান্সের বিষয়বস্তু। অতিপ্রাকৃত ও অবাস্তব বিষয় রোমান্সের উপাদান হলেও বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর এর সৌধ নির্মাণ করেছেন, যেখানে ইতিহাসের রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়ে উপন্যাসের সীমা বিস্তার ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা আশ্চর্যভাবে বাড়িয়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিশেষ করে *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের রোমান্সের স্বরূপ সন্ধান ও গতি-প্রকৃতি এবং বৈচিত্র্য সম্পর্কে অবগতির বিষয়টি তাই বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক।

বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। তাঁর প্রায় সমস্ত উপন্যাসের চরিত্রগুলো জীবনচেতনার আনন্দে প্রাণবন্ত। এই আনন্দকে আরও উপভোগ্য করেছে ইতিহাসের সাথে রোমান্সের সংমিশ্রণ। এই দুয়ের সংমিশ্রণে বঙ্কিমের অপূর্ব শিল্প–দক্ষতার পরিচয় ফুটে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের যে সমস্ত উপন্যাসগুলিকে রোমান্স শ্রেণিভুক্ত করা যেতে পারে সেগুলো হলোঃ ১. দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), ২. কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), ৩. মৃণালিণী (১৮৬৯), ৪. যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), ৫. চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), ৬. রাজসিংহ (১৮৮১), ৭. আনন্দমঠ (১৮৮২), ৮. দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪), ৯. সীতারাম (১৮৮৭)। বঙ্কিম তাঁর প্রায় প্রতিটি উপন্যাসে বাস্তব বর্ণনার মধ্যে অতিপ্রাকৃতের ছায়াপাত করতে চেষ্টা করেছেন।

বঙ্কিমের উপন্যাসে মূলত ঐতিহাসিক, ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক এবং সমাজ জীবনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ এই তিনটি বিভাগ আছে। ঐতিহাসিক যুগের পটভূমিকায় প্রথম স্তরে যে উপন্যাসগুলির নাম আসবে সেগুলো হলঃ মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা এবং রাজসিংহ। 'কপালকুণ্ডলা'য় সপ্তদশ শতকের দক্ষিণ–বাংলার ইতিহাস ও রোমান্স মিশ্রিত চমৎকার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাপালিকের রহস্যঘন তান্ত্রিকতা, দুর্গম গঙ্গাসাগর যাত্রা, সমুদ্রকূলের বালিয়াড়ি, নিবিড় ঘনবন, মুঘল হারেমের চিত্র, পথে দস্যুদের উপদ্রব এসবের বর্ণনা থেকেই অনুমান করা যায় উপন্যাসটি সপ্তদশ শতকের বাংলার সমাজ-পটভূমিকায় রচিত। এই উপন্যাসে সমাজচিত্র অঙ্কনেও বঙ্কিম যথেষ্ট শিল্প–নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কল্পনার যে গগনবিস্তৃত সমাবেশ 'কপালকুণ্ডলা' ছাড়া অন্য কোনো উপন্যাসে দুর্লভ। পরিবেশ উপযোগী মূর্তি–কল্পনায় বঙ্কিম অসাধারণ শিল্প–প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।
রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র- এই তিনজনই বাঙালির মনকে মননের দ্বারা সুদৃঢ় করে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের মননশীল সাহিত্যানুরাগী করে তোলেন এবং বাঙালিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনরস ও প্রাণবাণীতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বাংলা উপন্যাসের পথের দিশারী এবং বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রই (১৮৩৮–১৮৯৪) বহুল সমর্থিত। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বাংলা উপন্যাসের চাকা প্রথম

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

ঘুরেছিল যাঁর হাতে তিনি হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪–১৮৮৩)। তাঁর রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হলেও জীবনের একটি নক্শা ব্যতীত পরিপূর্ণ জীবনালেখ্য এতে প্রতিবিম্বিত হয় নি। এই কারণে সমালোচকগণ এই উপন্যাসকে বাংলা সাহিত্যের সার্থক উপন্যাসের মর্যাদা না দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) কে এই স্থানটি দিতে চান। তাঁর উপন্যাসে কাহিনীর শক্ত গাঁথুনি আছে, প্রাণবন্ত চরিত্রসৃষ্টি আছে, আছে মানবহৃদয়ের গহীন গোপন রহস্যের উদ্ঘাটন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেকটি উপন্যাসই অত্যন্ত কল্পনা-সমৃদ্ধ। তাঁর এই কল্পনা দিগন্ত বিস্তৃত আকাশে ডানা মেলেছে রোমান্সকে আশ্রয় করে। আর বঙ্কিমের রোমান্স মূলত ইতিহাসাশ্রয়ী, যার কারণে তিনি 'ঐতিহাসিক রোমান্স রচয়িতা'র অভিধায় অভিষিক্ত। ঐতিহাসিক রোমান্স রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ পেলেও তারুণ্যের প্রাবল্যে তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক রোমান্স পরিপূর্ণ বিকশিত নয়। এর এক বছর পর প্রকাশিত 'কপালকুণ্ডলা'(১৮৬৬) উপন্যাসে তাঁর রোমান্সচেতনা পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের রোমান্স বিষয়ক আলোচনার আগে রোমান্স সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটি পরিষ্কার হওয়া প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

'রোমান্স' শব্দটি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি থেকে আমদানি করা। `Romance' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিস্ময়কর কল্পিত-কাহিনী, উগ্র বা অস্বাভাবিক প্রেমমূলক উপন্যাস। Oxford Advanced Learner's Dictionary –তে Romance এর অর্থ করা হয়েছে এভাবে:

> 1. An exciting, usually short, relationship between two people who are in love with each other.
> 2. Love or the feeling of being in love.
> 3. A feeling of excitement and adventure, especially connected to a particular place or activity.[1]

'রোমান্স' শব্দের অর্থ নিয়ে ইউরোপের নানা দেশের সাহিত্যে অনেক আলোচনা হয়েছে। মূলত 'রোমান্স' শব্দের মধ্যেই এর অর্থ নিহিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেন: 'যে সকল কাব্য ও উপন্যাসে কল্পনা অতিশয় সমৃদ্ধিমান, যেখানে আখ্যায়িকা বা চরিত্র আমাদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে, তাহাই রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত।'[২]

এই শ্রেণির উপন্যাসে বাস্তবতার চেয়ে আবেগের প্রাধান্য বেশি থাকে । বঙ্কিমচন্দ্র অতিরঞ্জন ও কল্পনার জগত সৃষ্টিতে অদ্বিতীয়। তবে, বঙ্কিমের এই কল্পনা প্রাচীনত্ব বা মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনাপ্রসূত নয়, একেবারেই আধুনিক মননির্ভর ও চেতনাসঞ্জাত। রোমান্সের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সমালোচক বদিউর রহমান বলেন: 'যে উপন্যাসে কাল্পনিক বা অস্বাভাবিক উগ্র প্রেমমূলক কাহিনী বিধৃত হয় তাকেই রোমান্সধর্মী উপন্যাস বলে।'[৩]

রোমান্সে সাধারণত বাস্তবতার চেয়ে কল্পনার পরিসর বেশি। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের কাহিনীগ্রন্থন, চরিত্র সন্নিবেশ, কল্পনার অসাধারণ বিস্তার প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। রোমান্সে যে জিনিসটি একক ও প্রধান হিসেবে পরিগণিত তা হল 'উৎকট কবি-কল্পনা'। রোমান্সে সাধারণত বাস্তবতাকে কল্পনার রঙ দিয়ে এবং আদর্শ অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়। রোমান্স সম্বন্ধে রিচার্ড চেজ বলেছেন:

The romance is of loftier origin than the novel. It approximates the poem.It may described as an amulgum of the two.[4]

বঙ্কিম প্রতিভার মৌলিকতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন যে, তিনি প্যারীচাঁদের প্রভাবমুক্ত কিন্তু তাঁর পরবর্তী যুগের বাঙালি ঔপন্যাসিকদের উপর তাঁর প্রভাব অপরিসীম। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বঙ্কিমের ভাব ও রচনারীতি কেন্দ্রিক এক বিশেষ সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আবির্ভাবের মাধ্যমে। তিনি ইতিহাসের ঘাত–প্রতিঘাতের বিচিত্র বাণীবিন্যাসে সৃষ্টি করেন তাঁর প্রথম উপন্যাস। যে ইতিহাসকে ধারণ করে তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাসে রোমান্সের মালা গেঁথেছেন, তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলোও কল্পনাবিলাসী রোমান্সের ভাবোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। রোমান্সে সাধারণত বাস্তবকে উপস্থাপন করা হয় কল্পনার রঙে রাঙিয়ে। আর এই কল্পনার রঙ মিশ্রণে বঙ্কিম যেমনটা পারদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছেন, অনেক লেখকের এমন প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। অন্যত্র রিচার্ড চেজ রোমান্স সম্পর্কে বলেন:

> A neutral territory, somewhere between the real world and fairy-land, where the actual and the imaginary may meet, and each imbue itself with the nature of the other.[5]

রোমান্স রচনার ক্ষেত্রে একজন লেখক বিশেষ ধরণের স্বাধীনতা ভোগ করেন, যা সাধারণত উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি এতটা স্বাধীনতা পান না। বঙ্কিমের রোমান্সপ্রীতি সম্ভবত এই কারণে যে, এখানে কল্পনার যে অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে তাকে উপভোগ করা। রোমান্সে অতিরঞ্জন ও অতিপ্রাকৃত সাহসিক প্রেমের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর এক জগৎ নির্মিত হয়, যার প্রধান উদ্দেশ্য হল সৌন্দর্যসৃষ্টি, বিনোদনের মাঝে বৈচিত্র্য আনয়ন।

রোমান্স এবং রমন্যাসিকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রখ্যাত রোমান্স রচয়িতা হথর্ন তাঁর ÔThe house of the seven Gables' –এর ভূমিকায় বলেছেন:

> When a writer calls his work a romance, it need hardly by observed he wishes to claim a certain latitude, both as its fashion and material , which he would not have felt himself entitled to assume, had he professed to be writing a novel.[6]

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে প্রযুক্ত রোমান্সচেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ বিশ্লেষণের প্রয়াস পাব।
'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শুরুতেই বঙ্কিমচন্দ্র চমৎকার এক চিত্র এঁকেছেন, যেখানে দেখা যায় একটি যাত্রীবাহী নৌকা গঙ্গাসাগর হতে ফিরে আসছে। রাতের শেষে ঘন কুয়াশায় দিগন্ত আচ্ছন্ন। অন্ধকারে নৌকা কোনদিকে চলেছে বোঝা যায় না। উপন্যাসের সূচনাটি হয়েছে এভাবে:

> প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্ত্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল; কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন।[৭]

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র চমৎকারভাবে ইতিহাসের সাথে কল্পনার সামঞ্জস্য স্থাপন করেছেন। পর্তুগিজদের দস্যুতার কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে লেখক আড়াই শত বছর আগে বাস্তবতার যুগে পদচারণা করেছেন। কুয়াশার মাধ্যমে এক প্রকার অস্পষ্টতা ও প্রহেলিকা সৃষ্টির জন্য বেছে নিয়েছেন মাঘ মাসের শেষ রাত্রিকে। এটি রোমান্সের যথার্থ চিত্র। এই

পরিবেশ সৃষ্টিতে কোথাও কোনো অপূর্ণতা নেই, শিল্পীর সযত্ন চিন্তার স্পর্শ সর্বত্র দৃশ্যমান। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নবকুমারের সক্রিয় আবির্ভাব। বঙ্কিমচন্দ্র চালকের আসনে বসে থেকে সুপরিকল্পিতভাবে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আরোহিগণ সম্মুখস্থ সৈকতে রান্নার আয়োজন করতে গিয়ে দেখল যে রান্নার কাঠ নেই, পাশের বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহ করা যেতে পারে, কিন্তু বাঘের ভয়ে সেখানে কেউ যেতে আগ্রহী নয়। জগতে এমন এক ধরনের মানুষ আছে, যারা নিজের জীবন বিপন্ন হলেও পরোপকারে লিপ্ত হয়। নিজের সার্বিক ক্ষতি করে হলেও অপরের উপকারে পিছপা হন না। নবকুমার এমনই একজন পরোপকারী যুবক। আরোহিগণ উপবাস করে মরবে এ দৃশ্য দেখে নবকুমার নিশ্চুপ থাকতে পারেন নি। পরবর্তী ঘটনা অগ্রসর হয়েছে বঙ্কিমের পরিকল্পনা মাফিক। নবকুমার সচ্ছল পরিবারের সন্তান, ফলে কাঠ সংগ্রহ ও বহনে তার অনেক সময় ব্যয় হতে থাকে।

> এই হেতুবশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সমভিবিহারিগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল; তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। সম্ভাব্য কাল অতীত হইলে এইরূপই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থির সিদ্ধান্ত হইল। অথচ কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে।[৮]

এখানে নবকুমারের সাহসের দৃষ্টান্ত দেখে তাকে উপন্যাসের যথার্থ নায়ক চরিত্র বলে মনে হয়। অন্যান্য চরিত্র তাঁর বীরত্বের স্রোতে তুচ্ছ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের কাহিনী যতই অগ্রসর হয়েছে এই চরিত্রটির ঔজ্জ্বল্য ততই ম্লান হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নবকুমারের কাপুরুষোচিত আচরণে পাঠক-হৃদয়ে এক ধরণের অতৃপ্তি ও বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ উপন্যাসের প্রারম্ভে দেখি, কারো সাহস হল না তীরে উঠে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে নবকুমারের সন্ধান করার। এর কারণটি অত্যন্ত পরিষ্কার– এমন সাহস হলে যাত্রিগণ নবকুমারকে নির্জন বনভূমিতে একা ফেলে যেত না, এমন সাহস হলে– 'আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে?'–নাবিকের মনে এমন অস্বাভাবিক চিন্তার উদয় হত না, এমন সাহস হলে সহযাত্রীগণ নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করত না– আর নবকুমারকেও সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জিত হতে হত না, এমন সাহস হলে উত্তম আর অধমে প্রকৃত বৈশিষ্ট্য অজানা থেকে যেত, আর নবকুমার বনমধ্যে একাকী পতিত না হলে 'কপালকুণ্ডলা'র মত বিখ্যাত রোমান্স উপন্যাস সৃষ্টি হত না।

মূলত নবকুমারকে বনের মধ্যে একাকী ফেলে যাওয়ার মধ্যেই রোমান্সের বীজ রোপিত হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিম প্রতিভা এক পরম বিস্ময়। আর বঙ্কিমের এই বিস্ময়কর প্রতিভার মূলে কাজ করেছে তাঁর অসাধারণ কল্পনাবিলাসী রোমান্টিক মানস। বঙ্কিমের এই রোমান্টিকতার স্বরূপ সম্পর্কে সাহিত্যিক ও গবেষক নীলিমা ইব্রাহিমের মন্তব্যটি এখানে তুলে ধরা হল:

> বঙ্কিমের উপন্যাসের ঘটনা সংস্থাপন, পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয়, কবিত্বপূর্ণ অপূর্ব প্রকাশভঙ্গি সবই রোমান্টিক মনের পরিচায়ক। অলৌকিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর কল্পনাবিলাসী মনকে উদার উন্মুক্ত আকাশে ভ্রমণ করবার এবং আদর্শ স্থাপন করবার সুযোগ দিয়েছেন। সাধু-সন্ন্যাসী, জ্যোতিষী, স্বপ্নদর্শন, অশুভ ঘটনার পূর্ব সংকেত ইত্যাদির সহায়তায় পরবর্তী ঘটনার পরিণাম বা পরিণামের ইঙ্গিত আমরা পেয়ে থাকি। সত্যদ্রষ্টা ঋষির দূর-দৃষ্টি দিয়ে সে সত্য প্রচারে তিনি এতটুকু পিছ পা হন

> নি। বঙ্কিমের রোমান্টিসিজম তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি কুশলতার সৌন্দর্য ও পরিধি যে বাড়িয়ে তুলেছে সে কথা সত্য।[৯]

বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সের সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য 'কপালকুণ্ডলা'র প্রতিটি পরিচ্ছেদের শুরুতে ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে বিখ্যাত উদ্ধৃতি চয়ন করা হয়েছে। এ থেকে সহজেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যপাঠের পরিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবনাকে নিজস্ব ভাবনার সাথে মিশ্রণ ঘটিয়ে উপন্যাসে অভিনবত্বের আস্বাদন সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। বিশ্বমানের সাহিত্য থেকে রস আহরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র স্বকীয় শৈলীতে নির্মাণ করলেন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রোমান্স 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস। শিল্পবিচারে 'কপালকুণ্ডলা' শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, বিশ্বসাহিত্যের এক অসামান্য সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সব উপন্যাসেই যে বৈশিষ্ট্যসমূহ পাওয়া যায় তা হচ্ছে, ইতিহাস-নির্ভর, সমাজ-নির্ভর, ধর্ম-নির্ভর যাই হোক না কেন, কাহিনী শিহরণমূলক, রহস্যময়, রোমাঞ্চকর, জাঁকজমকপূর্ণ, চাঞ্চল্যকর, এবং উত্তেজনাকর চরিত্রগুলোর অধিকাংশই একমুখীন, চরিত্রের বিকাশ-বিবর্তন, পরিবর্তন স্বল্পমাত্রায় চাঞ্চল্য চরিত্রের অধিকাংশ মৃত্যু । বঙ্কিমের রোমান্স স্বকীয়তার বিষয়টি ধরা পড়েছে অরবিন্দ পোদ্দার এর নিম্নোক্ত মন্তব্যে:

> দুর্গেশনন্দিনী'র তুলনায় 'কপালকুণ্ডলা'র রোমান্স অধিকতর অবিমিশ্র। ইহার তুলনায় 'দুর্গেশনন্দিনী' মিশ্র; আবার 'দুর্গেশনন্দিনী'র তুলনায় 'মৃণালিনী' আরও বেশি মিশ্র ও অবিশুদ্ধ।[১০]

লেখক তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে রোমান্সের ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। রোমান্সে বর্ণিত ঘটনা ও পরিবেশ অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য হয়। লেখক সুচিন্তিতভাবেই সেই অবিশ্বাস্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নাম 'কাপালিকসঙ্গে'। নবকুমার কাপালিকের কুটীরে আগমনের পূর্বেই সেখানে একটি কাঠ জ্বলছিল। নবকুমার কাপালিকের গৃহে যেসব অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল তার পেছনে ছিল কাপালিকের মায়া। অনেক রাতে নবকুমারের স্মরণ হয় যে রাতে তার খাওয়া হয় নি। কোনো ক্ষুধার্ত মানুষ খেতে ভুলে যাবে এমনটা হতে পারে না। 'পরে যখন অনেক রাত্রে স্মরণ হইল যে, সায়াহ্নকৃত্য অসমাপ্ত রহিয়াছে–তখন জলান্বেষণ অনুরোধে চিন্তা হইতে ক্ষান্ত হইয়া এ বিষয়ের অসম্ভাবিতা হৃগয়াঙ্গম করিতে পারিলেন। শুধু আলো নহে–তণ্ডুলাদি পাকোপযোগী কিছু কিছু সামগ্রীও আছে। নবকুমার বিস্মিত হইলেন না–মনে করিলেন যে, এও কাপালিকের কর্ম্ম–এ স্থানে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে।'[১১]

পরদিন নবকুমার কাপালিকের গৃহ হতে একাকী বের হয়ে আগের দিন যেখানে অপরিচিতা কপালকুণ্ডলার সাথে দেখা হয়েছিল সেই সমুদ্রতীরের দিকে চললেন। কারণ, নবকুমারের মনে এমন আশা প্রবল হয়েছিল যে অপরিচিতা আবার এখানে আসবেন। কিন্তু তার আশা পূরণ হয় নি। অন্ধকার হয়ে আসায় নবকুমার আবার কাপালিকের গৃহে ফিরে আসলেন। ফিরে এসে নবকুমার–কাপালিকের মধ্যে যেসব কথোপকথন হয় তাতে এক প্রকার অন্ধকারময় পরিবেশের গন্ধ পাওয়া যায়। এই অস্পষ্ট প্রহেলিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি বঙ্কিমের স্বেচ্ছাকৃত। নবকুমার নিজ গৃহে ফেরার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে– পথ ও পাথেয় প্রাপ্তির প্রত্যাশা জ্ঞাপন করলে –

> কাপালিক কেবলমাত্র কহিল, 'আমার সঙ্গে আগমন কর।' এই বলিয়া উদাসীন গাত্রোত্থান করিলেন। বাটী যাইবার কোনো সদুপায় হইতে পারিবে প্রত্যাশায় নবকুমারও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।[১২]

কাপালিক নবকুমারকে সঙ্গে আসার প্রস্তাব করার সাথে সাথেই নবকুমার তাকে তাদের গন্ত ব্য জিজ্ঞাসা না করেই তাকে শুধু অনুসরণ করেছে, ব্যাপারটি কেমন বেমানান, অবাস্তব ঠেকেছে। আবার এও সত্য যে এমন নির্জন স্থানে তার আশ্রয়দাতা কাপালিকের অনুসরণ ছাড়া নবকুমারের কাছে কোনো বিকল্প ছিল না। আবার নবকুমার কাপলিকের পেছন যাত্রাকালে অকস্মাৎ নবকুমারের পিঠে কোমল হস্তস্পর্শে পেছনে ফিরে 'আগুল্‌ফলম্বিত–নিবিড়কেশরাশি–ধারিণী অপূর্ব রমণীমূর্তি' দেখে তার স্পন্দনহীনতা এসব কিছুতেই রোমাঞ্চকর, কৌতূহলোদ্দীপক, অদ্ভুত ও বিস্ময়কর জগতের চিত্র বিদ্যমান। রোমান্স রচয়িতা বাস্তবনিষ্ঠা অতিক্রম করে বস্তুর অতীত চেতনার মধ্য দিয়ে নির্মাণ করে থাকেন রোমান্স উপন্যাস। এ প্রসঙ্গে মিনতি কুমার রায় বলেন:

> ঔপন্যাসিক যখন তাঁর বাস্তবনিষ্ঠা উপেক্ষা করে কল্পনার পাখা মেলে দেন ভাবলোকে; কাহিনী নির্মাণ এবং চরিত্র চিত্রণ, ঘটনার দ্বন্দ্ব–সংঘাতকে উপেক্ষা করে বস্তুর অতীত সৌন্দর্যলোকে পাড়ি দেন অর্থাৎ উপন্যাস যখন কাব্য–রসে সিক্ত হয়ে উঠে তখনই তা হয় কাব্যধর্মী উপন্যাস। উচ্ছ্বাসময় বর্ণাঢ্যতা ও বাস্তব বিমুখীনতা কাব্যধর্মী উপন্যাসের প্রধান ধর্ম।[১৩]

'কপালকুণ্ডলা' যে প্রক্রিয়ায় নবকুমারকে কপালিকের হাত থেকে রক্ষা করলেন সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে বাস্তব বিমুখীনতার ছাপ সুস্পষ্ট। নবকুমার দেখিলেন, রমণী মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া আছে। নবকুমার বুঝিলেন যে, রমণী বাক্যস্ফুর্ত্তি নিষেধ করিতেছে–নিষেধের বড় প্রয়োজন ছিল না। ...কাপালিক এ সকল কিছুই দেখিতে পাইল না, অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল।[১৪]

এতকিছু ঘটে গেল, নবকুমার-কপালকুণ্ডলা আকারে–ইঙ্গিতে কথাও বিনিময় করে অথচ কাপালিক এই নির্জন বনভূমির মাঝে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনার কিছুই দেখল না, কিংবা কিছু শুনতে পেল না তা অবিশ্বাস্য। তবে কাপালিক একটু দূরে সরে গেলে কপালকুণ্ডলা নবকুমারের কানে কানে কি কথা যেন বলে। 'নবকুমারের কর্ণে এই শব্দ প্রবেশ করিল, কোথা যাইতেছ? যাইও না। ফিরিয়া যাও–পলায়ন কর।'[১৫]

কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে সতর্ক করেছে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ উক্তির মাধ্যমে –'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ।' এই উক্তির মাধ্যমে স্নেহময়ী কপালকুণ্ডলার হৃদয়বৃত্তির একটি পরিচয় পাওয়া যায়। এই সতর্কীকরণ বাক্যটির মধ্যে ফুটে ওঠে প্রকৃতি-পালিতা রমণী–হৃদয়ের অনুপম বৈশিষ্ট্য। 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'– এই বাক্যটির মধ্যেই অপূর্ব ধ্বনিসৌন্দর্য বিচ্ছুরিত।

বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি রোমান্সের আদর্শে গড়ে তুলেছেন। তাই কপালকুণ্ডলার প্রত্যেকটি কাজের মধ্যেই রোমান্সের নিদর্শন নিহিত রয়েছে। কপালকুণ্ডলা প্রায় নির্জনেই লালিত–পালিত হয়েছে। পাখির মতো যখন যেদিকে ইচ্ছা বিচরণ করতে পারত। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর হৃদয়ে সরলতা, পরদুঃখকাতরতা, সার্বজনীন স্নেহ প্রভৃতি প্রবৃত্তি সঞ্জাত হয়েছিল। স্নেহময় অধিকারীর উপদেশে সেই স্নেহ উপচে পড়ত। এভাবে লেখক কপালকুণ্ডলাকে সামাজিক মানবীতে পরিণত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কপালকুণ্ডলা চরিত্রের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি। বরং কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সংসারে এসে কিছুটা উদ্ধত, চপল আর মুখরা হয়েছে। তার এই মুখরা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই 'বিয়ে

করে সে সুখী না অসুখী'–শ্যামার এই প্রশ্নের উত্তরে কপালকুণ্ডলার নিম্নোক্ত মন্তব্য হতে: 'যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তাহা হইলে কদাপি বিবাহ করিতাম না।'[১৬]

বঙ্কিমের সৌন্দর্য বর্ণনার মাঝে বৈচিত্র্য আছে। আর রূপ-বর্ণনার স্বকীয়তার কারণেই উপন্যাসটিকে অন্য এক উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছে। তিনি কপালকুণ্ডলার রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে অকপটে বলেছেন, 'এই রমণী সর্বাঙ্গীণ সুন্দর নয়'। তবে, রূপের যে বিবরণ বঙ্কিম তাঁর 'কপালকুণ্ডলা'য় দিলেন তাতে পাঠকচিত্ত অন্যরকম এক অদ্ভুত রসে সিক্ত না হয়ে পারে না। বঙ্কিম তার বর্ণ 'শ্যাম' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে আমরা 'শ্যামবর্ণ' বলতে প্রচলিতভাবে যে ধারণা পোষণ করি এ তেমন শ্যামবর্ণ নয়। বঙ্কিম সেই শ্যামবর্ণের সঠিক ধারণা দিতে গিয়ে মহাকাব্যিক বাণীভঙ্গি অনুসরণ করেছেন, যা গ্রন্থটিকে কাব্যধর্মী করে তুলেছে এবং 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসকে শ্রেষ্ঠ রোমান্সের অভিধায় ভূষিত করেছে। নারীসৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের বিখ্যাত বাণীভঙ্গির কিছু নিদর্শন এখানে দেয়া হল:

> ইনি শ্যামবর্ণা 'শ্যামা মা', বা 'শ্যামসুন্দর' কাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ, এ সেই শ্যাম। পূর্ণচন্দ্রকরলেখা,অথবা মেহাম্বুদকিরীটিনী ঊষা, যদি গৌরাঙ্গীদিগের বর্ণপ্রতিমা হয়,তবে বসন্তপ্রসূত নবচূতদলরাজির শোভা এই শ্যামার বর্ণের অনুরূপ বলা যাইতে পারে।[১৭]

দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক মতিবিবির অসাধারণ রূপ বর্ণনার মাঝে মূলত রোমান্সের ফল্গুধারা প্রবাহিত করেছেন। রোমান্সের এমন সাবলীল চিত্র বাংলা সাহিত্যে বিরল। অনেক সমালোচক এই মতিবিবির আগমনকে অপ্রত্যাশিত এবং অপ্রয়োজনীয় বলে মন্তব্য করেছেন। সমালোচকগণের মতে এই চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে না আনলেও পারতেন। লেখক কী পারতেন আর কী পারতেন না আমরা সে বিশ্লেষণে না গিয়ে শুধু এতটুকু বলব যে, মতিবিবির রূপ বর্ণনায় লেখক যে ভাষাবিন্যাসের আশ্রয় নিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা অনুপম এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। নিম্নে মতিবিবির রূপের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল:

> তাহার কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্ম্মভেদী। তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎ অনুভূত কর যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মন পর্য্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে মর্ম্মভেদী দৃষ্টির ভাবান্তর হয়; চক্ষু সুকোমল স্নেহময় রসে গলিয়া যায়। আবার কখনও বা তাহাতে কেবল সুখাবেশজনিত ক্লান্তিপ্রকাশ মাত্র, যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। কখনও বা লালসাবিস্ফারিত, মদনরসে টলটলায়মান। আবার কখনও লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ–যেন মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্দাম।[১৮]

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে, বঙ্কিমচন্দ্র নারীর রূপ বর্ণনায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

এ উপন্যাসে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য বিদ্যমান, কিন্তু প্রকৃতি–বর্ণনায় তেমন কবিত্ব শক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট নয়। তবে প্রকৃতি বর্ণনার কিছু টুকরো ছবি আমাদের আলোড়িত করে। সাগরের অনন্ত–বিস্তার, কুয়াশা–ঢাকা শীতের গঙ্গাসাগর, দীর্ঘ বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি, নির্জন স্বল্পবৃক্ষ অরণ্য, নদী–মোহনা বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'য় এসবের চিত্র আছে, কিন্তু জীবন্ত চিত্র নেই। এই উপন্যাসে প্রকৃতির উপাদানগুলো জনহীন ও প্রাণীহীন। পাহাড়ের মত বালিয়াড়ি, অনন্ত সমুদ্র, নক্ষত্রবিদ্ধ অসীম আকাশ। বাঘ নেই, কিন্তু বাঘের ভয় আছে। এসব চিত্র থাকার পরও পাখির গান শোনা যায় নি। কোনো ছোট প্রাণীও চোখে পড়ে নি। রোমান্স উপন্যাসে প্রকৃতির যে ভয়ঙ্কর ও বিভীষিকাময় মূর্তি থাকা দরকার 'কপালকুণ্ডলা'য়

তেমন কোনো চিত্র নেই। চারিদিক পর্যবেক্ষণ করার ইচ্ছায় কাপালিক বালিয়াড়ির স্তূপশিখরে উঠলে কাপালিকের শরীরভরে স্তূপশিখর ভূপতিত হয় এবং তার দুই হাত ভেঙ্গে যায়। প্রকৃতির ভৈরবীরূপের খুব সামান্যই এতে প্রতিফলিত হয়। লেখক শান্তভাবে প্রকৃতির রুদ্ররূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা জড় ও জীবনবিমুখ। তারপরেও এই উপন্যাসে রোমান্সের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য একেবারে দুর্বল নয়। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে প্রকৃতি বর্ণনার স্বরূপ প্রসঙ্গে ক্ষেত্রগুপ্তের বিশ্লেষণটি নিম্নরূপ:

> রোমান্টিকেরা জড় প্রকৃতির মধ্যে প্রাণ খোঁজেন, আনন্দ–মুক্তির পথ দেখতে পান বদ্ধ বাস্তব জীবন থেকে; অসীমের দ্যোতনা প্রকৃতি আর আত্মার আত্মীয়। বঙ্কিম রোমান্টিক, কিন্তু তাঁর কল্পনায় যে নিসর্গ ধরা পড়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। রোমান্টিকের এভাবে দেখায়ও বাধা নেই। এখানে অসাধারণ রূপের আকর নিসর্গবস্তু প্রাণকে আশ্রয় দেয় না, মানবহৃদয়ের মুখের উপরে বন্ধ তার দাক্ষিণ্য–ক্রোধে বা ঘৃণায় নয়, মৌন অস্বীকারে। কপালকুণ্ডলার ভিত্তি পর্যন্ত এই নিসর্গ–চেতনা, কারণ মূল পাত্রীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা গল্পের কেন্দ্রীয় সমস্যাও।[১৯]

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে দৈবশক্তির লীলা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কপালকুণ্ডলার কাহিনীতে এবং উপন্যাসের গতি প্রকৃতিতে আমরা যে একটা দুর্বার ও প্রচ্ছন্ন শক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করি, একমাত্র কপালকুণ্ডলার চিত্তে ও চরিত্রে সেই শক্তির সজ্ঞানতা ক্রিয়াশীল দেখি। এই উপন্যাসে যা কিছু ঘটেছে তা মানব–প্রকৃতির নৈসর্গিক নিয়মেই ঘটেছে, এই নৈসর্গিক সংঘটনকে সাধারণ অর্থে দৈবই বলা চলে। প্রকৃতির নিয়মকেই যদি 'নিয়তি' বা 'অদৃষ্ট' বলা যায়, তবে, 'কপালকুণ্ডলা'য় অদৃষ্টবাদের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়। কপালকুণ্ডলার স্বপ্নদর্শন অদৃষ্টবাদেরই দৃষ্টান্ত। জটাজূটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ স্বপ্নে এসে কপালকুণ্ডলার নৌকা সমুদ্রমধ্যে নিমগ্ন করতে উদ্যত হলে– ব্রাহ্মণবেশধারী এক যুবক এসে তাকে নিমগ্ন করবে কি-না জিজ্ঞাসা করলে, প্রতি উত্তরে কপালকুণ্ডলা বলে 'নিমগ্ন কর'। কপালকুণ্ডলার এই ভবিতব্যের বিশ্বাস মূলত এটাই 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের ট্রাজেডির গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এটি কপালকুণ্ডলার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও বটে। বনপথে প্রত্যাবর্তনকালে সে আকাশে যে ভৈরবী মূর্তি দেখেছিল, তার সেই ভীষণ সঙ্কেতও সব সংশয় দূর করে তাকে যেন আশ্বস্ত করল। তার নিকট সেই অদৃষ্ট বা ভবিতব্য আর কিছু নয়– সেও যেন এক মহাশক্তির কল্যাণকর সমাধান। 'কপালকুণ্ডলা'র প্রত্যেকটি সমস্যা, নিয়তির তাড়না বা অদৃষ্টের সংঘটনক্রিয়া তার ভাববস্তুর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, বিধায় সর্বাংশে তা মৌলিক। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসেও এক ধরণের অদৃশ্য শক্তির প্রভাব সক্রিয়; কারণ এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের দেখে মনে হয় যেন তারা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েই একটা নিশ্চিত পরিণতির দিকে ধাবিত হয়েছে। অদৃশ্য এই শক্তির মহিমা এমনই যে, তার সম্মুখে মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গলের কোনো অর্থই নেই।

কপালকুণ্ডলার কল্পনামূলে এক প্রকার নিয়তির যে আভাস বিদ্যমান তা মানবীয় সংস্কারের মঙ্গল-অমঙ্গলবোধকে তৃপ্ত করে না। 'কপালকুণ্ডলা'য় একটা অদৃশ্য আকস্মিক শক্তির ঝলক আছে; কিন্তু তাই বলে তা অন্ধ নিয়তি নয় । এই অদৃশ্য শক্তিকে অদৃষ্ট বলা যেতে পারে। কারণ, অদৃষ্টের মধ্যে এক ধরনের ভীতি ও সংশয় থাকে, মানুষের দুর্বল হৃদয়ই এর অন্যতম কারণ। কিন্তু নবকুমারের জীবনে আমরা যে অদৃষ্টবাদের ইঙ্গিত দেখি, তার আঙ্গিকগত ভিন্নতার কারণে ঠিক তাকে অদৃষ্টবাদ না বলে 'হিন্দু কর্মফলবাদ' বললে মানানসই হয়। নবকুমার পূর্বে একবার বিবাহ করেছিল তার নির্মম কর্মফলই সমগ্র আখ্যানটিকে একটি গভীর জীবনসত্যের মহিমায় মণ্ডিত করেছে। নবকুমার-পদ্মাবতীর

বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা ছিল, যার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ উভয়ের জন্যই প্রস্তুত ছিল বিষপাত্র।

এই উপন্যাসের কাহিনী বিশ্লেষণে অদৃষ্ট একটা বড় প্রভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর এই অদৃষ্টকে সংকটাপন্ন পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে কপালকুণ্ডলার আজন্ম ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কার। কপালকুণ্ডলার এই সংস্কার একেবারে মনের গভীরে প্রোথিত। এখানে তার একটি নমুনা তুলে ধরা হলো:

> যে দিন স্বামীর সহিত যাত্রা করি, যাত্রাকালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলাম। আমি মার পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোনো কর্ম্ম করি না। যদি কর্ম্মে শুভ হইবার হইত, তবে মা ত্রিপত্র ধারণ করিতেন, যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে শঙ্কা হইতে লাগিল; ভাল মন্দ জানিতে মার কাছে গেলাম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না-অতএব কপালে কি আছে জানি না।[২০]

মূলত কপালকুণ্ডলার ভবানীর পাদপদ্মে ত্রিপত্র-ধারণজনিত কারণে অমঙ্গল ঘটার আশঙ্কাই সমগ্র উপন্যাসে সৃষ্ট বিষাদময় পরিস্থিতির জন্য দায়ী। এ উপন্যাসে প্রবল প্রতিকূল আবহাওয়ার হাত হতে নবকুমার রক্ষা পেয়েছে, কাপালিকের হাত থেকে জীবন ফিরে পেয়েছে, ডাকাতদলের হাতে আহত হয়েও মতিবিবি রক্ষা পেল, কিন্তু কাহিনীর শেষাংশে সেই কপালকুণ্ডলাই অদৃষ্টের হাত থেকে রক্ষা পায় নি। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে অদৃষ্টের ভূমিকা অনন্য। উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি অদৃশ্য দৈব দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এটি এই উপন্যাসের প্রধান গঠনবৈশিষ্ট্য।

বঙ্কিমের রোমান্স রচনাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, অলৌকিক ও বিস্ময়কর বিষয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ থাকলেও তিনি কখনো বাস্তবতার ভিত্তিভূমি পরিত্যাগ করেন নি। ইতিহাসের অকিঞ্চিৎকর সূত্র নিয়ে বঙ্কিম–প্রতিভা চমৎকার রোমান্সের পরিকল্পনা করতে পারে এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। রোমান্স রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র উপাদান সংগ্রহ করেছেন প্রধানত দুটি ক্ষেত্র হতে– প্রথমত ইতিহাস, দ্বিতীয়ত দৈবশক্তি। প্রথম দিকে ইতিহাসের মালমশলার স্বল্পতা সত্ত্বেও তিনি ইতিহাস হতে কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। ঐতিহাসিক তথ্যের অপ্রাচুর্যের কারণে বঙ্কিমের পরবর্তী উপন্যাসগুলোতে কল্পনার বিস্তৃতি প্রাধান্য লাভ করে। 'কপালকুণ্ডলা'য় ঐতিহাসিক ভিত্তি খুবই কম। ঐতিহাসিক তথ্যের ঘাটতির কারণে তিনি মেহেরউন্নিসা-মতিবিবির অসাধারণ সাক্ষাৎকার পরিকল্পনা করতে পেরেছেন। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক কিংবদন্তি ও দৈবশক্তি পরস্পরকে সম্পৃক্ত করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। শুধু তাই নয়, প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, ইতিহাস-দৈবশক্তি-কালচেতনা, রোমান্স-কাব্য-কাহিনী সবকিছুর আশ্চর্য সংমিশ্রণে 'কপালকুণ্ডলা' হয়ে উঠেছে অনন্য। তাই প্রখ্যাত সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দার বলেন:

> বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রোমান্স ও উপন্যাসগুলিতে জীবনের সুখ এবং দুঃখ উভয়কেই একত্র সংগ্রথিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার রোমান্স এবং উপন্যাসে কাব্য ও কাহিনী মিলিত হইয়াছে। কাহিনী কালে বিস্তৃত, আর কাব্য তুলনায় কালাতীত। তিনি কালকে কালাতীতে এবং কালাতীতকে কালে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সেই সমাধানেরই নিখুঁত চিত্র আঁকিয়াছেন।[২১]

'কপালকুণ্ডলা' এই কারণে 'দুর্গেশনন্দিনী'র গতানুগতিকতা অতিক্রম করে বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্য এক রোমান্সের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। বিশিষ্ট গবেষক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন:

> দুর্গেশনন্দিনী'তে যে রোমান্স ঐতিহাসিক-যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সাহিত্যসুলভ প্রেমের আশ্রয়ে ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল, তাহা 'কপালকুণ্ডলা'তে একেবারে সমস্ত বাহ্য অবলম্বন ত্যাগ করিয়া নিজ অন্তর্নিহিত রসের দ্বারাই পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে গতানুগতিকতার যে একটা জড়তা ছিল, তাহা 'কপালকুণ্ডলা'তে কল্পনা-শক্তির অসামান্য সাহসিকতায় সতেজ ও লীলাচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সাগরতীর-বাসিনী, কাপালিক-প্রতিপালিতা, চির-সন্ন্যাসিনী কপালকুণ্ডলার মূর্তি-কল্পনায় বঙ্কিম যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একজন বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকের পক্ষে বাস্তবিকই বিস্ময়কর।[২২]

বঙ্কিমের ভাষা জীবন্ত হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ হলো রোমান্স। বঙ্কিম তাঁর 'কপালকুণ্ডলা'য় এই কাজটি করেছেন তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে আর অসাধারণ দক্ষতায়। বঙ্কিম যে যুগের মানুষ ছিলেন, সে সময় রোমান্স খুবই প্রাসঙ্গিক ছিল। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বঙ্কিমের এই জনপ্রিয়তা শুধু তাঁর জীবদ্দশাতেই নয়, আজকের এই বিজ্ঞানের চরম প্রতাপের যুগেও ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

উপরিউক্ত আলোচনায় বঙ্কিম-মানসের ক্রম প্রবণতার বিষয়টি সুস্পষ্ট। মানবজীবন ও তার বিচিত্র গতি-প্রকৃতি, প্রকৃতির অপার রহস্য ও নারীসৌন্দর্যের বহুবর্ণিল প্রকাশ ইত্যাদি অনুষঙ্গের অনুসন্ধিৎসা বঙ্কিম-চরিত্রের মৌল বৈশিষ্ট্য। আর তাই এই প্রসঙ্গগুলোর সফল রূপায়ণের সহজ মাধ্যম হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সকে বেছে নিয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে বিশাল রোমান্স কাব্যসম্পদ গড়ে উঠেছিল, ইউরোপীয় ধারার সঙ্গে তার বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। সামন্ত, ভূস্বামী, জমিদার, মহাজনশ্রেণির চরিত্র সাধারণত রোমান্সের নায়ক হিসেবে দেখা যায়। এই ধরনের রোমান্সের নায়িকা প্রায় ক্ষেত্রে অবিবাহিতা। চরিত্র হিসেবে দেখা যায় নপুংসক স্বামী, ক্রোধান্বিতা মাতা, বৃদ্ধা মাতা-পিতা, নায়িকার সখী সহচরী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। কাহিনীর বর্ণনায় পাওয়া যায় অলৌকিকতা, পৌরাণিকতা ও অবাস্ত ব আজগুবি ঘটনার বিস্তৃতি। প্রেম, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বংশানুক্রমিক বিবাদ, ঐশ্বর্য-আভিজাত্যের দম্ভ, অভিযাত্রা, মরমিয়াবাদ প্রভৃতিকে অবলম্বন করে রোমান্সের বিস্তৃতি ঘটে। কিন্তু মধ্যযুগের এই রোমান্স সাহিত্য আধুনিক কালে এসে তার প্রভাব–প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রাখতে পরে নি। যুগ ও জীবনজিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক কালের রোমান্স সাহিত্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে– কারণ, যুগের পরির্তনের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা ও চেতনা জগতেরও বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। রোমান্সের আঙ্গিকগত এই পরিবর্তন তাই অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। আর একজন সাহিত্যিক-শিল্পী সময়ের সচেতন সন্তান হিসেবে কালের দাবিকে অগ্রাহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মধ্যযুগের রোমান্সের বাস্তবতা ছিল অনেকটা মিশ্র প্রকৃতির। সেই রোমান্সের মূল আকর্ষণ ছিল বাস্তবজীবনের সহজ প্রবাহের ঊর্ধ্বে অসাধারণ-অলৌকিক-অবাস্তব জীবনের রূপায়ণ। মধ্যযুগীয় রোমান্সের ভিত্তিভূমি ছিল ইহলৌকিক জীবনচেতনা বর্জিত অতিলৌকিক এক অনুপম জীবন। যার কারণে মধ্যযুগের রোমান্স জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে তা যেন কাল্পনিক এক পরীর গল্প হয়ে দাঁড়ায়। মধ্যযুগীয় রোমান্স অবাস্তব ও জীবনবিচ্ছিন্ন বলেই তা উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু আধুনিক যুগের রোমান্সধর্মী উপন্যাসে অলৌকিক-অবাস্তব উপাদান থাকলেও তা একেবারে জীবনবিচ্ছিন্ন নয়। প্রখ্যাত গবেষক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি:

> অতীতের বিচিত্র বেশ-ভূষা ও আচার ব্যবহার, অতীতের আকাশ-বাতাসে লঘুমেঘখণ্ডের মত যে সমস্ত অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও কবিত্বময় কল্পনা ভাসিয়া বেড়ায়, রোমান্সলেখক

> সেইগুলিকেই ফুটাইয়া তুলিতে যত্ন করেন। আধুনিক যুগের যে প্রবর্ধমান বাস্তব প্রবণতার মধ্যে সামাজিক উপন্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা রোমান্সের উপরেও নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়ে নাই। আধুনিক রোমান্সও বাস্তবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যের কঠোর সংযম স্বীকার করিয়া লইয়াছে।[২৩]

পৃথিবীর উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, উপন্যাসের জন্ম রোমান্সকে আশ্রয় করে এবং এর বিকাশও রোমান্সের হাত ধরে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু কালের পথ পরিক্রমায়, সমাজ-বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে ঔপন্যাসিকগণ রোমান্সকে পরিহার করে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাকে আঁকড়ে ধরেছেন। তবে, 'কপালকুণ্ডলা'র রোমান্স আজও প্রাসঙ্গিক মনে হয় এই কারণে যে, যতই আমরা সমাজ-বাস্তবতার দোহাই দিই না কেন, মানুষের কল্পনার দ্বার কোনোদিন বন্ধ হতে পারে না। মানুষের চেতনা জাগ্রত রাখার অনন্য উপাদান হলো এই কল্পনা। কাজেই এত সহজেই রোমান্সের জাল ছিন্ন করা সম্ভব নয়। সেকালে এবং একালেও 'কপালকুণ্ডলা' রোমান্সের তৃষ্ণা মিটিয়ে চলেছে অনবরত। শুধু রোমান্সের ক্ষেত্রেই নয়, বাংলা গদ্যের রূপ পরিবর্তনেও এই উপন্যাসটির অবদান অপরিসীম।

এই উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। একদল নাগরিক- এদের মধ্যে রয়েছেন যুবরাজ সেলিম, খস্রুর শ্বশুর খাঁ আজিম, মেহের-উন্নিসা, লুৎফ-উন্নিসা, জাহাঙ্গীর, রামগোবিন্দ ঘোষাল। অন্যদল প্রকৃতিঘেঁষা ও গ্রামীণ জীবনে অভ্যস্ত, এদের মধ্যে আছেন নবকুমার, কপালকুণ্ডলা, কাপালিক, অধিকারী, শ্যামা। প্রতিটি চরিত্র স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল। চরিত্র চিত্রণে বঙ্কিম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। নিম্নে কয়েকটি চরিত্র আলোচনা করা হল:

ক. নবকুমার:

'কপালকুণ্ডলা'র বর্ণিত কাহিনী আড়াই শত বছর পূর্বের অর্থাৎ এর রচনাকাল আকবর বাদশাহের রাজত্বকালের শেষ সময়ে। একবার নবকুমার তীর্থদর্শনে গিয়ে সঙ্গীদের দ্বারা সমুদ্রের জনহীন উপকূলে পরিত্যক্ত হয়েছিল। মানুষ হিসেবে নবকুমার ছিল পরোপকারী–পরের জন্য স্বীয় জীবনের মায়া তুচ্ছ করে শ্বাপদসঙ্কুল বনে কাঠ আহরণে যায়। নবকুমার একাকী গহীন বনে সহযাত্রীদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গমনের মধ্য দিয়ে চরম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। নবকুমারের এই কাজের মাধ্যমে শুধু বীরত্ব নয়, তাঁর মানবতাবাদী মানসিকতার প্রমাণ মেলে। উপন্যাসের শুরুতে নবকুমারকে সক্রিয় চরিত্র হিসেবেই তাকে দেখা যায়। সে প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু কাপালিকের হাতে পড়ার পর সে অনেকটাই নিষ্প্রভ এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল চরিত্রে পরিণত হয়েছে। নবকুমারের এই নিষ্ক্রিয়তার পেছনে কপালকুণ্ডলার প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। বন্যদেবী কপালকুণ্ডলা আকস্মিকভাবে নবকুমারের সামনে মোহিনী মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হলে নবকুমার বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। শুধু নবকুমার কেন, এমন নির্জন পরিবেশে আকস্মিক মধুর স্বরে –'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ' শুনলে যে কেউ বিস্মিত হতে বাধ্য। বঙ্কিমের রোমান্টিক বর্ণনার দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হল:

> নবকুমার অকস্মাৎ এইরূপ দুর্গমমধ্যে দৈবী মূর্ত্তি দেখিয়া নিস্পন্দশরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল;–স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। রমণীও স্পন্দনহীন, অনিমেষলোচনে বিশাল চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। ...অনন্তর সমুদ্রের জনহীন তীরে, এইরূপে বহুক্ষণ দুই জনে চাহিয়া

> রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ।[২৪]

এই ধ্বনি শ্রবণের পর নবকুমারের চেতনা এলোমেলো হয়ে গেল। সেই মধুর ধ্বনি নবকুমারের হৃদয়তন্ত্রীর মধ্যে সৌন্দর্যের খেলা খেলতে থাকে। নবকুমার সেই রমণীর পেছনে বসন্তকালে মন্দানিল-সঞ্চালিত শুভ্র মেঘের মতো ধীরে ধীরে কলের পুতুলের মতো চলতে থাকে। নবকুমারের এই আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায় মানুষ অবস্থার অধীন। প্রকৃতির কাছে ধীর প্রকৃতি, সাহসী, অধ্যবসায়ী নবকুমার অসহায় বোধ করে। নবকুমার দৃঢ় সংকল্পচিত্ত- যে কর্মে সে প্রবৃত্ত হয়, তা না করা পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হয় না। সে ছিল ভ্রমণপিয়াসী ও সৌন্দর্যপ্রিয়। তাই সমুদ্র দর্শনের ইচ্ছায় সমস্যাসঙ্কুল নদীপথে গঙ্গাসাগর গমন করেছিল এবং পথিমধ্যে ভয়ানক বিপদে পতিত হয়েছিল। নবকুমার সাহসী ও বলবান। কাপালিকের হাতে পড়ার পর তার হাত থেকে মুক্তি পেতে সাধ্যমত বল প্রকাশ করে ব্যর্থ হয়। নবকুমার অন্য দশজনের মতোই স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ছিল। স্ত্রীর প্রতি প্রবল ভালোবাসা ছিল বলেই স্ত্রীর পরকীয়া সন্দেহে সে অন্তর্দাহে জর্জরিত হয়েছে। কপালকুণ্ডলাকে বলি দিতে প্রস্তুত হওয়ায় নবকুমারকে নির্দয় মনে হলেও এটা ছিল তার নিয়তি নির্ধারিত। ভৈরবীর আজ্ঞা বলে কাপালিক নবকুমারকে এই নিষ্ঠুর কার্যে প্ররোচিত করে। কাপালিক কৌশলে নবকুমারকে সুরাপান করিয়ে কার্যসিদ্ধি করে। এতে নবকুমারকে নির্দয় মনে হলেও তার প্রণয়ে কোন পঙ্কিলতা ছিল না। উপন্যাসের প্রারম্ভে নবকুমারকে একজন মানবদরদী, আধুনিক জীবনবোধে উজ্জীবিত, টগবগে দুঃসাহসী তরুণ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে লেখকের সুচিন্তিত প্রয়াসেই হোক, আর প্রকৃতির অনিবার্য তাড়নাতেই হোক নবকুমারের সেই প্রাণপ্রাচুর্য আর দেখা গেল না। নবকুমারের সহসা আবির্ভূত প্রেম কৃতজ্ঞতায়, রূপজমোহে একদিকে যেমন তার জীবনকে রোমাঞ্চিত ও আবেগময় করেছে, অন্যদিকে তেমনই কপালকুণ্ডলার নির্বিকার ঔদাসীন্য তার মনকে করেছে নির্জীব ও নির্লিপ্ত। কপালকুণ্ডলাকে ব্রাহ্মণ যুবকের প্রদত্ত অঙ্গুরী নবকুমারের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সন্দেহ দূরীভূত করেছে বটে নবকুমারের দুর্ভাগ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে নি। প্রকৃতি নবকুমারের জীবনে এনেছে একের পর এক বিপর্যয়। কিন্তু নির্বিকার আত্মসমর্পণ ছাড়া প্রতিকূল দৈবের বিরুদ্ধে তেমন কোনো প্রতিরোধ সে গড়ে তুলতে পারে নি। এর কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধান যোগ্য:

> বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তাঁর দৃষ্টির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত করেছেন কপালকুণ্ডলার দিকে। নবকুমারকে পৌরুষের মহিমোজ্জ্বল প্রতীকরূপে চিত্রিত করতে চান নি। আবার নবকুমারকে ঈশ্বর সমর্পিতপ্রাণ দৈবাহত পুরুষরূপে অঙ্কিত করতে চান নি। কারণ তা'হলে সকল পাঠকের সহানুভূতি নবকুমারকে ঘিরেই উদ্বেলিত হয়ে উঠত।[২৫]

আমার কেবলই মনে হয়েছে নবকুমার শুধু প্রকৃতিরই অনুকম্পা-বঞ্চিত নয়, বঙ্কিমচন্দ্রেরও শুভদৃষ্টি-বঞ্চিত ভাগ্যবিড়ম্বিত একজন মানুষ। তার নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ তেমন ঘটে নি, যতটুকু বিকশিত হয়েছে তাও কপালকুণ্ডলার অনবদ্য সাহচর্যে। প্রতিদিনের সংসারে বীতশ্রদ্ধ নবকুমার যখন কপালকুণ্ডলার গোপন প্রণয়ের ব্যাপারে অবগত হল, সংসারের প্রতি তার বিরাগ আরও বেড়ে যায়। যেদিন কাপালিকের পানীয় ও ঈর্ষা জাগানো কথায় নারীজিঘাংসু হয়ে উঠে সেই শ্মশানে, নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বলি দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। এতে নবকুমারের কিছুটা পৌরুষের পরিচয় থাকলেও পরিণামে কপালকুণ্ডলার প্রেমেরই বিজয় হয়েছে। কপালকুণ্ডলার চিত্তচিকিৎসার প্রচেষ্টা না করে, দুর্ভাগ্যের প্রতিকারে আত্মনিয়োগ না করে কাপালিকের প্ররোচিত নেতিবাচক পথে পা দিয়ে তার ব্যক্তিত্বহীনতা ও কর্মহীনতার পরিচয় দিয়েছে। নবকুমারের জীবনে নায়কোচিত কোনো তৎপরতা পাই

না। প্রতিকূল দৈবের কারণে তার জীবনাকাশ গভীর অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। সমাজসংসারে বিরক্ত কপালকুণ্ডলা মহাসাগরের গান শুনেছে, মহাসাগরে তাই নিজেকে বিলীন করে দিতে ছুটে গেছে। সমগ্র জীবনব্যাপী মরুচারণায় মৃগ-তৃষ্ণা কাতর নবকুমার তাঁর প্রিয়তমাকে উদ্ধারে ঝাঁপ দেয় সাগরে এবং নিজেও বিলীন হয়ে যায় সাগরের অতলে। তাই বলতে গেলে নবকুমারের জীবন নীরব বেদনার পুঞ্জীভূত অনন্য এক ইতিহাস।

খ. কপালকুণ্ডলা:

যদিও আলোচ্য নিবন্ধে সামগ্রিক আলোচনা কপালকুণ্ডলাকে কেন্দ্র করেই, তারপরেও এই চরিত্রটির আলাদাভাবে কিছু পরিচয় দেয়া প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি। উপন্যাস বিশ্লেষণ করলে কপালকুণ্ডলার জীবনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। একভাগে তার কাননচর কুমারী-জীবন প্রকটিত হয়েছে, অন্যভাগে নবোঢ়ার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এবং শেষভাগে সমাজসংসর্গে এসে তার যতদূর পরিবর্তন ঘটতে পারে তার প্রমাণ এবং প্রকৃতি পালিতা কপালকুণ্ডলার প্রকৃতিতেই করুণ প্রত্যাবর্তন। কপালকুণ্ডলা এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। পৃথিবীর অন্য কোনো সাহিত্যে এই ধরণের চরিত্র বিরল। কপালকুণ্ডলা চরিত্রের এই স্বাতন্ত্র্যের কারণে সুধাকর চট্টোপাধ্যায় সম্ভবত নিম্নোক্ত মন্তব্যটি করেন:

> মাতা, কন্যা, বধূরূপে যাঁদের আমরা প্রাত্যহিক সংসারের উদয়াচলে জ্যোতির্ময়ী মূর্তিরূপে দেখি কপালকুণ্ডলা সেই নারী-সমাজেরই একজন অথচ তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর।[২৬]

কাপালিক-প্রতিপালিতা কাননবাসিনী কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির পরম আদরে গড়া স্নেহময়ী কন্যা। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির কন্যাসন্তান, অধিকারী ঠাকুরের কন্যাতুল্য শিষ্য, কাপালিকের প্রতিপালিতা। যে প্রকৃতিতে কপালকুণ্ডলার প্রতিপালন, আমাদের এ সমাজের ভাষা দ্বারা তার বর্ণনা অসম্ভব। কাপালকুণ্ডলাকে বিশ্লেষণ করতে গেলে কবির দৃষ্টি নিয়ে তাকে বিচার করতে হবে। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলাকে পরম আদরে গড়ে তুলেছেন। তার বর্ণনাও তিনি উপস্থাপন করেছেন কাব্যিক ভাষায়। কপালকুণ্ডলার সাথে আমাদের প্রথম সাক্ষাত হয় 'সন্ধ্যালোকে' সেই 'গম্ভীর-নাদী সাগরোপকূলে।' কপালকুণ্ডলার প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তটি বঙ্কিমের অপূর্ব বাণীভঙ্গিতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে:

> গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি![২৭]

সেই মূর্তি সেইকালের প্রকৃতির সাথে যেন একসুরে গাঁথা। নবকুমার এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন। এখানে নবকুমার অসহায়। কপালকুণ্ডলার যে রমণীয় মূর্তি তাতে যে কেউ বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে বাধ্য। তাই নবকুমারও দৃষ্টি ফেরাতে পারেন নি। অন্যদিকে কপালকুণ্ডলাও নবকুমারের মতো স্পন্দনহীন অনিমেষলোচনে বিশাল চক্ষুর স্থির দৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করে রাখলেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে তার লক্ষণ না থাকলেও তাতে উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছিল। নবকুমারের ন্যায় রূপবান যুবক কপালকুণ্ডলার প্রথম নয়ন–পাতে পড়ল। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের প্রতি আকৃষ্ট কি–না তা বুঝি না, কারণ আসক্তিজনিত যে লজ্জা সাধারণের মাঝে দেখতে পাওয়া যায়, কপালকুণ্ডলার তা ছিল না। একটি ফুল দেখলে কপালকুণ্ডলা যেভাবে চেয়ে থাকে, নবকুমারের দিকেও সে সেভাবে চেয়ে ছিল।

বঙ্কিম কপালকুণ্ডলাকে নিয়তির সন্তানরূপে এঁকেছেন। দেবীর সম্মতি আছে জেনেই কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে বিবাহ করে। বিবাহের পর দেবী বিল্বপত্র গ্রহণ করতে অসম্মত হলে তার ধারণা হয় যে, তাদের দাম্পত্য জীবন কখনো সুখের হবে না। তাই দেখা যায়, বিবাহের এক বছর পরেও সে নবকুমারকে ভালবাসতে পারে নি। মনোগত এই গোপন বিশ্বাসের কারণেই কপালকুণ্ডলার কোনো অকর্ষণ সৃষ্টি হয় নি তার স্বামী ও সংসারের প্রতি। নারীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বামী ও সংসারের প্রতি অদম্য ভালোবাসা। কিন্তু কপালকুণ্ডলার মধ্যে সে প্রেম সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এই কারণে কপালকুণ্ডলা নবকুমারের প্রতি নির্বিকার। তার মনের বাসনা ছিল অরণ্য মধ্যে গিয়ে যেন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে।

বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'য় নিয়তিতাড়িত মানুষের এক দুঃখের ইতিহাস অঙ্কিত হয়েছে। নবকুমার সমস্ত প্রাণজুড়ে কপালকুণ্ডলাকে ভালোবাসতে চায়। কিন্তু সে ভালোবাসা কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে কোনো সাড়া জাগায় না। সংসারের বন্দীজীবন তাঁর কাছে ছিল মরণতুল্য। একদিকে কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির কোলে স্বাধীনভাবে বিচরণ করেছে, অন্যদিকে তান্ত্রিকের সন্তান হওয়ায় প্রেম, ভালোবাসা বিষয়ে সে ছিল নির্বিকার, যার কারণে কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে নবকুমারের প্রেম কোনো তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে নি। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির কোলে লালিতা আবার প্রকৃতিই তাকে সংহার করে নেয়। উপন্যাসের আখ্যান সূত্রের বয়নে প্রকৃতির উপাদান পর্যাপ্ত। প্রকৃতি যেন ছলনার জন্যেই এই কুয়াশার জাল বিস্তার করে আছে। বস্তুত মানুষের মতোই এ উপন্যাসে প্রকৃতির একটি ভূমিকা আছে। কপালকুণ্ডলার জীবনে প্রকৃতির ভূমিকা সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি বেশ স্মরণযোগ্য:

> এ উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণে প্রকৃতির একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে। প্রকৃতি যেন মানুষের জীবন নির্ণয় করে। আবার প্রকৃতির প্রভাবে এ উপন্যাসের চরিত্রগুলি গড়ে উঠেছে। একদিকে প্রকৃতি ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর, অপরদিকে সুন্দরী ও রহস্যময়ী।[২৮]

কপালকুণ্ডলা চরিত্রের মধ্যে নাটকীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কপালকুণ্ডলাকে কাপালিক–পালিতা মনে করে তাঁর মধ্যে হিংস্রতা ও বর্বরতার নমুনা খোঁজার চেষ্টা করেছেন অনেকে, কিন্তু সে কাপালিকের কাছে শুধু নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করলেও অধিকারীর কাছে যে স্নেহ পায়, তা বাৎসল্য রসে উদ্বেলিত। অধিকারীর সাহচর্যে সে ভবানীর মধুর রূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। করুণাময়তা ও পরদুঃখকাতরতার মতো গুণাবলী অর্জনের শিক্ষা অধিকারীর নিকট থেকেই পেয়েছে। তাই করুণার বশবর্তী হয়ে সে নরঘাতক কাপালিকের হাত থেকে নবকুমারকে উদ্ধার করে। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির মতোই সরল, নিরাভরণ এবং সকল প্রকার ভীতি, সঙ্কোচ ও লজ্জাহীন। সে কাপালিকের পালিতা ছিল বলে সামাজিক কোনো সংস্কার তাঁর মধ্যে গড়ে উঠতে পারে নি। বহুবিচিত্র রং এবং পরস্পরবিরোধী গুণের সমন্বয়ে পরম যত্নের সাথে বঙ্কিম কপালকুণ্ডলা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এই চরিত্রে বাস্তবের সাথে কল্পনারসের সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং প্রচলিত সমাজজীবনের আস্বাদনের সাথে সমাজজীবনের বাইরের অপরিচিত মাধুর্য এসে মিশেছে। কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি রূপায়ণের মধ্যে শক্তির সাথে সুন্দরের, ভোগের সাথে বৈরাগ্যের সুন্দর সমন্বয় সাধিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে বলতে হয়, কপালকুণ্ডলা ঊনবিংশ শতকের নতুন মানুষের এক সার্থক প্রতীক। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস সমকালীন সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার প্রধান কারণ হল কপালকুণ্ডলা চরিত্রের রহস্যময়তা ও রোমান্টিকতা। কবির অসাধারণ বাণী কবিমূর্তি লাভ করেছে কপালকুণ্ডলা চরিত্রকে অবলম্বন করেই। কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি সমকালীন মানসে কেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল নিম্নের উদ্ধৃতিতে তার প্রমাণ মেলে:

> এই চরিত্রের মাধ্যমেই যেন কালের মানুষ ভাবমূর্তি অর্জন করে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন সংকট-বিধৃত সমাজ এইরূপ একটি চরিত্রকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবে এবং উহা দ্বারা প্রভাবিত হইবে ইহা একান্তই স্বাভাবিক। এখানে শক্তি আছে, ক্ষমতা আছে, সৌন্দর্য আছে, আর সর্বোপরি আছে বিদ্রোহ, যাহা সহজেই মানুষকে অভিভূত করে এবং শক্তি ও শ্রেষ্ঠতার চেতনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।[২৯]

কপালকুণ্ডলার সাথে কালিদাসের শকুন্তলা এবং শেক্সপীয়ারের মিরান্ডার প্রায়ই তুলনামূলক আলোচনা করা হয়ে থাকে। কপালকুণ্ডলা, শকুন্তলা ও মিরান্ডা প্রকৃতির প্রভাবে হয়ে ওঠে অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী ও লাবণ্যবতী।

কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্যের কাছে মোগল হেরেমের মতিবিবি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়, কারণ রাজ্যোদ্যানেও এমন ফুল ফুটে না। রাজা দুষ্মন্তের নিকট প্রকৃতির সংস্পর্শে পালিতা শকুন্তলা অধিকতর সৌন্দর্যময়ী বলে প্রতিভাত হয়। ফার্ডিনান্ডের কাছে মিরান্ডা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। কপালকুণ্ডলার সাথে মিরান্ডার তুলনা করা যেতে পারে। মিরান্ডার মধ্যে লজ্জা বা সংস্কার তেমন নেই। কপালকুণ্ডলার মধ্যেও লজ্জা ও সংকোচ নেই। কিন্তু শকুন্তলার মধ্যে লজ্জা ও সংকোচ আছে। শকুন্তলা তপোবনের অঙ্গীভূত। তপোবনকে দূরে রাখলে স্বয়ং শকুন্তলাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শকুন্তলা তার চারপাশের প্রকৃতির সাথে একান্তভাবে জড়িত। তার মধুর চরিত্রখানি অরণ্যের ছায়া মাধবীলতার পুষ্পমঞ্জরীর সাথে ব্যাপ্ত ও বিকশিত। পশুপাখির অকৃত্রিম সৌহার্দ্যের সাথে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট। অপরদিকে কপালকুণ্ডলা মানবসমাজ হতে বহুদূরে অরণ্যে আশৈশব লালিত। বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিতে তার চরিত্র বিকাশ লাভ করে। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য যেন তার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। তার গতিবিধি প্রকৃতির মতোই লীলাঞ্চল। কপালকুণ্ডলার সাথে শকুন্তলা চরিত্রের বড় পার্থক্য হল, শকুন্তলা তপোবন ছেড়ে দুষ্মন্তের বধূ হয়ে বিদায় নেয়, কিন্তু পুনরায় তপোবনে ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করে নি। অন্যদিকে, কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সংসারে এসেও প্রকৃতির মায়া ত্যাগ করতে পারে নি। তাই প্রকৃতির প্রতি প্রবল টান সে অনুভব করেছে। তাই শকুন্তলার চেয়ে মিরান্ডার সাথেই কপালকুণ্ডলার সাদৃশ্য গভীরতর। নিম্নোক্ত বর্ণনায় কপালকুণ্ডলার সাথে ÔTempest' নাটকের মিরান্ডা চরিত্রের সাদৃশ্যের বিষয়টি পরিষ্কার হবে:

> প্রবলবাত্যামথিত, অনন্তনীল সাগরের তরঙ্গরাশির মধ্যে, অসহায়, মগ্নপ্রায় তরী দেখিয়া মিরন্দা ঘোর ব্যথিতা হইলেন। পরের দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি স্ত্রীজাতি ভিন্ন আর কে দেখাইতে পারে? বিশেষ মিরন্দার কমনীয় চরিত্র কখনও আর কোন নিষ্ঠুরতার সংস্পর্শে আইসে নাই। মিরন্দা যাহা নিত্য দেখিত, তাহার সকলই ত দয়ার, মহত্ত্বের আকর। এ অবস্থায় মিরন্দায় কোমল প্রকৃতি অলৌকিক কমনীয়তা লাভ করিয়াছিল। মিরন্দা সেই মগ্নপ্রায় তরীর জন্য, তরীমধ্যস্থিত ব্যক্তির জন্য ব্যথিতা হইলেন।[৩০]

মিরান্ডার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে কপালকুণ্ডলার অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, 'ঞবসঢ়বংঃ' নাটকের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য এবং কাহিনীর সাথেও 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের মিল রয়েছে। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতিরই প্রতিরূপ। প্রকৃতিকে, সৌন্দর্যকে যেমন গৃহে বন্দি করে রাখা যায় না, তেমনি এই কপালকুণ্ডলাকেও নবকুমার বন্দি করে রাখতে পারে নি। কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্যে নবকুমার বিস্ময়ে বিমূঢ়, যথার্থ পৌরুষের অভাবজনিত কারণে নারীদেহকে দলিত মথিত করে সৌন্দর্যকে নিংড়ে নেবে এ দুঃসাহস নবকুমারের ছিল না। চরিত্রের উজ্জ্বলতা বিচারে কপালকুণ্ডলার চেয়ে অনেক নিচুতে নবকুমারের অবস্থান।

কপালকুণ্ডার সাথে নবকুমারের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় নবকুমার কপালকুণ্ডলার কাছে একেবারে অসহায়। রোমান্সের রসঘন পরিবেশ কপালকুণ্ডলাকে ঘিরেই মূলত অঙ্কিত হয়েছে। এই উপন্যাসে কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্য বর্ণনার যে স্বাতন্ত্র্য সে প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক ড. সফিউদ্দিন আহমদ এর নিম্নোক্ত বক্তব্যটি মূল্যায়নের দাবি রাখে:

> কপালকুণ্ডলার রূপ বর্ণনায়ও বঙ্কিম বাংলা–সাহিত্যে অপূর্ব শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। গতানুগতিক রূপ বর্ণনাকে এখানে পরিহার করা হয়েছে। এখানেই বঙ্কিম দেখিয়েছেন যে, 'নারীরূপ কেবল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপার নয়, সে সৌন্দর্যও বিশ্ব সৌন্দর্যের অংশীভূত।[৩১]

তাছাড়া কপালকুণ্ডলাকে বঙ্কিমচন্দ্র এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যে, নারীপুরুষের স্বভাবসুলভ প্রণয় বা যৌনসম্পর্কের ব্যাপারে একেবারেই অনভিজ্ঞ। লেখক অনভিজ্ঞ কপালকুণ্ডলাকে সামাজিকতা শিক্ষার সুন্দর পটভূমিকা নির্মাণ করেছেন। এর জন্য প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোদেশে শেক্সপিয়রের ÔComedy of ErrorsÕ হতে বিখ্যাত একটি বাক্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, ÔFloating straight obedient to the stream.Õ ভাসমান মানুষ স্রোতস্বিনীর স্রোত যেদিকে যায় সেদিকেই ভেসে যায়। উপন্যাসের কাহিনীও এই ইঙ্গিতবাহী বাক্যের সাথে যথার্থ সঙ্গতিপূর্ণ। শান্ত সমুদ্রে ঝড় উঠলেই তা হয়ে ওঠে বিক্ষুব্ধ। কপালকুণ্ডলাকে প্রথম দর্শনেই ঝড় ওঠে নবকুমারের হৃদয়ে। কপালকুণ্ডলার অন্তরেও হয়ত ঝড় উঠেছিল, তা না হলে তাকে জীবনের প্রতিকূল স্রোতের নির্মম শিকারে পরিণত হতে হত না। তাই নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার জীবন খড়ের মতোই কাহিনীর অনিবার্য স্রোতে ভেসে গেছে। কাপালিক পালিত পিতা, পিতৃতুল্য অধিকারীর স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে যেতে প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও ঘটনাস্রোতের প্রবল টানের কাছে তা টেকে নি। কপালকুণ্ডলার এই অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব খুবই নগণ্য।

গ. কাপালিক:

কাপালিক এই উপন্যাসের সবচেয়ে অবাস্তব আর কাল্পনিক চরিত্র। 'কপালকুণ্ডলা' রোমান্স উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতির পেছনে মূলত এই চরিত্রের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু এই চরিত্রটির সাক্ষাত পাই মাত্র দুবার– উপন্যাসের শুরুতে ও শেষে। কাপালিক চরিত্রটি মূলত কপালকুণ্ডলার চরিত্র বিকাশের প্রয়োজনেই এসেছে। একবার নবকুমারকে সে নির্দয়ভাবে বলি দিতে চেয়েছে, আবার উপন্যাসের শেষের দিকে কপালকুণ্ডলাকে বলি হতে প্ররোচিত করে কালির পূজা করতে চেয়েছে, কিন্তু দুবারই তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। 'কপালকুণ্ডলায় মানব সংসারের ঊর্ধ্বচারী আদ্যাপ্রকৃতি তত্ত্বের যে ব্যঞ্জনা তার চারধারে বৃথাই ঘুরেছে কাপালিক, সে সত্যে প্রবেশ করতে পারে নি।'[৩২]

কাপালিকের ভীষণ রূপ, বীভৎস চেহারা, গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা, আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটা পরিবেষ্টিত। কাপালিকের কটিদেশ হতে জানু পর্যন্ত শার্দুলচর্মে আবৃত। সব মিলিয়ে লেখক কাপালিকের চারধারে একটা ভয়াল পরিবেশ তৈরি করেছেন। শবসাধনার জন্য নবকুমারকে বলি দেবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে নরঘাতক করে তোলেন নি বটে, কিন্তু এটি নির্দয় চরিত্র এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই চরিত্র সংক্রান্ত নিম্নোক্ত মন্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ:

> কপালকুণ্ডলার কোমলতা সমীচীন স্ফুটিত করিবার জন্য দুরন্ত কাপালিক কল্পিত হইয়াছে। করাল কাদম্বিনী পার্শ্বে বিদ্যুতের বিকাশ যেরূপ মনোহর, দুর্দ্দান্ত কাপালিকের পার্শ্বে দয়াময়ী কপালকুণ্ডলাও তদ্রুপই মনোহর। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট- কিন্তু উভয়ের সংস্থান আবার একই স্থলে।[৩৩]

কপালকুণ্ডলাকে অনেকে আদর্শ রমণী বলে মেনে নিতে চান না, আদর্শ রমণীর প্রথাগত যে বৈশিষ্ট্য আমরা দাঁড় করিয়েছি তাতে দেখা যায় সংসারের প্রতি অনুরাগী, পতিপ্রেমই যার একমাত্র আরাধ্য, কোমলাঙ্গী ও কোমলপ্রাণা এমনই বৈশিষ্ট্যের অধিকারীকে আদর্শ রমণী বলা যায়। কিন্তু কপালকুণ্ডলা প্রকৃত সংসার অনুরাগী রমণী নয়। বরং দীর্ঘ সাংসারিক বন্ধনে থেকে আমরা হয়ত ক্লান্ত, যার কারণে সংসারছাড়া কপালকুণ্ডলা আমাদের নিকট বড় মধুর। নবকুমারের প্রতি কপালকুণ্ডলার যে অনুরাগ বা পতিপ্রেম তা কপালকুণ্ডলার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কপালকুণ্ডলার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যই মূলত কপালকুণ্ডলাকে পৃথক জীব করে তুলেছে। কোথায় কপালকুণ্ডলা, আর কোথায় আমরা, এই বিস্ময়টিও কপালকুণ্ডলার আর একটি সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য সম্পূর্ণ ভিন্নতর- অপরাপর সৌন্দর্যের সাথে এর কোনো মিল নেই। এই কারণে এই সৌন্দর্য আমাদের এত আকৃষ্ট করে। সব মিলিয়ে কপালকুণ্ডলা বিস্ময়কর এক চরিত্র যাকে এখনও পরিপূর্ণভাবে বুঝে ওঠা সম্ভব হয় নি।

ঘ. অধিকারী:

অধিকারী বনের মধ্যে অবস্থিত দেবালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সেবক। মন্দিরমধ্যে সংস্থাপিত কালীর উপাসক। তার বয়স পঞ্চাশের অধিক। কপালকুণ্ডলাকে তিনি মাতার অধিক স্নেহ করেন। মূলকাহিনীর সম্প্রসারণে অধিকারীর একটা জোরালো ভূমিকা আছে। কালীর উপাসক হলেও কাপালিকের সাথে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট। তিনি একজন সরল, স্থির , শান্ত, সংসার–সমাজ সচেতন, অভিপ্রেত কর্মে উৎসাহী, নীতিবাদী ও পরোপকারী। সংসারের বাইরে তার অবস্থান, কিন্তু মূল কাহিনীর একজন সহযোগী মানুষ। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য:

> বঙ্কিমবাবুর প্রায় উপন্যাসেই এইরূপ এক একটি দরিদ্র, কামনা বিশেষে প্রেরিত, চরিত্রবিশেষের হিতাকাঙ্ক্ষী পণ্ডিত বর্ত্তমান থাকে। দুর্গেশনন্দিনীর অভিরামস্বামী, মৃণালিনীর মাধবাচার্য, চন্দ্রশেখরের রমানন্দস্বামী, আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সত্যানন্দের গুরু, দেবীচৌধুরাণীর ভবানী পাঠক ও সীতারামের চন্দ্রচূড় অল্পাধিক পরিমাণে আমাদিগের দৃষ্টান্তস্থল।[৩৪]

ঙ. মতিবিবি:

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রধান কেন্দ্রীয় চরিত্র যদি কপালকুণ্ডলা হয়, তবে মতিবিবি অবশ্যই প্রতিনায়িকা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পদ্মাবতী-লুৎফউন্নিসা-মতিবিবি সময়ান্তরে একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম। মতিবিবির চরিত্র আলোচনায় এই তিনটি নামই ব্যবহার করে আমরা প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হব। কপালের চিত্র কপাল, শ্যামাসুন্দরী ও মতিবিবি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর চিত্রে রেখাপাত মাত্র হয়েছে, মতিবিবি তথা পদ্মাবতীর চিত্র পূর্ণবিকশিত। কপালকুণ্ডলা আর মতিবিবিকে পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে, কপালকুণ্ডলা যোগিনী-মতিবিবি সম্রাজ্ঞী। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতিপালিতা, সংসার-শাস্ত্রজ্ঞানভিজ্ঞ মতিবিবি রাজধানীতে পরিবর্দ্ধিতা, মানব মনোভাবে সম্যক অভিজ্ঞা। কপালকুণ্ডলা স্নেহময়ী, মতিবিবি পাষাণ হৃদয়া। কপালকুণ্ডলা অল্পভাষী, মতি মুখরা। কপালকুণ্ডলাকে কেন্দ্র করে যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হয়েছে তার প্রধান চক্রান্তকারী মতিবিবি। নবকুমারের প্রথমবারে বিবাহিত স্ত্রী পদ্মাবতী, পরবর্তী জীবনে মতিবিবি, আগ্রার বিলাসবহুল জীবনের মধ্য হতে হঠাৎ প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিচ্ছেদ-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। লুৎফউন্নিসার জীবনকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ নবকুমারের দর্শন লাভ ও পরিচয় প্রাপ্তি

পর্যন্ত বিধৃত; দ্বিতীয় ভাগ মেহেরউন্নিসার নিকট জাহাঙ্গীরের প্রতি অনুরাগের কথা অবগতিতে সমাপ্ত; তৃতীয় ভাগে লুৎফউন্নিসার কাহিনী বর্ণনা ও পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। জীবনের প্রথম ভাগে লুৎফউন্নিসা যৌবনের দুর্দমনীয় পাপ-স্রোতে নিমজ্জিত হয়েছিল। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা কিছুটা প্রশমিত হলে লুৎফউন্নিসার মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। তার স্থির প্রতিজ্ঞা হল যে, যুবরাজ সেলিমের মহিষী হবে। তাঁর রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, রসজ্ঞান প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল; সেলিমও তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, যে কারণে লুৎফউন্নিসার মনে এরূপ আশা সঞ্চারিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু মানুষের সব আশা পূর্ণ হবার নয়। যুবরাজ সেলিম মেহেরউন্নিসার প্রতি অনুরক্ত। অন্যদিকে মেহেরউন্নিসাও সেলিমের প্রতি প্রেমাসক্ত এবং এই প্রেমাকর্ষণের খবরটি খুব কৌশলে লুৎফউন্নিসা অবগত হল। সুতরাং লুতফউন্নিসাকে সেলিমের আশা ত্যাগ করতে হল। আশা ত্যাগ করল বটে, কিন্তু দু:সাহসিক এক সংকল্প করল। সংকল্পগুলি হল:

১. মেহেরউন্নিসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ লুৎফউন্নিসার হৃদয়শেল। যাতে মেহেরউন্নিসার সাথে সেলিম মিলিত হতে না পারে এই ইচ্ছা লুৎফউন্নিসার হৃদয়ে আবির্ভূত হল।

২. রাজপুরী–মধ্যে সামান্য পুরস্ত্রী হয়ে থাকতে তার ইচ্ছা হল না। সুতরাং খস্রুকে সিংহাসনে বসাতে পারলে পুরস্কার স্বরূপ কোনো প্রধান রাজপুরুষের ঘরনী হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আধিপত্যপ্রিয় লুৎফউন্নিসা এই ইচ্ছা মনে পোষণ করল। অন্য একটি কারণও ছিল। রাজপুরীর মধ্যে থেকে ভোগান্তরের কিছু বিঘ্ন হচ্ছিল, বাইরে সেরূপ কোনো বাধা হবার সম্ভাবনা নেই।

৩. সেলিম যে তাকে উপেক্ষা করে মেহেরউন্নিসার প্রতি অনুরক্ত এতে তারও প্রতিশোধ নেয়া হবে।

উপরিউক্ত অভীপ্সা তিনটি চরিতার্থ করতে মতিবিবির আধিপত্যপ্রিয়তা ও প্রতিশোধস্পৃহা প্রবল হতে দেখা যায়। এই সংকল্প সিদ্ধির জন্য লুৎফউন্নিসার উড়িষ্যা গমন এবং উড়িষ্যা থেকে ফিরে আসার সময় আকস্মিকভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে নবকুমারের সাথে দেখা হয়।

পরবর্তীকালে স্বামীর নিকটে পরিচয়প্রাপ্ত হয়ে মতিবিবি শিহরিত হয়ে ওঠে। অতীতের স্মৃতি, স্বপ্নের ন্যায় মনের মধ্যে জাগ্রত হল। এই সেই নবকুমার যে কিনা বিধাতার অন্যরূপ ইচ্ছা হলে, আজ মতিবিবির হৃদয়ের ধন হত। ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত পদ্মাবতী নবকুমারকে মোহিত করার জন্য বেশভূষা করে তাঁকে ডেকে পাঠাল। রূপের অভিমান প্রত্যেক নারীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রোথিত। সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত পদ্মাবতী স্বামীর সাথে সপত্নী–সম্ভাষণে কিছুক্ষণ কাটাল। প্রকৃতি–সজ্জিতা, নিরাভরণা কপালকুণ্ডলাকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখে পদ্মাবতীর অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। জেগে উঠল পদ্মাবতীর মধ্যে আত্মাভিমান। পদ্মাবতীর এই গর্ব খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রদীপের আলোকে যখন কপালকুণ্ডলাকে দেখল, তখন বিস্মিতা পদ্মাবতীর চক্ষুস্থির। পদ্মাবতী কপালকুণ্ডলার রূপে মুগ্ধ হয়ে নিজ গায়ের গয়না তাকে পরাতে থাকে আর তার সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে পড়ে। পদ্মাবতীর এই আচরণের মধ্যদিয়ে নবকুমারের প্রতি তার আসক্তির প্রমাণ মেলে। মতিবিবির মধ্যে দুই ধরণের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। পদ্মাবতীর পূর্ব অভিলাষ ছিল সে

সেলিমের মহিষী হবে, কিন্তু আজ সে নবকুমারের প্রণয়প্রার্থী। দুটি বিরুদ্ধ ভাবের উপস্থিত হয়েছে। একদিকে আধিপত্য বিস্তারের প্রবল ইচ্ছা, অন্যদিকে হৃদয়প্রদেশে প্রণয়ের প্রত্যাশা- এই দুয়ের সংঘর্ষ শুরু হয়। এই বিরুদ্ধভাব নিয়ে পদ্মাবতী মেহেরউন্নিসার কাছে বর্ধমান যাচ্ছিল। ইচ্ছা কৌশলে সেলিমের প্রতি মেহেরউন্নিসার অনুরাগ বা আসক্তি আছে কিনা তা জানা। কৌশলে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে জানতে পারে যে, মেহেরউন্নিসা প্রবলভাবে সেলিমকে ভালোবাসে, অন্যদিকে যুবরাজ সেলিমও তার প্রতি প্রেমাসক্ত। সব দিক বিবেচনা করে তাকে সেলিমের আশা পরিত্যাগ করতে হয়েছে। মতিবিবির কারণেই অনেকাংশে উপন্যাসের কাহিনী হয়ে ওঠে জটিল ও করুণ। মতিবিবির মধ্যে শক্তি ও ঐশ্বর্যের লীলা গতানুগতিক বাঙালি জীবনে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। বাঙালি জীবনে নারীর শান্ত-স্নিগ্ধ-কোমল-কান্ত, কল্যাণকামী, মমতাময়ী ও ক্ষমাসুন্দর রূপ নন্দিত। সব মিলিয়ে অত্যন্ত সক্রিয় ও প্রাণবন্ত চরিত্র এটি। মানবচরিত্রের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হয়েছে মতিবিবির মধ্যে। এই মতিবিবির চরিত্র প্রসঙ্গে মোবাশ্বের আলীর নিম্নোক্ত মূল্যায়নটি বিশেষ গুরুত্ববহ:

> এই নারী ক্ষমায় সুন্দর, ত্যাগে মহৎ, আত্মবিলাপে অসাধারণ, কিন্তু নারী দুর্বার ভোগাকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রসারে তৎপর হতে পারে, নারীর এই দিকটি ছিল অভাবনীয়।[৩৫]

আর এ কারণেই মতিবিবি চরিত্রটি হয়ে ওঠে দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় একটি জীবন্ত চরিত্র। 'কপালকুণ্ডলা'য় চরিত্রের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের ব্যাপকতা এনে ঔপন্যাসিক রোমান্টিক প্রণয়ের ব্যাপ্তি বিস্তৃত কেন যে করলেন না তা আমাদের নিয়তই ভাবিত করে, তাড়িত করে কল্পনার অনন্ত প্রান্তরে। বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রের দ্বন্দ্বকে যথার্থভাবে তুলে ধরতে পারতেন এবং চরিত্রের তলদেশে আলোক নিক্ষেপ করে পরিপূর্ণভাবে উন্মোচিত করতে পারলে, কপালকুণ্ডলা যথার্থ উপন্যাস হয়ে উঠত। মনে হয় এটা লেখকের অক্ষমতা নয়, বরং রোমান্স সৃষ্টির অপূর্ব কৌশল। বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্র বিশ্লেষণ করেন না, চরিত্রের মনের দুয়ার খুলে না দিয়ে পাঠককে কল্পনা করার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। আর এই কল্পনার সাথে অগাধ জলরাশির মতো ইতিহাসের তীব্র স্রোত এসে 'কপালকুণ্ডলা'কে রোমান্সের রসে সিক্ত করেছে। মতিবিবি, মেহের-উন্নিসা, লুৎফ-উন্নিসা, যুবরাজ সেলিম প্রভৃতি এক একটি ঐতিহাসিক চরিত্র যুক্ত হয়ে রোমান্সের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছে।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের গঠনবৈশিষ্ট্য:

কপালকুণ্ডলার যে শক্তি পাঠককে অভিভূত করে তা হলো এর Strangeness| পরিবেশ পরিবর্তনের সহজ কৌশলে যে অভিনবত্বের সঞ্চার হয় তা এই ঝঃৎধহমবহবংং এর আওতার মধ্যে পড়ে না। অভিনব এবং দুঃসাহসিক শিল্পশ্রী কপালকুণ্ডলাকে একটি উজ্জ্বল রসলোকে উত্তীর্ণ করেছে। বঙ্কিমের রচনারীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শিল্পসৃষ্টিতে নাট্যরসের আমদানি। বঙ্কিমের এই নাট্যরস প্রবণতার জন্য উপন্যাসের খণ্ড পরিকল্পনা, পরিচ্ছেদ বিভাগ, ঘটনার গতি নাট্যানুগ পরিকল্পনায় বিধৃত। প্রতিটি মানুষের চরিত্রে নিহিত থাকে অদৃষ্টের বীজ। বাইরের ঘটনার সংস্পর্শে এসে সেই বীজ মহীরূহে পরিণত হয়। সেই কথাটিই বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে ঘটনা- সংস্থানের ন্যায় শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমের কাছে ঘটনা সংস্থানের একটা স্বকীয় অর্থ রয়েছে। বঙ্কিমের এই উপন্যাস-রীতির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাট্যকারের গভীর নাট্যবোধ। বঙ্কিমের কোনো কোনো উপন্যাসের নাট্যধর্ম তার কাব্যধর্মকে অতিক্রম করে গেছে, যেখানে অল্প পরিসরের

মধ্যে জীবনকে ঘনীভূত করে দেখিয়েছেন–দ্রুত সংঘটিত ঘটনাবলীকে চিত্র পরম্পরায় সাজিয়ে পাঠকচিত্তকে অপূর্ব কৌতূহলী ও বিচিত্র রহস্যস্নিগ্ধ করেছেন।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের কাব্যধর্মিতা:

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের অন্যতম কাব্যধর্মী উপন্যাস। এই উপন্যাসে লেখক কাব্যিক ভাষায় গভীর রসসৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। অনেক গবেষক তাই একে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলেছেন। কেউ কেউ আবার 'কপালকুণ্ডলা'কে উপন্যাস না বলে কাব্য বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। 'কপালকুণ্ডলা'য় কাব্যের বৈশিষ্ট্য আছে সত্য, কিন্তু তাই বলে একে কাব্য অভিধা দেয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ক্ষেত্রগুপ্তের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক:

> কপালকুণ্ডলা নিশ্চয়ই উপন্যাস। কবিত্ব এর অঙ্গধর্ম হতে পারে, প্রাণলক্ষ্মণ নয়। কাব্যসুরভিত ভাষা, আবেগের প্রবলতা, প্রকৃতি পরিবেশের প্রেক্ষিত, বর্ণনার আধিক্য প্রভৃতি উপাদান মুখ্য হয়ে উঠলে তাকে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলা যেতে পারে।[৩৬]

কাব্যধর্মী উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে ক্ষেত্রগুপ্তের উপরিউক্ত মন্তব্যের আলোকে বলা যায় 'কপালকুণ্ডলা' যথার্থই কাব্যোপন্যাস। সুললিত কাব্যিক ভাষা, আবেগের প্রাবল্য আর প্রকৃতির শৈল্পিক উপস্থাপন চমৎকারিত্ব লাভ করেছে এই উপন্যাসে। আর বর্ণনার আধিক্য কাব্যধর্মী উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে যদি বিবেচিত হয়, তাহলে এক্ষেত্রে 'কপালকুণ্ডলা' বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। বিশেষ করে নারীর রূপ বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে বাণীবিন্যাস কৌশল ও ভাষাভঙ্গি নির্বাচন করেছেন তা অসাধারণ। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নারীসৌন্দর্য ও প্রকৃতির রূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ ও বর্ণনার আধিক্য পাঠককে ক্লান্ত করে না, বরং বিষয়ের গভীরতা সম্পর্কে পাঠকসমাজ সচেতন হয়ে ওঠে। চমৎকার সৌন্দর্য সৃজনের মাধ্যমে কোনো একটি বিষয়কে পাঠকের সামনে যেভাবে তুলে ধরা যায় এবং চিত্তকে নাড়া দেয়া যায়, তা আর কোনো প্রক্রিয়ায় সহজ নয়। তাই মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রক্রিয়াটি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সাহিত্য রচনার কৌশল হিসেবে। 'কপালকুণ্ডলা'র কাব্যিক ভাষা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের নিম্নের বক্তব্যটি আমার কাছে খুবই প্রাসঙ্গিক মনে হয়:

> কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা–কিন্তু নীতি ব্যাখার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতি শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।[৩৭]

শুধু সৃজনশীল রচনা নয়, শিল্প–সংস্কৃতির আলোচনতেও ভাষা ব্যবহারের অভিনবত্ব লক্ষ্য করার মতো। বঙ্কিমের কবিপ্রতিভার উজ্জ্বল প্রমাণ মেলে মূলত নারীসৌন্দর্যের সাবলীল বর্ণনায়। এই বর্ণনায় কবিবঙ্কিমের উন্মেষ ঘটে। উপমা, প্রতীক আর রূপকল্পের সিঁড়ি বেয়েই প্রধানত বঙ্কিমের কবিসত্তা উন্মুক্ত আকাশে ডানা মেলেছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক ও সমালোচক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি স্মর্তব্য:

> রূপ বর্ণনায় বঙ্কিম প্রায়ই উপমা প্রয়োগ করতেন। কোনো উপমা প্রাচীন সাহিত্য থেকে গৃহীত, আবার কোনো উপমা তাঁর অপূর্ব কবিদৃষ্টির পরিচয়বাহী। রূপবর্ণনার মধ্যে বঙ্কিমের প্রকৃতি–চেতনারও একটা বড় পরিচয় পাওয়া যায়।[৩৮]

বঙ্কিমের প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসে তাঁর উপরিউক্ত কবিস্বভাব পরিস্ফুট। অলঙ্কার কবিতার গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে অত্যন্ত সার্থকতার

সাথে অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন। 'কপালকুণ্ডলা'য় ব্যবহৃত আলঙ্কারিক ভাষার নমুনা নিম্নে দেয়া হল।

ক) উপমা:

১. রূপরাশিতরঙ্গে, তাঁহার যৌবনশোভা শ্রাবণের নদীর ন্যায় উছলিয়া পড়িতেছিল। (দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)।

২. বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। (প্রথম খণ্ড ,পঞ্চম পরিচ্ছেদ)।

৩. বসন্তকালে মন্দানিল–সঞ্চালিত শুভ্র মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে, অলক্ষ্য পাদবিক্ষেপে চলিল; নবকুমার কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে চলিলেন। (প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)।

খ. প্রতীক-সংকেত:

১. স্রোতোবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিবিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গি করিয়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। (তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

২. লুৎফ–উন্নিসার হৃদয় পাষাণ। সেলিমের রমণীহৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কখন তাঁর মনঃমুগ্ধ করে নাই কিন্তু এইবার পাষাণমধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল। (তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)।

গ. উৎপ্রেক্ষা:

১. সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত' রাশীকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। (প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)।

ঘ. রূপক:

১. সেইরূপ বেগে নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল। (দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)।

২. তাঁহার হৃদয়াকাশ কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তিতেই ব্যাপ্ত হইয়াছিল। (দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)।

৩. জলরাশির গতিমুখ হইতে বেগনিরোধকারী উপলমোচনে যেমন দুর্দ্দম স্রোতাবেগ জন্মে। (দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)।

ঙ. চিত্রকল্প:

১. কপালকুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না– সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। কৌতূহল পরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্তি রূপরসরাশিদর্শনলোলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন,

নৈশবনভ্রমণবিলাসিনী সন্ন্যাসিপালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, জ্বলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন । (চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ) ।

২. চতুর্দ্দিকে যাহা দেখা যাইতেছিল, তাহা লোচনরঞ্জন বটে। নিকটে, একদিকে নিবিড় বন; তন্মধ্যে অসংখ্য পক্ষী কলরব করিতেছে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র খাল, রূপার সুতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। দূরে মহানগরের অসংখ্য সৌধমালা, নববসন্তপবনস্পর্শলোলুপ নাগরিকগণে পরিপূরিত হইয়া শোভা করিতেছে। (দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) ।

উপরিউক্ত অলঙ্কারের যথোপযুক্ত প্রয়োগই প্রমাণ করে যে, বঙ্কিমচন্দ্র কতটা কাব্য-সচেতন। তাঁর উপমা, প্রতীক-সঙ্কেত, চিত্রকল্প ও রূপকের ব্যঞ্জনা পাঠকচিত্তকে আলোড়িত করে।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের ভাষা:

'কপালকুণ্ডলা'য় বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'র জড়তা ও দুর্বলতা কাটিয়ে সুউচ্চ মার্গে আরেহণ করেন। শিল্পীর মানস বিবর্তনের ইতিহাসে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের বিশেষ কোনো ভূমিকা না থাকলেও এই উপন্যাসের মধ্য দিয়েই তাঁর অপূর্ব সাহিত্যিক দক্ষতা অর্জিত হয়। রোমান্স সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাষা-ভঙ্গিও গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। এই গ্রন্থে শিল্পীর ভাষা এমন একটি কৌমার্য অর্জন করেছে যে, অতি সহজ ও সূক্ষ্ম স্পর্শে তিনি গভীর আবেদন ও ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। অন্যদিকে তাঁর ভাষার মুক্তির সাথে কাহিনীর স্থির লক্ষ্যের প্রতি সমস্ত ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্রীভূত করার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছেন। উপন্যাসের সমৃদ্ধশালী ও গুরুগম্ভীর ভাষা গ্রন্থটিকে একদিকে যেমন উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি রোমান্সের বাণীভঙ্গিতে এনেছেন বৈচিত্র্য ও ব্যঞ্জনা। এখানে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের ভাষাশক্তির কিছু নমুনা তুলে ধরা হল:

> সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার-অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুলফ্‌লম্বিত কেশভার, তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না-তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।[৩৯]

যে কোনো রচনার রসোত্তীর্ণতার ক্ষেত্রে ভাষার প্রভাব অপরিসীম। ভাষা দুর্বল কিংবা রসহীন হলে পাঠকের কাছে তা আকর্ষণহীন হয়ে পড়ে। বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার বড়াল যে সংস্কৃতানুগ গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতেন প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে বাংলা গদ্যকে সেই আড়ম্বরপূর্ণ ভাষার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে নিপুণ নির্মাণকুশলতায় আটপৌরে কথ্যভাষাকে ব্যবহার করেছেন। কথ্যভাষার সাহিত্যে ক্রমপ্রবেশাধিকারের একটা ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চয়ই আছে। বাংলা ভাষার বিবর্তন ধারায় 'আলালের ঘরের দুলাল' এর মূল্য তাই অনস্বীকার্য। তবে যে কারণে এটি 'বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস' অভিধা পাওয়ার গৌরব হতে বঞ্চিত তা হল- ভাষার শক্তিহীনতা ও কাহিনীর দুর্বল বুনন। এ ক্ষেত্রে কিছুটা অপূর্ণাঙ্গতা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) তে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো সমালোচকের কাছে তাঁর প্রথম উপন্যাসের কিছু দুর্বলতা ধরা পড়েছে। এ প্রসঙ্গে আবদুল আজিজ আল্-আমানের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি তুলে ধরা হল:

> বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'ও ভাষার দিক দিয়ে নিতান্ত দুর্বল। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সেই ভাষাই যদি বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসে প্রযুক্ত হতো তা হলে উপন্যাস সৃষ্টিতে তিনি ব্যর্থ হতেন। কিন্তু পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা ব্যবহৃত হয় নি। স্বল্পকালের মধ্যেই বঙ্কিম মহৎ উপন্যাসের উপযোগী ভাষা গড়ে তুললেন।[৪০]

ভাষা ব্যবহারের ক্রম–উন্নতির বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে ড. আব্দুর রহিম এর মন্তব্যটিও উদ্ধৃত করা গেল:

> বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কপালকুণ্ডলার ভাষা কাব্যিক তথা শৈল্পিক। তাঁর ভাষায় তৎসম শব্দের সংখ্যা বেশি। তাছাড়া তাঁর কাব্যময় আলঙ্কারিক ভাষায় রয়েছে অনেক উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, চিত্রকল্পের ব্যবহার। তাঁর ভাষা প্রতীক-সংকেতে ব্যঞ্জনাময়- ইতঃপূর্বে কয়েকটি প্রতীক-সংকেতময় ভাষার ব্যঞ্জনার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।[৪১]

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন যাতে তাঁর কবিআত্মার সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। 'কপালকুণ্ডলা'য় প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের যেমন একটি করে নাম আছে তেমনি কাহিনীর শুরুতে কাহিনীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো কোনো কবিতাংশ কিংবা বিখ্যাত কোনো উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। এতে উপন্যাসের মর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিখ্যাত উদ্ধৃতির জন্য তিনি ছুটে গেছেন কালিদাস, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিদ্যাপতি, শেক্সপিয়র, বাইরন, ডন জুয়ান প্রমুখ লেখকদের লেখনীর কাছে।

'কপালকুণ্ডলা'র ট্র্যাজেডির চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি দেশীয় ইতিহাস, ঐতিহ্যের পাশাপাশি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কাছে ছুটে গেছেন। দেশীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ট্রাজিক বেদনারস বঙ্কিমের অসাধারণ প্রয়োগ–কৌশলে নতুন অর্থমাত্রা লাভ করেছে এই উপন্যাসে। আধুনিক যুগ প্রবণতা অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্র মানবিক দৃষ্টিতে বৈষ্ণবপদাবলীকে দেখেছিলেন এবং সেই কারণে 'কপালকুণ্ডলা'য় বৈষ্ণবপদাবলীর সার্থক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে প্রতিটি অধ্যায়ের সূচনাতে বিখ্যাত কবিদের উদ্ধৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে এর কাব্যধর্মিতার বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়। এ প্রসঙ্গে দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পদ-প্রয়োগ' নামক প্রবন্ধের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি এখানে তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক মনে করি:

> 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে এর প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রতিটি পরিচ্ছেদের শিরোদেশে দেশবিদেশের প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকারের রচনাংশকে উদ্ধৃতিরূপে এমনভাবে পতাকার মতো ব্যবহার করা হয়েছে যার সুদূরব্যাপী ব্যঞ্জনা সমস্ত পরিচ্ছেদের এক কাব্যময় প্রতিধ্বনি হয়ে উঠেছে।[৪২]

বঙ্কিমের উপন্যাসে উদ্ধৃতি প্রয়োগের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কখনো ঘটনার সঙ্কেত, কোথাও কোথাও চরিত্রের আবেগময় মুহূর্ত, আবার কোথাও সংলাপের সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনা। কখনো আবার উদ্ধৃতিগুলো মনে হয়েছে তাৎপর্যহীন। গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতির প্রয়োগ, তৎসম শব্দের অজস্র ব্যবহার, ভাষার গাম্ভীর্য, আবেগের প্রাবল্য, বর্ণনার প্রখরতা সবমিলিয়ে 'কপালকুণ্ডলা'র কাব্যধর্মিতাকে প্রগাঢ় করেছে। তাঁর এই ভাষা–শৈলী 'কপালকুণ্ডলা'কে কাব্যোপন্যাসের অভিধা এনে দিয়েছে। আর বঙ্কিম তাঁর গদ্যসাহিত্যে যে ভাষাশৈলী নির্মাণ করেছেন, তা মূলত বিদ্যাসাগরের নিকট পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের দিকপাল গবেষক ড. আহমদ শরীফ এর মন্তব্যটি এখানে তুলে ধরছি:

> বিদ্যাসাগর নির্মিত ভাষাই বঙ্কিম–শৈলীর ভিত্তি। তাজমহলের ভিতও অন্য অনেক মসজিদের মতোই, কিন্তু তাজমহল যেমন সৌন্দর্যে অতুল্য, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা–শৈলী ছিল তাঁর সমকালে অনুকরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রূপ ও আচরণ বর্ণনা ভাষায় ও ভঙ্গিতে প্রায় ক্ষেত্রে আবেগপুষ্ট, ছন্দোবদ্ধ রোমান্টিক গদ্যকবিতা হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যে কোনো উপন্যাসের যে কোনো পৃষ্ঠায় এমনি কবিতার সাক্ষাৎ মিলবে।[৪৩]

অনেক সমালোচক 'কপালকুণ্ডলা'কে অনবদ্য 'কাব্য' কিংবা চমৎকার 'কাব্যগ্রন্থ' বলে অভিহিত করেছেন। কাব্যের গুণ বিদ্যমান থাকলেই রূপ ও আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে কোনো উপন্যাসকে কাব্য বলা যায় না। তবে 'কপালকুণ্ডলা' যে কাব্যধর্মী একটি উপন্যাস এ ব্যাপারে মোটামুটি সকলেই একমত। উৎকৃষ্ট রোমান্স সৃষ্টির জন্যই মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যধর্মিতার আশ্রয় নিয়েছেন। বিশিষ্ট সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দার বলেন:

> রোমান্স কাব্যধর্মী; অর্থাৎ ইহা বহুলাংশে শিল্পীমনের একক উৎস হইতে রস আহরণ করে। সেজন্যই কবিতার ভিতর দিয়া যেমন সহজে কবি-মনকে অবিষ্কার করা যায়, রোমান্সের মধ্যেও, রোমান্সের পাত্র-পাত্রীর সংগ্রাম, আত্মোপলব্ধির প্রেরণা, সৃজনপ্রয়াসী সীমাহীন আকুতির মধ্যেও আমরা বঙ্কিম–মানসেরই আকুতি অনুভব করিতে পারি।[৪৪]

ঔপন্যাসিকের বিচিত্র প্রবণতা 'কপালকুণ্ডলা'য় সম্মিলিত হয়ে কাহিনীকে নির্দিষ্ট একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। উদ্ভটরস রোমান্সের অন্যতম লক্ষণ এবং 'কপালকুণ্ডলা'য় এ উদ্ভটরস আছে এ কথা সত্য, তবে পড়ার সময় পাঠকের কাছে তা কখনো উদ্ভট বা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। এর একটি কারণ মনে হয় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বৃত্তি-প্রবৃত্তিতাড়িত মানুষের চিন্তা-কর্ম-আচরণের রহস্যজিজ্ঞাসু। বঙ্কিম তাই তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর আচরণ নিয়ন্ত্রণ না করে, কেবল অনুসরণ করেছেন।

'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাস হতে ভিন্ন। এ ভিন্নতা সুস্পষ্ট- উপন্যাসের গঠনশৈলীতে, পাত্রপাত্রী নির্বাচনে, উপন্যাসের কাহিনীতে, প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনায়, ভাষার গতিশীলতায়, বর্ণনার চমৎকারিত্বে, সর্বোপরি লেখকের চেতনাগত ভঙ্গিতে। এ কথা খুবই সত্য যে, বঙ্কিম তাঁর ভাষার ক্ষিপ্রতায়, বর্ণনা মাধুর্যের শক্তিবলে মানুষের অন্তরদেশে আলোকপাত করে তাকে পরিপূর্ণ উদ্ভাসিত করেছেন। মানুষের আঁতের কথা তুলে ধরার ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনের ছবি হয়ত প্রাসঙ্গিক নয়, যার কারণে বঙ্কিমচন্দ্র চিরচেনা সরলরেখায় না গিয়ে রোমান্সের পথে পা বাড়িয়েছেন । এটি বাংলা সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব সংযোজন। সমালোচকের ভাষায়:

> ভাব-ভাষা-কাহিনী সবদিকে এটি অভিনব। ইতিহাস আর কল্পনা মিলিয়ে সুখকর মুগ্ধকর এক কাহিনী উপহার দেন তিনি। বাঙলা সাহিত্যে তখন প্রবাহিত হলো নতুন বাতাস। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলো কিন্তু সমসাময়িক কালের সাধারণ মানুষের গল্প নয়, তিনি ইতিহাস এবং কল্পনা মিশিয়ে রচনা করেছেন তাঁর গল্প।[৪৫]

এ মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সবগুলো উপন্যাস সম্বন্ধেই প্রাসঙ্গিক। রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনা, ইঙ্গিতময়তা, নারীর সৌন্দর্য বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসকে প্রকৃত রোমান্স উপন্যাসে পরিণত করেছেন। ভাষা-সৃষ্টি, চরিত্রের পরিস্ফুটন, শিল্পমহিমা, কাব্যধর্মিতা, উদ্ভট ঘটনার সমাবেশ, দুঃসাহসিক কাহিনী প্রতিবিন্যাস প্রভৃতি উপাদানের সমাবেশে 'কপালকুণ্ডলা' সার্থক রোমান্স উপন্যাস হয়ে উঠেছে। তাই এ উপন্যাসটি বাংলা

সাহিত্যের এক অনন্য সংযোজন হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টিসম্ভারই তাঁকে সাহিত্য সম্রাটের আসনে বসিয়েছে।

তথ্যসূচি :

1. Sally Wehmeier, Oxford Advanced Learner's Dictionary, Sixth edition, Oxford University press, 2002-2003, P-1156.

২. শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র–রবীন্দ্রনাথ–শরৎচন্দ্র, এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানী প্রা. লি. কলকাতা, ষষ্ঠদশ সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪০৪, পৃ.৩

৩. বদিউর রহমান,সাহিত্য–সংজ্ঞা অভিধান, গতিধারা, বাংলা বাজার ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০১১, পৃ.১৯৪

4. Richard chase, The American novel and it's tradition , India,-1973, page-12.

5. Richard chase , Ibid, page-18.

6. Nathaniel Hawthrone, The House Of the Seven Gables, Oxford University press, 1998, Preface, page-1.

৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কপালকুণ্ডলা, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, সূত্রাপুর ঢাকা–১১০০। প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি–২০১১, পৃ. ৩

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৯. নীলিমা ইব্রাহিম, শরৎ প্রতিভা, বাংলা উপন্যাসের বিকাশ ও ধারা, বাংলা একাডেমী, জানুয়ারি, ২০০১, পৃ. ৩

১০. অরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিম–মানস, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৫০

১১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কপালকুণ্ডলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কপালকুণ্ডলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১৩. মিনতি কুমার রায়, সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্ব, চয়েস প্রকাশনী, লালমাটিয়াঘাট, রাজাবাজার বগুড়া

১৪. ঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কপালকুণ্ডলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কপালকুণ্ডলা, প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৬

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১৮. প্রাগুক্ত,পৃ. ২৮

১৯. ক্ষেত্রগুপ্ত, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, বিশ্বসাহিত্য ভবন, বাংলাবাজার ঢাকা–১০০০, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ–২০১১, পৃ. ৫২

২০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কপালকুণ্ডলা, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৭

২১. অরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিম–মানস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

২২. প্রণব চৌধুরী সম্পাদিত, বাংলা গদ্যের বিশেষ যুগ,শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯

২৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কপালকুণ্ডলা, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৩

২৫. প্রণব চৌধুরী সম্পাদিত, বাংলা গদ্যের বিশেষ যুগ, সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমের অবিস্মরণীয় কীর্তিঃ কপালকুণ্ডলা, বাংলাদেশ বইঘর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০২, পৃ. ৪২৬

২৬. প্রাগুক্ত পৃ. ৪২৩

২৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কপালকুণ্ডলা, প্রাগুক্ত,পৃ. ১২

২৮. সারোয়ার জাহান সম্পাদিত, বঙ্কিম–বিভূতি–ওদুদ, মোবাশ্বের আলী, বঙ্কিমচন্দ্র:কপালকুণ্ডলা, ৪৮/২, আরামবাগ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ. ৪৭

২৯. অরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিম–মানস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৩০. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, বঙ্কিম স্মৃতি, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সাহিত্যম, ১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা–৭০০০৭৩, আশ্বিন,১৩৯৫, পৃ. ১৮৫

৩১. ড. শফিউদ্দিন আহমদ, বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক, বিশ্বসাহিত্য ভবন, প্রথম প্রকাশ, মে,২০০৮, পৃ.

৩২. ক্ষেত্রগুপ্ত, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

৩৩. গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৩৫. সারোয়ার জাহান সম্পাদিত, বঙ্কিম–বিভূতি–ওদুদ, মোবাশ্বের আলী, বঙ্কিমচন্দ্র:কপালকুণ্ডলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৩৬. ক্ষেত্রগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: শিল্পরীতি, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা,, ১৯৮৭, পৃ. ৪৯

৩৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৮৩

৩৮. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বঙ্কিম সৃষ্টি সমীক্ষা, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, ৭০০ ০৭৩, জুন ২০১১, পৃ. ৮৪

৩৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কপালকুণ্ডলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৪০. আবদুল আজিজ–আল আমান, সাহিত্য–সঙ্গ, কয়েকটি ধারার উৎপত্তি ও বিকাশ, হরফ প্রকাশনী, এ–১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা, ৭০০০০৭, ৩০ শ্রাবণ, ১৩৬৫, পৃ. ২৭৫

৪১. ড. আব্দুর রহিম, বঙ্কিমচন্দ্রে উপন্যাস: রোমান্স প্রসঙ্গ, সূচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৮, পৃ. ১১২

৪২. ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদনা, বঙ্কিমচন্দ্র: আধুনিক মন, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পদপ্রয়োগ, পুস্তক বিপনী, কলকাতা : ৯, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর, ১৯৮৯, পৃ. ১১২

৪৩. আহমদ শরীফ, বঙ্কিম–বীক্ষা ঃঅন্য নিরিখে,উত্তরণ, ৩৮/২ বাংলা বাজার, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩

৪৪. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ, ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা, ৭০০ ০৭৩, পৃ. ৪২৬

৪৫. হুমায়ুন আজাদ, লাল নীল দীপাবলি বা বাংলা সাহিত্যের জীবনী, আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৭৬, পৃ. ১১৩

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

কাজী আবদুল ওদুদের সৃজনশীলতা: রাজশাহী পর্ব

ড. সাইফুল আলম*

সারসংক্ষেপ: 'বুদ্ধিরমুক্তি আন্দোলনে' তাত্ত্বিক ও কর্মীপুরুষ হিসেবে অবদানের জন্য কাজী আবদুল ওদুদ অন্যতম পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব। কথাশিল্পী, সংগঠক, শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, চিন্তানায়ক, সাময়িকপত্র-সম্পাদক, অনুবাদক, অভিধান প্রণেতা প্রভৃতি পরিচয়ে তাঁর অবদান স্বতন্ত্র ও তাৎপর্যময়। প্রকৃতপক্ষে তিনি মুক্তবুদ্ধির অনুসারী, যুক্তিবাদী, সমাজকল্যাণকামী, মানবতাবাদী লেখক হিসেবে সামাজিক ও সাহিত্যিক কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। ওদুদ মনে করেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথবাহিত বাংলার জাগরণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বাঙালি মুসলমানের জাগরণ। তাঁর কাছে বাংলার জাগরণ ছিল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের। ঔপনিবেশিক শাসন এবং রাজনৈতিক কারণে তাঁর লালিত *শাশ্বত বঙ্গে'র* স্বপ্ন বিপর্যস্ত হলেও থেমে থাকে নি তাঁর মুসলিম জাগরণের স্বপ্ন। বাঙালি মুসলমান সমাজের জাগরণ স্পৃহায় তিনি ইউরোপীয় রেনেসাঁস এবং বাংলার রেনেসাঁসের শীর্ষ ব্যক্তি প্রতিভার মূল্যায়নে আত্মনিয়োগ করেছেন। কর্মসূত্রে ওদুদ ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত রাজশাহীতে অবস্থান করেছিলেন। এ সময় রাজশাহী কলেজে শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, কাজী আকরম হোসেন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রমুখ সাহিত্যিকি ব্যক্তিত্ব। তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুসাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ রাজশাহীর একটি দপ্তরে এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজশাহীর এই সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে কাজী আবদুল ওদুদ এ সময় নিজেকে নিয়োজিত করেন গ্যেটে ও নজরুল চর্চায়। প্রতিপাদ্য নিবন্ধে রাজশাহী পর্বে তাঁর সাহিত্য সাধনার স্বরূপ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) বিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ বহুমাত্রিক প্রতিভা। বাঙালি মুসলমান সমাজের বৃত্তাবদ্ধ জীবনের অচলায়তন থেকে মুক্তির সম্ভাবনার ক্ষেত্র নির্মাণে তাঁর অবদান অসামান্য। 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের মাধ্যমে উদারমানবতাবাদী জীবনচেতনার বিকাশে তাঁর উদ্যোগ ও অবদান অনস্বীকার্য। কথাশিল্পী, সংগঠক, প্রাবন্ধিক, চিন্তানায়ক, সাময়িকপত্র-সম্পাদক, অনুবাদক, অভিধান প্রণেতা প্রভৃতি পরিচয়ে তাঁর ভূমিকা তাৎপর্যময়। তাঁর সাহিত্যকর্মে যে সমগ্রতার পরিচয় রয়েছে সেখানে রেনেসাঁসের চেতনাই মুখ্য। বাংলা সরকারের টেক্সটবুক কমিটির সচিব হিসেবে তিনি ১৯৪০ সালে কলকাতায় শিক্ষাদপ্তরে যোগদান করেন। ১৯৩৯ সালে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় জাপানি বোমাবর্ষণ শুরু হলে কলকাতা মহানগরীর প্রায় অর্ধেক জনমানব শূন্য হয়ে পড়েছিল। জাপানিদের বোমা হামলার ভয়েই বাংলা সরকারের কোনো কোনো অফিস কলকাতা থেকে মফস্বল শহরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এ কারণেই বাংলা সরকারের ডি.পি.আই. অফিস অর্থাৎ শিক্ষাদপ্তর ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয়। ওদুদের 'অফিস কক্ষ ছিল কলেজিয়েট স্কুল ভবনের মাঝামাঝি অংশের সিঁড়ি বরাবর'।[১] আর তিনি ভাড়া থাকতেন হেতেম খাঁ এলাকায়। বর্তমান হেতেম খাঁ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পশ্চিমে একতলা বাড়িতে তিনি থাকতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯৪৫ সালে সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত দপ্তরসমূহ কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ

গ্যেটে চর্চা ঃ

কর্মসূত্রে ওদুদ ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত রাজশাহীতে ছিলেন। এ সময় রাজশাহী কলেজে শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, কাজী আকরম হোসেন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্‌ রাজশাহীতে একটি দপ্তরের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী পদে নিয়োজিত ছিলেন। এই সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে ওদুদের দাপ্তরিক কাজের চাপ তেমন ছিল না। সে সময় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন গ্যেটে চর্চায়। রাজশাহী কলেজে তৎকালীন সহ-অধ্যক্ষ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন:

> তিনি (ওদুদ) এই সময় গ্যেটে সম্পর্কে বই লিখিতে ব্যাপৃত ছিলেন। আমাকে অনেক দিন সন্ধ্যায় তাঁহার বাড়িতে আহ্বান করিতেন।[২]

আবদুল হক ১৯৪২-৪৩ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাঁকে মাসিক দশ টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওদুদ *কবিগুরু গ্যেটে'র* দুই খণ্ডের পাণ্ডুলিপির প্রেসকপি করিয়ে নিয়েছিলেন।[৩] অধিকতর সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের পর ১৯৪৬ সালে *কবিগুরু গ্যেটে'র* দু'খণ্ড কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। কাজী আবদুল ওদুদের স্বপ্ন ছিল তাঁর আদর্শের মহাপুরুষের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করা। সাহিত্যজীবনের সূচনায় তিনি গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ ও হযরত মুহম্মদ (সা.) সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রণয়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ় সংকল্পের রূপায়ণ ঘটে দু'খণ্ডে প্রকাশিত *কবিগুরু গ্যেটে* (১৯৪৬) গ্রন্থে। কবি, নাট্যকার, নাট্যপরিচালক, দার্শনিক, সাধক, বিজ্ঞানী, শিল্পী, প্রশাসক, রোমান্টিক ও ক্লাসিক, প্রেমিক ও পূজারি ইত্যাদি যে কোন পরিচয়ে গ্যেটের সমগ্রতার সন্ধান করা যাবে না। গ্যেটের জীবনী, সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম ও মননশীলতা ছিল বিকাশধর্মী ও মৌলিক। রেনেসাঁসের পর আঠারো শতকের Enlightenment-এর সময়ে ইউরোপে নবমানবিকতার সাধনা (New Humanism) চলে। গ্যেটে সাহিত্যসাধনা এবং জ্ঞান অনুসন্ধানের মাধ্যমে যে ধারার সূচনা করেন তাতে মনুষ্যত্বের মহিমাই ছিল মুখ্য। গ্যেটের ভাবাদর্শ মূলত পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সংস্কৃতির ধারাসমুহের সমুন্নত রূপ। 'বিশ্বসাহিত্য' প্রত্যয়ের প্রবর্তন ঘটে তাঁর জীবন ও সাহিত্যসাধনা থেকেই। গ্যেটের জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টি কমবেশী অনুসৃত হয়েছে জাঁ পল সার্ত্র, বেনেদিত্তো ক্রোচে, টমাস মানের সাধনায়। ওদুদ মনে করেন উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ পূর্ণাঙ্গ হয় রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল প্রতিভার প্রভাবে। পরিপ্রেক্ষিতগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলতেই হয় রবীন্দ্রনাথও গ্যেটের সাহিত্যসাধনার অনুসারী। রবীন্দ্র অনুরাগী ওদুদের গ্যেটে চর্চায় উৎসাহী হওয়ার কারণ হলো মানুষের ব্যাপক জীবনবোধ ও বিশ্ববোধের মন্ত্রদ্রষ্টা ও দৃষ্টান্ত-স্থল গ্যেটে। তিনি গ্যেটের জীবনচরিত ও সাহিত্য-পরিচয় দিয়েছেন। ওদুদ ভেবেছেন:

> গ্যেটের স্বচ্ছ ও সবল মুক্তবুদ্ধি হয়ত আমাদের দেশকেও সাহায্য করবে জীবনের দায়িত্ব, প্রতিভা, ধর্ম, স্বদেশপ্রেম, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের অর্থ ও যোগাযোগ, সব কথাই আরো ভাল করে' বুঝতে, যেমন ইয়োরোপের ও আমেরিকার চিৎ-প্রকর্ষ তাঁর প্রভাবে লাভবান হয়েছে।[৪]

নিয়ন ইডেল তার *প্রিন্সিপিকা বায়োগ্রাফিকা* গ্রন্থে জীবনী লেখার আদর্শ নীতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি এক রকমের জীবনীর নাম দিয়েছিলেন অফিসিয়াল বায়োগ্রাফি। এ জাতীয় জীবনীগ্রন্থে ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি ঘটনার বর্ণনা থাকলেও ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের প্রয়াস থাকে না। তিনি আর এক রকমের জীবনীর নাম দিয়েছেন প্রোফাইল যেখানে ব্যক্তিজীবনের ঘটনার বদলে প্রাধান্য পায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসহ ব্যক্তির রূপরেখা। তিনি আরো এক রকমের জীবনীর নাম দিয়েছেন নিউ বায়োগ্রাফি যেখানে ব্যক্তিজীবনের প্রমাণিত ঘটনার ব্যাখ্যা এবং মূল্যায়ন থাকে। জীবনের যেসব অংশের প্রামাণ্য উপকরণ মেলে না সে সব অংশ সম্পর্কে আনুমানিক ব্যাখ্যা থাকে। গোলাম মুরশিদ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী পুনর্গঠনের চেষ্টা করতে গিয়ে নিয়ন ইডেল ব্যাখ্যাত একাধিক স্টাইলের সমন্বয় করেছেন। ফলে মাইকেল জীবনী 'আশার ছলনে ভুলি' (১৯৯৫) বাংলা জীবনীসাহিত্যে মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। গোলাম মুরশিদ বাংলা জীবনীসাহিত্যকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রবর্তিত ধারা যেখানে সমসাময়িক যুগের ছবি প্রাধান্য পেলেও ব্যক্তির জীবনী পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিফলিত হয় নি। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থটি এর দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত ধারা যেখানে যুগের কথা কিংবা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বদলে প্রাধ্যান্য পায় ব্যক্তিজীবনের কিছু কিছু ঘটনা এবং সন ও তারিখ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত জীবনীগুলো এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। তৃতীয়ত এক ধরনের জীবনীর ধারা রয়েছে যা সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত নয়। এ জাতীয় জীবনীসাহিত্য জীবনের ছোটবড়ো ঘটনার বর্ণনা থাকে যা ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নে সম্ভাব্য সত্যকে তুলে ধরে না, এমনকি মুখে মুখে প্রচলিত গুজব বা জনরবের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ থাকে না। বাংলা জীবনীসাহিত্যের বড় ত্রুটি হলো ভক্তিরস এবং বীর পূজার প্রাধান্য। নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত গবেষণা এবং বিশ্লেষণে অনীহা এর মূল কারণ। ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নে আদর্শ জীবনী সাহিত্যের দৃষ্টান্ত হলো মাইকেল জীবনী 'আশার ছলনে ভুলি'। বাংলা জীবনী সাহিত্যের মধ্যে ওদুদের দু'খণ্ডে প্রকাশিত 'কবিগুরু গ্যেটে' তাৎপর্যপূর্ণ। গ্যেটের প্রথম জীবনের কাহিনী ওদুদ সংগ্রহ করেছেন গ্যেটের আত্মচরিত থেকে। গ্যেটের শেষ বয়সের *একেরমান ও সোরের সঙ্গে আলাপ* থেকে সংগ্রহ করেছেন তাঁর অমূল্য বাণী। এ ছাড়া গ্যেটের চরিতকারদের মধ্যে লুইস (Lewes), ব্রান্ডেস (Brandes), হিউম ব্রাউন (Hume Brown), পল কেরাস (Paul Carus), রবার্টসন (Robertson), লুডভিগ (Ludwig), ক্রোচে (Croce) প্রমুখের রচনা থেকে ওদুদ সহায়তা নিয়েছেন। তবে এ ক্ষেত্রে ওদুদের বিবেচনাবোধ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কেবল সংকলকের ভূমিকাই পালন করেন নি বরং তাঁর মনে হয়েছে গ্যেটের জীবন ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। গ্যেটের সমুন্নত প্রতিভার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। ওদুদ গ্যেটের জীবনাদর্শ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্যকর্মের অনুবাদও করেছেন। গভীর অনুরাগে ওদুদ বাঙালি পাঠকের সামনে গ্যেটের জীবনী ও সাহিত্য বিশ্লেষণ করেছেন। *কবিগুরু গ্যেটে* জীবনীসাহিত্যের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে স্বীকৃতি পেয়েছে গ্যেটের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে। ওদুদের এ গ্রন্থটি বাংলা তুলনামূলক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কর্ম হিসেবে কালজ ও কালোত্তর মর্যাদায় অভিষিক্ত।

বিশ্বসাহিত্যে গ্যেটের অবদান তুলনারহিত। দু'খণ্ডে প্রকাশিত *কবিগুরু গ্যেটে* ওদুদের দীর্ঘ প্রস্তুতির ফল। গ্রন্থটি ১৩৫৩ সালে প্রকাশের সতের বছর পূর্বে তিনি ১৩৩৬ সালে ঢাকার

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে' 'গ্যেটে' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। গ্যেটের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ যথেষ্ট মনে না হওয়ায় ১৩৩৭ সালে আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'জয়তী' প্রকাশিত হতে থাকলে এ পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিকভাবে গ্যেটের বিস্তৃত পরিচয় লিখতে থাকেন। 'জয়তী' বন্ধ হয়ে গেলে 'প্রদীপে' ও পরে 'ছায়াবীথি'র কয়েকটি সংখ্যায় এই লেখা প্রকাশ হতে থাকে। সে ভাবেই ১৩৪১ সাল পর্যন্ত গ্যেটের প্রথম জীবনের পরিচয় লেখা শেষ হয়। এর প্রায় সাত বছর পর মূলত আবদুল কাদিরের আগ্রহে তাঁর সম্পাদিত 'শিশমহল' পত্রিকাতে তিনি গ্যেটে সম্পর্কে পুনরায় লিখতে আরম্ভ করেন। অচিরেই 'শিশমহল' পত্রিকা বন্ধ হলেও ওদুদের গ্যেটে-চর্চা অব্যাহত থাকে। অধিকতর সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের পর ১৩৫৩ সালে দু'খণ্ডে *কবিগুরু গ্যেটে* কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি 'গ্যেটে' প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে *কবিগুরু গ্যেটে* গ্রন্থের অবতরণিকা রূপে ব্যবহার করেছিলেন। *কবিগুরু গ্যেটে* প্রকাশের তিন বছর পরে ১৯৪৯ সালে তিনি 'গ্যেটের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী' প্রবন্ধ লেখেন যা পরবর্তীতে 'স্বাধীনতা-দিনের উপহার' প্রবন্ধ সংকলনে যুক্ত হয়। বাংলা ভাষায় গ্যেটে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের অভাব ছিল। *কবিগুরু গ্যেটে* বাংলা ভাষায় গ্যেটের জীবন ও সাহিত্যসাধনা সম্পর্কিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন সমালোচকের গ্যেটে চর্চা-পঞ্জির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, মহাকবি গ্যেটে ও তাঁর সাহিত্যকর্মকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে অনুধাবন করতে হলে ওদুদের *কবিগুরু গ্যেটে* বিশেষভাবে সহায়ক হবে। এ ক্ষেত্রে আহমদ ছফার মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ:

> গ্যোতের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্ত এবং সাহিত্যকর্ম বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে পরিচিত করার সবটুকু কৃতিত্ব কাজী আবদুল ওদুদের একার। দু'টি খণ্ডই অন্তরের তাগিদে লেখা অনুপ্রাণিত গ্রন্থ এবং পাঠ করে অনেকেই গ্যোতে সম্বন্ধে জানতে, তাঁর রচনা পাঠ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এটি কম সাফল্যের বিষয় নয়।[৫]

ইউরোপের রেনেসাঁস তের থেকে আঠার শতক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রেনেসাঁসের ধারাবাহিকতা ছিল কয়েক শতাব্দীব্যাপী এবং তা নানা লক্ষণের দ্বারা সনাক্ত করা হয়ে থাকে। প্রাচীন জ্ঞান ও কাব্যকলার নতুন আবিষ্কার, মর্ত্যজীবন সম্পর্কে মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং ধর্ম ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে নতুন বোধের উদ্ভব। ইতালির রেনেসাঁস, ফ্রান্সের এনলাইটেনমেন্ট এবং ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের কারণে নব আবিষ্কার ও পুনর্মূল্যায়ন গুরুত্ব পেলেও জার্মানির ক্ষেত্রে তা যথার্থ গুরুত্ব পেতে সময় লেগেছিল। ষোল শতকে জার্মানিতে দেখা দেয় ধর্মান্দোলন বা Reformation যা রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিপরীতধর্মী। তবে আঠার শতকে জার্মানিতে ক্লাসিক সাহিত্য অর্থাৎ গ্রিক শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে যার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে রিফরমেশন বা ধর্মান্দোলনের নয় বরং রেনেসাঁসের। ওদুদ ভেবেছেন:

> এই প্রাচীন-গ্রীকশিল্পের-পুনরুজ্জীবনবাদীদের সৌন্দর্যানুরাগ রেনেসাঁসের কিন্তু তাঁদের সত্য ও স্বদেশানুরাগ ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের।[৬]

জার্মানির নবজাগরণে একই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে। সাহিত্যে লেসিং (Lessing), ক্লপস্টক (Klopstock), ভীলান্ড (Weiland), হের্ডর (Herder), গ্যেটে (Goethe), শিলার (Schiller), শেগেল (Schlegel)| দর্শনে কান্ট (Kant) হেগেল

(Hegel), ফিক্‌টে (Fichte), শোপেনহাউয়র (Schopenhaver)| সংগীতে মোৎসার্ট (Mosart), বেটোফন (Bethoven)। এই বিচিত্র শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্বতমালার উচ্চতম এবং মহত্তম শৃঙ্গ হলেন গ্যেটে। আঠার শতকে ইউরোপে নবমানবিকতার সাধনার পরিণতি পরিলক্ষিত হয় গ্যেটের জীবনে ও সাহিত্যে। গ্যেটের মনীষা ও কাব্য সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণের পর ক্রোচে তাঁর 'গ্যেটে' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন:

> গ্যেটের কাব্যে, তাঁর সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যবিলাসী রূপগ্রাহী ও প্রখরবোধ চিত্তে প্রথম স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছিল আধুনিকতার বহু দিক।[৭]

ওদুদ মনে করেন ক্রোচে-কথিত গ্যেটের প্রতিভার আধুনিকতার বিষয়টি অনুধাবন করলে গ্যেটের সত্যিকার পরিচয় কিছুটা হলেও পাওয়া যাবে। যৌবনেই গ্যেটে ঘোষণা করেছিলেন:

> আমি প্রকৃতির মতো অকৃত্রিম হব, ভাল হব, মন্দ হব, তোমাদের যত আদর্শ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।[৮]

বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময় গ্যেটে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন সৃজনশীল ও মৌলিক কাজে। সৃষ্টিশীলতার বিকাশ ও বৈচিত্র্যে গ্যেটে কবি, দার্শনিক, সাধক, বৈজ্ঞানিক, প্রশাসক, রোমান্টিক ও ক্লাসিক, লোকায়ত ও অভিজাত, প্রেমিক ও পূজারি। এই বহুমুখী জীবনানুভবের সামঞ্জস্য গ্যেটের ব্যক্তিত্বে সঞ্জীবিত করেছে মনুষ্যত্বের মহিমা। তাঁর শিল্পচেতনায় সমান্তরালভাবে উপস্থিত ছিল প্রেমবিধুরতা ও জ্ঞান-অন্বেষণ। গ্যেটে প্রতিভার অমোঘ প্রভাব সম্পর্কে জন মেচি মন্তব্য করেছিলেন:

> 'আমরা সবাই গ্যেটের শিষ্য তা আমরা জানি আর নাই জানি, যে কোনো উদারচিত্ত ব্যক্তি এই গুরুর সংস্পর্শে এলেই সেই অবশ্যম্ভাবী শিষ্যত্বের কথা বুঝবেন।'[৯]

ওদুদ গ্যেটের ঋণ প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করেন নি তবে তাঁর গ্যেটে-চর্চার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতিতে অনুভব করা যায় কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল গ্যেটে তাঁর চিন্তা ও মননে। গ্যেটে নিজেও বলেছেন:

> 'যিনি প্রকৃতই আমার রচনা ও চরিত্রের ধর্মগ্রাহী হয়েছেন তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে তার ফলে তিনি এক প্রকার চিত্তের অবন্ধন লাভ করেছেন'।[১০]

গ্যেটে-চর্চার মাধ্যমেই ওদুদের জীবনদর্শনের নানা প্রবণতা স্বচ্ছ ও স্ফটিকায়িত হয়েছে। প্রকৃতির অকৃত্রিমতা ও মানুষের নিরন্তর অনুসন্ধান সমীকৃত হয়েছে গ্যেটের শিল্পচৈতন্যে। ওদুদ ভেবেছেন মধ্যযুগে মানুষকে জ্ঞান করা হতো ক্ষুদ্রায়তন বিশ্ব (microcosm) হিসেবে। প্রত্যেক মানুষ এখন ক্ষুদ্রায়তন বিশ্ব কি না তা বিতর্ক ও বিচারসাপেক্ষ হলেও গ্যেটে যে একটি ক্ষুদ্রায়তন বিশ্ব তা তিনি যথার্থ বলেই মনে করেন। সর্বযুগে, সর্বকালে গ্যেটে প্রতিভা মানস উৎকর্ষের সমুন্নতিতে সমুজ্জ্বল থাকবে। এ কারণেই ওদুদের মুল্যায়ন হলো: 'গ্যেটে-সমুদ্রের হাওয়া মানস-স্বাস্থ্যের জন্য অমূল্য।'[১১]

নজরুল চর্চা ঃ

নজরুলের সাহিত্যকর্ম বিবেচনায় কাজী আবদুল ওদুদের এক ধরনের বিশ্লেষণী ও দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান। ১৯৪২ সালেই নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে নজরুল দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলের কারণে আগস্ট মাসে টেক্সট বুক কমিটির অফিস রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে অফিসটি কলকাতায় স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ওদুদ সপরিবারে রাজশাহী অবস্থান করেন। কোন কাজে কলকাতায় গেলে ওদুদ অবশ্যই নজরুলকে দেখতে যেতেন। বন্ধুত্বের দায় আবেগে, উদ্যোগে এবং কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে বহন করতে ওদুদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। নজরুলের প্রতি ওদুদের অনুরাগ ও দায়িত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪২ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সুফী জুলফিকার হায়দারকে লেখা পত্রাবলীতে।[১২]

শুধু অসুস্থ কবির প্রতি দায়বদ্ধ থেকে নয়, ওদুদ সমকালে নজরুলের বিরুদ্ধে উত্থাপিত স্তাবকতা কিংবা নিন্দার ভিতর থেকে তাঁর আত্মস্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনে প্রয়াসী ছিলেন। সমসাময়িক হলেও ওদুদের ছিল স্বকীয় নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। কবির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, তাঁর অনুভবকে চক্ষুহীন না করে বরং গভীর অন্তর্দৃষ্টির বিবেচনাবোধকেই জাগ্রত রেখেছে। নজরুলের সাহিত্যকর্ম বিচারের ক্ষেত্রে ওদুদের বুদ্ধিদীপ্ত অথচ হৃদয়গ্রাহী সংবেদ ছিল। ওদুদের নজরুল বিষয়ক গ্রন্থ *নজরুল-প্রতিভা* (১৯৪৯)। গ্রন্থের মধ্যে প্রবন্ধ রয়েছে তিনটি: 'নজরুল ইসলাম,' 'প্রতীক-প্রীতি' এবং 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ'। 'নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯৪১, যা ওদুদের *আজকার কথা* (১৯৪১) শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। অন্য দুটি প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯৪৩। রাজশাহীতে অবস্থান করেই তিনি উক্ত প্রবন্ধ দুটি লিখেছিলেন।

'প্রতীক-প্রীতি' প্রবন্ধে নজরুলের প্রতীক প্রীতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ওদুদ রেনেসাঁসের চেতনাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। সমকালে নজরুল প্রতিভা একই সঙ্গে ইসলাম-প্রীতি আর প্রতীক প্রীতি প্রয়োগের কারণে ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। স্বসম্প্রদায়ের কাছে বিরাগভাজন হয়েও নজরুল মূলত ইউরোপের রেনেসাঁস এবং ইরানের রেনেসাঁসের আলোকে ঐতিহ্যসন্ধানী এবং নতুনতর বোধে জাগ্রত। রেনেসাঁস আর রিফরমেশন (সংস্কার-আন্দোলন)-এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। রেনেসাঁসের মূল বৈশিষ্ট্য মনুষ্যত্বপ্রীতি। রিফরমেশনে একটি বিশেষ জাতি ও ধর্মপ্রীতি থাকে। ইউরোপে রেনেসাঁস আর রিফরমেশন পাশাপাশি এসেছিল। উনিশ শতকে বাঙালি হিন্দুর নবজাগরণও ছিল একই ধরনের। বাঙালি মুসলমানের ঐতিহ্যচেতনা রেনেসাঁসধর্মী না রিফরমেশনধর্মী? এ সূত্র সন্ধানে নজরুলের প্রতীক-প্রীতিকে ওদুদ মূল্যায়ন করেছেন রেনেসাঁসধর্মী হিসেবে। নজরুলের ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার ছিল সমৃদ্ধ। তিনি ভারতীয় ঐতিহ্য এবং পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য থেকে ঋণ নিয়ে সমকালের জীবনকেই তাৎপর্যময় করে তুলেছেন। নজরুলের উত্তরাধিকারের স্বরূপ বিবেচনায় মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ:

> হিন্দু ঐতিহ্য, মুসলিম ঐতিহ্য এদুয়ের সংমিশ্রণের দায়িত্ব মুসলমানেরই, হিন্দুর নয়; কেননা হিন্দুর দুই উত্তরাধিকার নয়, মুসলমানের দুই উত্তরাধিকার। ... মুসলমান যদি এই দুই অধিকার স্বীকার করে, তবে তার দ্বারা এক বড় সৃষ্টি সম্ভব- আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মন্থনদণ্ডে মন্থিত করে সে দুই সংস্কৃতিকে এক বিরাট নবসংস্কৃতিতে পরিণত

> করতে পারে। ... অপূর্ব প্রতিভা তথা প্রচুর প্রাণশক্তির অধিকার বলে নজরুল ইসলাম এই মিলন-সাধনার শরীক হতে চেয়েছিলেন।[১৩]

নজরুল জন্মসূত্রে ভারতীয় উত্তরাধিকারের আধিকারী, ধর্মসূত্রে পশ্চিম এশীয় অর্থাৎ ইসলামের অতীত ঐতিহ্যের অধিকারী। নজরুল সচেতনভাবেই ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে পশ্চিম এশীয় ইতিহাসের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। নজরুলের ঐতিহ্যপ্রীতি ও পুরাণের সম্মিলন ছিল মূলত সমকালের দর্পণে নতুন সৃষ্টি। নজরুলের কাব্যে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পুরাণ সমকালের শক্তি সঞ্চয়ের পাথেয় কিংবা হাতিয়ার। একদিকে ঐতিহ্য সৃষ্টি প্রতিভার সংস্পর্শে সমকালে নতুনবোধে উৎসারিত হয়। অন্যদিকে মানুষের সামূহিকনির্জ্ঞানে মিথ সুপ্ত অবস্থায় আর্কেটাইপ বা প্রত্নপ্রতিমারূপে বিরাজ করে যা সময়ের অভিঘাতে সমকালকেই স্পর্শ করে থাকে। নজরুলের প্রতীক প্রীতির সাথে হিন্দুর প্রতীক উপাসনার সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এক্ষেত্রে ওদুদের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ:

> নজরুলের প্রতীক-প্রীতি আর একজন হিন্দুর প্রতীক-উপাসনার মধ্যে পার্থক্য এই যে নজরুল প্রতীকের ভাবের মাধুর্য গ্রহণ করেছেন পূর্ণভাবে, কিন্তু জীবনে তিনি অরূপেরই পূজারী-যে-অরূপ নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে অনন্ত কল্যাণ প্রচেষ্টায়। তাই নজরুল একালের সর্বহারাদের কবি, নিষ্ক্রিয় দেব-পূজারী নন।[১৪]

বাঙালি মুসলমানের পূর্বপুরুষ হলো বৌদ্ধ ও হিন্দু। নবপ্রত্যয়ে জাগ্রত বাঙালি মুসলমানের জন্য পূর্বপুরুষের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অংশের উপলব্ধি অপরিহার্য। প্রতীক-প্রীতির ভিতর দিয়ে নজরুল মূলত মুসলমানদের ইঙ্গিত দিয়েছেন দূর অতীতের স্মৃতি ও পরিবেষ্টনের মাধুর্যে সঞ্জীবিত হতে। নজরুলের সহজ জীবনানন্দ বাঙালি মুসলমানের নবজীবনজিজ্ঞাসাকে রেখেছে উদ্দীপ্ত। ওদুদ ভেবেছেন হিন্দু দেবদেবীতে নজরুলের আনন্দ অর্থপূর্ণ; কেননা এই আনন্দের ভিতর সঞ্চারিত হয়েছে জন্মভূমির সাথে যুগযুগান্তরের যোগ। হিন্দুপ্রীতি থেকেই নজরুল তার কাব্যকে সংযুক্ত করেন নি মিথ বা পুরাণের সঙ্গে। রেনেসাঁসের চেতনায় বাঙালির নৃবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য, প্রত্নপ্রতিমা ও ঐতিহ্যে সংযুক্ত হয়েই নজরুলের কাব্যে আদিম দেবতারা উপস্থিত থেকেছেন পুনঃজন্ম বা নবজন্মের বোধে। তবে এ পথের বিপদ সম্পর্কে ওদুদ সতর্ক ও সচেতন; মানুষের অভিজ্ঞান সৃষ্টিধর্মী না হলে, দুর্বল অভিজ্ঞতার কারণে সে হতে পারে অনুকরণপ্রিয় ও অতীতের পূজারী। ওদুদ ভাবেন জীবনের পথ ভয় ও অনুকরণের পথ নয় বরং প্রেমের পথ। এ ক্ষেত্রে জগতের সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব আহরণ অনিবার্য। নজরুলের প্রতীক-প্রীতি সৃষ্টিশীল। তাঁর ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা প্রকৃতি ও মানুষের সাথে সন্নিহিত। নজরুলের সৃজনধর্মী ঐতিহ্য চেতনা সম্পর্কে হুমায়ূন কবিরের মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য:

> ঐতিহ্যের লঙ্ঘন তিনি করেন নি- পুরাতন পুঁথি সাহিত্যের আবহাওয়ায় লালিত বলে বাঙলার বিপুল মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সহজ আত্মীয়তা। ভাষা ও ভঙ্গীতে নজরুল ইসলামের কাব্যে যে বিপ্লবধর্ম, পুরাতন ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই তার পরিচয় মেলে।[১৫]

নজরুল-প্রতিভা গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ ছিল 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ'। এখানে ওদুদ কবির আত্মমহিমার তাত্ত্বিক কারণ সন্ধানে সত্যাশ্রয়ী। ওদুদ মনে করেন

ব্যক্তিত্ব দুরবগাহ। কবির আত্মমহিমা-বোধ উন্মোচনে ওদুদের বক্তব্য কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত। অল্প বয়সেই নজরুল যাত্রার দলে গান করে বেড়াতেন। লেটোর দলের সংস্রব থেকেই তার বেদুয়িনী মানসিকতার উদ্ভব। যাত্রাদলের সংস্পর্শেই নজরুলের হিন্দু-পুরাণের সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্য ঘটে। হিন্দু-পুরাণ থেকেই তাঁর 'সোহহ্‌ম' তত্ত্বের লাভ বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম করাচিতে বাঙালি পল্টনে থাকাকালীন হাফিজ-ভক্ত পশ্চিমী মুসলমানের সঙ্গে সংস্পর্শের সূত্রে সুফী-তত্ত্ব 'আনাল হক' লাভ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। বস্তুত হিন্দু-পুরাণের 'সোহহ্‌ম' তত্ত্ব এবং সুফীবাদের 'আনাল হক' তত্ত্ব নজরুলের আত্মমহিমা প্রকাশের উৎস, যা কবিকে প্রাণিত করেছিল; এবং তিনি উদ্দীপ্ত রেখেছিলেন জাতিসত্তাকে। তবে এই তত্ত্বের প্রভাবে নজরুলের কবিতা তত্ত্বময় ও উচ্ছ্বাসময় হলেও তা বাণীর ঔজ্জ্বল্যে ম্রিয়মান ছিল। এজন্যই পাঠক-সমালোচক নজরুলকে যথেষ্ট মর্যাদা দিতে চান নি। নজরুলের মর্যাদা ও কাব্যচেতনার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক সম্পর্কসূত্র নির্ণয়ে ওদুদ গভীর পর্যবেক্ষণে উৎসাহী:

> দুর্লভ আত্মমহিমা বোধ তার রচনায় যে স্বাক্ষর রেখে গেছে এজন্য অনন্ত ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি একজন মর্যাদাবান কবিই। ...প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিদ্রোহ, সাম্যবাদ, হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়, সবের মূলে তাঁর আত্মমহিমাবোধ- এই আত্মমহিমাবোধ থেকে এইসব ভাব বিশেষ রস ও রূপ পেয়েছে।[১৬]

মুক্তপ্রাণ আবদুল ওদুদের 'রাজশাহী পর্ব' তাঁর জীবনকালের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সময়ের তাঁর সৃষ্টিকর্মকে শাস্ত্র অনুসরণের চেয়ে মনুষ্যত্ব অর্জনের দিকে অধিক ধাবিত হতে দেখা যায়। তৎকালীন মুসলমান সমাজের সমালোচনা তাঁর উদ্দেশ্য থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারে নি। কারণ ওদুদ শাস্ত্রের শরণ নিয়েও আস্থা রেখেছেন ব্যক্তিক বিচারবোধে, যুক্তিবাদে। সেজন্যই ওদুদ চর্চার মাধ্যমে তাঁর উত্তরপুরুষেরা সমৃদ্ধ হন অসাম্প্রদায়িক চেতনায়, বিকাশ ঘটান মানবিক মূল্যবোধের এবং জীবনকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার প্রয়াস পান।

তথ্যসূচি:

---

১. আবদুল লতিফ চৌধুরী, 'স্মৃতিকথা: কাজী আবদুল ওদুদ', আজিজুল কাদের সম্পাদিত, ঢাকা, হাবাসপুর কাশিমবাজার রাজ উচ্চ বিদ্যালয় প্লাটিনাম জুবিলী স্মরণিকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৫

২. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *তে হি নো দিবসা*, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৪, পৃ. ২১৩-২১৪

৩. আবদুল হক, *চেতনার এলবাম এবং বিবিধ প্রসঙ্গ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৪৪

৪. কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, খোন্দকার সিরাজুল হক সম্পাদিত, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ২

৫. ফাউস্ট প্রথম খণ্ড, আহমদ ছফা অনূদিত, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০ পৃ. ৩০

৬. কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১২ ক. 'আমরা কুশলে রাজশাহী এসেছি। ... কবির (নজরুলের) সংবাদ জানাবেন। ... কবির খবর সত্বর দিতে ভুলবেন না।' কাজী আবদুল ওদুদের পত্রাবলী, আবুল আহসান চৌধুরী সংকলিত ও সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃ. ৭১

খ. কবির (নজরুলের) জন্য এ মাসে পঞ্চাশ টাকা পাঠালাম। বাকী পঞ্চাশ টাকা সামনের মাসে পাঠাব। ... কবির খবর দেবেন। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

১৩. মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনাবলী, সৈয়দ আবুল মকসুদ সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ১৪৭

১৪. কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৮

১৫. হুমায়ূন কবির, "বাংলার কাব্য ও নজরুল ইসলাম", নজরুল সমীক্ষণ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, ঢাকা, আনন্দ প্রকাশ, ১৩৭৯, পৃ. ২৮

১৬. কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৯

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র সাহিত্যকর্ম: প্রসঙ্গ পীর-দরবেশ

আহম্মদ শরীফ*

সারসংক্ষেপ: খুব কম লিখে বেশি আলোড়িত ও সমালোচিত হয়েছেন এমন কয়েকজন সাহিত্যিকদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) অন্যতম। মুসলমান সমাজ বিশেষ করে অশিক্ষিত, ভণ্ড পীর-দরবেশে আস্থাশীল, অন্ধবিশ্বাসে পূর্ণ মুসলিম সমাজই ছিল তার লেখার বিষয়বস্তু। শেষ জীবনে অবস্থান করেছেন প্রবাসে কিন্তু দেশ ও দেশের মানুষের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি কখনও। বোধ করি এই দায়বদ্ধতা থেকে তার লেখায় উঠে এসেছে মুসলিম সমাজের কুসংস্কারে পূর্ণ নানা দিক। আধুনিক জীবনে ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রভাব, ব্যক্তি মানুষের মুক্তি, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এসবই উঠে এসেছে তার লেখায়। তাছাড়া তাঁর সাহিত্যকর্মে বারবার এসেছে পীর-দরবেশ প্রসঙ্গ। গভীর জীবনবোধ, অন্তর্লোকের রহস্য অনুসন্ধান স্পৃহা, ব্যক্তিজীবন ও সমাজ সমস্যার পটে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার, অস্তিত্ববাদী দর্শন, চেতনাপ্রবাহরীতি প্রভৃতি মতবাদ বা দর্শন প্রযুক্ত হয়েছে তাঁর কথাসাহিত্যে। এ কারণেই বাংলা সাহিত্যে তিনি পরিচিতি পেয়েছেন এক স্তম্ভপ্রতিম কথাশিল্পী হিসেবে।

বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এক বিশেষ আসনে সমাসীন। মাত্র তিনটি উপন্যাস, দুটি গল্পগ্রন্থ আর চারটি নাটক লিখে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন তিনি। তাঁর জন্ম ষোলশহর, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ এবং মৃত্যু প্যারিস, ফ্রান্স। জন্ম-মৃত্যুর এই কালিক দূরত্ব তাঁর সাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে এ কথা বলা যায় অনায়াসে। বিশ্বের নানা দেশে তিনি ঘুরেছেন চাকরির সুবাদে। তাই তাঁর সাহিত্যে আধুনিক অনুষঙ্গের অনেকগুলোই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। খুব অল্প পরিমাণ লিখেও বেশি সমালোচিত হয়েছেন তিনি তাঁর সময়ে এবং বর্তমানেও। মাতৃ এবং পিতৃকুল- উভয় দিক থেকেই তাঁর পরিবার ছিল শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত। 'ওয়ালীউল্লাহর পিতা সৈয়দ আহাম্মদউল্লাহ (১৮৯৩-১৯৪৫) ছিলেন ইংরেজিতে এম.এ. এবং পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা।'[১] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র মাতামহও ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, তিনি বাল্য ও কৈশোরে তাঁর বড় মামা খানবাহাদুর সিরাজুল ইসলাম এবং তাঁর বড় মামী রাহাত আরা বেগম এর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তাঁর বড় মামী ছিলেন উর্দু লেখিকা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র মানস গঠনে তাঁদের ভূমিকা ছিল বেশি। তিনি ছিলেন একজন আধুনিক মানুষ। পোশাকে-আশাকে, মনে প্রাণে আধুনিক। বিয়েও করেছিলেন একজন বিদেশিনী অ্যানা মারিকে। জীবনের অনেকটা সময় তিনি কাটিয়েছেন সভ্যতার লীলাভূমি ফ্রান্সে। 'শেষদিককার প্রায় সব গল্প-উপন্যাস-নাটক প্যারিসে বসেই লেখা।'[২] আধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, আধুনিক রাষ্ট্রে বসে লিখলেও বাংলাদেশের অখ্যাত চাঁদপরা গ্রাম, মহব্বত নগর গ্রাম, কুপন নদী, বাকাল নদী প্রভৃতি হয়েছে তাঁর লেখার কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি বিশেষ করে মুসলমান সমাজকে নিয়ে লিখেছেন তিনি। কাজি আফসারউদ্দিনকে লেখা একটি পত্রে তাঁর সে মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

> ...I want to write মুসলমান সমাজ নিয়ে -আমার সমগ্র মনের ইচ্ছে সেদিক পানে। এও একরকম passion থেকে সৃষ্ট। মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে আমরা কেউ হয়তো অজ্ঞ নই; কিন্তু অধঃপতনের এই যে একটা চূড়ান্ত অবস্থা-এই অবস্থা নিয়ে লিখে আমার লেখা কলঙ্কিত(?) করতে চাই।[৩]

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

মূলত তিনি মুসলমান সমাজের নানা দিক তাঁর লেখার মধ্যে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে যে ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ভণ্ডামি, পীরবাদ, পীর-মুরিদ সম্পর্ক, দরবেশ প্রভাব ইত্যাদি তাঁর লেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে বারবার।

> ধর্মাশ্রিত চিন্তা-চেতনার সিঁড়ি বেয়ে মুসলমান সম্প্রদায় কখনো কখনো যেমন গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে বিশ্বের বহু মানুষের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে তেমনি কখনো কখনো মুসলমানেরা ধর্মোন্মাদ হয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ডেকে এনেছে দারুণ বিপর্যয়।[৪]

এই বিপর্যয় মুসলমান সমাজে একদিনে সূচিত হয় নি। এর জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণই ছিল মুখ্য । বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ক্ষমতার পালাবদলে অনেক শাসকই এদেশের ক্ষমতা দখল করেছে। ক্ষমতা দখলের এই পালাবদলে গুপ্ত শাসন থেকে শুরু করে ইংরেজ শাসনামল পর্যন্ত অসংখ্য শাসক দল এসেছে এদেশের ক্ষমতায়। এরই ধারাবাহিকতায় '১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার-উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী নদীয়ার বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করেন।'[৫] দীর্ঘ 'ছয়শ' বছরের মতো সময় ধরে এ দেশে চলেছে মুসলিম শাসন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের হস্তগত হয়। এ দেশীয় হিন্দুগণ ইংরেজদের সাথে নানা সহযোগিতা করে শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানে এগিয়ে যেতে থাকে কিন্তু মুসলমানগণ রাজ্যহারা ও সম্পদহারা হয়ে অভিমানবশত ইংরেজি ও বাংলা শেখার ব্যাপারে অনাগ্রহী হয়ে থাকে। 'ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতার কারণ তিনটি:

> ক) মুসলমান সমাজের আর্থিক বিপর্যয়;
>
> খ) শাসক গোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ মনোভাব ও
>
> গ) মুসলমান সমাজের একটি অংশের রক্ষণশীলতা।[৬]

পলাশীর যুদ্ধের পর প্রথমে সামরিক বিভাগে মুসলমানদের আধিপত্য খর্ব হয়। এর পর বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগসমূহের পুনর্গঠনের ফলে ফৌজদারী, শিকদার, কাজী, মুফতী, প্রভৃতি উচ্চপদস্থ মুসলিম সরকারি কর্মচারীগণ চাকুরী হারাতে থাকেন। পরবর্তীতে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রর্বতনের ফলে মুসলমানদের ওপর মহাঘাত আসে। এবং মুসলমানদের আর্থিক অবস্থায় বিপর্যয় দেখা দেয়। আবার ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ৭ মার্চ তারিখে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তিত হলে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব বেড়ে যায়। ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই হিন্দু সমাজ ইংরেজি ভাষা আয়ত্ব করার চেষ্টা করতে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের চেষ্টা এবং ইংরেজদের সহযোগিতার ফলে হিন্দুগণ অল্পদিনেই বেশ এগিয়ে যায়। এর প্রমাণ হিসেবে দেখা যায় ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাবের ফলেও মুসলমানরা ইংরেজদের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারে নি। এই রক্ষণশীলতার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় পর পর দুটি সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে বাংলাদেশে। একটি হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে 'ফারাজী' আন্দোলন অন্যটি 'ওহাবী' আন্দোলন।

> আদর্শগত দিক থেকে ফারায়েজীরা সরাসরি ওহাবীদের অন্তর্ভুক্ত না হলেও তাদেরই সমগোত্রীয়। ফারায়েজী ও ওহাবীদের লক্ষ্য এক– তা ধর্মসংস্কার এবং আদি ইসলামের পুনঃসংস্থাপন।[৭]

'ইসলাম ধর্মের অন্ধ গোঁড়ামি উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে কি ভয়ংকর পরিণাম ডেকে এনেছিল তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ওহাবী আন্দোলন। ইংরেজ শাসনকে শত্রুর শাসন ফতোয়া দিয়ে ওহাবীরা দারুণ উন্মাদনায় সদ্য-প্রবর্তিত ও ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।'[৮] ফারায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহও ব্রিটিশ শাসিত বাংলাদেশকে ধর্মীয় জীবন যাপনের অনুপযোগী বলে মনে করতেন। তাঁর মতে এই বিধর্মী শাসিত (দারুল-হরব) দেশে জুমা ও ঈদের নামাজ সিদ্ধ নয়। অধিকন্তু হিন্দু সমাজের মতো সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাবও মুসলমান সমাজে ঘটে নি। শিক্ষার অভাবের ফলে তাই মুসলমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নানা কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় গোঁড়ামি বাসা বাধতে থাকে।

> মুসলমানদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা খসে গেলে শিক্ষা ও তবলিগের অব্যবস্থার ফলে তাদের মধ্যে এ অন্ধ মানসিকতা ও কুসংস্কার দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে।[৯]

এভাবে মুসলমানগণ প্রকৃত ধর্ম থেকে সরে গিয়ে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। মুসলমানরা যে কত বড় অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে এখনও রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় দেশের রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা হাজারো দরগা, মাজার প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দিলেই। এখনও তিনশ ষাট আউলিয়ার দেশ (সিলেট), বার আউলিয়ার দেশ (চট্টগ্রাম), প্রভৃতি নানা স্থানে জানা অজানা অনেক মাজার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বলাবাহুল্য এইসব মাজার কেন্দ্রিক ধর্মব্যবসায় অধিকাংশই ভণ্ড-প্রতারকের আশ্রয়স্থল এবং একশ্রেণির লোক এইসব মাজারকে কেন্দ্র করে তাঁদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে আজও।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র গল্প-উপন্যাস-নাটক সবগুলোর বিষয়ই গ্রাম। বাংলার পল্লীর কৃষিভিত্তিক সমাজের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায় তাঁর লেখাতে। পল্লীর মুসলমানের জীবনে ধর্মের প্রভাব ব্যাপক। 'কেবল *লালসালু* নয়, *চাঁদের অমাবস্যা* উপন্যাসে এবং *বহিপীর* ও *তরঙ্গভঙ্গ* নাটক-দু'টিতেও দেখা যায় ধর্মের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।'[১০]

পলীর মানুষ সাধারণত সহজ ও সরল। এই সমস্ত সহজ সরল ধর্মভীরু মানুষের সরলতাকে কাজে লাগিয়ে একশ্রেণির মোল্লা, মোতাওয়াল্লি, ভণ্ডপীর ধর্ম ব্যবসা করে চলে। ধর্মকে তারা বর্ম হিসেবে গ্রহণ করে ইহলৌকিক আরাম আয়েশের কাজে লাগায়। *লালসালু* উপন্যাসে দেখা যায় এক শস্যহীন জনবহুল এলাকার চিত্র। যেখানে 'শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।' জনবহুল দেশটা কেমন মরার দেশ। আর এই মরার দেশের লোকগুলোর অবস্থাও হাড় গিলগিলে। কিন্তু তারা ছোটবেলা থেকেই কোরানের হাফেজ হয়। এমনই এক এলাকা থেকে মজিদ ভাগ্যান্বেষণে ছুটে যায় গারো পাহাড়ে। সেখানে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য না এলে হাওয়াশূন্য, নিরাকপড়া এক স্তব্ধ দুপুরে সে উপস্থিত হয় মহব্বতনগর গ্রামে। সেখানে নাটকীয়ভাবে প্রবেশের পর এক বাঁশঝাড়ের পাশে জীর্ণ পরিত্যক্ত কবরকে কথিত 'মোদাচ্ছের' পীরের মাজার বলে চালিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় গ্রামের লোকদের '-আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ, মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?'[১১] বলেও সে গালাগাল দিতে ছাড়ে না। এর পর 'জঙ্গল সাফ হয় ইট, সুরকি-সালু কাপড়ে পরিচর্চিত হয়ে জরাজীর্ণ, অজ্ঞাত ও অপরিচিত কবরটি হয়ে ওঠে মোদাচ্ছের পীরের মাজার। স্মরণীয় আরবি 'মোদাচ্ছের' শব্দের অর্থ অজ্ঞাত, অপরিচিত, ঠিকানাহীন। কিন্তু গ্রামবাসীরা মজিদ কথিত 'মোদাচ্ছের পীর'-এর অর্থও বোঝে নি।'[১২] এর পর মজিদের উন্নতি আর উন্নতি। বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আওলা-ঘর। এভাবেই ঝড়ের

মুখে উড়ে চলা খড়কুটো সদৃশ মজিদের প্রতিষ্ঠা ঘটে মহব্বতনগর গ্রামে। এ উপন্যাসে এমন এক গ্রামীণ সমাজের চিত্র পাওয়া যায় যেখানে পূর্ববাংলার কৃষিভিত্তিক শ্রমনিষ্ঠ, সরল সহজ ধর্মপ্রাণ মুসলমান সমাজের মানুষ বিভ্রান্ত হয় ধর্ম ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রতি পদে পদে:

> এইসব মাজার ব্যবসায়ীরা গ্রামের সাধারণ মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস ও সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের সম্মোহিত ও বিভ্রান্ত করে। এই ধরনের তৎপরতার স্বরূপ উন্মোচিত করা হয়েছে মহব্বতনগর গ্রামে ধর্ম-ব্যবসায়ী মজিদের প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের ইতিবৃত্ত রচনা করে।'[১৩]

মহব্বতনগর গ্রামের লোকদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছিল না। আর তাই তারা মজিদের ভণ্ডামি ধরতে পারে নি। মজিদ যে ধর্মকে আশ্রয় করে মহব্বতনগর গ্রামের সম্রাটে পরিণত হয় তার মূলে উক্ত জনবসতিপূর্ণ এলাকার লোকদের অশিক্ষাই দায়ী। গ্রামের চৌম্বক ব্যক্তিত্ব মজিদকে সবাই ভয় পায়। বস্তুত মজিদ তাঁর চাতুরি দিয়ে গ্রামের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হয়েছিল। এই জন্যই অনেক জমিজমার মালিক খালেক ব্যাপারিও মজিদের কথায় তাঁর দীর্ঘ দিনের বিবাহিত স্ত্রী আমেনাকে তালাক দিতেও দ্বিধা করে না। মজিদের পথে যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ধূর্ত মজিদ সুকৌশলে তাদের সবাইকে শাস্তি দিয়েছে। তাহের কাদেরের বাপ মজিদের পীরত্বে অবিশ্বাস করলে সে তাকে ক্ষমা করে নি। সে কৌশলে এক ঝড় জলের রাতে তাকে চিরদিনের জন্য গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে। আমেনা বিবি মজিদের পীরত্বে অবিশ্বাস করে সন্তান কামনায় আওয়ালপুরের পীরের কাছ থেকে পানি পড়া খাওয়ার বাসনা প্রকাশ করলে মজিদ তাকেও ক্ষমা করে নি। আর তাই

> যে আমেনা বিবি হঠাৎ সন্তান-কামনায় অধীর হয়ে উঠেছিল সে-ই সমস্ত কামনা-বাসনা বিবর্জিত একটা স্তব্ধ, বজ্রাহত মন নিয়ে সেদিনের পালকিতে চড়ে বাপের বাড়ি রওনা হয়। বহুদিন বাপের বাড়ি যায় নি। তবু সেখানে যাচ্ছে বলে মনে কিছু আনন্দ নেই। পালকির ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায় চোখ মেলে নাক বরাবর তাকিয়ে থাকে বটে কিন্তু তাতে অশ্রুও দেখা যায় না।'[১৪]

আবার মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে মজিদ তাকেও নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে গ্রামের ভরা মজলিসে। আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠা হলে গ্রামের লোক শিক্ষিত হবে আর তার সমস্ত ভণ্ডামি সবার কাছে ধরা পড়বে এই ভাবনা মজিদকে বিচলিত করেছে। তাই গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠার বদলে মসজিদ তৈরির প্রস্তাবই গৃহীত হয়। তবে এসব কিছু করলেও সে কিন্তু মনে মনে খোদার কাছে তার গুণার জন্য মার্জনা চান। 'খোদার বান্দা সে নির্বোধ... ।'

শুধু মজিদই নয়। এরকম শত শত মজিদ গ্রাম বাংলার সহজ সরল লোকগুলোকে ধোকা দিয়ে তাদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ধর্ম ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে আজও। বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামের মতো এ গ্রাম সমাজেও মানুষ অদৃশ্য অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাসী। পীরভক্তি এ সমাজের আরেকটি দিক। পশ্চিমের উর্দু ফারসি শিক্ষাপ্রাপ্ত ও জোব্বা পরিহিত পীরদের আগমন ঘটে ফসল ওঠার পর। কিন্তু যে বার আকাল পড়ে সেবার অতিভক্ত মুরিদের বাড়িতে পীর সাহেব দু একদিনের বেশি থাকার সাহস পান না। আওয়াল পুরে আগত পীর এমনই এক সুযোগ সন্ধানী পীর।

আওয়ালপুরের কথিত পীর যে মজিদের মতোই ভণ্ড তা বলাবাহুল্য। মরা মানুষ জিন্দা করা, সূর্যকে ইচ্ছে মতো ধরে রাখা প্রভৃতি কেরামতি আওয়ালপুরের পীর সম্পর্কে প্রচলিত থাকার

কারণে মহব্বতনগর গ্রামের লোক দলে দলে আওয়ালপুরে উপস্থিত হয়েছে। পীর সাহেবের 'বাতরস-স্ফীত পদযুগলে একবার চুমু দেবার আশায়' দলে দলে লোক ছুটে চলে আওয়ালপুরে। পদচুম্বন অবশ্য সবার ভাগ্যে জুটে না, 'ভাগ্যবান যারা তারা পীর সাহেবের হাতের স্পর্শ হতে শুরু করে দু-এক শব্দ আদেশ উপদেশ বা তামাক-গন্ধ-ভারি বুকের হাওয়াও লাভ করে।'[১৫]

পীর দরবেশদের প্রতি ভীতি ও ভক্তি এসমাজের আর একটি চেহারা তাই যখন আওয়ালপুরের পীর 'সোহবতে সো'য়ালে তুরা সো'য়ালে কুনাদ (সুসঙ্গ মানুষকে ভালো করে)' বলে ওয়াজ করেন তখন পীরের আশীর্বাদের জন্য আসা জামায়েতের অর্ধেক লোকই সেটার অর্থ না বুঝে কেঁদে ফেলে। আবার এসমস্ত পীরের কাণ্ডকারখানাও অনেক সময় হাসির উদ্রেক করে। ধর্মভীরু লোকেরা যখন পীরের একটু স্পর্শ পাওয়ার আসায় পাগলের মতো ঘিরে ধরে পীরকে আর দিশাহারা পীর 'হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যুবকের সাবলীল সহজভঙ্গিতে মাথার ওপরে গাছটার ডালে উঠে গেলেন। দেখে হায়-হায় করে উঠল পীর সাহেবের সাঙ্গপাঙ্গরা।...পীর সাহেব অবশ্য ডালে বসে তখন দিব্যি বাতরস-ভারি পা দোলাচ্ছেন।'[১৬] বাংলাদেশের নিরক্ষর সাধারণ মানুষেরা ধর্ম ও ধর্মসম্পৃক্ত ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে মনে ভয় ও ভক্তি পোষণ করে এ জন্যই এদেশে পীরপূজা এবং মাজার পূজার এমন আধিক্য। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সে বিষয়টিকে আমাদের মাঝে উপস্থাপন করেছেন তাঁর উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে:

> এ উপন্যাসে প্রকৃত ধর্মের জায়গায় ধর্ম-ব্যবসার স্বরূপ সূক্ষ্মভাবে উদঘাটিত করে তিনি দেখিয়েছেন যে, বিবেক ও মানবিকতা-বর্জিত ধর্মের বেসাতি মানুষের জীবনকে কতখানি অর্থহীন ও অন্তঃসারশূন্য করে তোলে। তিনি আরো দেখিয়েছেন - বিবেকহীন, স্বার্থসন্ধানী মানুষেরা ধর্মের ধ্বজা ধরে সাধারণ মানুষকে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ হাসিলের হাতিয়ারে পরিণত করে।[১৭]

চাঁদের অমাবস্যা উপন্যাসের মূল বিষয় ব্যক্তির মনোজাগতিক স্তরের বিশ্লেষণ হলেও কাহিনীর সূত্রপাত ঘটে কথিত দরবেশ (!) কাদেরের ভণ্ডামির মধ্যে দিয়ে। *লালসালু*র মজিদের মতো বিস্তৃত পরিসরে না এলেও এ উপন্যাসে কথিত দরবেশ কাদেরের চরিত্রের বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে। কাদের দাদাসাহেবের কনিষ্ঠ ভাই। অনেকটা উগ্রস্বভাবের:

> কিছুদিন সে ইস্কুল করে, কিন্তু ইস্কুলের চার দেয়ালের শক্তি কি তাকে দু-মিনিটের জন্যেও কয়েদ করে রাখে! সে যে বিদ্রোহী ছেলে তাতে সন্দেহ রইল না। কেবল কিসের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ সে-কথা কেউ বুঝল না।[১৮]

অবশ্য দাদাসাহেবের বক্তব্য 'দরবেশের বিদ্রোহ সাধারণ লোকে কী করে বোঝে?' এর পর দাদাসাহেব তাকে শিক্ষাদীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু 'দরবেশকে কে কী শেখাতে পারে?' এহেন স্বল্পভাষী দরবেশ তিন বছর আগে বিয়ে করে। 'কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে আজ তার সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ। অনেক সময় দীর্ঘকাল তাদের মধ্যে কথালাপ হয় না।'[১৯] কাদেরের দরবেশ লাভের ইতিহাসও দাদাসাহেব ছেলেদের মাঝে গর্ব করে বলেন,

> একদিন মধ্যরাতে সে জেগেই শুয়েছিল, হঠাৎ বাড়ির দেউড়ির কাছে থেকে কে যেন তাকে ডাকল। অপরিচিত কণ্ঠস্বর, তবু কোন বন্ধু যেন ডাকল তাকে। ধড়মড়িয়ে উঠে দরজার খিল খুলে সে বেরিয়ে গেল। ... সে রাতে বুজুর্গের সঙ্গে তার প্রথমবার সাক্ষাৎ হয়।[২০]

প্রথম সাক্ষাতের পর প্রতি রাতে প্রায়ই বুজুর্গের সাথে কাদেরের দেখা হয়। সাধারণ লোকজন এই রহস্যের ভেদ না জানলেও দরবেশ বলে পরিচিত কাদের তার দরবেশি ছদ্মবেশের আড়ালে সমাজে অপকর্ম করে চলে। 'গ্রন্থের প্রথম দিকে কাদেরের চরিত্র অস্পষ্ট ও রহস্যময় বলে মনে হলেও সে যে তথাকথিত দরবেশি লেবাসের আড়ালে একজন নরপশু সেটি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।'[২১] বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও কাদের রাতের অন্ধকারে কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য ঘুরে বেড়ায়। জ্যোৎস্নালোকিত একরাতে কাদের তার কাম লালসা পূর্ণ করার জন্য বাড়ির বাইরে বের হলে গৃহাশ্রিত শিক্ষক আরেফ আলীর 'বিস্ময়ের অবধি থাকে না।' গৃহশিক্ষকের মনে প্রশ্ন 'এত রাতে এমন দ্রুতগতিতে কোথায় যাচ্ছে সে?.. তখন যুবক শিক্ষকের চোখ জ্যোৎস্নায় ঝলসে গেছে, তাতে ঘুমের নেশা পর্যন্ত নাই।'[২২] যুবক শিক্ষক সিদ্ধান্ত নেয় সে কাদেরকে অনুসরণ করবে। কেননা 'বড়বাড়ির দাদা সাহেব বলেন, কাদের দরবেশ।'[২৩] কাজেই দরবেশ কাদেরের দরবেশি দেখার জন্য আরেফ আলী তাকে অনুসরণ করে। কিন্তু অচিরেই তাকে হারিয়ে ফেলে। অতঃপর নারীকণ্ঠের কান্না এবং 'বাঁশঝাড়ের মধ্যে আলো-আঁধার। সে আলো-আঁধারের মধ্যে একটি যুবতী নারীর মৃতদেহ। অর্ধ-উলঙ্গ দেহ, পায়ের কাছে এক ঝলক চাঁদের আলো।'[২৪] প্রথমে দ্বিধান্বিত হলেও পরে আরেফ আলী বুঝতে পারে কাদেরই মৃত তরুণীটির হত্যাকারী। এবং সে আরও আবিষ্কার করে এজন্য কাদেরের কোন অনুশোচনাও নেই। অবশেষে আরেফ আলী মনোলোকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং কাদের 'আত্মীয়-স্বজন, ধর্ম-সমাজ ও আইনের রক্ষকদের বশীভূত ও হাত করে হত্যার সমস্ত দায়ভার সে চাপিয়ে দেয় হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ও সাক্ষী নিরীহ স্কুল শিক্ষক আরেফ আলীর ওপরে। শাস্তির দায় এড়িয়ে সসম্মানে দরবেশ হিসেবে সে বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকে। অত্যন্ত ইঙ্গিতময় বর্ণনার মধ্যে দিয়ে ওয়ালীউল্লাহ স্বার্থান্বেষী মহলের এই কূটকৌশলকে প্রকাশ করেছেন। এবং তার মাধ্যমে আমাদের সমাজের ধর্ম ও আইনের অক্ষমতা ও অসারতা যে কতখানি তা স্পষ্ট করে তুলেছেন।'[২৫] *লালসালুর* মজিদ এবং 'চাঁদের অমাবস্যা'র দরবেশ কাদের দুজনেই ভণ্ড। মজিদের ভণ্ডামি চলে সালু কাপড়ে আবৃত মাজারের আড়ালে আর দরবেশ কাদেরের ভণ্ডামি চলে দরবেশ নামের আড়ালে। দুটি উপন্যাসেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ গ্রামীণ জনসমাজে ইসলাম-ব্যবসায়ীদের এবং ভণ্ড দরবেশের দৌরাত্ম্যের স্বরূপকেই উন্মোচিত করেছেন।

ওয়ালীউল্লাহ্'র উপন্যাসের মতো গল্প-নাটকেও পীর-দরবেশ, মৌলভী প্রসঙ্গ এসেছে বার বার। *বহিপীর* নাটকে বহিপীর, *তরঙ্গভঙ্গ*-এ মৌলভি আবদুস সাত্তার এবং বারিশ পীর, *সুড়ঙ্গ* নাটকে ফকির, *গ্রীষ্মের ছুটি* গল্পে আম মৌলবি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য এই সমস্ত পীর-দরবেশ মৌলবির অধিকাংশই ভণ্ড, প্রতারক, প্রবঞ্চক। *বহিপীর* নাটকের বহিপীর ধরতে গেলে কোন অভিনব চরিত্র নয়, কেননা এরকম চরিত্র আবুল মনসুর আহমদের রচনাতে অনেক রয়েছে। তাঁর জবানীতেই তাঁর নামের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় 'আমি কথাবার্তা বিলকুল বহির ভাষাতেই করিয়া থাকি।...বহির ভাষাই আমার একমাত্র জবান।'[২৬] বহিপীরের মুরিদ দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বহিপীর যে 'বহির' ভাষাতে কথা বলেন তার দুটি কারণ, প্রথমত দেশের নানা স্থানে তার মুরিদ হওয়ায় এক স্থানের ভাষা অন্যস্থানের মুরিদগণ বোঝে না। দ্বিতীয়ত মানুষের মুখের ভাষাকে তিনি পবিত্র মনে করেন না। তাঁর ধারণা শুধু 'বহির' ভাষাতেই খোদার কাছে বাণী পৌছানো যায় কেননা 'কথ্য ভাষা হইল মাঠ-ঘাটের ভাষা, খোদার বাণী বহন করার উপযুক্ততা তাহার নাই।'[২৭] ভাষা সম্পর্কে এহেন মূর্খতা বহিপীরের জ্ঞানের স্বল্পতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আর বহিপীরের মুরিদ হওয়ার জন্য 'লোকেরা দলে দলে আসিয়াছে, কেহ কাঁদিয়াছে, কেহ ধন-সম্পদ উজাড় করিয়া আমার পায়ে ঢালিয়া দিয়াছে।'[২৮] আর সে মুরিদদের জন্য বহিপীরের এমনই মায়া যে বহিপীর ইচ্ছে করলেও 'মোজাহেদ' হতে পারেন নি। এ দেশে পীর

দরবেশদের কথা ধর্মভীরু লোক বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়। পীরদের প্রতি সাধারণ লোকের ভয় কাজ করে, তারা বিশ্বাস করে পীর-দরবেশ নাখোশ হলে খোদাও তাদের ওপর নারাজ হবেন। তাই হাশেম যখন তাহেরাকে বহিপীরের হাতে তুলে দিতে চায়নি তখন খোদেজা বলেছে 'তাঁর না-পছন্দ কাজ করে নিজের ঘাড়ে তাঁর বদদোয়া তুলে নিবি নাকি?'[২৯] বৃদ্ধ ও বিপত্নীক বহিপীরের মান-সম্মান, সম্পদ সবই আছে কিন্তু তাঁর মনে শান্তি নেই। এই অশান্তির কারণ তিনি তাঁর একজন ভক্ত মুরিদের তরুণী কন্যাকে (তাহেরা) বিয়ে করেন কিন্তু বিয়ের রাতেই তাঁর স্ত্রী উধাও হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে বহিপীর এবং তাহেরা দুজনেই আশ্রয় পায় রেশমপুরের জমিদার হাতেম আলীর বজরায়। বহিপীর তাঁর স্ত্রী তাহেরাকে ফিরে পেতে চান কিন্তু তাহেরা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত তবুও বৃদ্ধ পীরের সাথে কিছুতেই ঘর করতে রাজি নয়। মজিদের মতো বৃদ্ধ বহিপীরও অবচেতনায় লালন করছে কামজবাসনা–

> আমার প্রথম স্ত্রীর এন্তেকাল হয় চৌদ্দ বৎসর আগে। ... আমার সন্তান-সন্ততিও নাই, দেখাশুনা করিবার জন্য এ হকিকুল্লাহ আছে। কিন্তু সে আর কত করিতে পারে। দেখিলাম, বিবাহ করাটাই সমীচীন হইবে। অতএব আমি নিমরাজি হইতেই বাকি কার্যের ভার আমার পেয়ারা মুরিদ নিজের হাতেই গ্রহণ করিলেন।[৩০]

শেষ পর্যন্ত বহিপীর হাতেম আলীর জমিদারি রক্ষা করার ভার নিয়েছে কিন্তু বিনিময়ে তাহেরাকে তাঁর সাথে ফেরত পাঠাতে হবে। নাটকের শেষে দেখা যায় হাশেম আলী তাহেরাকে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সব কিছু জেনেও বহিপীর মজিদের মতো প্রতি হিংসাপরায়ণ হতে পারেন নি। বহিপীরের এ ব্যাপারে মন্তব্য:

> তাহারা গিয়াছে, যাক। তাছাড়া তাহারা তো আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যাইতেছে না। তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে।[৩১]

লালসালুর মজিদ যেভাবে কাল্পনিক মোদাচ্ছের পীরকে নিয়ে ব্যবসা করেছে অথবা আওয়ালপুরের পীর যেভাবে মানুষদের ধোকা দিয়েছে সে তুলনায় বহিপীর নাটকে উত্তরের সুনামগঞ্জের প্রবীণ অথচ সুস্থ সবল মানুষটি তেমন পীর নয়। 'বহিপীর সচেতন, আত্মবিশ্বাসী, বুদ্ধিমান, জেদী এবং শেষ পর্যন্ত উদার ও হৃদয়বান-এই নাটকে সবচেয়ে জীবন্ত ও প্রোজ্জ্বল চরিত্র।[৩২]

তরঙ্গভঙ্গ নাটকেও বারিশ পীর এবং মৌলবি আবদুস সাত্তার নেওলাপুরীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। নাটকের কাহিনী অতি সামান্য। ঢাকা জেলার রাঙাদিঘি থানার নেওলাপুর গ্রামের আফতাব শেখের কন্যা ও কুতুব শেখের স্ত্রী পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের আমেনা আদালতের কাঠগড়ায়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দুটি। প্রথম অভিযোগ অতি গুরুতর এবং ভয়ানক, সে তার দুধের বাচ্চাকে নিজ হাতে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। দ্বিতীয় অভিযোগ সে তার স্বামীকে ধুতুরার বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে। সাক্ষী সাবুদ প্রস্তুত, আদালতে জজও উপস্থিত। সবারই প্রত্যাশা খুনি আমেনার ফাঁসি হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় বিচারক আমেনার ফাঁসির হুকুম না দিয়ে নিজেই আত্মহত্যা করেছে। অন্যদিকে ক্ষিপ্ত জনতার হাতে আমেনার ঘটেছে মৃত্যু। বাহিরের ঘটনা এইটুকুই। কিন্তু ঘটনার ভেতরেও ঘটনা থাকে। আসল ঘটনা পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় আমেনা যে দু-দুটো হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তার পেছনে মুখ্য কারণ প্রিয়জনের প্রতি ভালোবাসা–

'এই এক বা একাধিক হত্যাই কিন্তু জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে নয়, এসব মমত্বময় হত্যা, দারিদ্র্যের জন্যে প্রিয়জনের যাতনা সহ্য করতে না-পেরে হত্যা। এই হত্যার দায় কি তার? না, যে-সমাজে আমেনা জন্মগ্রহণ করেছে, যে-সমাজ এই হত্যার পটভূমি তৈরি করেছে, তার? এই নিরুদ্ধ জিজ্ঞাসাই এই নাটকের কেন্দ্রবক্তব্য।'[৩৩]

আমেনা অত্যন্ত গরিব। তার ঘরে অন্ধ মা বাতের ব্যথায় 'গোঁ-গোঁ' করে। চার চারটে সন্তান এবং ঘরে অসুস্থ স্বামী 'রোগে মরণাপন্ন, তবু পেটে এক ফোঁটা ওষুধ নাই। কেবল তাবিজটা লকলক করে শীর্ণ বাহু থেকে।'[৩৪] আমেনার ঘরে খাবার নেই, অথচ সন্তানগুলো ক্ষুধায় 'ট্যাঁ-ট্যাঁ' করে সর্বদাই। দিশেহারা আমেনা অনন্যোপায় হয়ে কাজের খোঁজে যায় মিঞাদের বাড়ি। 'কিন্তু মিঞা বাড়িতে কাজ নাই। আজও নাই কালও নাই। মিঞার বিবি নাকের নথে ঝটকা দিয়ে বলল, না গো বেটি, তোমার কোলের এইটুকুন বাচ্চা কেঁদে-কেঁদে জান খেয়ে ফেলবে, বড় ছেলেমেয়েগুলো ঘরে-বাইরে ছুটোছুটি করে পাগল বানিয়ে দেবে। ...অনেক দিয়েছি, কিন্তু দেওয়ার একটা সীমা আছে।'[৩৫] স্ত্রী হয়ে স্বামী এবং মা হয়ে সন্তান হত্যা করা সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রিক অপরাধ কাজেই তা শাস্তিযোগ্য। আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী তাই বাদী হয়ে আদালতে মামলা করেছে। 'কী করি, এ-অনাচার বন্ধ করতেই হবে। সবারই নিরপত্তার জন্যে কাজটি আমাকে করতেই হবে।'[৩৬] কিন্তু বিচার কাজে নিয়োজিত বিচারক দেখেন যে প্রকৃত হত্যাকারী আমেনা নয়, অপর দুজন: মিঞার বিবি ও আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী। মিঞা বাড়ি থেকে কাজ না পেয়ে আমেনা খালি হাতে ফিরে এসেছিল। তখন বাচ্চাদের ক্ষুধা এবং কান্নাকাটিতে আমেনা দিশেহারা। সে উঠানে বসে নিজের কথা, মিঞা বিবির কথা, তার সন্তানদের কথা ভাবছিল। ঠিক সেই সময় সেখানে উপস্থিত হয়েছিল আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী। ধবধবে সাদা আলখাল্লা পরা, সে বলেছিল 'আমেনা, এস আমেনা, আমি যা বলি তাই কর। শুনছ? এস, অন্তত একটা সমস্যার সমাধান করি।'[৩৭] সে আরও বলেছিল, 'ছোটটা এখনো অবুঝ। কিছু বোঝে না, তাই জানবেও না কিছু।'[৩৮] আমেনা কিন্তু 'আদরের ধন'কে মেরে ফেলতে চায় নি। তখন আবদুস সাত্তার আমেনাকে বলেছিল 'নিষ্পাপ শিশু খোদার কাছেই ফিরে যাবে। তোমার গুণাহ হবে, তুমি দোজখে যাবে, কিন্তু তার কষ্টের শেষ হবে।'[৩৯] কাজেই দেখা যায় 'নেওলাপুরের প্রসিদ্ধ মৌলবি' আবদুস সাত্তার নেওলাপুরীই এ হত্যার ইন্ধনদাতা, প্রকৃত খুনী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনতার হাতে আমেনার হত্যার মধ্য দিয়ে আবদুস সাত্তার নেওলাপুরীর 'জয় হয়েছে।'[৪০] কিন্তু প্রকৃত হত্যার ইন্ধনদাতাকে সমাজ শাস্তি দিতে পারে নি। আমাদের সমাজে আজও অনেক লোক আছে যারা মনে করেন ধর্মের জন্যই মানুষ, মানুষের জন্য ধর্ম নয়। কাজেই তারা ধর্মের নামে অধর্ম করে চলে ধর্মেই আড়ালে। গ্রন্থে আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী তেমনি সুযোগ সন্ধানী চরিত্র।

লালসালু উপন্যাসে আওয়ালপুরের পীরের মতো এ নাটকেও বারিশ পীরকে পাওয়া যায়। তবে লালসালু উপন্যাসে আওয়ালপুরের পীরের যে ভূমিকা এ নাটকে বারিশ পীরের ভূমিকা তেমনটি নয়। এ নাটকে তাঁর ভূমিকা নগন্য। বারিশ পীরের অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। কেননা তিনি ইচ্ছে করলেই আকাশ থেকে বারিশ (বৃষ্টি) নামাতে পারেন। 'আমার নাম বারিশ পীর। বারিশ আনার অলৌকিক ক্ষমতা আমার। শব্দটি উচ্চারণ করলেই বারিশ নাবে।'[৪১]

বারিশ পীর কথা বলে আরবি, ফার্সি, উর্দু মিশ্রিত বাংলায়। নাটকের জজ যার নামে অভিযোগ উঠেছে আসামীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার সেই জজ বারিশ পীরের মুরিদ। অন্তত বারিশ পীর সেটাই দাবী করেছে। আর তাই প্রিয় মুরিদের এহেন বিপদের কথা শুনে তিনি

ছুটে এসেছেন। আমাদের সমাজে অনেক লোক এভাবে পীরের মুরিদ হয়। এবং তারা পীরের নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালিত করে।

সুড়ঙ্গ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র ভিন্ন স্বাদের নাটক। নাটকটি মূলত কিশোর-কিশোরীদের জন্যে লেখা। 'তবে তরুণমনা বয়স্করা-যারা সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না, তারা এটি পড়ে বা দেখে আমোদ বোধ করবেন'[৪২] বলে নাট্যকার দাবী করেছেন। 'এ নাট্যে ওয়ালীউল্লাহ্'র প্রিয় এবং পরিচিত পীর প্রসঙ্গ এসে গেছে।'[৪৩] রেজ্জাক সাহেবের কন্যা রাবেয়ার বয়স পনের ষোল। রেজ্জাক সাহেব মেয়ের বিয়ের আয়োজন করেছেন। কিন্তু মেয়ের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। রাবেয়া ঘর থেকে বেরও হচ্ছে না, কারও সাথে কথাও বলছে না। এতে পিতা স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত হয়েছেন। ডাক্তার, হেকিম সবাইকে ডাকা হয়েছে। কিন্তু ডাক্তার বলে তার 'বুক-পেট-জিব-দাঁত-কান সব ভালো।' আবার হেকিম বলেছে, তার 'নাড়ী তেজী ঘোড়ার মতো দিব্যি টগবগিয়ে চলছে।' কাজেই পিতা মনে করেছেন হয়তো বিয়েতে রাবেয়ার মত নেই। কিন্তু রাবেয়ার সাথে কথা বলে সে অনুমানের সত্যতাও পাওয়া যায় নি। বাধ্য হয়ে পীর ফকিরে অবিশ্বাসী রেজ্জাক সাহেব মেয়ের চিকিৎসার জন্য পীরকে (ছদ্মবেশী কলিম) ডেকে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পীরের লম্বা চুল-দাড়ি, পরণে আলখেল্লা, হাতে লাঠি। সে আবার অশরীরী বিষয়ে মশগুল থাকে। নাটকে ছদ্মবেশী পীর গুপ্তধন পাওয়ার প্রত্যাশী। পরিচিত সমাজ, সংসারের চোখে ধুলো দিতে হলে 'ফিকিরে ফকির' হতে হয়। তাই নাটকে কলিম কথিত গুপ্তধন পাওয়ার জন্য ভণ্ডপীর বেশে রেজ্জাক সাহেবের ঘরে প্রবেশ করেছে চিকিৎসার নামে। আজও বাংলার গ্রাম গঞ্জে অসংখ্য ভণ্ডপীর সাধারণ লোকদের ঠকিয়ে তাদের ধর্ম ব্যবসা করে যাচ্ছে বহাল তবিয়তে।

ওয়ালীউল্লাহ'র সাহিত্যকর্মে বার বার এসেছে পীর-দরবেশ প্রসঙ্গ। এসমস্ত পীর দরবেশ মৌলবিরা গ্রামের সাধারণ মানুষের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে তাদের কলাকৌশল ও চাতুরী দ্বারা। তারা তাদের ইহলৌকিক জীবনের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মের আড়ালে অধর্ম করে চলে। মানুষের বিশ্বাসকে পুঁজি করে, মানুষকে ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে তারা তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে আজও। অথচ আমাদের সমাজে একশ্রেণীর ধর্মান্ধ লোক অনেক সময় এদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে তাদের ধর্মব্যবসার পথকে সুগম করতে সাহায্য করে চলছে। ওয়ালীউল্লাহ্ সেই সত্যকেই তাঁর সাহিত্যকর্মে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে মাত্র।

তথ্যসূচি :

১. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৩

২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ৬

৩. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন ও সাহিত্য* (প্রথম খণ্ড), মিনার্ভা বুক্স, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮১, পৃ. ৩৩৯

৪. মমতাজউদদীন আহমদ (সম্পা), *লালসালু এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ,* মনন প্রকাশ, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৯

৫. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ.বি.এম. মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, সপ্তম সংস্করণ, মে ১৯৯৮, পৃ. ১৩৫

৬. খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী: বর্ধমান হাউস: ঢাকা, জুন ১৯৮৪, পৃ. ১৫

৭. মুহম্মদ আবদুল হাই- সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ৯
৮. মমতাজউদদীন আহমদ(সম্পা), পূর্বোক্ত, পৃ. ১০
৯. মুহম্মদ আবদুল হাই -সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭
১০. মমতাজউদদীন আহমদ(সম্পা), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
১১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *উপন্যাস সমগ্র*, প্রতীক, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ৭
১২. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬
১৩. শিরীণ আখতার, বাংলাদেশের তিন জন ঔপন্যাসিক, গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪০০, পৃ. ১৬৮
১৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *উপন্যাস সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
১৫. তদেব, পৃ. ২৫
১৬. তদেব, পৃ. ২৭
১৭. শিরীণ আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১
১৮. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *উপন্যাস সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২
১৯. তদেব, পৃ. ৮৩ ।
২০. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, উপন্যাস সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩
২১. শিরীণ আখতার, পৃ. ২১১
২২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, উপন্যাস সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
২৩. তদেব, পৃ. ৭৩ ।
২৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, উপন্যাস সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬
২৫. শিরীণ আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫
২৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *নাটক সমগ্র*, প্রতীক প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ. ৬
২৭. তদেব, পৃ. ৬
২৮. তদেব, পৃ. ৬
২৯. তদেব, পৃ. ৮
৩০. তদেব, পৃ. ১৬
৩১. তদেব, পৃ. ৩৫
৩২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩
৩৩. তদেব, পৃ. ৮৬
৩৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, নাটক সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪
৩৫. তদেব, পৃ. ১০৪
৩৬. তদেব, পৃ. ১০৭
৩৭. তদেব, পৃ. ৯৫
৩৮. তদেব, পৃ. ৯১
৩৯. তদেব, পৃ. ৯১
৪০. তদেব, পৃ. ১১৭
৪১. তদেব, পৃ. ১০৮
৪২. তদেব, পৃ. ৫৬
৪৩. মমতাজউদদীন আহমদ(সম্পা), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

উত্তর-ঔপনিবেশিক নিসর্গতত্ত্ব ও আধুনিক বাংলা কবিতা

নাজিব ওয়াদুদ*

সারসংক্ষেপ: উপনিবেশবাদের প্রক্রিয়া ও কুফল এবং তার প্রতিক্রিয়া ও মোকাবেলা নিয়ে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং কেতাবি পরিপ্রেক্ষিতকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পর্যালোচনার মাধ্যমে বিগত শতাব্দীর আশির দশকে উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্ব গড়ে ওঠে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে আজকের দিন পর্যন্ত ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশবিরোধী তৎপরতা ও সংঘর্ষের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং কেতাবি পরিপ্রেক্ষিতকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পর্যালোচনা করে উত্তর-উপনিবেশবাদী এইসব রচনা। এই চর্চার বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত শেষ পর্যন্ত উত্তর-উপনিবেশবাদকে একটি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সমালোচনাতত্ত্ব হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। এর মূল উদ্গাতা এডওয়ার্ড ডাব্লিউ সাইদ। পরে যুক্ত হয়েছেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, হোমি ভাবা, স্টুয়ার্ট হল, অনিয়া লুম্বা, জ্ঞানপ্রকাশ এবং আরো অনেকে। অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের ফলে বিশ্বময় সৃষ্ট পরিবেশসঙ্কট মোকাবেলা করার জন্য বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 'পরিবেশবাদ' নামে যে চর্চা শুরু হয় তার ভিত্তিতে শতাব্দীর একেবারে শেষে সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতকে পর্যালোচনা করতে গড়ে ওঠে 'প্রতিবেশ সমালোচনাতত্ত্ব', এখানে যাকে সহজবোধ্য করতে সংক্ষেপে 'নিসর্গতত্ত্ব' বলা হয়েছে। উত্তর-উপনিবেশবাদের একটি মূললক্ষ্য উপনিবেশিতের নিজস্ব সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় নির্মাণ করা। তার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে নিজস্ব প্রকৃতি ও লোকজ সংস্কৃতির কাছে প্রত্যাবর্তন এবং বিষয়, উপমা, প্রতীক, চিত্রকল্প ইত্যাদি নিজস্ব মাটি ও নিসর্গ থেকে আহরণ করা। আঙিক ও ভাষাও আসবে এই নিসর্গ এবং তার মধ্যে জীবনযাপনকারী মানুষের জীবন থেকে। এভাবে একটা পর্যায়ে গিয়ে উত্তর উপনিবেশবাদ ও নিসর্গতত্ত্বের হাত ধরাধরি করে হাঁটার কথা। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই সম্ভাবনাকে যাচাই করা হয়েছে আধুনিক বাংলা কবিতার ধারাকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।

একটি বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক তত্ত্ব হিসেবে উত্তর-উপনিবেশবাদ এখন যথেষ্ট প্রাধান্যশীল সমালোচনাধারা। যদিও রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির কারণে উপনিবেশবাদের নানামুখী নানারূপী আগ্রাসন এখনও বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক জীবনে অপ্রতিরোধ্য, তবু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়– উপনিবেশবাদের যাবতীয় ছলা-কলাকে শনাক্ত ও মোকাবেলা করতে উত্তর-উপনিবেশবাদ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রস্তুত এবং সক্রিয়। সে তুলনায়, পরিবেশচেতনা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড-কারখানা সত্ত্বেও, বুদ্ধিবৃত্তিক ও শৈল্পিক বিচারের মাপকাঠি হিসেবে নিসর্গতত্ত্ব এখন অব্দি প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করতে পারে নি।

গত তিন দশক ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ এবং উপনিবেশবাদের সমালোচনা করে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। এসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধে লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি, তথ্য বিশ্লেষণ ও মতামতের মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা থাকলেও এগুলোকে 'উত্তর-উপনিবেশবাদী' (Postcolonial) বলে শ্রেণিকৃত করা হয়। তার কারণ এসব রচনার সাধারণ আলোচ্য বিষয় উপনিবেশিক শাসন, তার প্রক্রিয়া ও কুফল এবং তার প্রতিক্রিয়া ও মোকাবেলা। উত্তর-উপনিবেশবাদ তত্ত্বের উদ্ভব কোনও আকস্মিক ব্যাপার নয়, তা বলাই বাহুল্য। শুরুতে

---

* ডেপুটি চিফ মেডিকেল অফিসার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এটা সাহিত্যতত্ত্বও ছিল না। সাধারণ রাজনৈতিক উপনিবেশবিরোধিতা থেকে এর যাত্রা শুরু, যাকে সর্বপ্রথম কেতাবি রূপ দান করেন ফ্রাঞ্জ ফ্যানন তার বিখ্যাত *ব্ল্যাক স্কিন, হোয়াইট মাস্কস* (১৯৫২) এবং *দি রেচেড অফ দি আর্থ (১৯৬১)* গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী এই মনোরোগ চিকিৎসক তার বইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিশ্বব্যাপী যেসব জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হয় সেগুলোকে সূত্রবদ্ধ করেন। তার আলোচ্য বিষয় অবশ্য সম্পূর্ণ রাজনীতিকেন্দ্রিক। তিনি দেখান উপনিবেশবিরোধী সংগ্রাম তিনটি পর্যায়ের (panorama on three levels) মধ্যদিয়ে এগোয়। প্রথম পর্যায়ে উপনিবেশিত জাতি রাজনৈতিক চেতনা লাভ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে জাতি তার আত্মপরিচয় গড়ে তুলতে চায় নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আর তৃতীয় পর্যায়টা হচ্ছে সরাসরি সংঘর্ষের (Revolutionary violence)। আলজিরিয়াতে কাজ করতে গিয়ে ফ্যানন লক্ষ্য করেন, ঔপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশিতের ওপর কেবল বস্তুগত শোষণই চালায় না, তার মনের ওপরেও এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, সে নিজেকে অধমর্ণ বলে মনে করে। তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের সঙ্গে সঙ্গেই তার বিরোধিতা ও মোকাবেলাও সক্রিয় হয়, অর্থাৎ উত্তর-উপনিবেশ মানে উপনিবেশের পরবর্তী পর্যায় নয়। যাই হোক, বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক এবং তার পরে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেন। তাদের ওইসব আন্দোলনকে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি দিতে গিয়ে যেসব বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক যুক্তি খাড়া করেন সেগুলোই উত্তর-উপনিবেশবাদ তত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা গড়ে তোলে।

এডওয়ার্ড সাইদের বহুল-আলোচিত *অরিয়েন্টালিজম* প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। তার এই গ্রন্থ প্রকাশের মধ্যদিয়ে উত্তর-উপনিবেশবাদ একটি সমালোচনাতত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় তার *দি কোশ্চেন অফ প্যালেস্টাইন* (১৯৭৯), *কভারিং ইসলাম* (১৯৮১), *কালচার অ্যান্ড ইমপেরিয়ালিজম* (১৯৯৩) প্রভৃতি যুগান্তকারী বই। সাইদ দেখিয়েছেন, অরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যতত্ত্ব হচ্ছে প্রতীচ্যের একটা বিশিষ্ট চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি যার মাধ্যমে সে প্রাচ্যের ওপর তার প্রাধান্য বিস্তার করে, তাকে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী বিনির্মাণ করে এবং তার ওপর কর্তৃত্ব করে। এইভাবে পাশ্চাত্য শুধু প্রাচ্যের ওপর নয়, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকাসহ পৃথিবীর তাবৎ দুর্বল জাতির ওপরেই উপনিবেশ চাপিয়ে দেয় এবং মানবপ্রজাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলে– একদিকে থাকে 'পাশ্চাত্য', অন্যদিকে 'অন্যরা'। উপনিবেশ উপনিবেশিতকে মন-মানসিকতায় এতটাই অধমর্ণ করে তোলে যে সে এমনকি শোষণের প্রতিবাদ করার কৌশল ও ভাষা খুঁজে পায় না। সাইদ বলেন, উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতার অর্থ কেবল নিজেদের ভূমি পুনরুদ্ধার নয়, নিজস্ব সংস্কৃতি নির্মাণ করাও। কিন্তু সমস্যা হলো, ঔপনিবেশিক তার চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ও মূল্যবিচারপদ্ধতির মাধ্যমে উপনিবেশিতের বস্তুবিশ্ব ও মানসগঠনে মৌলিক রূপান্তর ঘটায় এবং স্থানীয় সংস্কৃতিকে চোখের আড়াল করে রাখে, অথবা তাকে অবমূল্যায়িত করে, কিংবা তাতে ভেজাল মিশিয়ে দেয়। সে কারণে উপনিবেশবিরোধী লড়াইয়ের বিশুদ্ধ ও কার্যকর উপায়-উপকরণ মজুদ থাকে না উপনিবেশিতের হাতের কাছে। তাকে সেটা পুনরাবিষ্কার, পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন করতে হয়। সাহিত্যের প্রসঙ্গ যদি ধরি, তাকে নিজের ছাঁচ (stereotypes) তৈরি করতে হয় প্রথমে পুনর্নির্মাণ এবং পরে ক্রমান্বয়ে তাকে অতিক্রমণের মধ্যদিয়ে।

গায়ত্রী স্পিভাক এর সঙ্গে লিঙ্গ বৈষম্যকে যুক্ত করেন। অন্যদিকে হোমি ভাবার মতে, ঔপনিবেশিক উপনিবেশিতকে 'তার মতো' বানাতে চায়, সে পুরোপুরি 'অপর' হয়ে থাকবে না, কিন্তু পুরোপুরি ঔপনিবেশিক আগ্রাসনকারীর স্তরেও উঠবে না। তিনি এটাকে সঙ্করায়ণ (hybridization) বলেছেন। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত নিজের *'অফ মিমিক্রি অ্যান্ড ম্যান'* (Of Mimicry and Man) প্রবন্ধে ভাবা বলেছেন, ঔপনিবেশিক চেয়েছে উপনিবেশিত তার আদলে গড়ে উঠুক, তার 'দ্বিতীয়-স্থানত্ব' অর্জন করুক, কিন্তু অবশ্যই থেকে যাক সেই 'অপর'ই, যা সে আগেও ছিল।

উপনিবেশবাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য 'বশংবদ' তৈরি করা। উপনিবেশিত যেন সব সময় মনে করে সে ছোট, তার যা-কিছু রয়েছে তার সব কিছুই উৎকর্ষের তুলনায় ঔপনিবেশিকের চেয়ে গৌণ, সে কারণে তার উচিত কেবল অনুকরণ ও অনুসরণ করে যাওয়া। ১৮৩৫ সালে ভারতের ইংরেজ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কর্তা ম্যকলে বলেছিলেন, 'প্রাচ্যের তাবৎ সাহিত্যও ইউরোপীয় এক শেল্‌ফ সাহিত্যের সমান সাংস্কৃতিক মূল্য ধারণ করে না।' তার এই উক্তি তাদের ঔপনিবেশিক লক্ষ্যের উপস্থাপক। এই যুক্তির বলে উপনিবেশিতের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে অবমূল্যায়িত করে তাকে আড়ালে ঠেলে দিয়ে ইউরোপীয় শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে প্রতিস্থাপিত করা হয়। তার ফল কত মারাত্মক হয়েছে তা বোঝানোর জন্য আলেক বেহমার তার 'পোস্টকলোনিয়ালিজম' প্রবন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন। নাইজেরীয় ঔপন্যাসিক বেন ওকরি তরুণ বয়সে মনে করতেন 'ইংল্যান্ড হচ্ছে মহৎ গ্রন্থের দেশ।' শেক্সপীয়র ও ডিকেন্স পাঠ করে তার এই ধারণা জন্মেছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ঔপন্যাসিক ভি এস নইপলও প্রথম দিকে ডিকেন্স পাঠের প্রভাবে ইংল্যান্ডকে 'সাহিত্যের দেশ' মনে করতেন। *দি ওভারক্রাউডেড ব্যারাকুন*-এ তিনি বলেছেন, ত্রিনিদাদের স্থানীয় ফুল জুঁইকে তিনি বিদেশি ফুল মনে করতেন, আর ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর ড্যাফোডিল তার মনে এতই উচ্চাসন দখল করেছিল যে সেটাকেই নিজেদের বাগানের সুপরিচিত ফুল বলে মনে হতো। এই উপনিবেশিত মনই রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বকে দিয়ে ইংল্যান্ডের রাণীর ভারত আগমন উপলক্ষে লিখিয়ে নিয়েছিল– 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্যবিধাতা।' আসলে, তপোধীর ভট্টাচার্য যেমন বলেন, 'অলিন্দশূন্য বাতায়নশূন্য সুরক্ষিত বন্দীশালায় আমাদের মেধা ও হৃদয় শৃঙ্খলিত হওয়ায় আমরা যে আসলে আধিপত্যবাদী শক্তির পুতুল মাত্র, এই বোধের প্রকাশ ঘটে নি ইপ্সিত মাত্রায়।' একমাত্র ব্যতিক্রম কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি জানতেন এই ঔপনিবেশিক শক্তি একটি যাঁতাকলের মতো। তাঁর সরাসরি উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। তপোধীর আরো বলেন, 'উপনিবেশীকৃত মন কখনও আধিপত্যবাদী মহাসন্দর্ভকে প্রশ্ন করতে পারে না, বিকল্প কোনো প্রতিবেদন খোঁজার তো কথাই ওঠে না। ...লোকায়ত সাংস্কৃতিক উপলব্ধি ঐ মহাসন্দর্ভে কিছু মাত্র স্বীকৃতি পায় না এবং উপনিবেশীকৃত মনও নিজের শেকড়কে নিজেই তাচ্ছিল্য করতে শেখে।'

একটা সংস্কৃতিকে অন্য সংস্কৃতির তুলনায় অবমূল্যায়িত করার এই প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ উত্তর-উপনিবেশবাদী লেখকের কাছে লেখনীর মাধ্যমে আত্ম-সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উপনিবেশ কাল এবং উপনিবেশ পরবর্তী কাল, উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। উপনিবেশবাদী মনস্তত্ত্ব উপনিবেশিতের ওপর এতটাই প্রভাবশীল থাকে যে, উপনিবেশিত লেখককে এখানে দুটো সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়। প্রথমত, তার সামনে থাকে আঙ্গিক, ভাষা ও মূল্যবিচার, এমনকি বিষয়েরও, যে কর্তৃত্বশীল

প্রকৃতি ও মান স্থির করে দেওয়া আছে তাকে অস্বীকার করে টিকে থাকার ঝুঁকি। দ্বিতীয়ত, তার প্রতিস্পর্ধী নিজস্ব কোনও মানের অনুপস্থিতি। সে কারণে বশংবদ লেখকরা, এমনকি উপনিবেশবিরোধী লেখকরাও অংশত, ঔপনিবেশিকের বিষয়চেতনা, ভাষা, আঙ্গিক, উপমা, প্রতীক, চিত্রকল্প, তার কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে মান্য করেই লিখতে বাধ্য হন। আলেক বেহমার তার উপর্যুক্ত প্রবন্ধে নোবেলবিজয়ী ক্যারিবিয়ান লেখক ডেরেক ওয়ালকটের আম খেতে খেতে ইউরোপীয় ক্ল্যাসিক পড়ার মজার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এইভাবে তিনি দুটোকেই নিজের বলে দাবি করতে চেয়েছেন। এই আত্মসমর্পণ বা নিদেনপক্ষে সমঝোতা তাকে করতে হয়। এর থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেন খুব কম লেখকই।

উত্তর-উপনিবেশবাদের সঙ্গে নিসর্গতত্ত্বের একটা সম্পর্ক আছে, যদিও এই সম্পর্কের বিষয়টি এখনও অনালোচিত। পরিবেশবাদী ভাবনা থেকেই নিসর্গতত্ত্বের উদ্ভব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের ফলে বিশ্বময় যে পরিবেশসঙ্কট দেখা দিয়েছে তাকে কেন্দ্র করে পরিবেশ আন্দোলন গড়ে উঠেছে। পরিবেশ সঙ্কটের জন্যে দায়ী মূলত শিল্পোন্নত দেশগুলো, দু'একটা ব্যতিক্রম বাদে আসলে ইউরোপ ও আমেরিকা, অর্থাৎ পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শক্তি। এই কারণে পরিবেশ সঙ্কটকে ঔপনিবেশিক সঙ্কটেরই একটা ফল হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন এলাকার ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ আন্দোলনের পাঠ ও পর্যালোচনা 'পরিবেশবাদ' বা 'পরিবেশতত্ত্ব' (Environmentalism) নামে একটি জ্ঞানশাখার জন্ম দেয়। এটি মূলত প্রকৃতি-বিজ্ঞানের একটি বিষয়। এর উদ্ভব বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। ষাট এবং সত্তর দশকে শিল্প-কারখানার দূষণ আলোচনার কেন্দ্রে আসে। আশির দশকে এর সঙ্গে যুক্ত হয় আবহাওয়ার পরিবর্তনের বিষয়টি। এটিকে অবলম্বন করে সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতকে পর্যালোচনা করতে গড়ে উঠছে 'প্রতিবেশ সমালোচনাতত্ত্ব' (Ecocriticism), আমি যাকে সহজবোধ্য করতে সংক্ষেপে 'নিসর্গতত্ত্ব' বলছি। মার্কিন নিসর্গতাত্ত্বিক ঔপন্যাসিক মাইকেল জে ম্যাকডাওয়েল বলেছেন, 'উত্তর-আধুনিকতাবাদ ভাষার বিশ্লেষণ নিয়ে এত বেশি মগ্ন হয়েছে যে বস্তুবিশ্ব (Physical world) সরাসরি অস্বীকৃত না হলেও উপেক্ষিত হচ্ছে।' নিসর্গতত্ত্বে কয়েকটি দার্শনিক বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন, জটিল ও কৃত্রিম আধুনিকতা থেকে সরল ও আসল প্রাকৃতিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন। কোনও কোনও নিসর্গবাদী আরো এগিয়ে বলেছেন, গ্রাম হচ্ছে সাময়িক নিষ্কৃতির জায়গা, আসল ও স্থায়ী নিষ্কৃতি মিলবে স্বর্গে প্রত্যাবর্তনে। নিসর্গতত্ত্ব রোম্যান্টিসিজমকে প্রশ্রয় দেয়। শৈশব, ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ জীবিকা, প্রকৃতিমগ্নতা, আত্ম-অচেতনতা, বৌদ্ধিক জাড্যতা এর বৈশিষ্ট্য। এসব কারণে নিসর্গতাত্ত্বিকরা রুশো, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ এবং কীটসকে ভীষণ পছন্দ করেন।

নিসর্গতত্ত্ব এখনও পুরোপুরি একটি সাহিত্যিক তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মার্কিন মুল্লুকে পরিবেশ সংকট নিয়ে উপন্যাস লেখা হচ্ছে। এবং ইতঃপূর্বে লিখিত সাহিত্যে পরিবেশ সংকট কীভাবে চিত্রিত হয়েছে তার অনুসন্ধান চলছে। সমালোচনা সাহিত্যের এই নতুনতর ধারাটি প্রচল তত্ত্বগুলোর, যেমন, উত্তর-উপনিবেশবাদ বা উত্তর-আধুনিকতাবাদ, কোনোটির সঙ্গেই সম্পর্কিত হতে চাইছে না। সে-ও একটি ঔপনিবেশিক মনোভাবের প্রতিফলন বলে মনে হয়। অথচ আমরা খুব সহজেই একে উত্তর-উপনিবেশবাদের সঙ্গে মেলাতে পারি। উত্তর-উপনিবেশবাদের একটি মূল লক্ষ্য উপনিবেশিতের নিজস্ব সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় নির্মাণ করা। তার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে নিজস্ব প্রকৃতি ও লোকজ সংস্কৃতির কাছে প্রত্যাবর্তন এবং বিষয়, উপমা, প্রতীক, চিত্রকল্প এই প্রকৃতি থেকে আহরণ করা। আর

লোকজ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতি-নির্ভর। আঙ্গিক ও ভাষাও আসবে এই প্রকৃতি এবং তার মধ্যে জীবনযাপনকারী মানুষের জীবন থেকে। এভাবে একটা পর্যায়ে গিয়ে উত্তর-উপনিবেশবাদ ও নিসর্গতত্ত্ব হাত ধরাধরি করে হাঁটতে বাধ্য।

একটি বিষয় এখানে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার যে, উত্তর-উপনিবেশবাদের কালচেতনা নিয়ে বিতর্ক আছে, তবু এই মতই দিন দিন প্রবল হচ্ছে যে, সময়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটি আসলে একটি চেতনা। এমন নয় যে এই তত্ত্বের উদ্ভব ঘটার পর থেকে তাকে অনুসরণ করে সাহিত্য রচিত হচ্ছে, বরং উল্টোটাই সত্যি যে, সৃষ্ট সাহিত্যকে অবলম্বন করেই তত্ত্বের সৃষ্টি। নিসর্গতত্ত্বের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। উত্তর-ঔপনিবেশিক নিসর্গতত্ত্ব বলতে বোঝানো হয়েছে সেই নিসর্গচেতনাকে যার মধ্যে উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনা জড়িয়ে আছে, বা যখন উপনিবেশিকতার বিরোধিতায় নিসর্গ বা নিসর্গচেতনাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সংক্ষিপ্ত উপক্রমণিকার পর আমরা আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে দ্রুত পরিভ্রমণ করে দেখব সেখানে উত্তর-উপনিবেশবাদী নিসর্গচেতনা কোথায় কতটুকু রয়েছে বা নেই।

একথা বোঝা কষ্টকর নয় যে, আধুনিকতা শব্দটির সঙ্গে উপনিবেশবাদের গন্ধ জড়িয়ে আছে। কারণ, এই একটি শব্দ দিয়েই সাহিত্য বিচারের নতুন ইউরোপীয় মানদণ্ড দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় যা 'অন্যদের' অর্থাৎ প্রতীচ্যের বাইরের সকল সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে 'অনাধুনিক' ও 'পশ্চাদপদ' এবং 'নিম্নমানের' বা 'বর্তমানে অচল' বলে প্রত্যাখ্যান করে। বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা প্রথমে একটি ভাষা তৈরি করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মাধ্যমে এই ভাষার নির্মাণ ও লালন এবং সেই ভাষায় দক্ষ শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলা হয়। এই ভাষা ও শিক্ষা উপনিবেশিতকে শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বাংলা সাহিত্যকে গড়ে-পিটে 'মানুষ' করার দায়িত্ব এরাই পালন করেন। সুতরাং এই সাহিত্য বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সমাজবিচ্ছিন্ন, নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে। বাংলা কবিতার হাজার বছরের ঐতিহ্য থাকলেও তা বিচ্ছিন্ন হয়ে ইউরোপের আদলে নতুন রূপে, নতুন রুচিতে পুনর্নির্মিত হতে থাকে। এটি হচ্ছে 'ঔপনিবেশিক আধুনিকতা'।

ঔপনিবেশিক ধরনে বাংলা কবিতাকে 'যোগ্য' করে তোলার কাজ সাফল্যের সঙ্গে করেন প্রথমত মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর মন এতটাই উপনিবেশিত হয়েছিল যে, তিনি এমনকি ব্যক্তিজীবনের মতো কবিতায়ও পুরোদস্তুর ইউরোপীয় হয়ে উঠতে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালান। সেটা করতে গিয়ে তিনি নিজের ধর্ম, পরিবার, দেশ, এমনকি ভাষাও ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর বিপুল সৃজনক্ষমতা ও রচনার শৈল্পিক উৎকর্ষ সত্ত্বেও তিনি 'ইউরোপীয়' মানুষ বা কবির স্বীকৃতি পান নি, 'অপর'ই থেকে গেছেন। তাঁর মোহভঙ্গ ঘটে এবং হতোদ্যম হয়ে নিজ ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কাছে, এমনকি দেশেও প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তন করেন ইউরোপীয় আঙ্গিক, রুচি ও সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি। তাঁর প্রত্যাবর্তন সে কারণে, ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বিচারে বৈপ্লবিক হলেও ইউরোপের বিকল্প আবিষ্কার করতে পারে নি। কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঔপনিবেশিকের অনুকরণ ও অনুসরণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। এসব চর্চা আসলে ছিল ইউরোপীয় সাহিত্যের বাংলা সংস্করণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ঔপনিবেশিক ধারাকে অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তাঁর মধ্যে বিকল্প খোঁজার প্রয়াস লক্ষ্যযোগ্য। তিনি, বিশেষত কবিতায়, অন্তত

বিষয়চেতনার দিক থেকে, ইউরোপের হুবহু অনুসরণ না করে প্রাচ্যের দিকে মুখ ফেরান। তিনি বাংলার লালন ফকির ও ইরানের হাফিজ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার প্রকৃতিকেও আশ্রয় করেন। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত উপনিবেশিকতার সঙ্গে সমঝোতার পথই বেছে নেন। তার কাব্যিক ক্যারাভান পুরোপুরি উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনার ধারায় চলে নি, কিংবা তাঁর নিসর্গচেতনাও ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্বীকার করতে পারে নি। 'বালুচর বলতে আমি তোমাদের দেশের সুদূর পদ্মাতীরের চরগুলির সুন্দর কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা আশা করেছিলাম।' একথা পড়ে নিশ্চয়ই সকলেরই মনে হবে কোনও ভিনদেশী লোক বাংলাদেশের কাউকে বলছেন একথা। কিন্তু আসলে এটি জসীম উদ্‌দীনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির অংশবিশেষ। অথচ এই 'পদ্মাতীরের চর' এলাকায় ছিল রবীন্দ্রনাথের জমিদারি এবং এসব এলাকায় তাঁর বহু দিন কেটেছে। আসলে বাংলার নিসর্গকে তিনি দেখেছেন বজরা থেকে, অনেকটা পরিব্রাজকের দৃষ্টিতে, তাকে আপনার করে তুলতে পারেন নি। তাঁর শ্রেণিগত অবস্থানও এর একটা কারণ হতে পারে।

নজরুল ইসলামের উপনিবেশবিরোধিতা খুব আলোচ্য ও প্রশংসিত বিষয়। ফ্যানন-কথিত তিনটি বিষয়ই তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এডওয়ার্ড সাইদ, গায়ত্রী স্পিভাক এবং হোমি ভাবার দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রতিফলন মেলে তাঁর রচনায়। বিষয়চেতনা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প তিনি এই দেশ এবং প্রাচ্য থেকেই সংগ্রহ করেন, কাব্যজগৎ নির্মাণ করেন এদেশের হিন্দু-মুসলমানের হাজার বছরের লালিত ও চর্চিত ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-পুরাণকে আশ্রয় করে। কাব্যভাষা নির্মাণে ঔপনিবেশিক-প্রণোদিত ভাষার সঙ্গে মিশিয়ে দেন সর্বজনের মুখের ভাষা। তাঁর নিসর্গপ্রীতি খুব প্রোজ্জ্বল না হলেও বাংলার প্রকৃতিকে তিনি ইউরোপীয় চোখে দেখেন নি, এবং সবচেয়ে বড় কথা তাকে এঁকেছেন উপনিবেশবিরোধী চেতনাসম্পন্ন করে।

নজরুলকে বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তি আন্দোলনের উদ্বোধক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কথাটা সত্যি বটে। কিন্তু উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনা এবং নিসর্গতত্ত্বের দিক থেকে দেখলে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথকে সম্প্রসারিত করেছেন নজরুল। বাংলা কবিতা সেই পথে এগুলে ভিন্ন চারিত্র্য অর্জন করতে পারত। কিন্তু কল্লোল গোষ্ঠীর কবিরা বাংলা কবিতাকে আবার ঔপনিবেশিকের বন্দীশালায় ঢুকালেন (অবশ্য এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও জীবনানন্দ দাশ কিছুটা ব্যতিক্রম)। অনেক সমালোচকই দেখিয়েছেন কীভাবে জীবনানন্দ দাশ ইয়েটসকে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ভালেরি ও মালার্মেকে, অমিয় চক্রবর্তী হপকিন্সকে, বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়রকে এবং বিষ্ণু দে এলিয়টকে অনুসরণ, অনুবাদ ও আত্মস্থ করেছেন। এই কবিরা নজরুলের প্রায় সমসাময়িক, এবং প্রাথমিক কালে নজরুল দ্বারা কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত। কবি-সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দের মতে, নজরুলের প্রভাব তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে: ১. স্বপ্নকল্পনাচেতন ইন্দ্রিয়ঘন ধারা, যার প্রতিভূ জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ফররুখ আহমদ প্রমুখ; ২. লোকায়ত উন্মেষের ধারা, এর মধ্যে রয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে (প্রথম পর্যায়) প্রমুখ; ৩. ইসলামচেতন কাব্যোচ্চারণের ধারা, যার অন্তর্ভুক্ত গোলাম মোস্তফা, শাহাদৎ হোসেন, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান (প্রথম পর্যায়) প্রমুখ। বলা বাহুল্য, এই তিনটি ধারার মধ্যেই উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনার উপাদান রয়েছে। নিসর্গচেতনা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কারো কারো মধ্যে ক্রিয়াশীল। সে কারণে উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনার ধারায় নজরুল ইসলামকে আমরা পথিকৃতের আসন দিতে পারি।

নজরুলের (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রায় সমসাময়িক কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), জসীম উদ্‌দীন (১৯০২-১৯৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) ও বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)। কিন্তু, 'তিরিশের কবিদের সঙ্গে,' আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন, 'নজরুলের ব্যবধান মৌলিক ও আত্মিক– ...মানসতার দিক থেকে তাঁদের আমরা দেখতে পাই নজরুল-উত্তর।' এঁদের মধ্যে জীবনানন্দ ও জসীম উদ্‌দীন ছাড়া আর সবাই পুরোপুরি ঔপনিবেশিক মননের পরিচয় দিয়েছেন। এঁরা দেখেছেন ইউরোপের চোখে, ভেবেছেন ইউরোপের মস্তিষ্কে, বলেছেন ইউরোপের ভঙ্গিতে, তাদের সাহিত্যচর্চার ভাষা বাংলা (ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উপনিবেশিত বাংলা) হলেও তার মেজাজ-রুচি ইউরোপীয় ঘরানার, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, প্রতীক-চিত্রকল্প, পুরাণ প্রধানত ইউরোপ থেকে আহরিত। তপোধীর ভট্টাচার্য বলেন, '...ফসলও গোলায় উঠেছে অনেক। কিন্তু ... নিজস্ব শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আর ঐ বিচ্ছিন্নতার মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টায় মুখোশের ওপরে চেপে বসেছে আরো অনেক রঙিন মুখোশ। তাই যে-ফসলের কথা এইমাত্র লিখেছি, তা জনমানসকে যত না পুষ্টি দিয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি বিভ্রান্ত করেছে। স্ববিরোধিতা আর আত্মঘাত দিয়ে গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রতিবেদন; প্রতিমূল্যবোধ ও প্রতিবাস্তবতার চাষ হয়েছে সর্বত্র। সত্যভ্রম ঢেকে দিয়েছে সত্যকে। বিশেষত বাঙালি সমাজে উপনিবেশবাদ-স্পৃষ্ট বৌদ্ধিকতার আড়ম্বরে আড়ালে পড়ে গেছে জীবনপ্রবাহ।' এঁরা বাংলায় ইউরোপীয় কবিতার চাষ করেছেন। জীবনানন্দ দাশ এর থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বাংলার প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসপ্রবণতা পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেন নি। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তার সুবিখ্যাত *জীবনানন্দ* গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, আইরিশ কবি ডব্লিউ বি ইয়েটস কীভাবে 'জীবনানন্দকে প্রথম, ও চিরদিন, আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।' তার ওপর জার্মান কবি গটফ্রিড বেন-এর প্রভাবও (এটা কাকতালীয় হতে পারে) লক্ষণীয়। জীবনানন্দের 'প্রেম-পূজা-প্রকৃতির যে ত্রিবেণীবন্ধ' তার 'আর্তিঘন নিবেদন' ভারতীয় না ইউরোপীয় সে প্রশ্নও তুলেছেন অলোকরঞ্জন। জীবনানন্দের নিসর্গ বিষাদময়, এবং স্মৃতিমেদুরতায় আচ্ছন্ন। তা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় নির্মাণের উপকরণ হয়ে ওঠে নি। কারণ তার অবস্থান যেন এই নিসর্গের মধ্যে নয়, তিনি যেন বাইরে থেকে, দূর থেকে, তাকে পর্যবেক্ষণ করেন, বর্তমান থেকে অতীতকে স্মরণ করার মতো। *রূপসী বাংলার* প্রত্যেকটি কবিতায়ই বাংলার নিসর্গের মোহনীয় চিত্র ফুটে ওঠে। এই নিসর্গের প্রতি কবির আকর্ষণও প্রবল–

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে– এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়– হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব কাঁঠাল ছায়ায়;
(আবার আসিব ফিরে/ *রূপসী বাংলা*)

কিন্তু যে ঔপনিবেশিক চাপের মধ্যে তাঁর জীবনযাপন তার আগ্রাসনের কবল থেকে এই কাঁঠালছায়া কতদিন টিকে থাকবে সে উদ্বেগ তিনি অনুভব করেন নি। এই কাব্যের প্রায় প্রতিটি কবিতায় কবি নিসর্গকে স্মরণ করেন মৃত্যুচেতনার বিষাদে আক্রান্ত হয়ে। এই বিষাদ পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হয়, কিন্তু এই নিসর্গের ওপর ভিত্তি করে জীবনচেতনা দানা বাঁধে না।

উত্তর-উপনিবেশবাদী নিসর্গচেতনার দিক থেকে একেবারেই আলাদা ঘরানার কবি জসীম উদ্‌দীন। ইউরোপীয় 'ঔপনিবেশিক আধুনিকতা'কে তিনি কোনও অর্থেই গ্রহণ করেন নি। যে সময় রবীন্দ্রনাথও কল্লোল গোষ্ঠীর চর্চিত ইউরোপীয় আধুনিকতার কাছে পৌঁছার চেষ্টা করেছেন, সে সময় জসীম উদ্‌দীনের এই অবস্থান তাৎপর্যবহ, কারণ তিনি তথাকথিত পল্লীকবি বা গোবিন্দচন্দ্র দাসের মতো স্বভাবকবিও নন। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সচেতনভাবেই তিনি তার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বাংলার নিসর্গকে দেখেছেন, অনুভব করেছেন একেবারে তার মধ্যে নিবিড়ভাবে মিশে থেকে। তিনি নিজেও এই নিসর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। জসীম উদ্‌দীনের নিসর্গ মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে ফুটে ওঠে:

কাল সে আসিবে, মুখখানি তার নূতন চরের মত,
চখা আর চখী নরম ডানায় মুছায়ে দিয়েছে কত।
চরের চাষীর ধানের ক্ষেতের মতই তাহার গা,
কোথা বা হলুদ, আব্‌ছা হলুদ, কোথা বা হলুদ না।
(কাল সে আসিবে/ *বালুচর*)

তিনি বাংলার প্রকৃতির মোহনীয় ছবিই কেবল অন্বেষণ করেন না, তার রূঢ় রূপটিও আঁকেন। তাঁর কবিতায় উপনিবেশ কিংবা ঔপনিবেশিক বা উপনিবেশবিরোধিতা সরাসরি আসে না, কিন্তু উপনিবেশিতকে তিনি শনাক্ত করেন, চিত্রিত করেন অবিকল, তার পীড়নের ক্ষতাক্ত দাগ কখনও তাঁর চোখ এড়ায় না–

বাড়ি তো নয় পাখির বাসা ভেন্না পাতার ছানি
একটুখানি বৃষ্টি হলেই গড়িয়ে পড়ে পানি।
(আসমানী/ *এক পয়সার বাঁশী*)

তবে এটা ঠিক যে, তিনি এর জন্যে স্পষ্টরূপে উপনিবেশকে দায়ী করেন না বা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হন না। কিন্তু তাঁর নিসর্গ মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। প্রতিবাদ তাঁর কাছে উপলব্ধির বিষয়, তিনি সেটাকে সরাসরি পাঠকের ওপর চাপিয়ে দিতে চান না। বলা বাহুল্য, এটা আধুনিক কবিদের একটি করণকৌশল।

'ইসলামী রেনেসাঁর কবি'র সিলমোহর ফররুখ আহমদকে (১৯১৮-১৯৭৮) বোঝার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। তা না হলে তার সম্পর্কে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। তার একটি হচ্ছে উপনিবেশবাদ বিরোধিতা। যেমন–

হে জড় সভ্যতা!
মৃত-সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ!
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;
তারপর আসিলে সময় / বিশ্বময়
তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি'
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার-প্রান্তে টানি';
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও ঃ / ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও ॥
(লাশ/ *সাত সাগরের মাঝি*)

দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি সুদৃঢ় অঙ্গীকার। তাঁর এই ঐতিহ্য অনেকটাই এলিয়টীয়, কিন্তু এলিয়ট থেকে আলাদা হয়ে তিনি সামাজিক ও ঔপনিবেশিক অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সবসময় সোচ্চার থেকেছেন।। তিনি তাঁর বিষয়, উপমা, চিত্রকল্প আহরণ করেছেন দুটি উৎস থেকে। তার একটি লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। রামায়ণ-মহাভারতের মতো প্রথমে অনূদিত এবং পরে বিনির্মিত হয়ে পুঁথিসাহিত্যের মাধ্যমে আরব্য রজনীর কাহিনী বা তার সিন্দাবাদ, শাহেরজাদি প্রমুখ চরিত্ররাও এদেশে শত শত বছর ধরে চর্চিত। এর সঙ্গে ইসলামের কোনও সম্পর্ক নেই। থাকলেও কিছু আসত-যেত না। কারণ ইসলাম এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনদর্শন এবং জীবনাচরণের চেতনা ও আবেগের উৎস। সুতরাং এসব পুঁথিসাহিত্য এদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় উৎস এদেশের নিসর্গ। তাঁর নিসর্গচেতনার সঙ্গে উপনিবেশবিরোধিতা কীভাবে মিশে যায় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ *হে বন্য স্বপ্নেরা* কাব্যের 'পদ্মার ফাটল', 'পদ্মার ভাঙন', 'শূন্যমাঠ, 'মরা ঘাস', 'বৈশাখ', 'জ্যৈষ্ঠ', 'নিমের ছায়ায়', *মুহূর্তের কবিতা* কাব্যের 'বৈশাখী', 'ঝড়', 'বৃষ্টি', বর্ষার বিষণ্ন চাঁদ', 'ময়নামতির মাঠে', 'নদীর দেশ', 'ধানের কবিতা', 'সাম্পান মাঝির গান', প্রভৃতি কবিতা –

দু'শো বছরের খেলা। ব'লে গেল হাড়ের মিছিল
দু'শো বছরের মারীরোগ। সম্পূর্ণ রাখিয়াছিল
অন্তঃসারশূন্য করি। দেরী ছিল চরম পংকিল
আঘাতের। পদ্মার পাড়ের মত চূর্ণ ক'রে দিল
সে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু (শাসন সৃজিত অপঘাত)
পদ্মার দু'তীরে শুধু গাঢ়তর হ'ল কৃষ্ণরাত ॥
(পদ্মার ফাটল/ *হে বন্য স্বপ্নেরা*)

'বৈশাখের মরা মাঠ পড়ে থাকে নিস্পন্দ যখন/ নিস্প্রাণ, যখন ঘাস বিবর্ণ, নিস্প্রভ ময়দান,/ যোজন যোজন পথ ধূলি-রুক্ষ, প্রান্তর বিরান,/ শুকনো খড়কুটো নিয়ে ঘূর্ণী ওঠে মৃত্যুর মতন; তখন 'বিদ্যুৎ চমকে তার সাড়া জাগে সমস্ত আকাশে/ .../ ধ্বংসের আহ্বান নিয়ে অনিবার্য সে আসে সে আসে ॥' (বৈশাখী/ *মুহূর্তের কবিতা*)। এ রকম আরো অনেক কবিতার উল্লেখ করে দেখানো যায় ফররুখ আহমদের মধ্যে উত্তর-উপনিবেশিক চারিত্র্য এবং নিসর্গচেতনা কীভাবে একাকার হয়ে গেছে।

ফররুখ আহমদের সমসাময়িক কবি সৈয়দ আলী আহসানের নিসর্গ বড় বেশি মননশীল, এবং পাশ্চাত্যভাবনার ফল। তথাপি তাঁর 'অন্তর্গূঢ় চৈতন্যের সঙ্গেই প্রকৃতির আলো-হাওয়া-জল-মাটি-পাখি-গাছ-নদী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর অস্তিত্বচেতনা তাঁরই চারপাশে প্রকৃতির অবারিত সুন্দর অনুষঙ্গে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতিকে মানব-স্বভাবের ভেতরে নান্দনিক দৃষ্টিতেই রূপায়িত করার প্রয়াস পান তিনি':

আমার পূর্ব-বাংলা একগুচ্ছ / অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায় / একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ
(আমার পূর্ব-বাংলা : দুই/ *একক সন্ধ্যায় বসন্ত*)

কিংবা যখন বলেন– 'সেদিন রাত্রে চাঁদকে কুয়াশার মধ্যে/ মনে হয়েছিলো/ দুধে-ভরা খুব বড় একটি পেয়ালার মতো।' তখন তাঁর নিসর্গচেতনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁর

নান্দনিকচেতনা ইউরোপ-প্রভাবিত, উত্তর-ঔপনিবেশিক নয়। আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫) ও আবুল হোসেন (১৯২১-)-এর প্রকৃতি ও দেশচেতনাও কল্লোলীয় কবিদের মতো পাশ্চাত্যের আদলে গড়া।

পঞ্চাশ ও ষাট দশকে বাংলা কবিতার মূল ধারা প্রবাহিত হয় কল্লোল গোষ্ঠীর পথ ধরেই। ব্যক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য লাভ করে। প্রতীচ্যীয় নাগরিকচেতনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময় মার্কসবাদী জীবনবীক্ষা এবং স্বাধিকার আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। সে কারণে কারো কারো কণ্ঠে প্রতিবাদের ধ্বনি উচ্চারিত হলেও তা উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের চারিত্র্য পায় নি। আর বাংলাদেশ বলতে তখনও গ্রামই বোঝাত। সে কারণে প্রত্যেক কবির মধ্যেই নিসর্গ কম-বেশি জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু তাঁরা প্রকৃতিকে দেখেছেন কতকটা ছায়াছবি উপভোগ করার মতো মানসিকতা নিয়ে।

শামসুর রাহমানের (১৯২৯-২০০৬) মানসগঠনে এবং কাব্যচিন্তায় পাশ্চাত্যের প্রভাব ব্যাপক। পশ্চিমের প্রতিস্পর্ধী চিন্তা তিনি করেন না। তবে কখনও কখনও তিনিও উপনিবেশিতের চরিত্র এঁকে উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন–

কোন দেশী গাড়ল এ লোক? কোন দেশী?
গোত্র নেই, দেশ নেই তার। সে কি ছদ্মবেশী
শৃঙ্খলিত কিন্তু করজোড়ে তোতা পাখির মতন
ধন্যবাদ ধন্যবাদ বলে সারাক্ষণ।
...
খেলা শেষ হ'লেই সে শৃঙ্খলিত পুনরায়, কেউ তার
চুল ধরে টানে কেউ কেউ ছোঁড়ে লাথি, যন্ত্রণার
রেখাবলি ফোটে মুখে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে ভারি
মজা পায় নানা পথচারী,
ছুঁড়ে দ্যায় ছোলা কিংবা বাদামের খোসা কত ছলে,
সে শুধু ধ্যানীর মতো সর্বক্ষণ ধন্যবাদ ধন্যবাদ বলে।
(গাড়ল)

'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' কাব্যের দীর্ঘ গদ্যকবিতা 'চাঁদ সদাগর'-এ বেহুলা-লখিন্দর পুরাণ-কাহিনীকে অবলম্বন করে শামসুর রাহমান 'চাঁদ সদাগরের কণ্ঠ দিয়ে মনসা দেবীর বিরুদ্ধে নয়, বরং তৎকালীন স্বদেশী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তথা শাশ্বত অন্যায়, অত্যাচার ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছেন দারুণ রোষে।' এই স্বদেশী স্বৈরাচার ঔপনিবেশিক শক্তিরই প্রচ্ছায়া ভিন্ন তো কিছু নয়।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেছেন, 'শামসুর রাহমানের শহর... একটি অভ্যাস, বা অসুখ এবং অবসাদ ইত্যাদি উপচে পড়া শব্দের সাহায্যে অঙ্কিত হয়।' পাশ্চাত্যপ্রভাবিত নাগরিকচেতনাকে তিনি চূড়াস্পর্শী করে তোলেন। তাঁর নিসর্গ এবং নিসর্গভাবনাও সে কারণে শাহরিক এবং চেতনায় প্রতীচ্য-অনুবর্তী:

আমাদের বারান্দায় ঘরের চৌকাঠে

কড়িকাঠে চেয়ারে টেবিলে আর খাটে
দুঃখ তার লেখে নাম। ছাদের কার্নিশ, খড়খড়ি
ফ্রেমের বার্নিশ আর মেঝের ধুলোয়
দুঃখ তার আঁকে চকখড়ি/ এবং বুলোয়
তুলি বাঁশি-বাজা আমাদের এই নাটে।
...
রৌদ্রঝলকিত ভাঙা স্তিমিত আয়নায়/ নববর্ষে খুকির বায়নায়
আমার রোদ্দুর আর আমার ছায়ায়/ দুঃখ তার লেখে নাম।
(দুঃখ/ *রৌদ্র করোটিতে*)

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩) শাহরিক প্রকৃতিকে মানবিক প্রকৃতির সঙ্গে মেশাতে চেয়েছেন। সেখানে কখনও কখনও ঔপনিবেশিকতার অভিজ্ঞতা প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু তাঁর নিসর্গ শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতার ফসল হয়েই থাকে।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১) উপনিবেশের চিত্র আঁকতে গিয়ে লিখেছেন–

পাখিরা বসতে পারে এমন কোনো বৃক্ষ নেই
জোনাকি লুকাতে পারে এমন কোনো গুল্ম নেই
সূর্য শীতল হবে এমন কোনো নদী নেই
এবং আমার বিচিত্র শব্দাবলী বিবর্ণ
বৈশাখের শিলাপাতে আহত শস্যের মতো বিচূর্ণ
(বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা)

কিন্তু উত্তর-ঔপনিবেশিক নিসর্গচেতনায় উজ্জীবিত কবি 'বিশীর্ণ নদী কিংবা রুক্ষ মৃত্তিকা' চান না, মেনে নিতে পারেন না 'ভাঁটি অঞ্চলের বিপন্ন কৃষকের' দুর্ভাগ্য। –'আমি কেমন করে/ মরা গাঙ্গে বান আনবো/ কৃষকের ঘরে শস্যের দানা তুলে দেবো/ যুবকের বুকে ভালবাসার ধন তুলে দেবো/ অথবা বর্ণাঢ্য অরণ্য সৃষ্টি করবো?' ঔপনিবেশিক শক্তি তার সে ক্ষমতা ও সাহস কেড়ে নিয়েছে। 'সাহসী পুরুষ নিহত।' তিনি সাহসী পুরুষের আগমন কামনা করেন। প্রার্থনা করেন–

আমাদের ভূমি/ প্রভাতে সূর্যাস্তে যেন রঞ্জিত হয়
ভাদ্রে কার্তিকে যেন বারিসিক্ত হয়
কৃষকেরা কাজ করে কৃষকের গাভী
সুস্থ সবল থাকে নিরাপদে থাকে।
আমাদের বিশুষ্ক ভূমি/ তিমির মতন যেন জলে ভেসে ওঠে
আমাদের তৃষ্ণার্ত ভূমি
জননীর শিশু যেন স্তন্য পান করেন
আমাদের চির বন্ধ্যা ভূমি
বৃষ্টির আদরে যেন গর্ভবতী হয়।
(বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা)

সৈয়দ শামসুল হকও (১৯৩৫) এ রকম প্রশ্ন তোলেন, যদিও তা আসে ব্যক্তির একান্ত অনুভূতি হিসেবে। কিন্তু এসব মানসিক সংকট তো উপনিবেশেরই সৃষ্টি। সরাসরি ঔপনিবেশিক করাল গ্রাসের চিত্রও তিনি এঁকেছেন–

নিচে গ্রাম, গঞ্জ, হাট, জনপদ, লোকালয় আছে ঊনসত্তর হাজার।
ধবল দুধের মতো জোৎস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ– পূর্ণিমার।
নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, নদী নষ্ট, বীজ নষ্ট, বড় নষ্ট যখন সংসার
(নূরলদীনের সারাজীবন)

এবং তার প্রতিকার ও প্রতিরোধে বিপ্লবী পূর্বপুরুষ নূরলদীনকে স্মরণ করেছেন–

কালঘুম যখন বাংলায়
তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আবার নূরলদীন দেখা দেয় মরা আঙিনায়।
...
নূরলদীনের কথা যেন সারা দেশে
পাহাড়ী ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাসায়,
অভাগা মানুষ যেন জেগে ওঠে আবার এ আশায়
যে, আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়,
আবার নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায়
দিবে ডাক, 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবাই?'
(নূরলদীনের সারাজীবন)

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চেতনার এভাবে মেলবন্ধন ঘটে তাঁর কাব্যভাবনায়।

যে কোনও বিবেচনায় আল মাহমুদ (১৯৩৬) উত্তর-ঔপনিবেশিক নিসর্গতত্ত্বের সবচেয়ে সফল প্রতিনিধি কবি। তিনি উপনিবেশিকতাকে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করেন, তার প্রতিবাদ করেন, প্রতিরোধ কামনা করেন, তাকে অতিক্রম করতে পুনরুদ্ধার করেন পূর্বপুরুষকে, এবং শক্তি ও চেতনা লাভ করতে আঁকড়ে ধরেন বাংলার নিসর্গকে।

এখনো স্মরণ হয় ঈগল-স্বভাব তোর পূর্বপুরুষেরা
ইচ্ছার সামগ্রী সব বিঁধে নিতো বিজয়ী নখরে;
...
তুই শুধু পারলি না গোত্রছাড়া, নখদন্তহীন।
গগনভেরীর
বংশের গৌরব অই ঢেকেছিস বাদামি খদ্দরে?
...
প্রশ্ন শুনে নতশিরে পদস্পর্শ করে বললাম–
সীতার উদ্ধারে ব্যর্থ, রাক্ষসের অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন আমি
স্যার, এক আহত গরুড়।
(সরল ধিক্কার/ *কালের কলস*)

উপনিবেশিতের এই ছবি বড় মর্মান্তিক কিন্তু বাস্তব। এতে পুরাণের নবনির্মাণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। একইভাবে অন্যত্র অপ্রতিরোধ্য ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের চিত্র আঁকেন

তিনি– গাঁয়ের ছেলে ফিরে আসে। কিষাণেরা তামাক সাজিয়ে, বিচালি বিছিয়ে, বসতে দিয়ে বলে– 'লজ্জার কি আছে বাপু, তুমি তো গাঁয়েরই ছেলে বটে/ আমাদেরই লোক তুমি।' ছেলে বসতে গেলে দেখা যায়–

কী মুস্কিল! দেখলো যে, নগরের নিভাঁজ-পোশাক
খামছে ধরেছে হাঁটু। উরুতের পেশী থেকে সোজা
অতদূর কোমর অবধি
সম্পূর্ণ যুবক যেন বন্দী হয়ে আছে এক নির্মম সেলাইয়ে।
যা কিনা এখন তাকে স্বজনের সাহচর্যে, আর
দেশের মাটির বুকে, অনায়াসে
বসতেই দেবে না।
(খড়ের গম্বুজ/ *সোনালি কাবিন*)

কিন্তু আল মাহমুদ ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হন না, তিনি দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজি নন, তিনি তৎক্ষণাৎ উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান–

তোমাকে বসতে হবে এখানেই, এই ঠাণ্ডা
ধানের বাতাসে।
(খড়ের গম্বুজ/ *সোনালি কাবিন*)

এইভাবে আল মাহমুদ মানসচেতনায় উত্তর-ঔপনিবেশিক হয়ে ওঠেন। তাঁর নিসর্গও তাঁর সঙ্গী হয়। প্রকৃতি ও জীবনকে তিনি ইন্দ্রিয়ঘন চিত্রকল্পের মধ্যদিয়ে কেবল জীবন্তই করেন না, পরস্পরের শক্তিদায়িনী হিসেবেও চিত্রিত করেন।–

ক্ষুধার্ত নদীর মতো তীব্র দু'টি জলের আওয়াজ
তুলে মিশে যাই চলো অকর্ষিত উপত্যকায়,
চরের মাটির মতো খুলে দাও শরীরের ভাঁজ
উগোল মাছের মাংস তৃপ্ত হোক তোমার কাদায়,
ঠোঁটের এ-লাক্ষারসে সিক্ত করে নর্ম কারুকাজ
দ্রুত ডুবে যাই এসো ঘূর্ণ্যমান রক্তের ধাঁধায়।
(সোনালি কাবিন ৩/ *সোনালি কাবিন*)

আল মাহমুদের নিসর্গ স্বাধীন ও গতিশীল, যেন প্রাণময়, অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের মতোই।

আমরা কোথায় যাবো, কতদূর যেতে পারি আর
ওই তো সামনে নদী, ধানক্ষেত, পেছনে পাহাড়।
বাতাসে নুনের গন্ধ, পাখির পাঁপড়ি উড়ে যায়
দক্ষিণ আকাশ জুড়ে সিক্তডানা সহস্র জোড়ায়;
...
প্রাণের রঙের মত পরাজিত প্রেমের কেতন
আবার তুলতে চাই পলাতক আমরা ক'জন।
মানুষের বাসস্থান, লাউমাচা, নীলাম্বরী নিয়ে
আমরা থাকতে চাই; এ হৃদয় যেন ঝিলকিয়ে

কখনো উঠতে চায়, আমাদের পূর্বপুরুষের
তাড়ির আসরে গিয়ে অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে নিজের
আদিম সাহসে বলে, আমাদের হাতে দিন
কর্পূর গন্ধের বিন্দু ফোঁটা ফোঁটা বাসনা রঙিন।
(প্রত্যাবর্তন/ *কালের কলস*)

এইভাবে তাঁর কবিতাসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে আল মাহমুদ নিজে যেমন উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনায় জ্বলে ওঠেন তেমনই তার মানুষ ও নিসর্গকেও উত্তর-ঔপনিবেশিকরূপে চিত্রিত করেন।

ওমর আলী (১৯৩৯) নিসর্গকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে অবলোকন করেন। জসীম উদ্‌দীনের পর তিনিই প্রকৃতিকে এত সরল সহজভাবে মানবিক অনুভূতির মধ্যে দিয়ে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃতিদর্শনও পরিব্রাজকের মোহমুগ্ধতায় আপ্লুত, এবং কখনও কখনও নাগরিকবোধেও আক্রান্ত:

এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি,
আইভি লতার মতো সে নাকি সরল, হাসিমাখা;
সে নাকি স্নানের পরে ভিজে চুল শুকায় রোদ্দুরে,
রূপ তার এদেশের মাটি দিয়ে যেন পটে আঁকা।
(এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি)

শহীদ কাদরীর (১৯৪২-) নিসর্গচেতনা নাগরিক, এবং উপনিবেশিক শিল্পভাবনার প্রভাবে জারিত।

ভীষণ ক্ষুধার্ত আছি : উদরে, শারীরবৃত্ত ব্যেপে
অনুভূত হ'তে থাকে– প্রতিপলে– সর্বগ্রাসী ক্ষুধা।
অনাবৃষ্টি– যেমন চৈত্রের শস্যক্ষেত্রে– জ্বেলে দ্যায়
প্রভূত দাহন– তেমনি ক্ষুধার জ্বালা, জ্বলে দেহ।
...
ভাত দে হারামজাদা, তা-না-হ'লে মানচিত্র খাবো।
(ভাত দে হারামজাদা/ *চুনিয়া আমার অর্কেডিয়া*)

রফিক আজাদ (১৯৪৩-) এই সাহসী উচ্চারণ ছুঁড়ে দিয়ে আলোড়ন তুলেছিলেন চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে। কালিক প্রেক্ষিত থেকে আলাদা করে নিয়ে তাঁর এই ঘোষণাকে উত্তরউপনিবেশিক চেতনার ফল হিসেবে গণ্য করা চলে। এর মধ্যে নাগরিক নিসর্গভাবনা বর্তমান।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০) প্রতীচ্যের শিল্প ও প্রকরণভাবনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। তাঁর নাগরিক নিসর্গচেতনা একান্তই ব্যক্তিবাদী, নন্দনভাবনায় আপুত, প্রতিবাদহীন। তবে হঠাৎ কখনও তিনিও অবলোকন করেন এবং প্রশ্ন তোলেন–

চাঁদের মুখে ঐ ধুলো ছুঁড়ে মারল পৃথিবী, আর আকাশের ব্রিজ ঝনঝনা তুলে ফের স্থির হয়ে যায় নক্ষত্রের ঢেউয়ের উপর; কেবলি নির্দেশ দিচ্ছে তারা চোখ পিটপিট করে: 'দুপুর নিবিয়ে, ফুল মেখে নাও কৈশোরবেলায়।'

ফুটো-করা চৈতন্যের বাঁকা খেজুর গাছের দেহ থেকে মাধুরী ঝরে পড়ছে স্বরূপের অচেনা কলসে, কথা হয় রামধনুর ভিতর হু-হু টেলিগ্রাফে শৈশবের পিঁড়ির উপর বসে পড়ে:

'কোলে করে প্লাবন ঠেকাচ্ছি।' পদ্মার, নাকি শিল্পের?
(জীবন, আমার বোন/ *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ*)

আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫) দেখেন 'রমণীর বুকের স্তনে আজ শিশুদের দুধ নেই', কিন্তু তিনি চান—

সূর্য হোক শিশিরের ভোর, মাতৃস্তন হোক শিশুর শহর!
...
এইভাবে নতজানু হতে চাই ফলভারানত বৃক্ষে শস্যের শোভায় দিনভর
তোমার ভিতর ফের বালকের মতো ঢের অতীতের হাওয়া
খেয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চাই!
(উদিত দুঃখের দেশ/ *যে তুমি হরণ করো*)

তার এই অভীপ্সার পাশাপাশি আমরা পড়ে দেখি তিনি এই ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের মধ্যে নিজের অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে নেন—

মারী ও বন্যায় যার মৃত্যু হয় হোক। আমি মরি নাই— শোনো
লেবুর কুঞ্জে শস্যে সংগৃহীত লেবুর আত্মার জিভে জিভ রেখে
শিশু যে আস্বাদ আর নারী যে গভীর স্বাদ
সঙ্গোপনে শিহরণে পায়— আমি তাই
নতুন ধানের ঋতু বদলের পালা শেষে
শস্যিতা রৌদ্রের পাশে কিশোরীরা যে পার্বণে আজো হয়
পবিত্র কুমারী শোনো— আমি তাতে আছি।
...
আমি মরি না, মরি না কেউ কোনোদিন কোনো অস্ত্রে
আমার আত্মাকে দীর্ণ মারতে পারবে না।
(নচিকেতা/ *পৃথক পালঙ্ক*)

আবুল হাসানের মননে নাগরিকতাবোধ থাকলেও তা নিসর্গকে অস্বীকার করে না, যে নিসর্গ উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনাকে উসকে দেয়।

'বাঙালি জাতিসত্তার মর্মবীজকে উপলব্ধি করে প্রাচ্য-প্রতীচ্য বিষয়ক পঠন-পাঠনের অভিজ্ঞতা নিয়ে' আবির্ভাব মুহম্মদ নূরুল হুদার (১৯৪৯)। উত্তর-ঔপনিবেশিক ধারার নারীবাদী চেতনার দ্বারা উজ্জীবিত এই কবি দ্রাবিড়সভ্যতার সুলুকসন্ধান করে আবহমান বাঙালি নারীর প্রতীক আঁকেন। সে কারণে তাঁর নিসর্গভাবনা ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণকে আশ্রয় করে। তিনি বলেন—'ত্রিভুবন উড়ে এসে/ পাতা ও মাটির নীড়ে গভীরে দাঁড়াও।' কিন্তু তাঁর এই ভাবনা ব্যক্তিবাদী।

এর পরে, অর্থাৎ স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে, উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি কালিক অস্থিরতা, হতাশা, যন্ত্রণা কবিদের আত্মপ্রকাশের অবলম্বন হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে মেশে রোমান্টিক বোধ।

প্রথম দিকে আধুনিকতাবাদ ও মার্কসীয় জীবনবীক্ষা এবং পরে প্রতীচ্যের বিভিন্ন মতবাদ, বিশেষত উত্তর-আধুনিকতাবাদ, এদের প্রভাবিত করে। আশির দশক থেকে ইসলামের আশ্রয়ও নতুনভাবে দেখা দেয়। রাজনীতিমুখিতা (মন্দ অর্থে দলবাজি) কবিদের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়। তবু কারো কারো মধ্যে প্রতিবাদ, নিসর্গপ্রীতি, লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি অঙ্গীকার নান্দনিক স্বীকৃতি লাভ করে। যেমন নাসির আহমেদ। –জানতাম সুন্দর সে তো স্নিগ্ধতার নাম/ ফুলের উপমা কিংবা শান্ত শরতের/ উদার নীলিমা মগ্ন নির্মেঘ আকাশ।' এভাবে তিনি ব্যক্তির অনুভূতি ও উপলব্ধিকে প্রকৃতির মধ্যে চারিয়ে দেন।

এই ধারার আরেকজন উজ্জ্বল কবি আবু হাসান শাহরিয়ার। তিনি যখন উচ্চারণ করেন– 'শোনো ভাই জলদস্যু শোনো সওদাগর/ শোনো হে সভ্যতা আমি মাটিবংশধর।/ শবরপা চন্দ্রাবতী দাও পদধূলি/ কেহ না পড়ুক খাতা পদ্যে ভরে তুলি ॥' (ব্রাত্যগীতিকা *: একলব্যের পুনরুত্থান*) তখন সেটি কেবলই প্রচল নান্দনিক ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহই ঘোষিত হয় না, তা উত্তর-উপনিবেশিক জাগরগীতিও হয়ে ওঠে। এ হচ্ছে 'আবহমান বাঙলার চিত্রকল্পের সমাহারে ব্যক্তিবিশেষের আত্মবিশ্বাস ও পবিত্র অহংবোধের দাঢ্য উচ্চারণ।' এই উচ্চারণ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তিনি বলেন–

> সার্কাসের তাঁবু পড়ে উল্লুকের বহুব্রীহি মাঠে। বুদ্ধির ঢেঁকিতে ধান; শিবকণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত। পঁচিশে বৈশাখ আজ; বাঙলা একাডেমি যাবে শান্তিনিকেতনে। কোলাপুরি চটি পায়ে সঙ্গে যাবে পুলিশ ব্যারাক। কেউ কেউ খ্যাতিমান মিডিয়ার ম্যানিপুলেশনে। সমকাল সমস্বরে তেড়ে ফুঁড়ে আসে। হালের সকল কাব্য পাঠযোগ্য নয়। বিজ্ঞাপনি ঢেউয়ে ভাঙে পাড়ের বসতি। নাওয়ের বাদাম তুলে ছুটে চলে অধুনাস্তিকতা। কবিতার শীষে লাগে পশ্চিমের হাওয়া। আমি ভাগচাষী; বুঝি পুবের তেভাগা। আকাশে লাগাও সিঁড়ি; এ কবিতা কার? চাঁদের বদলে আজ উঠেছেন চারু মজুমদার।
>
> (চাঁদের বদলে আজ উঠেছেন চারু মজুমদার/ *ফিরে আসে হরপ্পার চাঁদ*)

এছাড়াও *ফিরে আসে হরপ্পার চাঁদ* কাব্যের 'চলিতেছে মুক্তপুঁজি; আসিতেছে শতাব্দীর ভোর', *হাটে গেছে জড়বস্তুবাদ* কাব্যের 'গোপন বৈঠক ডাকো; প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কই', 'তোমার বুকের মাপে চাঁদ উঠেছে সাহেববাজারে', 'তখন পুঁজির পাখি ডেকেছিল টুইন টাওয়ারে', 'বুশ-পৃথিবীকে আমি নীলখামে প্রেমপত্র লিখি', 'পুড়িতেছে প্যালেস্টাইন; হাসিতেছে দেবতার ক্লোন', 'কন্ট্রাসেপটিভ হাতে বিশ্বব্যাংক দুয়ারে দাঁড়ানো', *সে থাকে বিস্তর মনে বিশদ পরাণে* কাব্যের 'ক্ষেপেছে পুঁজির হাতি; মাহুতেরা সভায় বসেছে' প্রভৃতি কবিতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও নব্য উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ যেমন স্পষ্ট, তেমনই *একলব্যের পুনরুত্থান* কাব্যের 'মাটিবর্তী', 'বর্ষার হাওড়ে একদিন', *এ বছর পাখি বন্যা হবে* কাব্যের 'এখন ঘড়িতে বাজে অন্ধকার', 'জলবাউল ও সবুজের প্রতিকৃতি', 'নিসর্গসাম্রাজ্য ও সাম্যবাদী বৃক্ষ', *তোমাদের কাঁচের শহর* কাব্যের 'মানুষ ও প্রকৃতি', *হাটে গেছে জড়বস্তুবাদ* কাব্যের 'নিসর্গরণন' প্রভৃতি কবিতায় তার শেকড়লগ্ন নিজস্ব নিসর্গভাবনা ফুটে উঠেছে। শাহরিয়ারের *বালিকাশ্রম* কাব্যগ্রন্থটি এক্ষেত্রে অবশ্যপাঠ্য। তপোধীর ভট্টাচার্য বলেন–

> ...ডাঙ্কেল প্রস্তাব ও গ্যাট চুক্তির পরবর্তী দুনিয়ায় স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে নব্য উপনিবেশবাদের আক্রমণ নিরঙ্কুশ হয়ে পড়েছে। দখলদারদের প্রসার শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অধিসংগঠনে আবদ্ধ নেই; সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক উপরিকাঠামোয় ঔপনিবেশিক শক্তির শ্যেনচক্ষু কেন্দ্রীভূত।

> ...গত কয়েক বছরে প্রতিটি গণমাধ্যম কার্যত প্রভুশক্তির স্বেচ্ছাবৃত দাসে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে। নব উপনিবেশবাদ উপগ্রহ-প্রযুক্তিকে কব্জা করে নিয়ে মহাকাশে তাদের যে-জাল বিছিয়ে দিয়েছে তার ফলে অজ পাড়াগাঁ থেকে মহানাগরিক জীবন পর্যন্ত বৈদ্যুতিক গণমাধ্যমগুলি তাদের মোহিনী মায়ায় গেঁথে নিয়েছে। ...সমস্তই পণ্যসর্বস্ব, বাজারের বিক্রয়যোগ্যতা দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে সব মূল্যমান। গন্তব্যহীন যাত্রায় প্ররোচিত করার জন্যে নব্য উপনিবেশবাদ এভাবে নিরন্ধ্র ও অবক্ষয়ক্লিষ্ট আধুনিকোত্তর সমাজকে ব্যতিক্রমহীন একমাত্র সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে।
>
> (উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ/ *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*)

এ অবস্থায় উত্তর-উপনিবেশিক তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে 'যাবতীয় ছদ্মবেশের উন্মোচন এবং অলীক বাস্তবতার বিনির্মাণ' এবং পুনর্নির্মাণ। নিসর্গতত্ত্ব এক্ষেত্রে একটি বড় হাতিয়ার।

'বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য মূলত ঔপনিবেশিক চেতনা-সম্পৃক্ত মহাসন্দর্ভের কাছে আত্মসমর্পণের দলিল।' –তপোধীরের এ কথা পুরোপুরি গ্রহণ না করলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, 'ঔপনিবেশিক আধুনিকতা'কে প্রত্যাখ্যান বা বিনির্মাণ করা ছাড়া আমাদের সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক মুক্তি অসম্ভব। কারণ, 'স্ববিরোধিতা আর আত্মঘাত দিয়ে গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রতিবেদন; প্রতিমূল্যবোধ ও প্রতিবাস্তবতার চাষ হয়েছে সর্বত্র। সত্যভ্রম ঢেকে দিয়েছে সত্যকে।' একালে এককেন্দ্রিক বিশ্বায়নের চাপে 'সকল প্রাকৃতায়নের প্রেরণা ও প্রাসঙ্গিকতা লুপ্ত হতে বসেছে।' সমকালের কবিরা এ সম্বন্ধে খুব সচেতন বলে মনে হয় না। তাদের অনেকের কবিতায় নিসর্গ আছে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধও আছে, কিন্তু আদর্শিক লক্ষ্য তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর যথার্থভাবে যথেষ্ট সচেতন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়।

সহায়তাসূত্র :

১. *Literary Theory and Criticism*, edited by Patricia Waugh; Oxford University Press, New Delhi; First Indian Edition, 2006

২. *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, তপোধীর ভট্টাচার্য; অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা; তৃতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৬

৩. *কতিপয় প্রবন্ধ*, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম; বাংলা একাডেমী, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯২

৪. *কবিতার আধুনিকতা*, সায়ীদ আবুবকর; সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা; প্রকাশকাল : জুন ২০১০

৫. *হাজার বছরের বাংলা কবিতা*, মাসুদুল হক; ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা, ২০০৮

৬. মোহাম্মদ নূরুল হক, আবু হাসান শাহরিয়ার : সোনালি ডানার ঈগল; নন্দন, (সম্পাদক : নাজিব ওয়াদুদ), রাজশাহী; দ্বিতীয় সংখ্যা জানুয়ারি ২০১০

৭. ফজলুল হক তুহিন, বাঙলার প্রকৃতিপাঠ; নন্দন, (সম্পাদক : নাজিব ওয়াদুদ), রাজশাহী; তৃতীয় সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১০

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

হার না মানা বিদ্যাসাগর

গোলাম কবির*

সারসংক্ষেপ: স্বর্ণপ্রসূ উনিশ শতক বাংলাদেশে শিক্ষা-সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির নবজীবন সঞ্জীবনে বহুসংখ্যক কীর্তিমান বাঙালির জন্ম দিয়েছে। এঁদের মধ্যে অবশ্যই অন্যতম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। তাঁর অনন্যতার কথা স্মরণে রেখে সৃজনশীল সৃষ্টি-মাধ্যমে প্রথম তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন মধুসূদন (১৮২৪-১৮৭৩) 'বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে' বলে।[১] রবীন্দ্রনাথ আরো একধাপ এগিয়ে বিদ্যাসগার প্রশস্তি করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি।'[২] বাংলাদেশের সাহিত্যে সংস্কৃতির দিকপাল এই দুই কবির 'হার্দিক' প্রশস্তির স্বরূপ অবশ্যই বিদ্যাসাগরের বিদ্যাসাগর হয়ে ওঠা এবং বাংলা গদ্যে অনন্য অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শিক্ষক হিসেবে এবং শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর কতখানি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন, সে বিষয়টি উপস্থাপনের চেষ্টা করব।

আজকের দিনের শিক্ষকসমাজ এবং শিক্ষার বেহাল অবস্থা থেকে মুক্ত হতে হলে সেই সাথে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে হলে অনমনীয় বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসরণের কথা ভাবা যায়। সম্ভবত এদিকে লক্ষ্য রেখেই ১৯৯১ সনে বিদ্যাসাগরের তিরোধানের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে 'দেশ' পত্রিকার বিদ্যাসাগর সংখ্যার সম্পাদকীয়তে যে মন্তব্য করা হয়েছিল তার সূত্র ধরে আমাদের উদ্দিষ্ট বিষয়ে অগ্রসর হব: 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তিরোধান শতবর্ষপূর্ণ হল। এটি সেই অনন্য পুরুষকে স্মরণের সুবর্ণ লগ্ন। এ ঋণ শোধের দায়ে নয়। নিজেদের শুদ্ধির জন্য সঞ্জীবনের জন্য জরুরি।'[৩]

শিক্ষকতা পেশা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয় নি বলে নিজেদের শুদ্ধির এবং সঞ্জীবনের আবশ্যকতা অনুভব করে বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাদের কী হয়েছে, কী হয় নি, তার খতিয়ান উপস্থাপন আমাদের লক্ষ্য নয়। শিক্ষক বিদ্যাসাগর এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁর উৎসর্গীকৃত কর্মযজ্ঞের কিছু বিষয় ফিরে দেখে আমাদের কর্মকাণ্ডগুলোকে যাচাই করে দেখব। জানি, এতে অনেকে ক্ষুব্ধ হতে পারেন; কিন্তু সত্যকে তো দীর্ঘসময় কৃত্রিম আলোর ঝলকানি দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না।

বিদ্যাসাগরের বিদ্যাসাগর হয়ে ওঠার পেছনে পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতীদেবী এবং সহধর্মিনী দীনময়ী দেবীর অপরিমাণ অবদানের কথা স্মরণে রেখে আমরা তাঁকে ফিরে দেখব নতুন করে। প্রসঙ্গত বলে রাখি বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার্থী থাকাকালে ১৪ বছর বয়সে ৮ বছর বয়সের দীনময়ীর পাণিগ্রহণ করেন। এ সময়ে তাঁরা উভয়ে বয়সের এমন এক পর্যায়ে ছিলেন যে দাম্পত্যজীবনের কোনো টানাপোড়েন তাঁর অধ্যবসায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি।

রামজয় তর্কভূষণের সন্তান ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পুরুষানুক্রমিক টোলের শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে মেদিনীপুরের বীরসিংহ থেকে কলকাতায় এনেছিলেন। অসাধারণ মেধাবী এই বালক পায়ে হেঁটে কলকাতা আসার পথে মাইলস্টোন

---

* প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

দেখে ইংরেজি সংখ্যা আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। সেই বালক যে টোলের পণ্ডিত মশায় হয়েই জীবনের দায়শোধ করবেন না, এটা বোধ করি তখন কেউ সম্যক উপলব্ধি করতে পারে নি। অসহনীয় দারিদ্র নিত্য সঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও অসাধারণ মনোবল বিদ্যাসাগরকে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছুতে সহায়তা করেছে। প্রথম বয়সের গ্রাম্যশিক্ষার শেষে নয় বছর বয়সে তিনি কলকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন এবং প্রায় সাড়ে বারো বছর ধরে ব্যাকরণ, কাব্য অলংকার, বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিষ ও ধর্মশাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ইংরেজি বিষয়েও তাঁর অধ্যয়ন এখানেই সূচিত হয়েছিল– পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত চেষ্টায় ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তুলনা রহিত। হিন্দু আইনের পরীক্ষায় হিন্দু ল কমিটির হাতেও তিনি উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।[৪]

১৮৪১ সালের ৪ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের (প্রথম প্রতিষ্ঠা জানুয়ারি ১৮২৪) পাঠ শেষে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত হবার পর তিনি এই সালে ২৯ ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে যোগ দেন।[৫] এ সময়ে তাঁর বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সদাগরি অফিসে ১০ টাকা বেতনের চাকরি করতেন। জনককে সম্মানের সাথে শান্তিতে গৃহে অবস্থান অথবা এমনো হতে পারে, শিক্ষকের মর্যাদা উন্নত রাখার তাগিদে পিতাকে চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে প্রভাব খাটিয়েছিলেন। এতে অনেকে ভবিষ্যতের কথা ভেবে ঠাকুরদাসকে চাকরিতে ইস্তফা না দেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি তাতে কর্ণপাত করেন নি। কেননা, ঠাকুরদাস এতদিনে বুঝে গেছেন এ ছেলে ঠাকুর দেবতাদের বিশেষ ভক্তি করেন না বটে, কিন্তু পিতা-মাতাই এর ঠাকুর দেবতা।[৬]

শিক্ষক বিদ্যাসাগর ফোর্টউইলিয়াম কলেজে নিয়োজিত হয়েছিলেন সিভিলিয়নদের বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য। পাঠ্যক্রম তাদেরই করা। পাঠ্যসূচির মধ্যে ছিল অন্নদামঙ্গল আর কেরিসাহেব মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার রামরামবসু প্রমুখের গদ্য-পদ্য রচনা। বিদ্যাসাগর শিক্ষকতার দায়িত্ব পেয়ে ভাষা শেখানোর উপযোগী গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে প্রথমে লিখেছিলেন 'বাসুদেব চরিত'। সম্ভবত সেটি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকাশিত হয় নি। পরে অধ্যক্ষ পি.টি মার্শাল সাহেবের অনুরোধে রচনা করেন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭)। বলা বাহুল্য, ফোর্টউইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গ্রন্থটি প্রথম।[৭] মাত্র একুশ বছর বয়সে বিদ্যাসাগর নিজেকে একজন দক্ষ শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শিক্ষক বিদ্যাসাগরের কর্মদক্ষতার এটি প্রথম সোপান। অনেকটা কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ছাড়া ব্যক্তি প্রতিভা উন্মোচনের অনুকূল পরিবেশ এখানে বেশি ছিল না। এতদসত্ত্বেও অদম্য এই তরুণ শিক্ষক তাদের ছাড় দেন নি। ২ এপ্রিল ১৮৪৬ সংস্কৃত কলেজে যোগদানের পর বাব-মা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করার জন্য বিদ্যাসাগর বীরসিংহ যান। তাঁদের সাথে দেখা করে পদধূলি নিতে যান তাঁর আদি শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। তখন বিদ্যাসাগরের বয়স ২৬ বছর। অল্পবয়সী শিক্ষককে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থীরা কতটুকু মান্য করে তা গুরুমশাই কৌতুকের ছলে জানতে চাইলে বিদ্যাসাগর আত্মপ্রত্যয়ের সাথে বলেছিলেন, ফোর্টউইলিয়াম কলেজের সাহেব ছাত্রদের শায়েস্তা করেছি আর এই নিরীহ ডালভাত খাওয়া ছাত্ররা আমায় মানবে না।[৮] এটা বিদ্যাসারের দম্ভোক্তি ছিল না। তাঁর কর্মযজ্ঞের খতিয়ান অনুসরণ করলে দেখা যাবে। ঈশ্বরচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে তরুণ সিভিলিয়ানরা কেবল তাঁর সাথে অন্তরঙ্গভাবে সকল বিষয়ে যে আলোচনা

করতো তা নয়, তাঁকে দিয়ে নিজেদের নামে সংস্কৃত শ্লোকও লিখিয়ে নিত।[৯] শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষার্থী বৎসল বিদ্যাসাগর ফোর্টউইলিয়াম কলেজ থেকে সংস্কৃত কলেজে সহকারি সম্পাদক পদে যোগদান করেন ২ এপ্রিল ১৮৪৬ এবং জুলাই ১৮৪৭ পর্যন্ত একবছর তিন মাস দায়িত্ব পালন কালে কর্তৃপক্ষের সাথে মতপার্থক্যের কারণে চাকরি ছেড়ে দেন। সেকালে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষিত তরুণদের উপযুক্ত কর্মসংস্থান বাঘের দুধের চেয়ে দুর্লভ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক বিদ্যাসাগর আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতাধরদের সাথে আপোস করেন নি। ফোর্টউইলিয়াম কলেজে চাকরি পাবার পর পিতৃদেবকে কর্মভার মুক্ত করেছিলেন। অথচ নিজেই উপার্জনহীন হয়ে গেলেন। এ সময়ে তাঁর আশ্রয়ে ২০ জন আশ্রিত থাকত। তিনি তাদের থাকা খাওয়া এবং লেখাপড়ার খরচ চালাতেন। এ খরচ চলতো ফোর্টউইলিয়াম কলেজে ছেড়ে আসা বিদ্যাসাগরের পদে চাকরি পাওয়া মধ্যমভ্রাতা দীনবন্ধুর উপার্জন থেকে। আর বিদ্যাসাগর বাবাকে টাকা পাঠাতেন ধারকর্য করে। এ সময়ে ময়েট সাহেবের অনুরোধে কয়েকমাস তিনি কাপ্তেন ব্যাংককে বাংলা ও হিন্দি শিখিয়েছিলেন। ধার করে বাবাকে টাকা পাঠালেও প্রাইভেট পড়িয়ে টাকা নেন নি।

সংস্কৃত কলেজ থেকে চাকরিতে ইস্তফা দেয়ার কারণ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি কিংবা বিদ্যাসাগরের অন্য কোনো দুর্বলতা ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যক্রম এবং পাঠদান ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে। এ ব্যাপারে কর্তপক্ষের চেয়ে অনেক প্রবীণ সহকর্মী তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে। বিদ্যাসাগরের প্রবল ব্যক্তিত্ব তা মেনে নেয় নি। তিনি ১৮৪৭ সালের এপ্রিল মাসে চাকরি থেকে ইস্তফার আবেদন করলে তা গৃহীত হয় ১৬ জুলাই। ‘সম্পাদক রসময় দত্ত এবং শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ময়েট সাহেব অনেক উপরোধ-অনুরোধ করিয়াও তাহার পণভঙ্গ করিতে পারিলেন না। আত্মীয় বান্ধবরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চলিবে কী করিয়াই? তিনি বলিলেন, আলু পটল, মুদির দোকান করিয়া দিন চালাইব।’[১০] অনমনীয় দৃঢ়চেতা ও সত্যসন্ধানী এই মানুষটিকে তাইতো রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘ঈশ্বরচন্দ্র চরিত্রের প্রধান গৌরব, তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।’[১১] জাতশিক্ষক এই মানুষটির বিরুদ্ধে নানাভাবে ষড়যন্ত্র হয়েছে। শিক্ষাকে যুগোপযোগী এবং আধুনিক করে ঢেলে সাজাবার পরিকল্পনায় অনেক সাবেকি তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। তিনি দমেন নি। শিক্ষকের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে শ্বেতাঙ্গ কার সাহেব জুতোসহ টেবিলে পা উঠিয়ে রেখে দম্ভ দেখালে বিদ্যাসাগর তার সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন, নিজে চটি পায়ে টেবিলে পা রেখে তার সাথে কথা বলেন। এ নিয়ে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে শিক্ষা সচিব ময়েট সাহেব তদন্তে আসেন। তদন্ত শেষে ময়েট সাহেব মন্তব্য করেছিলেন, ‘পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতন সাহসী ও তেজস্বী পুরুষ আমি বাঙালির মধ্যে আর একজনও দেখি নাই।’[১২] কেবল শিক্ষা সচিব বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন করেছিলেন তাই নয়, অপর এক শ্বেতাঙ্গ তদানীন্তন লেফটেনেন্ট গভর্নর হ্যালিডে বলেছিলেন, হাজারো মুরুব্বির জোর থাকলেও বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জয়ী হওয়া যায় না।[১৩]

শিক্ষার্থী বৎসল হার না মানা এই মহৎ মানুষটির শিক্ষা সম্পর্কিত কর্মসাধানার দিকে দৃষ্টি ফেরালে নিজেকে ভারী অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। দীর্ঘসময় শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার সুবাদে আয়নায় যখন নিজেদের চেহারা দেখি তখন ভাবি আমরা কত দীন। কর্মসংস্থানের

ক্ষেত্রে সুবিধামতো জায়গায় সুযোগের অভাবে আমরা অনেকেই পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে বেছে নিয়েছি। জোর করে কিংবা সমাদর করে কেউ আমাদের শিক্ষকতায় আনে নি। বরং আমরাই তোষামোদ করে দলের ছত্রছায়ায় কখনো কখনো কড়ির বিনিময়ে শিক্ষকতায় আসি। অথচ অচিরেই ভুলে যাই আমরা শিক্ষক পেশার মাহাত্ম্য ভুলে গিয়ে কোমর বেঁধে দাবি দাওয়া আদায়ের মিছিল সরগরম করি। পদ পদবি একই কর্মস্থলে দীর্ঘসময় অবস্থানের সুবিধা প্রাপ্তি ইত্যাদির জন্য আমাদের দায়িত্বের কথা মনে রাখি না। ক্ষমতার কাছে আছড়ে পড়ি, বিসর্জন দেই ব্যক্তিত্ব। এক সময় লক্ষ্য করা গেছে রাজনীতিকবৃন্দ শিক্ষকের কাছে পরামর্শের জন্য যেতেন। এখন উল্টো শিক্ষকরাই আদর্শের জন্য যতটুকু তার চেয়ে বেশি সুবিধা পাওয়ার জন্য ধন্না দেন, দলবাজী করেন (অবশ্য সবাই নয়)। তাছাড়া রাজনীতিকরাও চান সমর্থন আর ক্ষমতা। শিক্ষার ভবিষ্যতের কথা ততটা আমলে আনেন না। শিক্ষা আর শিক্ষকতার এই অধোগামিতার কথা ভেবে শিক্ষাবিদ প্রফেসর শহিদুল ইসলাম বলেন, ৪৭ সালে ইসলামের নামে এমন একটা রাষ্ট্র গড়েছিলাম যেখানে স্কুলের শিক্ষক হবার অনুপযুক্ত ব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে বসেছিলেন। ফলে সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয় নি। সম্ভবত স্কুলের শিক্ষক হবার মত শিক্ষক ব্যক্তি সৃষ্টি করতেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি।[১৪] তবে শিক্ষক বিদ্যাসাগরের হার না মানা চরিত্রের দৃঢ়তার কথা স্মরণ করে আমার কি নিজেদের গড়ে তুলতে পারি না?

বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করতে গিয়ে কিছু তিক্ত কথা বলা হল। অথচ আশ্চর্যের বিষয় তাঁর সমকালে এমন খাঁটি মানুষ বেশি ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে বলা যায়, 'আমাদের এই অবনমিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্ম গ্রহণ করিল আমরা বলিতে পারি নি।'[১৫]

প্রায় সাড়ে তিন বছর পর কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় আবার বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩১ বছর। ১৮৫১ সালের জানুয়ারিতে যোগদান করে ১৮৫৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত মোট ৭ বছর ৯ মাস দক্ষতার সাথে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে চাকরির বয়স শেষ হবার আগেই ৩৮ বছর বয়সে স্বেচ্ছায় অবসরে যান। এ বারের চাকরি থেকে অকালে বিদায় নেবার কারণ ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগরের অনমনীয়তা। যদিও আবেদনপত্রে স্বাস্থ্যগত কারণের কথা তিনি উল্লেখ করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহের সময় সরকার সংস্কৃত কলেজে বৃটিশ সৈন্য রাখার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়। তিনি তা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন নি। অনেকে মনে করেন তাঁর পদত্যাগের অন্যান্য কারণের মধ্যে এটিও একটি।

সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছেড়ে দেবার পর বিদ্যাসাগর ৩৩ বছর বেঁচেছিলেন। এসময়ে শিক্ষা বিস্তার এবং সমাজসংস্কারের কাজে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। বলাবহুল্য সমাজ ও শিক্ষা পরস্পরের পরিপূরক হলেও আমরা সমাজ সংস্কারের বিষয়টি আলোচনায় আনব না। শিক্ষার বিষয়কেই প্রাধান্য দিব।

উনিশ শতকের সামাজিক সময়ে প্রায় পরিকল্পনাহীন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা পরিকল্পনার বিষয়টি আমরা ফিরে দেখব:

১. বাংলা শিক্ষার বিস্তার ও সুব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। তা না হলে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ হবে না।
২. কেবল লিখন পঠন ও গণনা বা সরল অঙ্ক কষার মধ্যে বাংলা শিক্ষা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। যতদূর সম্ভব বাংলা ভাষাতেই সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে হবে এবং তার জন্য ভূগোল, ইতিহাস জীবনচরিত, পাটিগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ও শারীরবিজ্ঞান বাংলায় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।[১৬]

লক্ষণীয় শিক্ষাকে বিদ্যাসাগর ব্যাকরণ আর ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান নি। চেয়েছিলেন সর্বজনীন করতে। তিনি যে বাংলা শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে চেয়েছিলেন তার প্রমাণ দিয়েছেন বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী হিসেবে।[১৭] এ বিষয়ে আমরা গভীরে যাব না। শিক্ষা প্রসারের দিকটি কেবল আংশিক ফিরে দেখব। ইতিহাস বলছে ৭ মে ১৮৪৯-এ বেথুনস্কুল, জানুয়ারি ১৮৭৬-এ মেট্রোপলিটন কলেজ, এপ্রিল ১৮৯০-তে বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয় বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ অবদানে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া শিক্ষা প্রসার বিশেষ করে নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যাসাগরের অতুল প্রচেষ্টা যেন আমাদের কল্পনা বিলাসকেও হার মানায়। তিনি গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারের কাছে পরিকল্পনা পেশ করেই ক্ষান্ত হন নি। রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে পল্লির ধূলি-ধূসর পথে প্রান্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন তা বাস্তবায়িত করার জন্য। সে ইতিহাস কম দীর্ঘ নয়। সাহিত্য পত্রিকার পাতায় ক্ষুদ্রপরিসরে হার না মানা বিদ্যাসাগরের পরিচয় তুলে ধরা সহজ নয়। এজন্য প্রয়োজন বৃহৎগ্রন্থের। বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার বিশেষ করে বিধাব বিবাহ নারীশিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে তাঁর সমকালে বিরোধিতা কম হয় নি। শোনা যায় একবার নাকি তাঁর প্রাণনাশেরও ষড়যন্ত্র হয়েছিল।

শিক্ষক ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের কর্মসাধনায় ব্যাপক উচ্চবাচ্য না হলেও সমাজ সংস্কার ও নারীশিক্ষা প্রবর্তনে তাঁর আন্তরিকতাকে কেউ কেউ কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। বঙ্কিমচন্দ্র তো সরাসরি বলে দিলেন: 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন। তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দেয় সে যদি পণ্ডিত হয় তবে মূর্খ কে?'[১৮] বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যঙ্গোক্তির কারণ তাঁর ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতার ফসল বলে মনে করেছেন সেকালে নবীনচন্দ্র সেন।[১৯] এবং একালে অরবিন্দ পোদ্দার।[২০] আমরা আগেই বলেছি সমাজ সংস্কারের বিষয় নিয়ে বেশি অগ্রসর হব না। তবে নারীশিক্ষা প্রবর্তন এবং প্রসারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের প্রাণপাত প্রচেষ্টারও সমালোচনা হয়েছে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে যার ভূমিকা প্রবাদোপম, তিনিই আবার নিজের স্ত্রী-কন্যার শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন। স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাবার কোন চেষ্টা বিদ্যাসাগর করেন নি।[২১] এ অপবাদ স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যাদের আদেশ বিদ্যাসাগর শিরোধার্য মানতেন, তাঁরা তাঁর জনক জননী। বলা হয়ে থাকে পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষেধাজ্ঞার কারণে তিনি ঘরের দিকে নজর দিতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাকেও তাঁর কন্যাদের অল্প বয়সে পাত্রস্থ করার জন্য সমকালের এবং একালেও অপবাদ বহন করতে হচ্ছে। বিদগ্ধ রবীন্দ্র গবেষক আব্দুশ শাকুর রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রশান্তকুমার পালের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যে বাংলা থেকে নবজাগরণের হাওয়া তখন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই বাংলায় বিশেষ করে কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে নারীমুক্তি চিন্তার হাওয়ার বেগ তুলনামূলক ভাবে

বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের হিস্যায় সে প্রভাবের লেশমাত্র নাই।[২২]

ইতিহাসের এই ঘটনার পুনরাবৃত্তির কথা স্মরণে আসায় আমরা রবীন্দ্র প্রসঙ্গ উপস্থাপন করলাম মাত্র। এর গভীরেও আমরা যাব না। তবে বিদ্যাসাগর কেন নিজের অন্দরমহলে শিক্ষার আলো জ্বালতে পারেন নি, সে বিষয়ে তাঁর জীবনীকার সুবলচন্দ্র মিত্র ১৯০২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে বলেছেন, ঠাকুরদাস না কি তার পুত্রবধূদের লেখাপড়া শেখার একান্ত বিরোধী ছিলেন।[২৩] এ ধরণের দু একটি বিরূপ সমালোচনা তো হবেই। না হলে, হিউম্যানিস্ট বিদ্যাসাগর হবেন কেন? হতেন মহামানব বিদ্যাসাগর। আমরা দেখতে চেয়েছি শিক্ষক এবং ব্যাপক শিক্ষা প্রসারবতী বিদ্যাসাগরকে। এ ব্যাপারে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। জীবনে শেষ পর্যায়ে বিধবা বিবাহ বিষয়ে কিছুটা নিরুৎসাহবোধ করলেও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি হার মানেন নি।

তথ্যসূচি:

---

১. মধুসূদন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, কবিতা সংখ্যা ৮৪, মাইকেল মধুসূদন গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয়ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা (তারিখ নাই) পৃ. ২১
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম বাংলাদেশ সুলভ সংস্করণ, ১৩৮০, পৃ. ৯৭১
৩. দেশ, বিদ্যাসাগর সংখ্যা, ২৭ জুলাই, ১৯৯১ সম্পাদকীয়।
৪. ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যেও ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৪, পৃ. ১৫২
৫. বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, প্রথম ওরিয়েন্টলংম্যান সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃ. ১১০
৬. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সেই সময়, কলকাতা, ১৪০১, পৃ. ১৫২
৭. ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪
৮. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
৯. বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারিত্রপূজা, বিদাসাগর চরিত, রবীন্দ্রসমগ্র, খণ্ড ২, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৭৭৫
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
১২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৫৭
১৩. দেশ, বিদ্যাসাগর সংখ্যা, ২৭ জুলাই ১৯৯১, সম্পাদকীয়, পৃ. ১২৭
১৪. শহিদুল ইসলাম শিক্ষা সম্মেলন স্মারকগ্রন্থ, ২০০১, পৃ. ১৩৫
১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮২
১৬. বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯
১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৭
১৮. বঙ্কিমচন্দ্র, বিষবৃক্ষ, বঙ্কিমরচনাবলী, ১মখণ্ড, কলকাতা ১৯৮৩, পৃ. ২০২
১৯. ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪
২০. অরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিম মানস, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, পৃ. ৭৯
২১. স্বপন বসু, সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর সংখ্যা, ২৭ জুলাই ১৯৯১, পৃ. ৪১

২২. আব্দুশ শাকুর, রবীন্দ্রনাথকে গভীর প্রণিধান সহকারে অধ্যয়ন প্রয়োজন, সোনারদেশ, সার্ধশততম রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা, ৭ মে ২০১১

২৩. স্বপন বসু, প্রাগুক্ত উদ্ধৃতি, পৃ. ৪১

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

মধুসূদনের জীবনে জননী ও ভার্যা

ড. ফাল্গুনী রানী চক্রবর্তী*

সারসংক্ষেপ: সাগরদাঁড়ির 'দত্তজপুত্র' মধুসূদন দত্ত একক পরিবারে 'একেশ্বর' এবং নব্যধনী পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী হওয়ায় প্রযত্নের প্রাচুর্যে কিশোর বয়স থেকেই স্বেচ্ছাচারী, অমিতাচারী, উচ্চাভিলাষী হতে থাকে। ''অর্থ-মোক্ষ-যশ' প্রাপ্তিই ছিলো তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-তপস্যা। এই তপস্যার কারণে তিনি জীবনের পরমাত্মীয়দের স্নেহ-প্রেম-শ্রদ্ধা হতে বঞ্চিত হয়েছেন। স্বীয় সংকল্প সাধনে যাঁরা তাঁকে আশ্বাস ও নির্ভরতা দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন প্রতিশ্রুতি। তাঁদের প্রবঞ্চনাই মাইকেল চিত্তে দহন সৃষ্টি করেছে। 'আত্মবিলাপ' করেছেন তরুণ কবি। জননী জাহ্নবী দেবীর একমাত্র জীবিত সন্তান মধু মায়ের মমতাকে অবজ্ঞা করেছিলেন, স্বদেশ-স্বজন-স্বভাষাকে প্রত্যাখান করেছিলেন, প্রিয়তমা পত্নী রেবেকা এবং চার সন্তানকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, আবেগে অন্ধ মধুসূদন গোপনে হেনরিয়েটাকে করেছেন জীবনসঙ্গী। কিন্তু কোনকিছুতেই তিনি পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। কারণ ছিল তাঁর অস্থির চিত্তের চাঞ্চল্য এবং অসংযমী মানসিকতার বিকার। দ্বিমুখী দ্বন্দ্বে তিনি শেষাবধি হয়েছিলেন জর্জরিত। বাহ্যত মধুসূদনকে চরম স্বার্থান্বেষী মনে হলেও, মধু-হৃদয় ছিলো জননী, ভার্যা, জীবনসঙ্গী এবং আত্মজ-আত্মজাদের প্রতি স্নেহসিক্ত। শুধু প্রকাশভঙ্গি ছিলো স্বতন্ত্র। ব্যক্তি মধুসূদন এবং কবি মধুসূদনের জীবন অসমান্তরাল হয়েও তাঁর স্বাতন্ত্র্যই তাঁকে করেছে মহিমান্বিত।

'মধুসূদনের প্রপিতামহ রামকিশোর দত্ত বাসিন্দা ছিলেন বর্তমান খুলনা (এবং সেকালের যশোর) জেলার।'[১] তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর তিন ছেলে – রামনিধি, দয়ারাম এবং মানিকরাম এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন মাতামহের গ্রাম– সাগরদাঁড়িতে। রামনিধি দত্তের চার পুত্রের জ্যেষ্ঠ রাধামোহন, মধ্যম মদনমোহন, তৃতীয় দেবীপ্রসাদ এবং কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ দত্ত। মধুসূদন রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র জীবিত সন্তান। মধুসূদনের পিতা এবং জেঠারা সবাই ভাগ্য তৈরি করেছিলেন ফারসি শিখে। তাঁর বাবা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন কলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল। জেঠা রাধামোহন যশোরের সেরেস্তাদার, মেজ জেঠা মদনমোহন কুমারখালির মুন্সেফ আর সেজ জেঠা যশোরের উকিল। রাজনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের বিদ্যা এবং বুদ্ধিবলে ভাগ্য উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছিল। তাঁর যেমন ছিল বিদ্যার গৌরব তেমনি ছিল বিত্তের অহংকার। স্বয়ং লক্ষ্মী যেন তাঁর গৃহে অধিষ্ঠিত হলেন। নব্যধনী দত্ত পরিবার বিশেষ করে রাজনারায়ণ দত্ত বিত্ত-বৈভবে 'বাবু' বনে গেলেন। জমিদারি কিনে ফেললেন। কলকাতার খিদিরপুরে বড় রাস্তার পাশে একটা ইমারত কিনে ফেললেন। জাঁকজমকপূর্ণ বাড়ি-ঘর শুধু নয়, চলনে-বলনে, বসনে-ভূষণে, আহারে-বিহারে এসেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। তাঁর সুযোগ্য পুত্র মধুসূদন উত্তরাধিকারসূত্রে বিলাসিতা, বাকপটুতা, অমিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণ অর্জন করেছিলেন। সে জন্যে এক মোহর দিয়ে চুল ছাঁটাতেন নিজের খুশির চেয়ে অন্যদের বিস্মিত করবার অভিপ্রায়ে। পিতার নিকট থেকে মধু সৌন্দর্যপ্রিয়তা এবং বদান্যতার বৈশিষ্ট্যও পেয়েছিলেন। শোনা যায়, রাজনারায়ণ দত্ত সংগীতপ্রেমিক ছিলেন এবং সুগায়কদের তিনি দরাজ দিলে দান করতেন। কেবল বিত্তে নয়, মধুসূদনের পিতা প্রেমময় চিত্তের অধিকারীও ছিলেন। 'চারি ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়া রাজনারায়ণ দত্ত জ্যেষ্ঠ সহোদরদিগের বড়ই আদরের পাত্র ছিলেন এবং সেই জন্য বাল্য হইতেই বিলাসিতায় ও ভোগসুখে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।'[২] 'বংশরক্ষার ব্যাকুলতায়' কিম্বা 'আত্মসংযমের অভাবেই' হোক প্রথমা পত্নীর জীবদ্দশাতেই পরপর তিনজন ভার্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন।

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

বৈভবের সাথে ভার্যার আধিক্য আভিজাত্যবোধকে বৃদ্ধি করে বটে! মধুসূদন-জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ 'মুন্সি রাজনারায়ণ দত্তের' পত্নীপ্রেমের দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর (রাজনারায়ণ দত্তের) স্ত্রীকে লেখা একটি পত্রের উল্লেখ করেছেন: 'আমি যে কুকার্য্য করিয়াছি, তাহা তুমি শুনিয়াছ; যদি ইহাতে আমার উপর অসন্তুষ্ট হও, তবে আমার জীবন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। পৃথিবীতে দুইটি মাত্র লোকের নিকট আন্তরিক ভালবাসা পাওয়া যায়; এক জননী, অপর সহধর্ম্মিণী। আমার জননী স্বর্গে গিয়াছেন, কেবল তোমার জন্যই আমি সংসারাশ্রমে রহিয়াছি।'[৩] পত্নীভক্তির চরম প্রকাশ ঘটেছে – এক নয়, দুই নয়, তিনজন 'সেবিকা' আনয়নে। 'পুত্র পিতার দোষ-গুণ উভয়েরই অধিকারী হইয়া থাকেন।' প্রবল আভিজাত্যবোধ এবং বাকচাতুর্য যেমন পুত্র পেয়েছিলেন পিতার নিকট থেকে, তেমনি মধুসূদনের কিছু গুণ ছিল তা স্বীকার করতেই হবে। অমিত মেধাশক্তি, অপরিসীম বিদ্যানুরাগ, ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ, প্রখর কল্পনাশক্তি প্রভৃতি। তবে আত্মসংযমের অভাব পিতা-পুত্র দু'জনের মধ্যেই ছিল।

সোপার্জিত অর্থে জমিদার হয়ে ওঠা দত্ত বাবু আত্মগৌরবেই ব্যয় করতে দ্বিধা করতেন না। ভোগে বিশ্বাসী 'দত্ত মহাশয়' রক্ষণশীল চেতনা বা সনাতন শাস্ত্রের শাসনে অনুগত ছিলেন না বরং কিছুটা ইংরেজি কায়দা রপ্ত করার মানসিকতা তাঁর মধ্যে ছিল। পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি প্রযত্নের কারণ ছিল– 'উন্নতি' অর্থাৎ বিত্ত বৃদ্ধির যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম করা। 'একমাত্র বংশধরের' প্রতি অপত্য স্নেহের মাত্রাধিক্য কীভাবে পিতাকে পীড়ন করেছে, মাতাকে করেছে জীবন্মৃত– মধুই তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। জীবনের সঙ্কল্পের কাছে সব তুচ্ছ, বন্ধু-বাবা-মা। বাবার সস্নেহ শাসন, মায়ের নীরবে অশ্রুমোচন-অনুনয় বড় কবি হবার পেছনে অন্তরায় বলে তাঁদের পরিত্যাগ করতে বিচলিত হন নি। মধুসূদনের আচরণিক-মানসিক পরিবর্তনের জন্য অনেকাংশে দায়ী সে সময়ের সমাজ এবং শিক্ষা। কৈশোরের আকাঙ্ক্ষা যৌবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। পরিবার কিম্বা শিক্ষাঙ্গন কোথাও মধু-মানসিকতার বিকাশে সহায়ক ছিল না। অপরিণামদর্শী উচ্চাভিলাষ তাঁর পরবর্তী জীবনের ভয়ানক পরিণতির অন্যতম কারণ। কী গৃহে, কী সমাজে, কী শিক্ষাঙ্গনে, কী বন্ধুমহলে কোথাও নৈতিক শিক্ষা-সহায়ক পরিবেশ ছিল না। বরং আভিজাত্যবোধের অহমিকা এবং জনক-জননীর স্নেহাধিক্যে তাঁকে ছোটবেলা থেকেই স্বেচ্ছাচারী করেছে। স্বীয় অভীষ্ট পূরণের স্বার্থে স্বদেশ-স্বজাতি-স্বজন বর্জনে ইতস্তত করেন নি মধুসূদন।

সাগরদাঁড়িতে দত্ত বাড়ির আঙ্গিনা আলো করে ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি ভূমিষ্ঠ হলেন ভবিষ্যতের মহাকবি মধুসূদন দত্ত। মধুর জন্মের চার বছরের মধ্যে জাহ্নবী দেবীর আরও দুটি ছেলে হয়েছিল– প্রসন্নকুমার এবং মহেন্দ্রনারায়ণ। শিশুবয়সেই এই দু' ছেলের মৃত্যু হয়। পরে মধুসূদনের আর কোনো অংশীদারের আবির্ভাব ঘটে নি। একমাত্র জীবিত সন্তান হিসেবে মধুসূদন মাত্রাতিরিক্ত প্রযত্নেই প্রতিপালিত হচ্ছিলেন।

পরিবার-পরিজনের স্নেহের সাথে শাসন, অন্যায়ের প্রতি অনমনীয় মনোভাব, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা সন্তানকে শীলিত, বিনীত, সৎ করে তুলতে সাহায্য করে। মধুসূদন সে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। গ্রামের পাঠশালায় তিনি ভালো ছাত্র ছিলেন এবং লেখাপড়ায় তাঁর আত্যন্তিক মনোযোগ ছিল। কলকাতার খিদিরপুরে আসার পরে মধুসূদন একক পরিবারে 'একেশ্বর' হওয়ায় এবং 'পিণ্ড-দানে'র একমাত্র অবলম্বনের ওপর প্রযত্নের প্রাচুর্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কিশোর মধু অমিতাচারী, অমিতব্যয়ী, অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অবিমৃষ্যকারী হয়ে উঠতে থাকেন। পিতা প্রচুর আয় করতেন, পুত্রের জন্য ব্যয়ের পরিমাণও ছিল 'অপর্যাপ্ত' (পর্যাপ্তের

অধিক)। পুত্রের ব্যয়ের হিসেব নেবার মতো 'হ্রস্ব-হৃদয়' রাজনারায়ণ দত্তের ছিল না। ফলে বয়ঃসন্ধিক্ষণের চাপল্য এবং 'অনায়াস-লব্ধ' অর্থ মধুর আত্মম্ভরিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। এছাড়া মধুর শিক্ষাজীবনের অর্জন– 'বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা, স্বদেশীয় সাহিত্যে অনীহা, পাশ্চাত্য সাহিত্যে অন্ধ অনুরাগ, সমাজে প্রচলিত সংস্কারে অনাস্থা, সনাতনী আচারে-আহারে-বসনে প্রকাশ্যে ঘৃণা প্রকাশ, বায়রন-মূর-ক্যাম্পবেল প্রমুখ প্রীতি, লর্ড মেকলে-আলেকজান্ডার ডাফ প্রমুখের ভাষ্য অন্তরে ধারণ। মহাকবি কালিদাস অপেক্ষা মিল্টনকে শ্রেষ্ঠ এবং 'ইলিয়াড'কে রামায়ণ, মহাভারত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করতেন মধুসূদন। পাশ্চাত্য শিক্ষা-রুচি-সাহিত্যের প্রতি অন্ধ অনুরাগের কারণ তাঁর শিক্ষক ও সহাধ্যায়ী ছাড়াও মধুসূদনের খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকর্ষণ এবং পুরোপুরি 'সাহেব' হবার বাসনা কাজ করেছে। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র মধুসূদন অধ্যয়নকালেই ইংরেজি কবিতা রচনায় মনোযোগী হন। তাঁর এ সময়ের কবিতায় বিলেত যাবার তীব্র বাসনা প্রকাশিত হয়েছে। মধুসূদন সম্পর্কে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিব্যক্তি: 'তিনি ছিলেন প্রখর মননশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁর কল্পনাশক্তি কিছুটা উদ্দাম। আপন অনুভূতিতে ও অভিমতে তিনি ছিলেন অতিশয় উগ্র। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা ব্যক্তি; আপন অধিকার সম্বন্ধে তিনি অতি সচেতন ছিলেন।'[৪] যথার্থই মধু চরিত্রের ব্যাখ্যান। আপন অনুভূতি ও অভিমতে অতিশয় উগ্র ছিলেন বলেইতো 'বড় কবি' হবার জন্য অতি আপনজনদের ত্যাগ করে বিলেত গমনের অভিলাষে গৃহ হতে অন্তর্ধান হলেন। মধুসূদনের মানসিকতার পরিবর্তনের আরও একটি হেতু রয়েছে। গ্রাম থেকে আসা বালক মধু কলকাতায় এসে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে নিজেকে মেলাতে যেয়ে কিছুটা অসহায় বোধ করেছেন। 'যশুরে ভাষায় কথা বলতেন এবং আচার-আচরণে, পোশাকে-আশাকে অ-নাগরিক ছিলেন, এটা নিশ্চয় তাঁকে পীড়িত করেছে। ... কয়েক বছরের মধ্যে এই হীনমন্যতাই নিজেকে জাহির করার মানসিকতায় পরিণত হয়।'[৫]

তিনি যাদের সাহচর্যে এবং শিক্ষায় খ্রিস্টধর্মে অনুরক্ত হন তারা কেউ পরবর্তী সময়ে তাঁর অনায়াসে বিলেত গমনের আশ্বাস দিতে পারেন নি। তাদের আচরণে মধুসূদন আহত হয়েছেন। মধুর নিশ্চিত ধারণা ছিল যে খ্রিস্টান হলে তাঁর বিলেত যাওয়া সহজ হবে। ১৮৪৩ এর ৯ ফেব্রুয়ারি ওল্ড চার্চে আর্চ ডীকনডিয়াল্ট্রির পৌরহিত্যে এবং বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে মধুসূদন দত্ত হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 'মাইকেল' হবার পরেও তাঁর পিতা পুত্রের কল্যাণে পুত্রের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করেন এবং পুত্রকে বিলেত পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছেন। যদিও অত্যন্ত বৈষয়িক পিতার এই উদারতার কারণ ছিল ভিন্ন। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, পুত্রের এহেন কর্মে মর্মান্তিক যন্ত্রণায় পিতা-মাতা প্রায় অর্ধ-মৃত হয়েছিলেন। পিতার ক্ষীণ আশা ছিল পিতা-মাতার ভালোবাসার টানে যদি পুত্র তার ভুল বুঝতে পেরে পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবশত স্বধর্মে ফিরে আসে। কিন্তু অল্প সময়েই পিতার অভিপ্রায় অনুধাবন করে মাইকেল ঘরের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হন। মধুসূদন খ্রিস্টধর্মের প্রতি অন্তর থেকেই অনুরক্ত হয়েছিলেন। সনাতন সমাজ ও ধর্মের কুসংস্কারাচ্ছন্নতা এবং তুচ্ছতাকে তিনি বিভিন্ন সময় তুলে ধরেছেন। কিশোরকাল থেকেই মধু মদ্য পানে আসক্ত হন। নিষিদ্ধ আহারেও ছিল আকর্ষণ। পোশাকে-পরিচ্ছদেও পুরো সাহেবিয়ানাকে মর্যাদার বলে ভাবতেন।

ধর্মান্তরের ফল পেলেন হাতে হাতে। পিতার দরাজ দিল এবং বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। কলেজের দরজা থেকেও হলেন বিতাড়িত। দীক্ষা দানকারী ডিয়ালট্রির সমাদরও হল সমাপ্ত। বন্ধুরাও খ্রিস্টান বন্ধুর সাহচর্য থেকে চলে গেলেন নিরাপদ দূরত্বে। সম্পর্ক ছিন্ন

করতে চেয়েও পারেন নি কেবল বন্ধু গৌরদাস, সেও বন্ধুর অনুনয়ে। কর্মহীন, কপর্দকহীন, আশ্রয়হীন খ্রিস্টান মধুসূদন নিজেকে বড় অসহায় ভেবে গোপনে অশ্রুবর্ষণ করেছেন, এমন ভাবাটা অসঙ্গত নয়। যদিও মধুসূদন কখনও ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে মুখ খুলতেন না। যাঁরা তাঁকে অতি আগ্রহের সাথে খ্রিস্টধর্মে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তাঁরাই মাইকেলের আর্থিক সংকট নিরসনে 'অপেক্ষা করো' বলে অসহযোগিতা করেছেন। বিশপস কলেজের শেষ পরীক্ষাটায় অংশগ্রহণ করতে পারলে হয়তো মাইকেলের জীবন ভিন্ন খাতে বইতো। কিন্তু পিতার সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েনে মাইকেল স্বীয় সংকল্পে আরো দৃঢ় হন এবং তিনি মিশনারি হবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। চিরতরে সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করে দূরে কোথাও যাবার জন্যেও অস্থির হয়ে ওঠেন। 'অভাবের দরুন এ সময়ে তরুন কবি তাঁর বই এবং অন্য জিনিশপত্র বিক্রি করতে আরম্ভ করেন।'[৬] পিতার প্রতি প্রবল অভিমান এবং পিতার পুনর্বিবাহে বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। জননীর জন্য অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হলেও ঘরে ফেরা সম্ভব ছিল না। মাইকেল শিশু বয়স থেকে দেখে আসছেন, তাঁর মা অত্যন্ত সহজ-সরল-স্নেহশীলা। কোনো অভিযোগ নেই বরং ধর্মান্তরিত পুত্রের প্রতিও সমান স্নেহপরায়ণা ছিলেন। চিরন্তন বঙ্গ-জননীর মতোই তাঁর কাছে ছেলের পরিচয় ধর্মে নয়, সে যে তাঁর সন্তান এটিই বড় পরিচয়। মধুসূদন প্রায় অর্ধ-উন্মাদের মতো কলকাতা ত্যাগ করেন। তিনি চলে গেলেন মাদ্রাসে। তাঁর মাদ্রাস গমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক গোলাম মুরশিদ তাঁর *আশার ছলনে ভুলি* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: মাইকেল মাদ্রাসে গেছেন বিশপস কলেজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাদ্রাসের চার্লস এগবার্ট কেনেটের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে। বন্ধুটি তাঁকে এও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, অন্তত কেনেটের পিতা মাইকেলকে কিছুটা সাহায্য করবেন। এগবার্টের পিতা চার্লস কেনেট ছিলেন একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি। বন্ধুর আশ্বাস নিষ্ফল হয় নি। চার্লস কেনেট তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন অ্যাসাইলামের কোনো বাড়িতে। স্বল্প বেতনে হলেও কেনেট এবং চার্চের কর্মকর্তাদের সহায়তায় অ্যাসাইলামে একটি চাকরি পেয়ে গেলেন। রেবেকা এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী ছিলেন। রেবেকাকে তাঁর ভালো লেগে যায়। যে নীল-নয়নার জন্য তাঁর অন্তরে একটা আকুতি ছিল, সেই কল্পনার নারীকে তিনি যেন পেয়ে গেলেন। মাত্র ছ'মাস তেরো দিনের মাথায় তিনি রেবেকাকে বিয়ে করেন। তারিখ ছিল ১৮৪৮ এর ৩১ জুলাই। রেবেকার সাথে মধুসূদনের প্রণয় অনেকটা অবিশ্বাস্য। কারণ মধুসূদন কেবল কৃষ্ণাঙ্গই নয়, কপর্দকহীনও। আত্মীয় ও সহায়হীন রেবেকা মাইকেলের মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা এবং আশ্রয়ের ভরসা পেয়েছিলেন, যা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। 'সে জন্যে, তিনি তাঁর গায়ের রং এবং আর্থিক দৈন্য দেখে ভয় পান নি।'[৭]

মধুর জীবনে জননী :

মধুর জননী চার জন। জ্যেষ্ঠা জাহ্নবী দেবী তাঁর গর্ভধারিণী। বিমাতাগণের মধ্যে প্রথমা শিবসুন্দরী, দ্বিতীয়া প্রসন্নময়ী এবং তৃতীয়া হরকামিনী। জাহ্নবী দেবী এবং শিবসুন্দরী স্বামীকে রেখেই ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। অপর দু'জন বিধবাবস্থায় কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন। জাহ্নবী দেবী জন্মসূত্রে জমিদার-কন্যা। বর্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত 'কাটিপাড়ার জমিদার গৌরিচরণ ঘোষের কন্যা।'[৮] 'মহৎ বংশে জন্ম বলেই তিনি মহতী ছিলেন'– এটি যথার্থ না হলেও তিনি সত্যিই মহতী ছিলেন। 'স্বামীসেবা তিনি পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন; এবং কখনও কোন বিষয়ে স্বামীর প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইতেন না'– যোগীন্দ্রনাথ বসুর এই স্তুতি বাক্য থেকে অনুমেয় জাহ্নবী দেবী ধৈর্যে-দানে-পতিপ্রেমে লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন। নারী প্রগলভা হলে দোষের, মতামত প্রকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠা নিতান্ত ধৃষ্টতা ছাড়া আর কী! সুতরাং শ্রী-হ্রী-ধীশক্তির অধিকারিণীই উত্তমা স্ত্রী। পুরুষের দম্ভ, দণ্ড, আর ত্রাসনের

নিকট সংগুপ্ত সংলাপ সরবে উচ্চারণ নিষ্ফল জেনেই জাহ্নবী দেবী 'পতিগতাপ্রাণা'। পরপর দু'ছেলের মৃত্যুজনিত বিয়োগ-ব্যথা তাঁকে মৌন, সংহত, সাংসারিক বিষয়ে নিরাসক্ত করেছে। ধনাঢ্য স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকা দোষের নয়, তার উপর বংশরক্ষা এবং পিণ্ডদানের বিষয়টি বিবেচ্য বিষয় বটে। বিশেষত দত্তজ মহাশয়, যিনি প্রৌঢ় বয়স অবধি বিলাসী ও ভোগসুখে রত ছিলেন, তাঁর সাথে জাহ্নবী দেবীর হৃদয়জ সম্পর্ক কতোখানি ছিল, তা অনুভবযোগ্য। তাঁর নয়নের মণি, আঁচলের ধন, একমাত্র সন্তান মধুকে তিনি অপরিমিত স্নেহে লালন করেছেন। শিশু মধু মায়ের আঁচল ছাড়তো না, লাজুক কৃশকায় ছেলেটি যখন গাঁয়ের স্কুলে যেত– তাঁর মা পথের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মধুকে পাশটিতে বসিয়ে পৌরাণিক কাহিনী শোনাতেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন এবং মধুকে ছেলেবেলায় লেখাপড়ায় সাহায্য করেছেন; আর সেই সঙ্গে তাঁকে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পড়তে উৎসাহিত করেছেন। মায়ের পাশটিতে বসে ছোট্ট মধু মায়ের মুখে এসব কাব্য থেকে বিভিন্ন অংশের আবৃত্তি শুনতেন অত্যন্ত সুবোধ বালকের মতো। পরবর্তী সময়ে তাঁর রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনে কবি মায়ের দ্বারা প্রাণিত হয়েছিলেন। বালক মধু যেন ঠিক সময়মতো স্নান সেরে গরম ভাত খেয়ে স্কুলে যেতে পারে, সে জন্যে একাধিক উনুনে চলতো রান্না। নিজের হতে খাওয়াতেন। ছেলে বড় হবে, মস্ত বড় এই ছিল মায়ের বুক ভরা আশা। অন্যায় করলেও পরিবারের কেউ মধুকে ধমকও দিতেন না। 'সবে ধন নীলমণি' বলে কথা। সেই মধু গাঁ ছেড়ে কলকাতায় এসে একটু একটু করে মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকলেন। শহুরে শিক্ষা-সংস্কৃতির হাওয়া লাগলো শরীরে ও মনে। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকাল থেকে মধুসূদন সনাতন রীতির বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। 'মধুই দেশীয়দের মধ্যে প্রথম ইউরোপীয় পোশাক পরিধান চলন করেন।'[৯] শুধু পোশাক নয়, 'মদ খেতেন, মাংস খেতেন, খেতেন আরও অনেক হিন্দুর নিষিদ্ধ আহার্য।'[১০] মধুসূদনের আচরণের কিংবা মনের এহেন পরিবর্তন রাতারাতি হয় নি। কিন্তু পিতা-মাতা তাঁকে স্নেহ করেছেন, শাসন করেন নি। বিশেষত জননীর অপত্য স্নেহের এবং প্রযত্নের আধিক্য তরুণ মধুসূদনকে অপরিণামদর্শী, স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল হতে সাহায্য করেছে। খ্রিস্টধর্মের আদর্শ এবং বিলেত-প্রীতির কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল মায়ের মমতা। কিন্তু মাতৃহৃদয়ে ধর্মান্তরিত ছেলের প্রতি কোন অনুযোগ-অভিমান ছিল না। 'তাঁহার জননী তাঁহাকে আত্মহারা হইয়া ভালবাসিতেন, সে ভালবাসার কিছুতেই পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। মধুসূদনের গৃহ হইতে অন্তর্দ্ধান অবধি তিনি আহার, নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং যেদিন তিনি শুনিয়াছিলেন যে, মধুসূদন সত্যই খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অবধি তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়াছিলেন।'[১১] বরং ক্রুদ্ধ পিতাকেও বাধ্য করেছেন ছেলের প্রতি দায়িত্ব পালনে। 'তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাজনারায়ণ দত্ত ধর্ম্মভ্রষ্ট পুত্রকে; সময়ে সময়ে, গোপনে গৃহে আহ্বান করিতে বাধ্য হইতেন। মধুসূদনকে দেখিলে তাঁহার শোকাতুরা জননীর যন্ত্রণা কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইত।'[১২] সমাজের চোখ এড়িয়ে ছেলেকে ডেকে খাওয়াতেন, কুশল জিজ্ঞেস করতেন, আদর করে হৃদয় জুড়াতেন। এসবের পেছনে পিতার একটা উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু মাতার অন্তরে কোন ফাঁক ছিল না। পিতা-পুত্রের সম্পর্কে স্বার্থ বিজড়িত থাকলেও মাতা জাহ্নবী দেবীর হৃদয়ে ছিল অগাধ মমতা। সেখানে ধর্ম-সমাজ-সংসার কোন অন্তরায় নয়। স্নেহপ্রবণা জননীর আঁচলের ধন মধুকে তিনি একদণ্ডও চোখের আড়াল করতে পারতেন না। সেই মধুই মাকে ছেড়ে অন্তর্ধান হলেন। সুদূর মাদ্রাসে। পুত্রের হৃদয়ে মাতৃ-বিচ্ছেদ কতটা যন্ত্রণাদায়ক ছিল তার প্রকাশ অনেকাংশে সংগুপ্ত, তবে পুত্র-বিচ্ছেদ-জনিত ব্যথায় মাতা জাহ্নবী দেবীর অন্তর্দহন যে কতখানি পীড়াদায়ক ছিল তার প্রমাণ মিলে তাঁর অন্তিম সময়ের উচ্চারণে। তিনি বলেছেন 'আমার বাছা যে সাত-সমুদ্রের পারে রহিয়াছে;

তাহার মুখখানি না দেখিয়া আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।'[১৩] শেষাবধিও তিনি ছেলের আগমন প্রতীক্ষায় কাতর ছিলেন। ধর্মত্যাগী, গৃহত্যাগী হলেও জাহ্নবী দেবী সর্বদা পুত্রের মঙ্গল কামনা করেছেন। ১৮৫১ সালের প্রথম দিকে জাহ্নবী দেবী দেহত্যাগ করেন। মায়ের মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিলেন তাঁর বাবা। হয়তো এও ছিলো জাহ্নবী দেবীর শেষ অনুরোধ। পিতার একাধিক বিবাহে মধুসূদন পিতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। প্রতিবাদবিমুখ মায়ের কথা তাঁকে বড়ো বেশি বিচলিত করেছে। বিষণ্ন জননীর অশ্রুসজল নয়ন তাঁকে মাঝে মাঝেই ব্যথিত করেছে কিন্তু সমাজসংস্কারের প্রতিবন্ধকতার জন্যে ছুটে যেতে পারেন নি মায়ের কাছে। অথচ এই মধুসূদনই একসময় মায়ের আঁচলের তলা থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন জোর গলায়। মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আর থাকতে পারলেন না। ছুটে গেলেন কলকাতায়। পিতার সাথে দেখা করেই সবার অলক্ষ্যে ফিরে গিয়েছিলেন মাদ্রাসে। তিনি তখনও জানতেন না, তাঁর পিতার সাথে এই শেষ দেখা হবে। পিতাও হয়তো অনুমান করতে পারেন নি, মধুর সাথে আর দেখা হবে না। পিতার প্রতি পুত্রের একরাশ অভিমান ছিলো, তবে এও সত্য যে, মায়ের অকাল মৃত্যু এবং দুর্দশার জন্য মধুসূদন নিজেও অনেকটাই দায়ী।

মাইকেল-জীবনে ভার্যা :

মাইকেল মাদ্রাসে যে অরফ্যান অ্যাসাইলামে শিক্ষক হিসেবে চাকরি করতেন, সেই অ্যাসাইলামে থাকতেন রেবেকা এবং এখানেই তিনি সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন। রেবেকা মাইকেলেরও কয়েক মাসের ছাত্রী ছিলেন। রেবেকার সঙ্গে মাইকেলের বিয়ের দলিলে রেবেকার পিতার নাম উল্লেখ আছে ডুগাল্ড ম্যাকটাভিস। 'ডুগাল্ড ম্যাকটাভিস আদৌ রেবেকার পিতা ছিলেন না।'[১৪] রেবেকার পিতার নাম রবার্ট টম্পসন। রেবেকার পিতার মৃত্যুর পরে রেবেকার মা ডুগাল্ডের সঙ্গে স্ত্রীর মতো বসবাস করতেন বলে ধারণা করা হয়। নামের সাথে উপকারীদের বংশনাম জুড়ে দেয়ার রীতি থেকেই বিয়ের দলিলে 'ম্যাকটাভিসের' নাম জড়িয়ে আছে বলে উল্লেখ করেছেন গবেষক গোলাম মুরশিদ। রেবেকাকে মাইকেল ইংরেজ বললেও তিনি ছিলেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, কারণ রেবেকার মা ছিলেন অ্যাংলো-বৃটেন। রেবেকার জন্ম নাগপুরে, ১৮৩১ সালে। রেবেকার বাবার মৃত্যুর পরে কিছুদিন ডুগাল্ড ম্যাকটাভিসের আশ্রয়ে থাকার পর রেবেকার ঠাঁই হয় এতিমখানায়। অনাথ এই মেয়েটির প্রতি মাইকেল দুর্বল হয়ে পড়েন। ভালোলাগা থেকে ভালোবাসা এবং সেখান থেকে একেবারে একঘরে। রেবেকাকে তিনি গভীর ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন, একথা মিথ্যে নয়। রেবেকা নিজেও ছিলেন একজন গরীব 'গোলন্দাজ সৈন্যের মেয়ে, কোনোদিন স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষ হয়েছেন, তার কোনো প্রমাণ নেই।'[১৫] তাঁর প্রত্যাশা সীমাহীন ছিল না। সহজেই মানিয়ে নিয়েছিলেন মাইকেলের গরিবীর সঙ্গে। মাইকেলের জীবনে ছিল অভাব-অনটন, কিন্তু প্রিয়তমা পত্নীর সুগভীর আশ্বাস এবং পরিপূর্ণ প্রেম কবির জীবনকে স্বপ্নে বিভোর রাখতো। *Captive Ladie* রচনাই তা প্রমাণ করে। মাইকেল-রেবেকার সংসারে এসেছে পরপর চার সন্তান। একদিকে সন্তানের জন্য ঐকান্তিক উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে ব্যয় সংকুলানের জন্য বাড়তি শ্রম কবি মাইকেলকে বিচলিত করে তোলে। মাদ্রাসে এসে দাম্পত্য জীবনের আনন্দ-বেদনার মধ্যে তলিয়ে গেলেন কবি। শত ব্যস্ততার মাঝেও মমতাময়ী মায়ের স্মৃতি তাঁকে ব্যাকুল করেছে। কিন্তু সে কথা কারো কাছেই ব্যক্ত করেন নি, কারণ তাঁর স্বভাবটাই ছিলো চাপা। মাদ্রাসে এসে তিনি চরম বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন, সেই সাথে উপলব্ধি করেছেন অর্থের অপরিহার্যতা। অভাব-

অনটন ছিলো নিত্য দিনের সঙ্গী। তবুও সুখি হবার পরিপূর্ণ আশা, পরবাসের দিনগুলোকে মধুময় করে তোলার প্রাণান্তকর চেষ্টায় তিনি ছিলেন মগ্ন:

> সন্তান জন্মের পর দারুণ অভাবের তাড়নায় তিনি যখন অস্থির হয়ে পড়েন তখন তিনি আর অরফ্যান অ্যাসাইলামের আশার অর্থাৎ সহকারী শিক্ষক ছিলেন না।... তিনি তখন অরফ্যান অ্যাসাইলামের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছিলেন।[১৬]

অর্থ সংকট নিরসনের জন্য তিনি শিক্ষকতার পাশাপশি পত্রিকা সম্পাদনায় তৎপর হয়ে ওঠেন। মাঝে মধ্যে দু'একটি সাহিত্যকর্ম প্রকাশেও উৎসাহী হন। এ সময় তিনি মাদ্রাস স্কুলে চাকরি পেয়ে যান। কিছুটা খুশির ঝলক উছলে ওঠে মনে। এখানে তাঁর আরো তিনজন সহকর্মী ছিলেন। তার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন জর্জ হোয়াইট। ১৮৫৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। এরপরে *ঝঢ়বপঃধঃড়ৎ* এর সাংবদিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এ বছরেই বন্ধু গৌরদাসের প্রেরিত পত্রে পিতার মৃত্যুর সংবাদ পান। 'যোগাযোগ যতই বিচ্ছিন্ন হোক, পিতা নেই– এ খবর শুনে কবি একটা আকস্মিক রূঢ় আঘাতে বিচলিত হলেন। ... স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো শৈশব-কৈশোরের অনেক চিত্র। বাবা যে কী ভালোবাসতেন! ...সেই বাবা আর নেই! মধু ভাবলেন, 'সত্যি সত্যি আমি আজ অনাথ হলাম!'[১৭] কবি ঝোঁকের মাথায় অনেক কিছু করেছেন কিন্তু আজ পিতা-মাতার অভাব তাঁকে তাড়িত করেছে, এর কারণ নাড়ির টান। এদিকে ঘন ঘন সন্তান প্রসবের কারণে রেবেকার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। আমার মনে হয়েছে, শুধুই সন্তান প্রসব কারণ নয়, সংসারের বাস্তবতা তাঁকে মানসিকভাবেও অবসন্ন করেছিল। রেবেকা শরীর এবং মনের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বেড়াতে গেলেন উত্তরে, সম্ভবত জন্মস্থান নাগপুরেই হবে। স্বামীকে রেখে বেড়াতে যেয়ে রেবেকা উপলব্ধি করলেন– বিচ্ছেদ-যাতনা। কবিও বিরহে ব্যথিত হয়ে কবিতা লিখে ফেললেন:

> my home is lonely_ for i seek in vain
> for them who made its star light ; there's a cry
> of anguis feircely wrung by untold pain
> e'en from heart of heart's! hear it on high! [8]

এই সাময়িক বিচ্ছেদ খুব অল্প সময়েই চিরবিচ্ছেদের সূচনা করে। সেজন্য অবশ্য এই দম্পতির কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। মাইকেলের মাদ্রাস স্কুলের সহকর্মী ছিলেন জর্জ হোয়াইট। তাঁরা এক পাড়াতেই থাকতেন এবং সম্ভবত তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। ঘনিষ্ঠতার আর একটি কারণ ছিলো– জর্জ হোয়াইটের স্ত্রী মারা যাবার পর তাঁর তিন সন্তান অসহায় হয়ে যায়। হোয়াইট তাঁর কন্যার বয়সী একজনকে বিয়ে করে নতুন করে সংসারী হলেন, কিন্তু বিমাতার সাথে হেনরিয়েটা ও ছোট দুটি ভাই কিছুতেই মানিয়ে চলতে পারছিলেন না। কিশোরী হেনরিয়েটার অসহায়ত্ব মাইকেলকে এদের প্রতি সহমর্মী করেছে। এই সহমর্মী হৃদয়ের সান্ত্বনাই ক্রমশ প্রণয়ের দিকে গড়ায়। প্রণয় পরিণয়ে পরিণত না হয়েও দ্বিতীয় প্রেমিকা হয়েছেন আজীবন সঙ্গী। যে মাইকেলের অন্তর জুড়ে ছিল 'চমৎকার ইংরেজ স্ত্রী এবং চার সন্তান', সেই অন্তরেই দৃঢ় আসনে অধিষ্ঠিত হলেন সহকর্মীর কন্যা হেনরিয়েটা। ভাগ্যের কী পরিহাস ! চতুর্থ সন্তানের বয়স যখন প্রায় মাস দশেক, বড় দু' মেয়ের বয়স যথাক্রমে ছ'বছর এবং পাঁচ বছর, তৃতীয় সন্তানের বয়স আড়াই বছর, রেবেকার বয়স পঁচিশ, মাইকেলের বত্রিশ, তখন কবি গেলেন কলকাতায়। সাথে সাথে মাদ্রাসের স্মৃতি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল চিরতরে:

> বস্তুত, স্নেহের বন্ধন অথবা পারিবারিক দায়িত্ব কোনো কিছুই তাঁকে তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। তেরো বছর আগে তিনি যখন ধর্মান্তরের জন্যে বাড়ি ছাড়েন অথবা ন'বছর আগে কলকাতা ছেড়ে তিনি যখন মাদ্রাসের পথে পা বাড়ান, তখনো কোনো স্নেহের টান তাঁর মনকে টলাতে পারেনি।[১৯]

স্ত্রী ত্যাগের মধ্যে হয়তো কোনো অপরাধ নেই, কিন্তু চার-চারটি অসহায় সন্তানের কচি মুখগুলো কীভাবে ভুলে গেলেন কবি? তিনি সেখানে তাঁর পরিবারের জন্য কোনো টাকা-পয়সাও রেখে আসেন নি। সহায়-সম্বলহীন রেবেকার কথা, সন্তানদের কথা কখনোই কোনো প্রসঙ্গেও উত্থাপন করলেন না। কাব্য সাধনার জন্য মাকে ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হননি, প্রেমের জন্য পত্নী ত্যাগেও বিচলিত হন নি– এও না হয় সম্ভবের মধ্যে পড়ে । কিন্তু স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য শিশু সন্তানদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেয়ার বিষয়টি কোনোভাবেই বিবেচনার মধ্যে আসে না। রেবেকা প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন বলেই মাইকেলকে আর কখনো জীবনে কামনা করেন নি। মাইকেলের এমন বিশ্বাসঘাতকতায় রেবেকা মনেপ্রাণে ভুলে থাকতে চেয়েছেন অতীতকে। রেবেকার সাথে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে নি, কিন্তু সত্যিকার বিচ্ছেদ ঘটেছে ১৮৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে। তারপর রেবেকা বেঁচে ছিলেন ১৮৯২ সাল পর্যন্ত। রেবেকা মাইকেলকে যখন বিয়ে করেছিলেন তখন তাঁর চোখেমুখে ছিলো পরিপূর্ণ আস্থা এবং ভালোবাসা। বিয়ের পরেও তিনি দারিদ্র্য, রুগ্নতা, পরপর সন্তানধারণ, স্বামীর বোহীমিয়ানস্বভাব সবই সহ্য করেছেন শুধু স্বামীর ভালোবাসায় ভরসা করে। আপাতদৃষ্টিতে মাইকেলকে পাষণ্ডহৃদয় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি তা ছিলেন না । তিনি নিরন্তর অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন। প্রমাণস্বরূপ মাইকেলের রচনা থেকে উদ্ধৃতি টেনেছেন অনেকেই। আমি মনে করি এমন অনুশোচনার কোনো মূল্যই নেই মাদ্রাসে ফেলে আসা পরিবারের কাছে। অপরাধবোধ যদি থাকতোই তবে গোপনে হলেও সন্তানদের খোঁজ-খবর নিতেন। তাঁর জীবন প্রবাহে অনেকবার তিনি আর্থিক সংকটে পড়েছেন একথা ঠিক তবে অর্থইতো সম্পর্কের মূল নয়, হৃদয়ের টান কোথায়? রেবেকা এবং সন্তানদের সুসময়েও স্মরণ করেন নি, কেন? কাব্য আর জীবন-বাস্তবতা এক নয় এটি একবারও ভাবলেন না কেন? এ কি দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার পরিচয় নয়? অথচ রেবেকা স্বামীর পরিচয় মুছে ফেলতে পারেন নি বলেই মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 'রেবেকা টম্পসন ডাট' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অনাথ রেবেকার শিক্ষা ছিলো সামান্য, অন্যদিকে হেনরিয়েটা সে তুলনায় বেশি শিক্ষিত। মাইকেল হেনরিয়েটার সঙ্গ পছন্দ করতেন। রেবেকাকে তিনি সত্যিই ভালোবাসতেন, কিন্তু কিশোরী হেনরিয়েটার প্রতি প্রবল আকর্ষণ তাঁকে দোটানায় ফেলেছিলো। সম্ভবত কবির এই সম্পর্কের কথা রেবেকার কাছে চাপা থাকে নি। গবেষক গোলাম মুরশিদ এর সাথে আমিও একমত যে, রেবেকাকে নিয়ে ঘর করলেও মাদ্রাসে থাকার সময়ে অন্তত দু'বছর তিনি হেনরিয়েটার প্রণয়ে মগ্ন ছিলেন। 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' এমন সংকটে ছিলেন তিনি।

পিতার মৃত্যুর পরে হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মাইকেল চলে এলেন কলকাতায়। সম্পত্তি উদ্ধার ছিলো বাইরের বিষয়, অন্তরে অন্যরকম অভিলাষ যে ছিলো, তা বোঝা যায়, আর মাদ্রাসে ফিরে না যাবার সিদ্ধান্তে এবং হেনরিয়েটাকে কলকাতায় আসার আহ্বানে। সঙ্গী হলেন হেনরিয়েটা। যেহেতু প্রথম পক্ষের সাথে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে নি, সেহেতু হেনরিয়েটার সাথে বিবাহবন্ধন হলো না। কিন্তু তিনিই হলেন মাইকেলের সহচরী। হেনরিয়েটার পুরো নাম 'অ্যামেলিয়া হেনরিয়েটা সফাইয়া'। হেনরিয়েটার জন্ম ১৮৩৬ সালের ১৯ মার্চ। প্রায় পনেরো বছর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করেন। হেনরিয়েটার কোল জুড়ে এসেছে চার সন্তান। এ পর্যায়ের সংসার জীবনে বহুবার তিনি আর্থিক

স্বচ্ছলতার সান্নিধ্য পেয়েছেন, অবিমৃষ্যকারী মধুসূদন তা অবিবেচকের মতো ব্যয় করেছেন। যার ফলে তাঁকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের নিকট হাত পাততে হয়েছে। শেষ বয়সে এসে তাঁকে কী রকম আর্থিক সংকটে পড়তে হয়েছিলো এবং কী পরিণতি হয়েছিলো– তাতো অবিদিত নয়।

কবি-আত্মা আর কবির ব্যক্তিগত জীবন এক নয়। বাস্তবজীবনে যিনি চরম ব্যর্থ, তিনিই আবার কাব্য-রাজ্যে মহাপ্রতিভাবান। মধুসূদন এমনি এক ব্যক্তিত্ব যাঁর সবটুকু জানা যায় না। একটা মহাঘোরের মধ্যে জীবনের অনেকটা ব্যয় করার পরে যখন তিনি বাংলা ভাষার প্রতি, স্বজন-স্বদেশের প্রতি নিজেকে নিবেদিত করেছেন, তখনই মহাকবি হয়ে উঠেছেন। অর্থলাভ এবং যশোলাভ এই দ্বিমুখী কামনা কবি-চিত্তকে করেছে চঞ্চল। 'মধুসূদনের অর্থলিপ্সা, সুখভোগের প্রবল আসক্তিকে ক্ষত্রিয়ের বীর্যদীপ্ত ভোগ কামনা বলে শ্রদ্ধা জানানো চলে।'[২০] এই বাক্যে মধুসূদনের চারিত্র্য-পূজা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে–

> শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে বা প্রৌঢ়াবস্থায় বন্ধু, বান্ধব, জনক, জননী বা পুত্র, কন্যা, প্রণয়িনী, পরিবার-সমাজ-সংসার তিনি কখনও কাহারো সমক্ষে নিজের 'পান হইতে চুনটুকু খসাইতে' পারেন নাই। মধুসূদন চিরকালই মধুসূদন, তাঁহার আমিত্বটুকু কুত্রাপি কাহারও সমীপে এতটুকুন নত হইতে জানে নাই।[২১]

শেষাবধি নত হতে হয়েছে। *Captive Ladie* মাদ্রাসে প্রশংসিত হলেও কলকাতায় তেমন সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়। এ গ্রন্থটি পড়ে বেথুন সাহেব কবির বন্ধু গৌরদাসকে লেখা পত্রের মাধ্যমে 'কবিকে মাতৃভাষার চর্চায় আত্মনিয়োগের পরামর্শ দেন।'[২২] তবে বেথুন সাহেবের পরামর্শে তিনি বাংলা ভাষায় প্রত্যাবর্তন করেন নি। বরং এর বেশ কিছু সময় আগে থেকেই তিনি মাতৃভাষার গ্রন্থাদি অধ্যয়ন এবং অনুশীলনে মনোযোগী হয়েছিলেন। এর প্রমাণ মেলে *Captive Ladie,* তাঁর নামবিহীন অপ্রকাশিত একটি কাব্য এবং *Upsori*-র বিষয়বস্তু নির্বাচনে। সনাতন ধর্ম ত্যাগ করলেও ভারতীয় কিংবদন্তী ও পুরাণ বিশেষত রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অন্তরে ধারণ করেছিলেন। বেথুন সাহেবের রূঢ় মন্তব্যে তিনি ইংরেজি কাব্যচর্চা ছেড়ে দেন নি। 'মাতৃভাষার সেবা এবং স্থায়ী খ্যাতি অর্জন', 'উচ্চতর ও মহত্তর স্বাদের সাহিত্য গড়ে তোলার জন্য' বেথুন সাহেবের পরামর্শ তাঁকে মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে নিশ্চিত। যখন তিনি মাতৃভাষার কাছে নিজেকে নিবেদিত করেছেন, সেই হতে কবির বোধোদয় ঘটেছে। যে বিলেতের জন্য স্বপ্নে বিভোর থাকতেন, যে মানুষদের সভ্য এবং স্বজন ভেবেছিলেন, যে ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ মনে করেছিলেন একসময় তাঁর সেই ভ্রম কেটেছে বলেই তিনি বাংলা সাহিত্যের মহাকবি হলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে কবির আত্মস্বীকৃতি: আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী/ স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে। আবার ষষ্ঠ সর্গে স্বজন-স্বদেশ-স্বধর্মত্যাগী বিভীষণের উদ্দেশ্যে মেঘনাদ বলেছে: কোন্ ধর্ম্ম মতে, কহ দাসে, শুনি/ জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি– এ সকলে দিলা/ জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি / নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!'। মেঘনাদের এই উক্তির মধ্যে রয়েছে স্বয়ং কবির আত্মধিক্কার। স্বীয় সঙ্কল্প সাধনের মত্ততায় অনায়াসে যে মধুসূদন গর্ভধারিণীর স্নেহমাখা মুখখানি বিস্মৃত হতে পারেন, সেই মধুসূদন তাঁর মহাকাব্যে পুত্রহারা চিত্রাঙ্গদাকে প্রবল প্রতাপশালী লঙ্কেশ্বরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে পুত্রের মৃত্যুর কৈফিয়ত চাইবার মতো সাহসী করে তুলেছেন। 'নিজ কর্ম্ম ফলে মজালে রাক্ষসকুলে মজিলা আপনি' (প্রথম সর্গ)। আমার মনে হয়েছে, এ যেন মাইকেলের আত্মিক বিশ্লেষণ।

আপাতদৃষ্টিতে মাইকেলকে বড় বেশি স্বার্থান্ধ মনে হতেই পারে, কিন্তু তাহলে একটা বিরাট প্রশ্ন এসে সামনে উপস্থিত হয়, তা হলো– কবির সাহিত্যে যা কিছু লেখা হয়েছে তা কী কেবলি সাহিত্যের প্রয়োজনে। চিত্রাঙ্গদা-মন্দোদরীর পুত্র-স্নেহ, বীরাঙ্গনা কাব্যের নারীদের স্বামী বা প্রাক্তন প্রেমিকের প্রত্যাখান, বঞ্চনা এবং অনাদরের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ, হৃদয়াকুতি, ক্ষোভ এও কী শুধুই সাহিত্যের বক্তব্যমাত্র। 'এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি/প্রাণপতি?' (বীরাঙ্গনা কাব্য)– একি শকুন্তলার মর্মবেদনার প্রকাশ? নাকি এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে– রেবেকার চিত্তদহন। 'কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী/ ভুলাইলা মনঃ তব?' (বীরাঙ্গনা)– এখানে কৌশল্যার আড়ালে রয়েছে হেনরিয়েটা। একটি পত্রে বিনা দোষে সন্তানদের ত্যাগ করার কথাও আছে। প্রকৃতপক্ষে মাইকেল চিত্ত ছিলো বড়ই অস্থির। যখন যা ভাবতেন তাই করে বসতেন। অপরিণামদর্শীতার কারণে তাঁর ভূত-ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করবার মতো স্থির মতি ছিলো না। গ্রহণ এবং বর্জনের মধ্যেই নিহিত থেকে গেছে মাইকেল-জীবনের পরিণতি। তাঁর পারিবারিক বিশেষত জননী এবং রেবেকা সম্পর্কে অন্তরানুভূতি অনুচ্চারিত রেখেছেন কেন? তা এক রহস্যজনক বিষয়। কত কথাইতো বন্ধুদের কাছে লিখেছেন, তবে জননীর বিচ্ছেদ-যাতনা কিম্বা জননীর মৃত্যু সংবাদে তাঁর হৃদয়-চাঞ্চল্য কেন লিখলেন না। প্রথম পক্ষের সংসার, সন্তানদের ছেড়ে আসার পরে তাদের জন্য মর্মপীড়া কিম্বা অপরাধবোধের কথা ব্যক্ত করলেন না কারো কাছেই– সেও এক গভীর রহস্য বটে।

জননী, জায়া এবং আত্মজরা কী কেবলি অম্লান স্মৃতি হয়ে রইলো কবির অন্তর্মুখী চেতনায়? 'দশমী দিবসে প্রতিমা বিসর্জনের' মতো তিনি তাঁর প্রিয়তমা পত্নীসহ সন্তানদের চিরতরে বিসর্জন দিয়েছেন। হেনরিয়েটাকে নিয়ে জীবনের বাকিটা পথ পাড়ি দিলেন– কীভাবে? সেকি হেনরিয়েটার একাগ্রতা, নাকি দ্বিতীয় পক্ষের সংসার-সন্তানের কথাটি কলকাতার সকলের গোচরীভূত বলে? অস্থির মতির এই কবি কখনও আবেগে অন্ধ, কখনও নিরুদ্বেগ উদাসীনতা। 'ভাঙ্গা সংসার, লেগে-থাকা দুর্বহ দারিদ্র্য, কর্মস্থানে অসন্তোষ, নিঃসঙ্গতা– সবকিছুর মধ্যেও আরো খ্যাতির খোয়াব দেখেছেন, আইন পড়ে অর্থ উপার্জন করার আশা করেছেন, হেনরিয়েটা এবং নতুন সন্তানকে ভালোবেসেছেন, বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করেছেন।'[২৩] কিন্তু আশানুরূপ সুখ-ঐশ্বর্য তিনি কখনই পেলেন না। হেনরিয়েটাও এটুকু বুঝেছিলেন যে, 'তাঁর জীবনসঙ্গী অর্ধেক বাস্তব বিশ্বে বাস করেন, অর্ধেক স্বপ্নের জগতে।'[২৪] হেনরিয়েটা মাইকেলের সত্যিকারের সঙ্গী হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন। ১৮৫৮ সালের শেষ দিকে মাইকেলের ডাকে হেনরিয়েটা কলকাতায় আসেন। তাঁদের এই মিলন ছিলো আবেগ আর উচ্ছ্বাসে ভরা। আবার সংসার, আবার অর্থকষ্ট। আয় বুঝে ব্যয় করবার শিক্ষা নেই বলেই তিনি অতি অল্প সময়েই ধার-দেনায় জড়িয়ে গেলেন। নতুন সংসারে পুনরায় আর্থিক সংকট তাঁকে মানসিকভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত করে তোলে। অধিক আয়ের জন্য তিনি আইন পরীক্ষা দিতে মনস্থির করলেন, শেষ পর্যন্ত তা আর হলো না। হেনরিয়েটাকে পাবার বাসনা তাঁকে বিচার-বিবেচনাবোধহীন করে তুলেছিলো, অথচ কামনা-লক্ষ্মীকে নিজের করে পাবার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ক্লান্ত হয়ে গেলেন। মাদ্রাসে ফেলে আসা রেবেকা এবং সন্তানদের জন্য হৃদয় ভারাক্রান্ত হলেও তা প্রকাশ করতে পারেন নি কারো কাছে। একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁকে বিষণ্ন করেছে। তিনি তাঁর বন্ধুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন– কলকাতা তাঁর আদপে ভালো লাগে না। তাঁর এই বৈরাগ্যের কারণও হতে পারে মাদ্রাস। হেনরিয়েটার প্রথম সন্তানের জন্ম হয় ১৮৫৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরে। তাঁরা দু'জন মিলে কন্যার নাম রাখেন হেনরিয়েটা অ্যালাইজা শর্মিষ্ঠা। শর্মিষ্ঠার আগমনে আনন্দিত কবির অন্তরে একই সাথে বেদনার কষ্টও ছিলো। শর্মিষ্ঠার কচি মুখ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ব্যর্থা, ফিবি, জর্জ এবং

মাইকেলের স্মৃতি। মধুসূদন নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন লেখার মধ্যে। বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা কেমন যেন ফ্যাকাশে মনে হলো, তাই হেনরিয়েটার সঙ্গে বাড়িতেই থাকতেন। লোয়ার চিৎপুর রোডের বাড়ি ছেড়ে দিতে হলো নানান কারণে। চলে গেলেন খিদিরপুরে। তবে তাঁর পিতার বাড়িটিতে নয়। ইতোমধ্যে পুত্র ফ্রেডারিক মাইকেল মিল্টনের জন্ম হয়। পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে কলকাতায় এসে আইনি সহায়তায় মধুসূদন খিদিরপুরের বাড়ি পেয়েছিলেন, মায়ের অলঙ্কার বাবদ পেয়েছিলেন '১৩০০টাকা' এছাড়া আরো কিছু সম্পদ তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু স্বভাববশেই তা রক্ষা করতে পারেন নি। তিনি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরেছেন। হেনরিয়েটার প্রতি আগ্রহও কমতে থাকে। কিন্তু হেনরিয়েটার প্রতি কর্তব্যে অনীহা ছিলো না। মাত্র ৩৭ বছর বয়সে কবির যে 'আত্মবিলাপ' প্রকাশ পেল তা থেকে তাঁর যুবা বয়সের বৈরাগ্যের হেতু অনেকখানি অনুমেয়। 'সুখ বাহিরের কোনও সামগ্রীর উপর নির্ভর করে না; সুখ মনুষ্যের নিজের মনে ও আত্মসংযমে। কিন্তু মনকে কেমন করিয়া সংযত ও সমাহিত রাখিতে হয়, মধুসূদন তাহা জানিতেন না। সুতরাং ধন, যশ, পরিবারবর্গের স্নেহ, কিছুই তাঁহাকে তৃপ্তি দান করিতে পারে নাই। বাহিরের লোকে দেখিত, মধুসূদন বিলাসী, আমোদনিরত ও উদ্বেগশূন্য; কিন্তু অভ্যন্তরে তাঁহার হৃদয় বিষম যন্ত্রণায় দগ্ধ হইত।' যোগীন্দ্রনাথ বসুর এই মধু-উপলব্ধি যে যথার্থ, তা এই বয়সে লেখা 'আত্মবিলাপ' থেকে অনুভব করা যায়। কবি লিখেছেন: রোদন নিনাদ কিরে লোকে মনে করে / মধুমাখা গীতধ্বনি অজ্ঞানে বিচারি? (শ্যামাপক্ষী, চতুর্দশপদী কবিতাবলী)। অর্থাৎ মানুষ বিহগের মর্মবেদনার করুণ সুরকে, অন্তরের আর্তনাদকে সুমধুর সঙ্গীত বলে মনে করে। এই বিহগ কবি স্বয়ং তাতে সন্দেহ নেই। 'আত্মবিলাপ'– এ কবি-চিত্তের আক্ষেপ: নারিলি হরিতে মণি দংশিল কেবল ফণী; / এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি মন, কেমনে? স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, কেন এই যন্ত্রণা? কেন এই গ্লানিবোধ? কেন এই বিলাপ? তবে কী কৃতকর্মের জন্য অপরাধবোধ তাঁকে কাতর করেছিলো। কবির বিলাপে আছে জননীর অপত্যস্নেহ, অন্তর-আকুতি, অশ্রুসজল নয়ন, আছে মাদ্রাসে ফেলে আসা প্রিয়তমা পত্নী এবং সন্তানদের জন্য করুণ আর্তি, আছে আত্মকর্মের জন্য অনুশোচনা। এই অনুশোচনা তাঁকে দগ্ধ করেছে মৃত্যু পর্যন্ত। হতভাগ্য মানুষটি সারাজীবন যে চিত্ত, বিত্ত, যশের পিছনে ধাবিত হয়েছেন, শেষাবধি সে সবই অধরা থেকে গেছে। তিনি অনুধাবন করেছেন, কষ্ট পেয়েছেন কিন্তু জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে পরিশুদ্ধ হতে পারেন নি। এখানেই ব্যক্তি মধুসূদনের ব্যর্থতা। হেনরিয়েটা মাইকেলের সঙ্গী হয়ে কতখানি সুখী ছিলেন, জানি না। নাকি এই কিশোরী মেয়েটি কিছুটা বাধ্য হয়েই মাইকেলের জীবনে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। কয়েক বছরের মধ্যেই হেনরিয়েটা চার সন্তানের জননী হয়েছেন। সন্তানদের হিত কামনায় তিনি অন্য কোনো চিন্তা করেন নি। তবে হেনরিয়েটা যে মাইকেলকে সুগভীর ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে রেখেছিলেন, তার অনেক দৃষ্টান্তও রয়েছে। অর্থ-মোক্ষ-কাম চরিতার্থের কথা শাস্ত্রেও আছে। বিত্ত-বৈভব বৃদ্ধির মানসে মাইকেল কবি হতে নয়, ব্যারিস্টারি পড়তে গেলেন ইংল্যান্ডে। হেনরিয়েটাকে সন্তানসহ রেখে গেলেন কলকাতায়। তাঁদের দেখ-ভালের দায়িত্ব দিয়েছিলেন যাদের ওপর, তারা যে কতটা দেখেছিলেন, তাতো আমরা জেনেছি মধু-জীবনীকারদের তথ্য থেকে। মধুসূদন পৈতৃক বাড়িসহ বেশ জমি-জমা বেচে দিয়ে বিলেতে গিয়েছিলেন। বাকি সম্পদের আয় থেকে স্ত্রীর জন্য দেড় শো এবং নিজের জন্য আড়াই শো টাকার পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। হেনরিয়েটার দু'সন্তানসহ সেই অর্থে চলুক বা না চলুক কিন্তু বিলেতি বাবুর তাতে চলছিলো না মোটেও। কলকাতার বিষয়-আশয় দেখার দায়িত্ব ছিলো যাঁদের ওপর তাঁরা কিছুদিন পর বিলেতে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। হেনরিয়েটা নিরূপায় হয়ে দু'সন্তান নিয়ে লন্ডনে স্বামীর কাছে চলে যান।

কেবল আর্থিক সংকট নয়, একটা গুজব কানে এসেছিলো হেনরিয়েটার, নারীঘটিত বিষয়। তাছাড়া স্বামীর ওপর গভীর আস্থা রাখতে পারেন নি তিনি, কেননা এর আগের ঘটনাতো তাঁর কাছে অবিদিত ছিলো না। পরিবার লন্ডনে চলে আসায় কবি ভীষণ বিপদে পড়ে যান। কলকাতায় যাঁদের নিকট তাঁর পাওনা ছিল, তাঁদের সবাইকে তাগাদা দিতে থাকলেন। কিন্তু হায়! সবাই থাকলেন নীরব। বিপদাপন্ন মাইকেলের ব্যারিস্টারি পড়া শেষ হতে আর মাত্র দু'বছর বাকি। বিলেতে একদিকে বর্ণবাদের সমস্যা অন্যদিকে আর্থিক সংকট। মধুসূদন বিলেতের পরিজনদের নিকট নিজের অসহায়ত্বকে গোপন রাখতে বাধ্য হলেন লন্ডন ছেড়ে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিতে। ভার্সাইতে তিনি কীভাবে দিনাতিপাত করেছেন তার স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় গোলাম মুরশিদের 'আশার ছলনে ভুলি' গ্রন্থে। ১৮৬৪ সালে ৩ আগস্ট হেনরিয়েটা একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। জন্মের পরেই কন্যাটি মারা যায়। বিদ্যাসাগরের দয়ায় ও দানে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছিলেন প্রবাসে, ভার্সাই থেকে লন্ডনে যখন আসেন, তখনও সীমাহীন অভাব তাঁকে পীড়ন করেছে। লন্ডনের অনেকটা বাইরে একটা ছোট্ট পাড়ায় শেফার্ডস বুশে কোনোরকমে ভাড়া বাড়িতে দিন কাটাতেন 'দত্ত মহাশয়ের' একমাত্র পুত্র। লন্ডন বাসের শেষের দিকে বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যে রাসেল স্কোয়ারে তাঁর পছন্দসই একটি বাসায় থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। বেহিসেবি স্বামীর ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরবার মতো দৃঢ় হাত ছিলো না হেনরিয়েটার। হেনরিয়েটা সহজ-সরল মনের স্ত্রী (প্রেমিকা) ছিলেন, তাঁকে কোনো বিষয়ে বিরোধিতা করতে দেখা যায় নি। বরং বেশি সারল্যের সুযোগে মাইকেল তাঁকে একবার কলকাতায় ,একবার লন্ডনে ফেলে এসেছেন। ব্যারিস্টারি পাশ শেষে অর্ধমাসও থাকলেন না প্রিয়তমা ইংল্যান্ডের মাটিতে। যদিও বলা হচ্ছে যে, মাইকেল এবং হেনরিয়েটা পরামর্শ করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন –মধুসূদনের একাকী কলকাতা ফেরার বিষয়টি। কিন্তু আমার এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সম্পূর্ণ অনাত্মীয় পরিবেশে অসহায় গর্ভবতী স্ত্রী এবং দুটি সন্তানকে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে মাইকেলের স্বার্থান্ধতা ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিতে চাইলেন সদ্য গ্রেজ ইন থেকে পাশ করা ব্যারিস্টার মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি অকৃতজ্ঞও ছিলেন। তাঁর হঠকারিতার ফল পেতে বিলম্ব হয় নি। আত্মম্ভরিতার কারণে তিনি পুনরায় ধার-দেনায় জড়াতে থাকলেন। পরবাসে সংসার-সন্তান। উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন মাইকেল। তথাপি ব্যয় সংকোচনের শিক্ষা না থাকায় জীবনে যা চেয়েছেন, তা পেলেন না। অতিরিক্ত মদ্যপান এবং স্বেচ্ছাচারের ফলে ক্রমেই অসুস্থ হতে থাকেন। ওদিকে হেনরিয়েটাও স্বামীর সহচরী হিসেবে মদ্যপানে আসক্ত হয়েছিলেন ভার্সাইতে থাকতেই। মাইকেল যখন কলকাতায় আসেন, তখন হেনরিয়েটা গর্ভবতী ছিলেন। পাঁচ-ছ' মাস পরে তাঁদের দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মাইকেল আসার সময় হেনরিয়েটাকে স্বপ্ন দেখিয়ে এসেছিলেন যে, অল্প সময়েই তিনি ব্যারিস্টারিতে খ্যাতি অর্জন করবেন এবং তাঁদের জীবনের অমানিশা দূর হবে। কিন্তু হেনরিয়েটার সে স্বপ্ন ম্লান হতে বেশি সময় লাগে নি। তিনি অবশেষে সন্তানদের নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। এই আসার জন্যেও তাঁকে ভীষণ কষ্ট করতে হয়েছে। হেনরিয়েটা মাইকেলের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। যখন মাদ্রাস থেকে চলে এসেছেন কলকাতায় তখন অনেক বিশ্বাস নিয়েই এসেছিলেন। সে সময় স্বজন বিরহেও সান্ত্বনা ছিলো এই যে, তাঁর স্বামী নাম-করা কবি ও নাট্যকার। দেশীয় সমাজে তাঁর বিশেষ কদর। তাছাড়া স্বামী তাঁকে নিরন্তর সঙ্গ দেন। অভাব থাকলেও দিনগুলো ভালোই কাটতো। সব কষ্ট সয়েছেন, স্বামী একদিন ব্যারিস্টার হবেন, যথেষ্ট আয় হবে, সুন্দর ভবিষ্যৎ হবে। কিন্তু কলকাতায় এসে দেখলেন, স্বপ্ন আর বাস্তবতায় বিশাল ব্যবধান। দুজনের মধ্যেও যেন একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তা সত্ত্বেও সন্তানসহ হেনরিয়েটা

স্বামীর অনুগামী হলেন। কলকাতায় প্রত্যাশিত আয় না হওয়ায় মধুসূদন মানসিক-শারীরিকভাবে ভেঙ্গে পড়তে থাকেন। ১৮৭১ এ তিনি ঢাকায় যান। মুখে যদিও বলেছেন ঢাকায় মামলার কাজে যাচ্ছেন, মনে ছিলো অন্য রকম আশা। ঢাকায় 'মহাকবি'কে সংবর্ধনা দেয়া হয়। এই অনুষ্ঠানেই মহাকবি ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর অভিপ্রায়। ঢাকায় আশ্রয়প্রার্থী হয়েও ফিরে আসেন কলকাতায়। ঢাকায় দিন দশেক থাকতেই তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। ফিরে আসেন কলকাতায়। আবার সন্তান-সংসার, বাড়ি-ভাড়া, পাওনাদার জীবনে অনির্বচনীয় হয়ে ওঠে। কোথাও সান্ত্বনা নেই, স্বস্তি নেই। আত্মহননের প্রয়াসে মদ্যপানের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। গর্বিত মধুসূদন যেন মহাকাব্যে রাবণের নিয়তি-নির্ভরতার মধ্যে নিজেকেই সমর্পণ করেছেন। অপরিণামদর্শী মধুসূদন জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজন, স্বদেশ-স্বধর্ম, স্বভাষা-স্বীয় সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়েছেন অনায়াসে স্বীয় সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য। দেশে-বিদেশে আভিজাত্যকে প্রকাশের জন্য ঋণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। প্রয়োজনে হাঁটু গেড়ে বসেছেন, প্রয়োজন মিটতেই সদর্পে বিচরণ করেছেন। চিরকাল দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্বে তিনি সমর্পিত। 'বাঙ্গাল' বলে নিজেকে পরিচয় দিতে যিনি কুণ্ঠিত হতেন, বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশে যিনি গর্বিত হতেন, ইংল্যান্ডকে যিনি অমরাবতী ভেবে আহলাদিত হতেন সেই তিনিই একসময় বোধোদীপ্ত হয়ে অকপটে স্বীকার করলেন, তিনি যা করেছেন তার সমস্তটাই ছিলো অজ্ঞতাজনিত ভ্রম। তিনি সগর্বে বলেছেন: 'আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর।'[২৫] বিলেতের সৌন্দর্যের অসারতা তাঁকে স্বদেশ- স্বভাষা-স্বজনদের কাছে ফিরে আসতে বাধ্য করেছে। কপোতাক্ষ তীরে দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করেছেন: 'এই মধুমাখা স্থানে আসিলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে গেলে সেরূপ পাওয়া যায় না।'[২৬] শেষাবধি মধুসূদনের এই অনুশোচনা এবং উপলব্ধি তাঁকে বাংলা সাহিত্যেই শুধু নয়, বাঙালির হৃদয়েও মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

মধুসূদনের পুরো জীবনে একটি সত্য হলো, গ্রহণ এবং বর্জন। তিনি সর্বদা অতৃপ্ত থেকেছেন। পাওয়ার ইচ্ছে সীমাহীন, তাই না পাওয়ার বেদনাও অসীম। সদাচঞ্চল, সদালাপী মাইকেলের অন্তর ছিলো নীরন্ধ্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন। জাহ্নবী দেবী, রেবেকা কিম্বা হেনরিয়েটা কেউ তাঁর অন্তর অনুধ্যান করতে পারেন নি। পুত্র-বিচ্ছেদে কাতর জননী ইহলোক ত্যাগ করে বেঁচেছেন। রেবেকা স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতায় সীমাহীন ক্ষোভ হৃদয়ে পোষণ করেছিলেন। তবে রেবেকার হৃদয়ে মাইকেল ছিলেন নমস্য, সেজন্যই হয়তো আমৃত্যু একাকী থেকেছেন। যদিও তাঁদের সমাজে দ্বিতীয়, তৃতীয় বিবাহে বাধা ছিলো না। সন্তানদের পরিচয়ে 'ডাট' উপাধি বহনের মধ্যেও রয়েছে মধুসূদনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ। হেনরিয়েটা মাইকেলকে ভালোবেসেছেন, নির্ভর করেছেন। জীবনসঙ্গীর সব আচরণকেই হয়তো তিনি সমর্থন করতেন না, কিন্তু মধুসূদনের গতির মুখে বাবা-মা, স্ত্রী, প্রেমিকা, সন্তান সব তুচ্ছ। 'পর্ব্বত- গৃহ ছাড়ি/ বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে/কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?' (তৃতীয় সর্গ; মেঘনাদবধ কাব্য) প্রকৃতই মধুসূদনের স্বাপ্নিক জীবনের লাগাম টেনে ধরবার মতো ক্ষমতা ছিলো না হেনরিয়েটার। তিনি কখন কাকে কতটুকু ভালোবেসেছেন, তার চেয়ে বড় কথা বিধাতার আশীর্বাদে তিনি সর্বদা ভালোবাসা পেয়েছেন। ব্যক্তি জীবনে নিয়তি নির্মম হলেও তাঁর শৈল্পিক জীবনে বিধাতা সুপ্রসন্ন ছিলেন, নইলে যে মধুসূদন একদিন 'বাংলা ভাষা ভুলিয়া যাচ্ছি' বলে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করেছিলেন, স্বদেশ-স্বজন ছেড়ে বিলেতে 'বড় কবি' হবেন ভেবে স্বধর্ম ত্যাগ করেছিলেন, সেই মধুসূদন যখন বঙ্গদেশে-বাংলা সাহিত্যে ফিরে এলেন তখন এই বাংলাই তাঁকে 'মহাকবি' বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

কিছু কিছু মানুষ থাকেন যাঁদের অন্তর-বাহির, ব্যক্তিজীবন-সাহিত্যিক পরিচয় সর্বদা সমান্তরাল হয় না। তাঁদের অন্তরের অনেক অভিব্যক্তিই থেকে যায় সংগুপ্ত। তাঁদের জীবনের কোনো কোনো অংশ থেকে যায় রহস্যাবৃত। রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র মধুসূদন দত্তও এমনি একজন। তাঁর জীবনে জননী, ভার্যা এবং সন্তান কেউ বিস্মৃত ছিলেন না, বরং এঁদের প্রভাব মাইকেলকে ক্রমাগত পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

তথ্যসূচি:

---

১. গোলাম মুরশিদ, *আশার ছলনে ভুলি*, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৫, কলকাতা, পৃ. ১৭
২. যোগীন্দ্রনাথ বসু, *মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, ৫ম সংস্করণ, ১৯২৫, কলকাতা, পৃ. ১২
৩. ঐ, পৃ.১৪
৪. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬ , কলকাতা, পৃ. ৬৫
৫. *আশার ছলনে ভুলি*, পৃ. ২৬–২৭
৬. ঐ , পৃ. ৮৮
৭. ঐ, পৃ. ১০১
৮. সুরেশ চন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
৯. ঐ , পৃ. ৪০
১০. ঐ , পৃ. ৪১
১১. যোগীন্দ্রনাথ বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
১২. ঐ, পৃ. ৯৫
১৩. ঐ, পৃ. ১৫
১৪. গোলাম মুরশিদ, *মধুর খোঁজে*, ১ম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি২০০৭, ঢাকা, পৃ. ২৩
১৫. *আশার ছলনে ভুলি*, পৃ. ১০৪
১৬. ঐ, পৃ. ১২৪
১৭. ঐ, পৃ. ১৪৭
১৮. ঐ, পৃ. ১২৯
১৯. ঐ, পৃ.১৫০
২০. ক্ষেত্রগুপ্ত, *মধুসূদন: কবিমানস ও কাব্যশিল্প*, ১ম প্রকাশ ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ. ২৪
২১. শশাঙ্কমোহন সেন, *মধুসূদন (অন্তর্জীবন ও প্রতিভা)*, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৯, কলকাতা, পৃ. ২১
২২. *আশার ছলনে ভুলি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
২৩. ঐ, পৃ. ১৮৮
২৪. ঐ, পৃ. ১৯৩
২৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ২৩ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৬২, কলিকাতা, পৃ. ৯১
২৬. যোগীন্দ্রনাথ বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র: প্রসঙ্গ কমলাকান্তের দপ্তর

মোঃ শহিদুল ইসলাম*

সারসংক্ষেপ: রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের চিন্তায় ও কর্মপ্রয়াসে বাংলায় যে নবযুগ সূচিত হয়েছিল, সেখান থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র যাত্রা শুরু করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় মিশেছিল সনাতন স্থিতিশীলতার সাথে গতিশীলতা। তিনি ব্যক্তিবিবেচনাসম্মত যুক্তি ও বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে দেশের মানুষের সমগ্র সামাজিক অস্তিত্বের বিষয় চিন্তা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এ চিন্তা প্রকাশের অন্যতম প্রধান বাহন ছিল 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা। এ পত্রিকাটিকে ঘিরে এক শ্রেণির লেখক ও পাঠকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের বিচিত্র সাহিত্য-প্রতিভা এ পত্রিকাটিতেই বিশেষভাবে উন্মোচিত হয়। উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনাসহ সাহিত্যের নানা দিক এতে স্থান লাভ করে। 'কমলাকান্তের দপ্তর'ও এ পত্রিকার এক অপূর্ব ফসল। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' ভাবের গাম্ভীর্য মৃদু পরিহাসের পাতলা আবরণে ঢেকে উপস্থাপিত হয়েছে। তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ, স্বদেশ ও স্বজাতি সম্পর্কিত সত্যসন্ধ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। আলোচ্য নিবন্ধে মূলত সে সম্বন্ধেই আলোকপাত করা হয়েছে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে উনিশ শতক ছিল এক পরিবর্তনের যুগ। ভারতীয় সমাজ বাস্তবতায় এক নবজাগরণের কাল। সেই নবজাগরণ ও সংস্কৃতির পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। বিশেষ করে কাব্য, গদ্য ও নাট্য সাহিত্যে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এমনই এক সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে সৃষ্টিশীল প্রতিভা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) পদযাত্রা। এ সময়ে জাতির জীবনে যে যুগান্তরের সমস্যা বিরাট হয়ে দেখা দিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-বিবর্তনেও এর প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। যুগান্তরের এ সংকট বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়কে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রে ও প্রতিভায় সে সময়ের বাঙালি হিন্দুর আত্মজাগরণের প্রয়াস প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

সার্থক উপন্যাস রচয়িতা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাধিক পরিচিতি। কিন্তু প্রবন্ধকার হিসেবেও তাঁর মর্যাদা কোন অংশে কম নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এ যুগপৎ প্রতিভার কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'সব্যসাচী' আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে একজন ধ্রুপদী শিল্পী। তাঁর রচনায় প্রবন্ধ সাহিত্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণে তাঁর প্রবন্ধ স্বকীয়তার মর্যাদা রাখে। রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকগণ বিষয় ও ভাষারীতিতে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে কিছুটা সমৃদ্ধ ও সহজতর করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা প্রবন্ধকে প্রথম শ্রেণির শিল্পকলার মর্যাদায় উন্নীত করেন। প্রবন্ধের আঙ্গিক পরিকল্পনায় ও উপস্থাপনায় যোগ করেন এক ভিন্নতর মাত্রা। দান করেন অনমনীয় দৃঢ়তা ও সুসংবদ্ধ সাহিত্যিক সরলতা। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে ক্রমবিকাশমান বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য যে বিশেষ উদ্দেশ্য ও আদর্শকে সামনে রেখে রচিত হয়েছে, তা পরিহার করে নিছক সাহিত্যিক মনোভাব নিয়েই তিনি প্রবন্ধ রচনা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র ব্যক্তিসত্তায় প্রোথিত ছিল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার প্রতি নিবিড় আকর্ষণ। অলৌকিক প্রতিভা, দুর্লভ মনীষা ও তেজোদীপ্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের অন্তঃপ্রকৃতির গভীরতর মর্মমূলে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল সুদূর প্রসারিত এবং তা কখনও কোন সীমাবদ্ধ মতাদর্শের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে নি। তিনি

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, এন. এস. সরকারি কলেজ, নাটোর

'কোনো তত্ত্ব বা মূল্যবোধকেই নির্দ্বিধায় মেনে নেন নি, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যকেও যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করেছেন।'[১] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য গভীরভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে তাঁর গভীর পরিচয় ঘটে। আর এ পরিচয়ের সূত্র ধরেই তাঁর যাবতীয় রচনা ও সাহিত্যসৃষ্টির আদর্শে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সভ্যতার প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত হলেও, তিনি তাকে যতটুকু সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন ঠিক ততটুকুই হিন্দু জাতির সাধনা ও সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত করে দেখেছিলেন। ফলে ইউরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা অন্তরায় না হয়ে স্ব-ধর্ম্ম, স্ব-সমাজ ও স্ব-জাতির কল্যাণপ্রসূ হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমের প্রেরণাযুক্ত এক অপূর্ব প্রতিভায় স্বধর্ম ও পরধর্মের বিরোধ নিষ্পত্তি করেছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ের সাংস্কৃতিক জীবনের পারস্পরিক তুলনার মাধ্যমে তিনি পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের আদর্শ অনুসন্ধান করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিষয়োপযোগী উপাদান সংগ্রহ করে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিষয়-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেন। তাঁর বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ যুক্তির সুতীক্ষ্ণতায় ও প্রামাণ্য তথ্য-সমাবেশে দীপ্তিমান। কোথাও অসংযত অতিরেক উচ্ছ্বাসে ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নেই। শব্দ বা অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও রচনার ভাব বা রূপগত সঙ্গতি অক্ষুণ্ন রয়েছে। তিনি বিতর্কমূলক প্রতিপাদ্য বিষয়ও দৃঢ়ভিত্তিক যুক্তির সহায়তায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর সকল প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় পরিবেশন গুণে সুস্পষ্ট এবং মননদীপ্ত হয়েছে। দুরূহ সমস্যামূলক বিষয়ও তিনি সহজভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি একজন বিজ্ঞান-সচেতন, দার্শনিক মনষ্ক ব্যক্তি হলেও তাঁর প্রবন্ধসমূহে বিচিত্র চিন্তা ও ভাবোপলব্ধি রসাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রসঙ্গ অবলম্বনে প্রবন্ধ প্রকাশের অন্যতম প্রধান বাহন ছিল *বঙ্গদর্শন* (১৮৭২) পত্রিকা। এই মাসিক পত্রিকাটি তাঁর সম্পাদনায় ও রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে সে সময়ে শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক মুখপত্রের খ্যাতি অর্জন করেছিল। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-ভাষার ক্ষেত্রেও এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। অতিরিক্ত অলঙ্কার ও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার কমিয়ে তিনি ভাষায় বিশুদ্ধ প্রাঞ্জলতা ও ওজস্বিতা দান করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে শ্রী অধীর দে যে মূল্যায়ন করেছেন তা স্মরণযোগ্য,

> বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার-বিশ্লেষণধর্মী অধিকাংশ প্রবন্ধই তাঁহার মহান সুন্দর বলিষ্ঠ কল্পনায় অধিকতর মহিমামণ্ডিত হইয়াছে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁহার সুদুর্লভ এক অখণ্ড রূপের প্রতীতি হইতেই ইহার উদ্ভাবনা সম্ভবপর হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় বাংলা ভাষায় জ্ঞানগর্ভ বিচারধর্মী প্রবন্ধ সাহিত্যের যে সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমান্বয়ে সংহত চিন্তা ও গাঢ়বদ্ধ বাণী ভঙ্গিতে সুসমৃদ্ধ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে।[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে বহুদর্শী অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি, গভীর ধ্যান ও ধারণালব্ধ তীক্ষ্ণ বোধিদৃষ্টি যৌক্তিকভাবে উপস্থাপিত হলেও তাতে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদী রসিক হৃদয়ের স্পন্দন-বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর আলোচনায় সন্নিবেশিত হয়েছে বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস– প্রভৃতি বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের লঘু ও গুরু, সাহিত্যধর্মী এবং চিন্তাপ্রধান নানা প্রকার প্রবন্ধের উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থের তালিকা এখানে দেওয়া হল। *লোকরহস্য* (১৮৭৪) কৌতুকরসাত্মক নকশার সঙ্কলন। *বিজ্ঞানরহস্য* (১৮৭৫), বিজ্ঞানবিষয়কে জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে রচিত প্রবন্ধসংগ্রহ। *কমলাকান্তের দপ্তর* (১৮৭৫), পরের সংস্করণে কমলাকান্তের পত্রগুলো যুক্ত হয়ে *কমলাকান্ত* (১৮৮৫) নামে প্রচারিত। *বিবিধ সমালোচনা* (১৮৭৬), *প্রবন্ধপুস্তক* (১৮৭৯) গ্রন্থ দুটি একসঙ্গে *বিবিধ প্রবন্ধ* (১৮৮৭) প্রথম ভাগ নামে প্রকাশিত হয়। 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। *সাম্য* (১৮৭৯), *কৃষ্ণচরিত্র* (১৮৮৬) এবং *ধর্মতত্ত্ব* বা *অনুশীলন* (১৮৮৮) তাঁর অন্য সমস্ত বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থ।

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা *কমলাকান্তের দপ্তর* ১২৮০ থেকে ১২৮২ সালে *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত এগারটি প্রবন্ধ নিয়ে আলাদাভাবে গ্রন্থাকারে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলি হল, একা– 'কে গায় ওই?' (ভাদ্র, ১২৮০), 'মনুষ্য ফল' (আশ্বিন, ১২৮০), 'ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন' (কার্তিক, ১২৮০), 'পতঙ্গ' (অগ্রহায়ণ, ১২৮০), 'আমার মন' (মাঘ, ১২৮০), 'বসন্তের কোকিল' (চৈত্র, ১২৮০), 'ফুলের বিবাহ' (আষাঢ়, ১২৮১), 'বড় বাজার' (আশ্বিন, ১২৮১), 'আমার দুর্গোৎসব' (কার্তিক, ১২৮১) 'একটি গীত' (ফাল্গুন, ১২৮১) এবং 'বিড়াল' (চৈত্র, ১২৮১)।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন-থেকে জানা যায়, দপ্তরের মোট চৌদ্দটি রচনার মধ্যে 'চন্দ্রলোক, (ফাল্গুন, ১২৮০) এবং 'মশক' (বৈশাখ, ১২৮২) অক্ষয়চন্দ্র সরকারের এবং 'স্ত্রীলোকের রূপ' (জ্যৈষ্ঠ,১২৮১) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা বলে এই গ্রন্থে এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। কিন্তু পরে 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'কমলাকান্তের পত্র' ও 'কমলাকান্তের জবানবন্দী' (ভাদ্র, ১২৮৮) একত্রিত হয়ে যখন 'কমলাকান্ত' (১৮৮৫) শিরোনামে প্রকাশিত হয়, তখন 'চন্দ্রলোক' এবং 'স্ত্রীলোকের রূপ' রচনা দুটি সেখানে স্থান লাভ করে। 'কমলাকান্ত' এর দ্বিতীয় সংস্করণে 'ঢেঁকি' (বৈশাখ, ১২৮৯) নামে একটি রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়। আলোচ্য নিবন্ধে 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রসঙ্গে আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

বঙ্কিম-প্রতিভার সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে 'কমলাকান্তের দপ্তর'একটি অপূর্ব ব্যতিক্রম সৃষ্টি। এ সৃষ্টির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাশীলতা, মনস্বিতা ও পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি সাহিত্য-স্রষ্টার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। এখানে মানব-চরিত্র সম্পর্কে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ও গভীর জ্ঞান অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিতান্ত স্নেহকরুণ দৃষ্টিতে মানবজীবনের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সংযত শূভ্র হাস্য-রসিকতার মাধ্যমে উদ্‌ঘাটন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে এখানে বেদনা-করুণ জীবনরসিক স্রষ্টা হিসেবে আমরা পাই। 'গদ্য-রচনাও যে একটা সাহিত্যিক সৃষ্টির কতখানি উচ্চস্তরে এসে পৌঁছতে পারে, 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এ কথাটাই আমাদের প্রথম সচকিত করে দিয়েছে।'[৩] সমাজ ও সময়ের চাহিদায় বঙ্কিমচন্দ্রকে ঔপন্যাসিকের আসন থেকে উঠে এসে সমাজচিন্তা ও দেশচিন্তার পথে অগ্রসর হতে হয়েছে। সৃষ্টি করেছেন 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র মত হাস্য-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মিশ্রিত বিশিষ্ট মনন-সমৃদ্ধজাত সাহিত্য। এতে আবিষ্কার করেছেন দার্শনিক দৃষ্টির সহায়তায় জগৎ ও জীবনের গভীর রূপ ও রহস্য। কমলাকান্ত চরিত্রের সাহায্যে তুলে ধরেছেন সমকালীন মানুষ এবং সামাজিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক, ঘাত-প্রতিঘাতের মনোজ্ঞ চিত্র। এখানে কমলাকান্তের যে অভিজ্ঞতা উপস্থাপিত হয়েছে তা শুধু তার একার নয়, বিভিন্ন মানুষের অভিজ্ঞতার সমন্বিত প্রকাশ। সাধারণ মানুষের যে জীবনাচরণ তারই ব্যঞ্জনা এখানে অনুরণিত হয়েছে । তাই এ রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের কালকে অতিক্রম করে বর্তমান কালের মানসকে স্পর্শ করে কালোত্তীর্ণ সাহিত্য-শিল্পের মর্যাদা লাভ করেছে।

ইংরেজি-শিক্ষিত ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তাসংকটের প্রতীক বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও ব্যবহারিক জীবনে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের মুখোমুখী হয়েছিলেন সে দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ *কমলাকান্তের দপ্তরেও* অতি সুস্পষ্ট । গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ দ্বন্দ্বের কলরবও বেদনায় মুখর। শিল্পী মানসের সাথে ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীন বিরোধের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে *কমলাকান্তের দপ্তরে*। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দারের বিশ্লেষণ,

> বিদেশী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক আরোপিত জীবনের প্যাটার্ণ, প্রচলিত আদর্শ, সাংস্কৃতিক অঙ্গাবরণ, প্রচলিত রাজনীতি, জীবনাচরণের সমস্ত দিকের সহিত শিল্পী মনের ঘোরতর সংগ্রাম দেখা দিয়াছে ; পাস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান, অথবা তাল মিলাইয়া চলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। হয় বাস্তবকে বিশিষ্ট ধারায় রূপায়িত করিয়া শিল্পী মানস

> আপন কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে, নয়তো বাস্তব ব্যবহারিক পৃথিবী সম্পর্কে তাঁহার আচরণ পরিবর্তন করিতে হইবে। এই সংকটের চরম অভিব্যক্তি রূপেই 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর আবির্ভাব।[৪]

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর বিষয়বস্তু সাধারণ বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের মতই। কিন্তু রচনাগুলোতে গুরুগম্ভীর ভাবের সঙ্গে ব্যঙ্গাত্মক লঘুতম ভঙ্গির মেলবন্ধনে ভাবের গাম্ভীর্য হাল্কা এবং সহজতর হয়েছে। ফলে রচনাগুলো যথার্থ প্রবন্ধ-শিল্পের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ না হয়েও এক অভিনব সাহিত্য-সৃষ্টি হয়েছে।

'কমলাকান্তের দপ্তর'–এ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপম কল্পনাপ্রসূত চারটি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কমলাকান্ত স্বয়ং, ভীষ্মদেব খোসনবীশ, নসীরামবাবু ও প্রসন্ন গোয়ালিনী। কমলাকান্ত ই প্রধান চরিত্র এবং তারই চিন্তা-ভাবনা অন্যান্য চরিত্রগুলোর সংলাপ সহযোগে প্রকাশ পেয়েছে। আফিম নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি কমলাকান্তের বিবৃতি হতে তার চরিত্র সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু ধারণা করা সম্ভব হয় এবং কমলাকান্ত যে তথাকথিত সাধারণ নেশাগ্রস্ত বিকৃত মস্তিষ্ক কোন ব্যক্তি নয়, সে সম্পর্কেও নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। বরং কমলাকান্তের মধ্যদিয়ে একজন প্রত্যুৎপন্নমতি, সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীল পুরুষের পরিচয়ই প্রকাশিত হয়েছে।

'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থের শুরু হয়েছে শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস-এর উপস্থাপনায়। ভীষ্মদেব-এর বর্ণনায় কমলাকান্তের চরিত্র-পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণের কাছে কমলাকান্ত পাগল হিসেবে পরিচিত। সে 'কিছু ইংরেজি, কিছু সংস্কৃত' জানত। এই বিদ্যার গুণে এবং তার ইংরেজি কথা শুনে এক ইংরেজ সাহেব তাকে কেরাণীগিরি চাকরি দিয়েছিল। কিন্তু সরকারি নথিপত্রে কবিতা রচনা, প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রে শেক্সপীয়রের উক্তি, সবশেষে বেতন বিলে বিদ্রূপাত্মক চিত্রাঙ্কনের অভিযোগে অল্পদিনের মধ্যেই তার চাকরির পাট চুকিয়ে দিতে হয়। কমলাকান্তের বেশি অর্থের প্রয়োজন ছিল না। কেননা, সে ছিল 'দারপরিগ্রহ' হীন। যেখানে সেখানে সে পড়ে থাকত। কেবল 'দুইটি অন্ন এবং আধ ভরি আফিম' পেলেই তার চলত। কিছুদিন সে ভীষ্মদেব এর বাড়িতে অবস্থান করেছিল। পাগল বলে তাকে বেশ যত্নও করত ভীষ্মদেব। কিন্তু ভীষ্মদেব তাকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারে নি। কারণ, অস্থির কমলাকান্ত স্থায়ীভাবে কোথাও কোন ঘর বাঁধেনি। একদিন সকালে 'ব্রহ্মচারীর মত সে গেরুয়া– বস্ত্র পরে কোথায়' চলে যায়। যাবার সময় কমলাকান্ত 'মসীচিত্রিত, পুরাতন, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা' 'একটি দপ্তর' ভীষ্মদেবকে উপহার দিয়ে যায়। কমলাকান্ত চরিত্র পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে কমলাকান্তকে বৈষয়িক বিষয়ে নির্লিপ্ত বাস্তব সংসার বিমুখ এক টাইপ চরিত্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। বৈষয়িক বিষয়-সম্পদে মগ্ন, আত্মকেন্দ্রিক মানুষদের মনে মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তোলাই ছিল এ চরিত্র গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য।

কমলাকান্তের অতীন্দ্রিয় শক্তি লাভের বিশেষ অবলম্বন ছিল আফিম। এ আফিম সেবনে তার দিব্যদৃষ্টি এবং দিব্যকর্ণ খুলে যায়। তাতে সে অদৃশ্য নানকিছু দেখতে পায় এবং অশ্রুত বিষয় শ্রবণ করতে পারে। কমলাকান্তের এ অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে বিচিত্র অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে, তা যেন বঙ্কিমচন্দ্রেরই অন্তর্দৃষ্টির এক নান্দনিক বহিঃপ্রকাশ। এখানে কমলাকান্ত যেন বঙ্কিমচন্দ্রের মানসপুত্র। বাস্তবে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে যা প্রকাশ করা সম্ভব নয়, সেখানে তিনি কমলাকান্তের আশ্রয় নিয়েছেন। অসঙ্কোচে প্রকাশ করেছেন ব্যক্তিজীবনে সঞ্চিত বাস্তব অভিজ্ঞতা। কমলাকান্ত চরিত্র নির্ণয়ে বঙ্কিমচন্দ্র জীবন ও জগতের বিচিত্র বিষয়কে চিত্তের পুলক ও ধ্যানের মধ্যদিয়ে অনুভব করে শিল্পবস্তুতে রূপদান করেছেন।

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর খণ্ড খণ্ড রচনায় বিভিন্ন শ্রেণির ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। সে হিসেবে এতে উপস্থাপিত হয়েছে আবেগজাত আত্মগত উপলব্ধি, সমাজভাবনা, স্বদেশভাবনা, সাহিত্যভাবনা ইত্যাদি। তবে এরূপ শ্রেণিবিভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা ততটা হয়তো সমীচীন হবে না। কারণ রচনাগুলো সাহিত্যের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে রচিত না হওয়ায় একই রচনায় একাধিক বিষয়ের ভাব-বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। তবুও মূল প্রতিপাদ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে রচনাগুলোর ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রনির্দেশ করা সম্ভব।

১. আত্মবীক্ষণ

'কমলাকান্তের দপ্তর' রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মবীক্ষণমূলক রচনা বলে মনে হতে পারে। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মবীক্ষণমূলক কোনো রচনা নেই; গদ্যের এই রীতিটি সে সময়ে প্রায় অনুপস্থিত ছিল। তবুও বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অন্তর্গত 'একা', 'আমার মন', প্রভৃতি রচনায় মানবজীবনের নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষোভ গীতিরসের সাথে আত্মপ্রকাশ করেছে। কমলাকান্তের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রের নির্জন ব্যক্তি-সত্তার আর্তি ধ্বনিত হয়ে এ জাতীয় রচনা আরও বেশি হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ রচনাসমূহের মধ্যেই পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যে বহুল প্রচলিত ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বীজ সর্বপ্রথম সার্থকভাবে লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমের গদ্যরীতিতে যুক্তি তথ্য প্রমাণ ইত্যাদি বহিরঙ্গ বক্তব্যবন্ধনই প্রধান। কেবল 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র 'একা' রচনাটিতেই এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। এখানে কমলাকান্তের স্বগতকথনে প্রকাশিত হয়েছে তার আত্মবীক্ষণজাত উপলব্ধি। কমলাকান্ত শুধু নিজের মনের পলাতক আলোছায়া নিয়েই মালা গেঁথেছে। একাকিত্বের এক অনির্দেশ্য হাহাকার এখানে ব্যঞ্জিত হয়েছে। এ হাহাকার পাঠক হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যায়। কমলাকান্ত তার মনোলোককে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে। সমাজের মধ্যে থেকেও সে একা, বান্ধবহীন, স্বেচ্ছানির্বাসিত। সে দেখেছে ঘোর বনে বের হবার রাস্তা নেই, ধূ ধূ প্রান্তরে জল নেই, নদী পার হবার উপায় নেই, অকূল সমুদ্রে দ্বীপের আশ্বাস নেই, অন্ধকারে তারার আলো পথের ঠিকানা দেয় না। ফুলে পোকা আছে, গাছের নরম পাতা ছুঁতে গেলে কাঁটা বাঁধে। অনাবিল নদীতে গোপন ঘূর্ণি, স্বাদু ফলের কন্দরে বিষ, বাগানে লুকিয়ে থাকা সাপ, মানুষের অন্ধ স্বার্থপরতা, বন্ধ্যা গাছ, নির্গন্ধ ফুল, বৃষ্টিহীন মেঘের মায়া, সৌন্দর্য ঐশ্বর্য পবিত্রতার মিথ্যা অন্বেষণ, ছদ্মবেশী মেকি। সবই সে জেনেছে। বস্তুত মনে হয়, তার অভিজ্ঞতায় রিপুর ছোবল নেই, পতঙ্গের মত সে পুড়ে যায় নি, সে জীবনের স্বাদ নিয়েছে জ্ঞানের রসনায়। যৌবনে স্বপ্নদ্রষ্টা সৌন্দর্যপ্রেমিক প্রাণচঞ্চল কমলাকান্ত জীবনের অভিজ্ঞতার দীর্ঘ পথপরিক্রমা করে এখন দেখছে এই জগৎটাকে আপাতদৃষ্টিতে যেমন দেখায় বস্তুত তা নয় । প্রথম বয়সের মুগ্ধতা রূপান্তরিত হয় প্রৌঢ় বয়সের সংশয়-দ্বিধায়, সৌন্দর্যকে মনে হয় মোহিনী, বাস্তব হয়ে যায় স্বপ্ন। কমলাকান্তের যে লেখাগুলোকে ভীষ্মদেব খোশনবিশ প্রলাপোক্তি মনে করেছে, সেগুলো আসলে প্রৌঢ় কমলাকান্তের মোহভঙ্গের করুণ কাহিনী। কঠিন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে কমলাকান্ত জেনেছে, জীবনের সব-কিছুই ঠিক আছে ভেবে আত্মতৃপ্ত হবার কোনো কারণ নেই। কেননা জগৎ ও জীবন একটা প্রহেলিকা মাত্র। গবেষক ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ,

> কমলাকান্তের আত্মকথায় ও বিভিন্ন উক্তিতে যে হাস্যরসের কথা বলা হয়েছে, তার অনেক মাত্রা আছে। কখনো শব্দগন্ধস্পর্শস্বাদবর্ণে রূপময়ী জগতের সৌন্দর্যের আরাধনা, কখনো বিরাগ, কখনো প্রীতি, কখনো ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাত, কখনো তির্যক বিদ্রূপ। ব্যথা ও শ্লেষ, গভীরতা ও চাপল্য, প্রেম ও ভ্রূকুটি, বুদ্ধি ও আবেগের এমন আশ্চর্য সমন্বয় বঙ্কিমসাহিত্যে আর কোথাও পাওয়া যায় না।[৫]

'একা' রচনাটিতে প্রধান হয়ে উঠেছে কমলাকান্তের হৃদয় খুঁড়ে জাগানো বেদনা। তবে এই বেদনা প্রশমিত হয়েছে তার মানবপ্রীতিতে। আত্মপরায়ণতাকে বিশ্বপরায়ণতায় রূপান্তরিত করা সম্ভব যে উপায়ে তার নাম প্রীতি-বৃত্তি। গভীর জীবনদর্শনের আলোয় জগৎ ও জীবনকে অবলোকন করে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় যে নিষ্কাম প্রীতিতত্ত্ব প্রধান স্থান অধিকার করেছিল, কমলাকান্তের নানা উক্তিতে সেই প্রীতিতত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে। 'প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী– ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার সংগীত। অনন্তকাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না'।[৬]

উনিশ শতকের বাঙালি জাতি নব শিক্ষার অভিমানে আত্মতৃপ্ত, অহংকৃত। কিন্তু সে শিক্ষা মানবপ্রীতির শিক্ষাই যে সবচেয়ে বড় শিক্ষা, এ বোধ জাগাতে পারে নি। 'একা' রচনাটিতে এ ব্যর্থতার বেদনাই কমলাকান্তের মনে প্রবল হয়ে উঠেছে।

'আমার মন' রচনায় কমলাকান্ত তার হারানো মনের অনুসন্ধান করেছে। যেখানে তার মন ছিল সেখানে নেই। সাত পৃথিবী খুঁজেও তার "মনচোর"কে সে পায় নি। এক হিতৈষীর প্রেরণায় 'পাকশালায়' 'পলান্ন, কোফতা' প্রভৃতির কাছে মনের সন্ধান করে জেনেছে তারা কেউ তার মন চুরি করে নি। প্রসন্ন গোয়ালিনী এবং তার মঙ্গলা গাইয়ের প্রতি কমলাকান্তের সমান ভালবাসা ছিল। সে 'প্রসন্নের গবাক্ষতলে, অথবা তাহার গোহালঘরে' তার মনকে খুঁজে পায় নি। এক সময় কাঁদতে কাঁদতে পথে বের হয়ে এক যুবতিকে দেখে মনে হয়েছিল সে-ই তার মন চুরি করেছে। কিন্তু সে যুবতিও তার মন চুরি করে নি। অবশেষে কমলাকান্তের এই বোধ জাগে, 'আমি কখন কিছুতে মন বাঁধি নাই – এজন্য কিছুতেই মন নাই।...আমি চিরকাল আপনার রহিলাম– পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই।'[৭] অনেক অনুসন্ধানের পর কমলাকান্তের এই প্রত্যয় জন্মে যে, 'পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল্য নাই।'[৮] 'পরসুখবর্দ্ধনে'র এ কথাটি আড়াই হাজার বছর আগে 'শাক্যসিংহ' বলে যাওয়ার পর 'শত সহস্র লোকশিক্ষক শত সহস্র বার' শিক্ষা দিয়ে আসলেও লোকে 'আত্মাদরের ইন্দ্রজাল' থেকে মুক্ত হতে পারে নি। অন্ধ আত্মপ্রেমের এমন পরিস্থিতিতে ইংরেজি সভ্যতার প্রভাবে 'বাহ্য সম্পদে'র পূজায় দেশ উৎসন্নে যাবার উপক্রম –

> বাহ্য সম্পদের পূজা কর। হর হর বম্ বম্! টাকার রাশির উপর টাকা ঢাল! টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা নতি, টাকা গতি! টাকা ধর্ম্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ!...টাকার ঝনঝনিতে ভারতবর্ষ পুরিয়া যাউক! মন! মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই; টাকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে! টাকাই বাহ্য সম্পদ! হর হর বম্ বম্! [৯]

কমলাকান্তের ধারণায় বাহ্য সম্পদের মাধ্যমে একজনও অভদ্র থেকে ভদ্র, অশিষ্ট থেকে শিষ্ট কিংবা অধার্মিক থেকে ধার্মিক হতে পারে নি। বাহ্য সম্পদ বৃদ্ধির মত উদর বৃত্তিতেও মানুষ এক ধরনের সুখ অনুভব করে। তবে কমলাকান্ত বুঝেছে উদরপূর্তির সুখের চেয়ে মনের সুখই বড় সুখ। মনের সুখ বৃদ্ধির জন্য মানুষে মানুষে ভালবাসা বৃদ্ধির প্রয়োজন। কমলাকান্ত এ উদ্দেশ্যে তাই প্রস্তাব করেছে, 'তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কল হয় না?'[১০]

'বসন্তের কোকিল'-এ আত্মনিষ্ঠ ভাবতন্ময়তা গীতিময় মাধুর্যে ঝংকৃত হয়েছে। শুরুতে বসন্তের কোকিলের রূপকে সুদিনের সঙ্গীদের তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে। কিন্তু পরে হৃদয়ের আকুতি আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে অনন্ত সৌন্দর্যের সন্ধানে। জগতে নির্মুক্ত কোকিলেরও

কেউ নেই, নির্বিকার কমলাকান্তেরও কেউ নেই। উভয়েই 'সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী'। তাই কমলাকান্ত কোকিলের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে,

> আয়, ভাই, তোতে আমাতে মিলে মিশে পঞ্চম গাই। তোরও কেহ নাই-আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই- আনন্দ আছে। তোর পুঁজিপাটা ঐ গলা ; আমার পুঁজিপাটা এই আফিঙ্গের ডেলা; তুই এ সংসারে পঞ্চ-স্বর ভালবাসিস্- আমিও তাই; তুই পঞ্চম-স্বরে কারে ডাকিস্? আমিই বা কারে? বল দেখি পাখী কারে?
>
> যে সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভাল তাকেই ডাকি! যে আমার ডাক শুনে তাকেই ডাকি।[১১]

কোকিলের মত ভুবন ভুলানো স্বর কমলাকান্তের নেই বলে তার মনের বেদনা প্রকাশ করতে পারছেনা। তাই কমলাকান্তের অদম্য বাসনা,

> 'যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই – অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি। ঐ নীলাম্বর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে উড়িয়া, কখন কি কুহু বলিয়া ডাকিতে পাইব না? আমি না পাই, তুই কোকিল আমার হয়ে একবার ডাক দেখি রে!'[১২]

'আমার দুর্গোৎসব'-এ কমলাকান্তের আত্মগত উপলব্ধি আরও প্রবল হয়ে উঠেছে:

> 'উঠ মা হিরন্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা ! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব- তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবী দেবানুগৃহীত- এবার আপনা ভুলিব- ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব- অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব- উঠ মা-একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননী!'[১৩]

'একটি গীত' রচনায় 'বাঙ্গালির মর্ম্মোক্তি' কমলাকান্তের ঐতিহ্য-চেতনার মধ্যদিয়ে বিচিত্র স্বরে অনুরণিত হয়েছে। বাঙ্গালির পূর্ব গৌরবের কাহিনী বিস্মৃত ইতিহাস হতে সংগ্রহ করে তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে স্বদেশানুরাগী বঙ্কিমচন্দ্র যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন-

> 'আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে- নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,- প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? সে যে কেবল যবনলাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ! আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? '[১৪]

২. সমাজ ভাবনা

সমাজভাবনা মূলক রচনাগুলোর মধ্যে 'মনুষ্য ফল'-এ মনুষ্য সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষকে তাদের চরিত্রের সদৃশ্য ফলের সঙ্গে তুলনা করে কৌতুক করা হয়েছে। যেমন কমলাকান্তের চোখে সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষেরা কাঁঠাল, সিভিল সার্ভিসের লোকেরা আম, নারীরা নারকেল, দেশীয় লেখককুল তেঁতুল এবং দেশী হাকিমেরা কুষ্মাণ্ড। এখানে ব্যঙ্গ অপেক্ষা কৌতুকের মাত্রাই বেশী। 'বড় বাজার'-এ দেখা যাচ্ছে, আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় সমাজ ও জীবনের সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে ব্যবসায়িক বুদ্ধি। সাহিত্য-শিল্প-জ্ঞানচর্চা-যশ-খ্যাতি সবকিছু বাজারের ক্রয়বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হয়েছে।

সমাজভাবনামূলক শ্রেণির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা 'বিড়াল'। এ বিড়াল সুবিচারক, সুতার্কিক। তার বাকযুদ্ধ দরিদ্র ও নিপীড়নের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে। এখানে বিড়ালকে শোষিত জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা পাই। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা দারিদ্র্য এবং শোষণের মূল কারণ। বিড়ালের

তর্কে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে। জটিলযুক্তিপূর্ণ বিষয়ের বিচার-মীমাংসা হাস্যরসিকতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবার অনন্য সাধারণ ক্ষমতা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। 'বিড়াল' নামক রচনা হতে তা প্রমাণিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই রূপাত্মক রচনা-চিত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ এই দুটি পরস্পরবিরোধী মতবাদের বৈশিষ্ট্য যুক্তি-তর্ক সহকারে বিবৃত করেছেন। চতুষ্পদ জন্তু বিড়াল সাম্যবাদী সমাজের প্রতিনিধি এবং তার্কিক কমলাকান্ত পুঁজিবাদী ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতিভূরূপে এতে চিত্রিত হয়েছে। দরিদ্র সর্বহারা ব্যক্তিদের ব্যথা-বেদনা এবং চুরি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সামাজিক দুর্নীতির মূল উৎস সন্ধানে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনার মধ্যে যে বাস্তব সত্যের আলোকপাত করেছেন, তা যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনি তাঁর কৌতুকমিশ্র বিদগ্ধ মনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়েছে। সুপরিচিত 'বিড়াল' প্রবন্ধটিতে ধনী-দরিদ্রের ধনবৈষম্যের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ করা হয়েছে:

> দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেক চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে– চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?'[১৫]

৩. স্বদেশ ভাবনা

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ পরিচয় যে, তিনি একজন স্বদেশপ্রেমিক লেখক ছিলেন। স্বদেশভাবনার দীক্ষা কারও কাছ থেকে গ্রহণ করতে হয় নি। শিক্ষালব্ধও নয়। এ তাঁর সহজাত মনীষার মত প্রাক্তন সম্পদ। এই দেশপ্রেম তাঁকে অভিভূত করেছিল, দেশের নামে তিনি আত্মহারা হতেন। 'এই দেশ কোন মনঃকল্পিত দেবতা নয়– যেন সাকার বিগ্রহ; এ প্রেম যেন রক্তের ধর্ম্ম–ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিবিড় চেতনা।'[১৬] এই দেশপ্রীতির মধ্যদিয়েই তিনি আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটিয়েছেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যতঃ সমাজসংস্কারক অথবা ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন না বটে; কিন্তু তাঁর সাহিত্য সাধনায় সমাজচেতনা ও ধর্মবোধ অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত ছিল বলে তাঁর স্বদেশানুরাগ প্রবল ও আন্তরিক হয়ে উঠেছিল।'[১৭] 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমচন্দ্রের এ স্বদেশপ্রেম উন্মত্ত আবেগজাত উপলব্ধিতে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে 'আমার দুর্গোৎসব' এবং 'একটি গীত' রচনায়। রচনা দুটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশভাবনা দুঃখবোধের প্রলেপে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সপ্তমী পূজার দিন আফিম চড়ায়ে কমলাকান্ত বাংলা-মায়ের যে পরিপূর্ণ দুর্গামূর্তি ধ্যাননেত্রে দর্শন করেছিল, তার ভিতরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একাধারে বঙ্কিমের ঋষিত্ব এবং স্বাদেশিকতা। কমলাকান্ত যখন অমোঘ স্বরে আহ্বান জানায়, 'এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি।'[১৮] – তখন বাণীময়রূপে স্বদেশ পূজারী বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের নিকট একান্ত জীবন্ত হয়ে ওঠেন।

'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধটিতে 'আনন্দমঠে'র মাতৃরূপের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। এ কারণে বঙ্কিম-সাহিত্যে প্রবন্ধটি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। স্পষ্টতই বঙ্কিম এখানে দেশপ্রেমের সহজাত সংস্কারকে যুক্তি ও তথ্যের অবলম্বন থেকে মুক্ত করে অন্যনিরপেক্ষ নিজস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেশজননীকে তিনি হিন্দু বাঙালির সহজ ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। কমলাকান্তের আর কোনো দেবী নেই দেশ লক্ষ্মী ছাড়া, আর কোনো পূজা নেই দেশ পূজা ছাড়া। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের উত্তরার্ধে ধর্মতত্ত্বে মনুষ্যচরিত্রের নীতি স্থির করতে গিয়ে দেশভক্তিকেও তাঁর চারিত্র্যনীতির অন্তর্গত করেছিলেন। তার সূচনাও এখানেই। আনন্দমঠের দেশজননী-মূর্তি বলিষ্ঠ ভাবের উদ্দীপক, ঐশ্বর্যময়ী। পতিত অবসন্ন জাতির হৃদয়ে শক্তি ও উৎসাহ সঞ্চার করে রজোগুণান্বিত করে

তুলতে পারে এমনিভাবেই সেই মূর্তি রচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'আমার দুর্গোৎসবে'র মাতৃমূর্তি বর্ণনাতেও সেই ঐশ্বর্যভাবের স্বপ্নেই কমলাকান্ত মগ্ন:

> চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি – এই মৃন্ময়ী-মৃত্তিকারূপিণী-অনন্ত-রত্নভূষিতা–এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ–দশ দিক্–দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু-বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রু–নিষ্পীড়নে নিযুক্ত![১৯]

দুর্গামূর্তির সঙ্গে দেশজননী কি করে অভিন্ন হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিকে অধিকার করেছিল, সেই ইতিহাসও জানা যায়। একবার অষ্টমী পূজার দিন রাত্রিতে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে একজন কীর্তন-গায়ক বলরাম দাসের 'এসো এসো বঁধু' পদটি গান করেন। গানের মাধুর্য বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রকে অনেকক্ষণ অভিভুত করে রাখে। কীর্তন গায়ক আরও অন্য গান করেন কিন্তু এই গানটি বারবার শুনেই সেই রাত্রি ভোর হয়ে যায়। এই ঘটনার স্মৃতিতেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

> 'যখন এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই – মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি দৈববংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর – শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই–এই গীত কখন ভুলিতে পারিলাম না; কখন ভুলিতে পারিব না।'[২০]

সেই দুর্গাপূজার উপলক্ষের সঙ্গে বৈষ্ণব কবির এই গানটি মিশে গেল। গানের বঁধু হলেন দেবী দুর্গা। বঙ্কিমের তীব্র দেশাকাঙ্ক্ষার প্রতিমায় রূপান্তরিত হয়ে তিনিই হলেন মনের মানস।

> ... আমি কেন দিবস গণিব ?
>
> গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যে-দিন বঙ্গে হিন্দু নাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যে-দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গ জয় করিয়াছিল সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয় , শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল, কই?[২১]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'মনের মানস' আর কিছুই নয়, তা বাংলার স্বাধীনতা। শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নয়, শৌর্যে-বীর্যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে-শিল্পে, চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ মহিমায় বাঙালি আবার মানুষ হয়ে উঠবে, প্রাচীন আর্য হিন্দু পরিচয়ের গৌরবোজ্জ্বল মূর্তিতে জগতের ভিতরে আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠবে, এ-ই বঙ্কিমের জাগরণ ও নিদ্রার স্বপ্ন। প্রতি মুহূর্তের এই স্বপ্ন, প্রাণের এই উন্মাদ বাসনা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রতিটি অক্ষরের ভিতর দিয়ে যেন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। এ রচনার আবেদন শুধু আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে নয়, আমাদের সকল হৃদয়বৃত্তির কাছেও।

> আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণিমাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া, কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না! তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকে, মিশরে, চীনে, দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি![২২]

এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের যে গভীর হৃদয়াবেগ, মাতৃভূমির প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা – বাঙালি জাতির জন্য যে দরদবোধ উথলে উঠেছে তা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। 'একটি গীত' রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার পূর্ব গৌরব এবং দেশ-লক্ষ্মীকে স্মরণ করে তাঁর অন্তঃনিরুদ্ধ আবেগকে কমলাকান্তের হৃদয়-মথিত বিলাপের মাঝে অবারিত করে দিয়েছেন:

> ...সুখ গিয়াছে– সুখচিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে– চাহিব কোন্ দিকে ?
>
> চাহিবার এক শ্মশান-ভূমি আছে – নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান-ভূমি প্রতি চাই। যখন দেখি সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যপি সেই কলধৌত-বাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি – তুমি আছ, সেই রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? তুমি যাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? ... আমি চক্ষে সব দেখিতেছি– আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে– ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে।[২৩]

শোকার্ত হৃদয়ে অন্তর্ধান মানস-পটে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার গৌরবলক্ষ্মীকে যে দর্শন করছিলেন, তা নিছক স্বাদেশিকতার উচ্ছ্বাস নয়, এর ঐতিহাসিক মূল্যও সর্বজন-স্বীকৃত নাও হতে পারে, কিন্তু এ সাহিত্য। এখানে জেগেছে লেখকের সাথে পাঠকের নিবিড়তম হৃদয়ের সংবাদ। স্বদেশ-প্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র নিছক কতকগুলো গালভরা রাজনৈতিক সমস্যার চর্চা না করে নিজেকে রসস্পন্দনের ভিতরে একেবারে বিলিয়ে দিতে পেরেছেন, সেখানেই জাতীয়তাবাদও সাহিত্যের রূপ গ্রহণ করেছে।

৪. সাহিত্য ভাবনা

সাহিত্যভাবনামূলক রচনাগুলোতে বাংলা সাহিত্য, সাহিত্যিক, পত্রিকা সম্পাদক, সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রকে নিয়ে কটাক্ষপাত করা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যিকদের বাগাড়ম্বর, বিদ্যাহীন উচ্চাশা এবং আস্ফালন, যশলাভের নীতিহীন কৌশল ইত্যাদি নিয়ে সরল কৌতুক ও এগুলোতে প্রধান হয়ে উঠেছে। যেমন, কমলাকান্তের বিশ্বাস, 'বিদ্যার জন্য বিশেষ লিখিতে বা পড়িতে শিখার প্রয়োজন নাই...বিদ্যা বাঙালির স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখাপড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।[২৪] সাহিত্যের এমনই দুর্দশা যে তা বাজারের ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য সামগ্রিতে পরিণত হয়েছে। কমলাকান্ত কলকাতার বড়বাজারে গিয়ে দেখে বিভিন্ন পণ্যের দোকানের মধ্যে বাল্মীকি প্রমুখ 'ঋষিগণ অমৃতফল বেচিতেছেন... ইহা সংস্কৃত সাহিত্য।' অন্যত্র দেখা গেল কিছু লোক লিচু, পীচ, পেয়ারা, আঙুর, আনারস ইত্যাদি ফলের পসরা সাজিয়ে বসে আছে, বোঝা গেল 'এ পাশ্চাত্য সাহিত্য'। সবচেয়ে বেশি কৌতুক করা হয়েছে বাংলা সাহিত্যকে নিয়ে। বাংলা সাহিত্য যে শিশুজনোচিত সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই নয়, এ বিষয়টি কমলাকান্তের কাছে একেবারে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয়েছে–

> আরও একখানি দোকান দেখিলাম– অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে–ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না–জিজ্ঞাসা করিলাম,"এ কিসের দোকান?"
>
> বালকেরা বলিল ,"বাঙ্গালা সাহিত্য।"
>
> "বেচিতেছে কে?"
>
> "আমরাই বেচি। দুই একজন বড় মহাজনও আছেন। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পশ্বাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।"
>
> "কিনিতেছে কে?"

"আমরাই।"

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম–খবরের কাগজে জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।[২৫]

'ঢেঁকি' রচনাটিতেও সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে অনুরূপভাবে কৌতুক করা হয়েছে–

> সর্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢেঁকি–সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন–স্কুলবুক! দেখিতে দেখিতে দেখিলাম–আমিও একটা মস্ত ঢেঁকি– কমলাশ্রমে লম্বমান হইয়া পড়িয়া আছি; নেশার গড়ে মনোদুঃখ ধান্য পিষিয়া দপ্তর চাউল বাহির করিতেছি।[২৬]

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, কমলাকান্তের বক্তব্য জুড়ে নির্মল কৌতুক আছে সত্য, তবে এর অন্তরালে এক ধরনের সূক্ষ্ম বেদনার ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৫. দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি

'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অন্তর্ভুক্ত কোন কোন রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের মানব-জীবন সম্পর্কিত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁর মৌলিক চিন্তা ও ব্যক্তিমানসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া 'পতঙ্গ', 'মনুষ্যফল', 'ঢেঁকি', 'বড় বাজার' প্রভৃতি রচনাসমূহে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর প্রতি রচনার পশ্চাতে যে একটি দার্শনিক ভাবাদর্শ প্রচ্ছন্ন আছে, তা সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের এ জাতীয় রচনার প্রধান সুর বা আশ্রয় হাস্যরস এবং বিশুদ্ধ সংযত কৌতুক রস-রসিকতার মধ্য দিয়ে তিনি মুখ্যত তাঁর বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তবু তাঁর কোন কোন রচনা অংশ বিশেষের মধ্যে বিশিষ্ট প্রবন্ধ সাহিত্যের উৎকৃষ্ট গুণসমূহ লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'পতঙ্গ' রচনায় কমলাকান্তের উপলব্ধি –

> ...এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্য মাত্রই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে–। সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে। সকলেই মনে করে , সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে– কেহ মরে , কেহ কাঁচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি– সংসার বহ্নিময়।...বহ্নি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে। বিজ্ঞান হারি মানে। ধর্ম্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?[২৭]

উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি বিশিষ্ট একটি দার্শনিক প্রবন্ধ-সাহিত্যের অংশ বিশেষ বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

৬. আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভাবনা

আধুনিক বাঙালি চিন্তার জগতে যেসব নতুন মূল্যবোধ তৈরি হয়েছে সেসবের মধ্যে দেশাত্মবোধ তার অন্যতম। এই নতুন ভাবের প্রেরণা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ফল, তার সঙ্গে জড়িত আমাদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি। কিন্তু নতুন শিক্ষা দেশের চিত্তকে কতখানি আলোকিত করেছে, এই প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রই তুলেছিলেন। আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতির কাম্যতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ছিলেন নিঃসংশয় তেমনি অভ্রান্ত দূরদর্শী চিন্তাশীলরূপে এই শিক্ষার প্রসার ও প্রকৃতি সম্পর্কেও তিনি ছিলেন উদ্বিগ্ন। সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, কলকারখানা, জীবিকা-অর্জনের নতুন নতুন উপায়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ সংবাদপত্র প্রভৃতির বিস্তার দেখেছেন। বাঙালি ধনিকশ্রেণি

ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকেছেন, ফলে দেশে অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এই বাহ্যসম্পদের বিস্তার আমাদের চিত্তকে সম্পদশালী করতে পারে নি। বোধ হয় আধুনিক সভ্যতার এই প্রকৃতিতেই স্ববিরোধ। আধুনিক সভ্যতা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে মাত্র। 'আমার মন' রচনাটিতে বর্তমান সভ্যতার শূন্যতা উদ্ঘাটিত হয়েছে এভাবে:

> ইংরেজি জাতি বাহ্যসম্পদ বড় ভালবাসেন–ইংরেজি সভ্যতার এটাই প্রধান চিহ্ন–তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্যসম্পদ সাধনেই নিযুক্ত–আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্ত্তিসকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে–সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত কেবল বাহ্যসম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে–দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দু-ভূমি জালনিবদ্ধ হইয়া উঠিল–দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু! দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারান মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে? কাহারও মনের আগুন নিবাইতে পারিবে?[২৮]

এই সম্পদের বিস্তারের কথা দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র শুরু করেছেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'বঙ্গদেশের কৃষক'। এই প্রবন্ধে তিনি উজ্জ্বল রঙে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ছবি এঁকেছেন। 'বঙ্গদেশের কৃষকে'র আরম্ভেই বঙ্কিম অধীর চিত্তে উপস্থাপিত করেছেন দেশের বৃহৎ জনসাধারণের বঞ্চনার দৃশ্য। সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে এই জনসাধারণকে বুভুক্ষু বঞ্চিত রেখেই। এজন্য কারো কোনো বেদনা নেই। এই হৃদয়হীনতাই আধুনিক সভ্যতাকে করেছে শূন্যগর্ভ। এই বেদনা কমলাকান্তেরও। তবে কমলাকান্তের বেদনাবোধ আরও সর্বব্যপী গভীর হয়ে উঠেছে। কমলাকান্তের দৃষ্টিতে সংসার ও জীবনের প্রতি উদাসীন না হয়ে সম্পদকে লোক কল্যাণে লাগানোই পূর্ণতা ও সার্থকতা; তা না হলে সভ্যতাবৃদ্ধির বস্তুতই কোনো সার্থকতা নেই। সংসার-উদাসীনতা যেমন অর্থহীন, লোক কল্যাণহীন স্বার্থসাধন তেমনি মনুষ্যস্বভাবের দীনতাকেই প্রকাশ করে। কমলাকান্ত পরিহাস করে যে কথা বলেছে, সেটা বস্তুত ধর্মতত্ত্ব-প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্রেরই কথা:

> সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহনিবন্ধনে তোমাদের চিত্ত মার্জ্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া, তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ।[২৯]

৭. ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও হাস্যপরিহাস

বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' গ্রন্থের রচনাগুলোতে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ও লঘু কৌতুকের আবরণে সমাজ ও স্বদেশ-চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে এতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রাধান্য পেলেও অন্তর্নিহিত ভাববস্তু যথাযথভাবে প্রকাশ পেয়েছে। *লোকরহস্যর-এর* ব্যঙ্গাত্মক, শাণিত, শ্লেষপূর্ণ মনোভাব বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে' আরও এক আশ্চর্য পদ্ধতিতে চিত্তাকর্ষকভাবে পরিবেশিত হয়েছে। হাস্য-রসসৃষ্টি হিসেবে 'কমলাকান্তের দপ্তর' এক অনুপম সৃষ্টি। এই হাস্য-পরিহাসে রচনাগুলো হয়ে উঠেছে সহজ-সরল। এই শুভ্র নির্মল সংযত হাস্যরসেরই ইংরেজি নাম 'হিউমার'।

'অসামঞ্জস্য, বৈষম্য বা বৈকল্যকে অতিরঞ্জনের দ্বারা পরিস্ফুট করিবার ফলেই হাস্যরসের উৎপত্তি।'[৩০] হাস্যরসের 'সাহায্যে লেখক মানবজীবনের অসঙ্গতি ও বৈষম্যকে এক সর্বগ্রাহী উদার অনুভূতি দ্বারা গ্রহণ করে আপাত বৈষম্যময় মানবজীবনকেও ক্ষমাসুন্দর হাস্যোজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করেন। জগৎ ও জীবনের প্রতি একটা নির্লিপ্ত অথচ অভিযোগ বা উচ্ছ্বাসহীন প্রসন্ন ও সহৃদয় মনোভাবই উৎকৃষ্ট হাস্য রসের লক্ষণ।'[৩১] ইচ্ছার সাথে অবস্থার, উদ্দেশ্যের সাথে

উপায়ের, কথার সাথে কাজের – প্রভৃতির মধ্যে অসঙ্গতিই হাস্যরসের উপজীব্য। Humour এ আছে প্রসন্ন আনন্দ-বোধ বা বেদনা-বিধৌত নির্লিপ্ত হাসির ব্যঞ্জনা। করুণ রসাশ্রিত হলে এ Humour সর্বাপেক্ষা সুগভীর ও উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। 'প্রতিকারহীন দৈন্য-দুর্দশার মধ্যেও লেখক যখন ব্যক্তিগত জীবনের গভীর বেদনাকে জীবনের প্রতি কোন অভিযোগ বা আক্ষেপহীনভাব দৃষ্টির সাহায্যে পাঠকের মনে রস-সঞ্চার করে, তখন এই শ্রেণির হাস্য-রস সৃষ্টি হয়। লেখকের হাস্যোচ্ছল লঘুতায় তখন বেদনার সকরুণ দীপ্তি রামধনু সৌন্দর্য সৃষ্টি করে– তাই তার হাসির পশ্চাতে অশ্রুবিন্দু ঝলমল করে ওঠে।'[৩২] এ ধরনের হাস্যরসের নিদর্শন 'কমলাকান্তের দপ্তরে' সহজেই পাওয়া যায়। জগৎ ও জীবনের প্রতি কমলাকান্তের হাস্যোচ্ছল উক্তির সাথে মিশে আছে তার জীবনের গভীর বেদনার অশ্রুবিন্দু।

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ বঙ্কিমচন্দ্র যে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তা হৃদয়ের অনুভূতি হতেই উৎপন্ন। তিনি তীক্ষ্ণ ও মার্জিত ব্যঙ্গ পরিবেশনে অসাধারণ শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। এ রচনায় হাস্যরসকে ব্যবহার করা হয়েছে অস্ত্রের মতো। পরিহাসাত্মক ছুরি চালিয়ে অন্যায় অবিচার বা অসঙ্গতিকে আক্রমণ করা হয়েছে। এখানে কোন ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ করা হয় নি। আক্রমণ করা হয়েছে সামাজিক বিচ্যুতি, কাপট্য, অসাধুতা, মিথ্যা অহমিকা, বড়লোকের মোসাহেবী করার প্রবৃত্তি প্রভৃতির বিরুদ্ধে:

> 'আমাদের দেশের এক্ষণকার বড় মানুষদিগের মনুষ্যজাতিমধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি খাজা কাঁটাল, কতকগুলি বড় আটা, কতকগুলি কেবল ভুতুড়িসার, গরুর খাদ্য। কতকগুলি ইঁচোড়ে পাকে, কতকগুলি কেবল ইঁচোড়ই থাকে, কখন পাকে না।...যদি পাকিল ত বড় শৃগালের দৌরাত্ম্য। যদি গাছ ঘেরা থাকে ত ভালই। যদি কাঁটাল উঁচু ডালে ফলিয়া থাকে, ভালই; নহিলে শৃগালেরা কোনমতে উদরসাৎ করিবে। শৃগালেরা কেহ দেওয়ান, কেহ কারকুন, কেহ নাএব, কেহ গোমস্তা, কেহ মোছাহেব, কেহ কেবল আশীর্ব্বাদক।'[৩৩]

'বসন্তের কোকিল' রচনায়ও তোষামোদকারীদের তীক্ষ্ণ কষাঘাত করা হয়েছে–

> যখন নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ– কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়– কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি, চসমার হাট লাগিয়া যায়,– কত কবিতা, শ্লোক, গীত, হেটো ইংরেজি, মেটো ইংরেজি, চেরা ইংরেজি, ছেঁড়া ইংরেজিতে নসীবাবুর বৈঠকখানা পারাবত-কাকলি-সংকুল গৃহসৌধবৎ বিকৃত হইয়া ওঠে।...যখন নসীবাবু বাগানে যান, তখন মানুষ-কোকিল, তাঁহার সঙ্গে পিপীড়ার সারি দেয়। আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নসী বাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না।[৩৪]

লঘু হাস্যরস সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে 'ঢেঁকি' প্রবন্ধে কমলাকান্তের পরহিতব্রত ত্যাগের বর্ণনায়। কমলাকান্ত একদিন প্রসন্ন গোয়ালিনীর মঙ্গলা গাইকে 'উর্দ্ধপুচ্ছে, প্রণতশৃঙ্গে ধাবমানা' অবস্থায় দেখে ভীতসন্ত্রস্তভাবে দৌড়াতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে গড়াতে গড়াতে 'বিবরলোক প্রাপ্তি' ঘটেছিল। তখন তার মনে হয়েছিল,

> বসুন্ধরা যদি গোশূন্য হয়েন, আর নারিকেল, তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে দুগ্ধনিঃসরণ হয়, তবে এই দুগ্ধপোষ্য বাঙালি জাতির বিশেষ উপকার হয়। তাহার শৃঙ্গভীতিশূন্য হইয়া দুগ্ধ পান করিতে থাকে। সে দিন সেই বিবরপ্রাপ্তি হেতু আমার পরহিতকামনা এত দূর প্রবল হইয়াছিল যে, আমি প্রসন্নকে সময়ান্তরে বলিয়াছিলাম, "অয়ি, দধিদুগ্ধক্ষীরনবনীতপরিবেষ্টিতা গোপকন্যে ! তুমি গোরুগুলি বিক্রয় করিয়া স্বয়ং লাউ ভুসি খাইতে থাক, তুমি স্বয়ং ঘটোধ্নি হইয়া বহুতর দুগ্ধপোষ্য প্রতিপালন করিতে

> পারিবে,–কাহাকেও গুঁতাইও না।" প্রত্যুত্তরে প্রসন্ন হঠাৎ সম্মার্জ্জনী হস্তে গ্রহণ করায়, সে দিন আমাকে পরহিতব্রত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।[৩৫]

তবে রচনাগুলোতে হাস্য-রস প্রাধান্য পেলেও মূলত বঙ্কিমচন্দ্র জীবন সম্বন্ধে ধ্রুব বিশ্বাস, প্রীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রভৃতিই পরিবেশন করেছেন। কেবল 'ফুলের বিবাহে'র মতো কল্পনামূলক লেখাটি ছাড়া অন্য সবগুলোতেই বঙ্কিমচন্দ্রের এই উদ্দেশ্যটি বেশ স্পষ্ট।

উনিশ শতকে আমাদের সাহিত্য কোন সুদৃঢ় বুনিয়াদের উপরে আপন স্বাতন্ত্র্যে দাঁড়াতে পারে নি, সস্তায় জনপ্রিয়তা লাভ করে রাতারাতি একটা বড় সাহিত্যিক হবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা অনেকেরই মাথায় জেঁকে বসেছিল। আত্ম-প্রত্যয়ের অভাবে, ইংরেজি সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণের ফলে আমাদের যে সাহিত্য গড়ে উঠছিল বঙ্কিমচন্দ্র তাকে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে 'অপক্ক কদলী' নাম দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে শুধু উনিশ শতকের নবশিক্ষিত পল্লব-গ্রাহীদেরকে এবং সাহিত্যের আসরের অরসিকদেরকেই বিদ্রূপবাণে আহত করেছেন তা নয়, প্রাচীন শিক্ষা এবং সংস্কৃতি যে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের হাতে পড়ে নীরস এবং অকেজো হয়ে উঠছিল এবং 'তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন' হয়ে উঠছিল, তাদের সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ কিছু কম তীক্ষ্ণ নয়। 'মনুষ্য ফলের' ভিতরে অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণকে তিনি 'ধুতুরা ফল' আখ্যা দিয়েছেন। 'বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাঁহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতূরা।'[৩৬] বিশ্ব সংসারের বড় বাজারে প্রবেশ করে কমলাকান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ঝুনা নারিকেল বিক্রয় করতে দেখেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন লম্বা লম্বা বক্তৃতাকারী বাক্সর্বস্ব দেশহিতৈষীদের প্রতিও বিদ্রূপ-বাণ ছুঁড়েছেন অকুণ্ঠ চিত্তে। তিনি তাদের 'শিমুল ফুল' উপাধি দিয়েছেন।

> যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা – বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না। একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রাঙ্গা দেখা যায়, সেই সুন্দর। ফুলে গন্ধ মাত্র নাই– কোমলতা নাই, কিন্তু তবু ফুল বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা। যদি ফুল ঘুচিয়া, ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্রমাস আসিলে রৌদ্রের তাপে অন্তর্লঘু ফল, ফট করিয়া ফুটিয়া উঠে; তাহার ভিতর হইতে খানিক তূলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়ে।'[৩৭]

'কমলাকান্তের দপ্তরে' সমাজের নানা বিচ্যুতিকে আক্রমণ করে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজকে উন্নত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। সার্বিক মানববিদ্বেষ প্রচার তাঁর উদ্দেশ্য নয়।

৮. নারীপ্রকৃতি বিশ্লেষণ

'কমলাকান্তের দপ্তরে' নারী চরিত্র এক অপূর্ব মহিমোজ্জ্বল রূপে চিত্রায়িত হয়েছে। 'কমলাকান্তের দপ্তর' যদি নিবিষ্টচিত্তে পড়া যায় তবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসাহিত্যে নিবদ্ধ বঙ্কিমী চিন্তার বহু ভাববীজ এবং উপন্যাসের ভাববস্তুর চিহ্নও এতে পাওয়া যাবে। তাঁর উপন্যাসের মূলবিষয়ই ছিল নরনারীর প্রেম। এই প্রেমের যে পরিণাম তিনি এঁকেছেন তা উপন্যাস শিল্পের বিচার্য বিষয়। কিন্তু নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণের অনিবার্যতাকে বঙ্কিমচন্দ্র কখনোই অস্বীকার করেন নি। এরই ভিতর দিয়ে বরং তিনি এমন একটি অন্ধ শক্তির লীলাকে দেখেছিলেন যার ভয়ংকরতা এবং সৌন্দর্য দুয়েই তিনি ছিলেন অভিভুত। বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই এই বিষয়টিকে নিয়ে আবর্তিত। প্রায় সবগুলো উপন্যাসই নারী রূপের বহ্নিশিখায় পুরুষের আত্মবিসর্জনেরই কাহিনী। 'কমলাকান্তের দপ্তরে'ও নানা বহ্নির সাথে নারীর রূপবহ্নির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। কমলাকান্তের বর্ণনায়,

> রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,– আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয় তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মান-বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্য্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন;–জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞান-বহ্নিজাত দাহের গীত Ôparadise LostÕ, ধর্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেন্ট পল। ভোগ-বহ্নির পতঙ্গ, 'অ্যান্টনি, ক্লিওপেত্রা'। রূপ-বহ্নির 'রোমিও ও জুলিয়েত', ঈর্ষা-বহ্নির 'ওথেলো'। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ-বহ্নিতে সীতা-পতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি।[৩৮]

নারী-প্রকৃতির প্রতি বিস্ময়বোধ বঙ্কিমমানসকে আগাগোড়াই ভরে রেখেছে। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' 'ঢেঁকি' রচনায় নারীজাতির এই রহস্য-বিস্ময় ব্যক্ত হয়েছে কৌতুকের ভাষায়:

> আমার দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল–কার্য্যকারণসম্বন্ধপরম্পরা আমার চক্ষে প্রখর সূর্য্যকিরণে প্রভাসিত হইল। ঐ ত ঢেঁকির বল! – ঐ ত ঢেঁকির মাহাত্ম্যের মূল কারণ! –ঐ রমণীপাদপদ্ম! ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে, আর ঢেঁকি ধান ভানিয়া চাল করিতেছে। উঠিয়া পড়িয়া–ঢক ঢক কচ কচ! কত পরোপকারই করিতেছে! হায় ঢেঁকি! ও পায়ের কি এত গুণ! পিঠে পাইয়া তুমি এই সাত কোটি বাঙ্গালিকে অন্ন দিতেছ– তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছ![৩৯]

'মনুষ্যফল' নামে লেখাটি এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে অর্থপূর্ণ। কেননা, এতে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কমলাকান্তের চিন্তা কৌতুকপূর্ণ শ্রদ্ধায় বিশেষ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বাইরের জগতে পুরুষের ভূমিকা বিচিত্র, নানা কর্মক্ষেত্রে প্রসারিত। বঙ্কিম 'মনুষ্যফলে' পুরুষের বিচিত্র ভূমিকা নিয়ে নানা হাস্যকৌতুক করেছেন আলাদা আলাদাভাবে। কিন্তু আমাদের সংসারে নারীর ভূমিকা তখনও পর্যন্ত অন্তঃপুরচারিণী; সেইজন্য নারী-ব্যক্তিত্বের স্নিগ্ধ বর্ণনাই এতে আছে। চিরকুমার নিঃসঙ্গ কমলাকান্তের গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা এখানে উচ্ছ্বলিত হয়েছে:

> নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি, উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর। যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শীতল জল পান করিও–সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র্য-চৈত্রে বা বন্ধুবিয়োগ বৈশাখে– তোমার যৌবন-মধ্যাহ্নে বা রোগতপ্ত–বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কণ্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে ? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে ?[৪০]

৯. রচনারীতি

কমলাকান্তের দপ্তরে রচনারীতির দিক থেকে 'ফ্যামিলিয়ার এসেস্' (Familiar Essays)-এর ঢঙ্ লক্ষ্য করা যায়। আঠারো এবং উনিশ শতকে ইংরেজি রচনা সাহিত্যেও এই বিশেষ ঢঙ্টি প্রাধান্য লাভ করেছিল। এই 'ফ্যামিলিয়ার এসেস্'-এর লেখকগণ যে কি বিষয়বস্তু অবলম্বন করে কি কথা বলবেন তার কিছু ঠিক নাই। তাঁদের বিষয়বস্তুও যেমন অতি সাধারণ, রচনা-ভঙ্গিও অনুরূপ সাধারণ। অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র–একান্ত অকিঞ্চিৎকর কোনও একটি বিষয় বা প্রসঙ্গ তুলে লেখক কথা বলতে আরম্ভ করেন, তারপরে একটু একটু করে তার ভিতরে এসে পড়ে বহু সত্য ও তথ্য–বহু গম্ভীর আলোচনা; কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে তিনি গভীরে চলে যান। একটি সহজ ভাব, একটি অকপট সারল্যই তাঁদের রচনা-ভঙ্গিকে সাহিত্যের মর্যাদা দান করে। *কমলাকান্তের দপ্তরের* 'পতঙ্গ' রচনাটিতে এ ধরনের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য অতি সুস্পষ্ট। এখানে আমরা দেখি সাধারণ পতঙ্গ কিভাবে রচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে:

> ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে, একটা পতঙ্গ আসিয়া ফানুসের চারি পাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। "চোঁ-ও-ও-ও""বোঁ-ও-ও" করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের ঝোঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গের ভাষা কি বুঝিতে পারি না? কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিলাম – কিছু বুঝিতে পারিলাম না।[৪১]

এর পর নানা প্রসঙ্গ আলোচনায় এসেছে, পরিশেষে আরও গভীরে গিয়ে কমলাকান্তের মনে হয়েছে, আমরা প্রত্যেক মানুষই যেন এক এক জন পতঙ্গ। 'ঢেঁকি' শীর্ষক লেখাটিও 'ফ্যামিলিয়ার এসেস্' পদ্ধতিতে নির্মিত। অতি তুচ্ছ ঢেঁকি নিয়েও যে রসাত্মক সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব এ রচনাটি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ–

> আর ভাই, ঢেঁকির দল! তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি বুঝিয়াছি। যখনই পিঠে রমণীপাদপদ্ম ওরফে মেয়ে লাথি পড়ে, তখনই তোমরা ধান ভান,– নহিলে কেবল কাঠ–দারুময়–গর্ত্তে শুঁড় লুকাইয়া, লেজ উঁচু করিয়া, ঢেঁকিশালে পড়িয়া থাক। বিদ্যার মধ্যে খানায় পড়া, আনন্দের মধ্যে "ধান্য"; পুরস্কারের মধ্যে সেই রাঙ্গা পা।[৪২]

'ঢেঁকি' রচনায় আফিম সেবনে 'জ্ঞাননেত্র' উদয় হলে কমলাকান্ত দেখেছে, 'এ সংসার কেবল ঢেঁকিশালা'। সবাই ঢেঁকি হিসেবে আপন আপন কর্ম সম্পাদনে নিয়োজিত।

> কোথাও জমিদাররূপে ঢেঁকি, প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষিয়া, নূতন নিরিখ রূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। কোথাও আইনকারক ঢেঁকি, মিনিট রিপোর্টের রাশি গড়ে পিষিয়া, ভানিয়া বাহির করিতেছেন আইন; বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন– দারিদ্র্য, কারাবাস–ধনীর ধনান্ত–ভাল মানুষের দেহান্ত।[৪৩]

প্রবন্ধ সাহিত্যের কাজ নিকটতম বন্ধুর মত হৃদয়ের কোমল গভীর নিভৃত কোণটি পাঠকের সামনে উন্মুক্ত করে ধরা, *কমলাকান্তের দপ্তরেও* এ প্রাণ খুলে কথা বলবার রীতি লক্ষ করা যায়। গ্রন্থের শুরুতেই এর দৃষ্টান্ত অত্যন্ত সুস্পষ্ট,– 'তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলিস্পর্শের ন্যায়, ঐ গীতধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন?'[৪৪] এর পর মনে হল লেখক যেন সে কথাই খুলে বলবেন; কিন্তু কথা প্রসঙ্গে মন অন্য দিকে চলে যায়। 'কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনষ্যজন্ম বৃথা।'[৪৫] বলতে বলতে আবার তিনি পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে এসেছেন,– 'কিন্তু বারেকমাত্র শ্রুত ঐ সঙ্গীত আমার কেন এত মধুর লাগিল তাহা বলি নাই।'[৪৬] এবারও তা বলা হলনা। গত জীবনের কত দুঃখ-সুখের স্মৃতি,–কত আশা–নিরাশার কথা–মনের পটভূমিতে ভিড় করে দাঁড়ালে লেখক খেই হারিয়ে যেন কোথায় চলে যান; কিন্তু সহসা আবার থেমে যান,–'কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি![৪৭]

এমন সহজ ভাবে কথোপকথনের রীতি 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র প্রায় সব রচনার মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। লেখক কি বলবেন, কেমন করে বলবেন আগে যেন কিছুই ভেবে রাখেন নি; একটি রসের আবেদনে সমগ্র প্রাণ-মন ব্যাকুল হয়ে উঠছে, তিনি তাকেই ভাষা দিতে বসেছেন,–ভাষা ও গঠনরীতি আপনা-আপনি গড়ে উঠছে।

কমলাকান্তের দপ্তরে বঙ্কিমচন্দ্র একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। নেশাগ্রস্ত কমলাকান্তের মুখ দিয়ে নানা মন্তব্যের মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের অসংগতিগুলোকে উন্মোচিত করেছেন। কমলাকান্তের বস্তুত কোনো ব্যক্তিগত জীবন নেই। সে নিরাসক্ত, আত্মীয়পরিজনহীন, সংসার-বিমুখ। তার চিন্তা বস্তুতই নিজেকে নিয়ে নয়, সংসার ও জীবনের সাধারণ প্রকৃতি ও ধর্ম নিয়ে। কমলাকান্তের যখন যা মনে আসত তা-ই ছেঁড়া কাগজে লিখে রাখত। একদিন কমলাকান্ত তার এ কাগজগুলো ভীষ্মদেব খোশনবীশকে

উপহার দিয়ে চলে যায়। ভীষ্মদেব সেগুলো নিয়ে নানা ভাবনা চিন্তার পর শেষে প্রচারের উদ্যোগ নেয়:

> এ অমূল্য রত্ন লইয়া আমি কি করিব। প্রথমে মনে করিলাম, অগ্নিদেবকে উপহার দিই। পরে লোকহিতৈষিতা আমার চিত্তে প্রবল হইল। মনে করিলাম যে, যে লোকের উপকার না করে তাহার বৃথায় জন্ম। এই দপ্তরটিতে অনিদ্রার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে– যিনি পড়িবেন, তাঁহারই নিদ্রা আসিবে। যাঁহারা অনিদ্রারোগে পীড়িত, তাঁহাদিগের উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।[৪৮]

৯.১ ভাষা

কমলাকান্তের দপ্তরের নির্মাণ শৈলীতে ভাব ও বিষয়গত চিন্তা যেমন বহুমুখী তেমনি ভাষারও বহুধা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বিষয় বা ভাব অনুসারে প্রয়োজনানুরূপ সকল রকম শব্দ নির্বাচন করে ভাষা প্রয়োজনার ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'গদ্য ভাষাকে কতটা নমনীয় করে গীতিঝঙ্কারের সৃষ্টি করা যায় বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তরে তা দেখিয়েছেন।'[৪৯] ভাব বা বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করবার জন্য যেখানে যে শব্দ বা বাক্যের প্রয়োজন, বঙ্কিমচন্দ্র তার যথাযথ প্রয়োগে সিদ্ধকাম হয়েছেন। দীর্ঘ সমাসযুক্ত বিশুদ্ধ সংস্কৃতমূলক শব্দের সাথে তিনি দেশজ কথ্য ভাষাগত শব্দের অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু তা কখনও মাত্রাতিরিক্ত হয়ে ভাবকে বিকৃত দুষ্ট করে নি। যেমন,

> এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি নববলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি! ...ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,–সিন্ধুসেবিতে সিন্ধু–পূজিতে সিন্ধু–মথনকারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণ-ধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি![৫০]

তাঁর ভাষার বিশুদ্ধতা ও রীতি-সৌষ্ঠব ভাব বা বিষয়ের স্বচ্ছন্দ ও সুসংগত প্রকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্রূপাত্মক ভাষার শাণিত তীরে এবং উদ্ভট কল্পনার রূপবিলাসে সামাজিক বিচিত্র অসঙ্গতি এবং জাতীয় চরিত্রের নানা দুর্বলতা তীব্র আঘাত পেয়েছে।

৯.২ অলঙ্কার

কমলাকান্তের দপ্তরের রচনারীতিতে আর একটি বৈশিষ্ট্য অলঙ্কার-সমৃদ্ধি। রচনার মাঝে অলঙ্কারগুলো ভাষার সৌন্দর্যবৃদ্ধি করেছে এবং অত্যন্ত শোভনীয় হয়ে উঠেছে। অনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি এবং দৃষ্টি নন্দন উপমাগুলো অতি সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি যথোপযুক্ত স্থানে সার্থক উপমা ব্যবহারে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। *কমলাকান্তের দপ্তর* থেকে বিভিন্ন শ্রেণির অলঙ্কারের কিছু উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করা হল:

অনুপ্রাস

ক. যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন **প্রতি** পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, **প্রতি** পত্রমর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, **প্রতি** নক্ষত্রে চিত্রা রেহিণীর শোভা দেখিতাম, **প্রতি** মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল।[৫১]

খ. পৃথিবী **এখনও তাই আছে**, সংসার **এখনও তাই আছে**, মনুষ্য-চরিত্র **এখনও তাই আছে**। কিন্তু এ হৃদয় এখন আর তাই নাই।[৫২]

গ. ওরে আমার সরম পুটি, বিক্রি হলেই উঠি। **ঝোলে ঝালে অম্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাতে দিবে ফেলে,** রান্না **যাবে চলে,**–সংসারের দিন সুখে কাটবে আমার এই সরম পুঁটির **বলে**।[৫৩]

ঘ. বেচি আমরা ঘট**ত্ব**পট**ত্ব**ষ**ত্ব**ণ**ত্ব**–ঘরে চাল থাকিলেই স্ব–**ত্ব**, নইলে ন–**ত্ব**। দ্রব্য**ত্ব** জাতি**ত্ব** গুণ**ত্ব** পদার্থ– বাপের শ্রাদ্ধে বিদায় না দিলেই তুই বেটা অপদার্থ।[৫৪]

ঙ. দেখ, আমাদিগের দশা দেখ, দেখ **প্রা**চীরে **প্রা**চীরে, **প্রা**ঙ্গণে **প্রা**ঙ্গণে, **প্রা**সাদে **প্রা**সাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছি– কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না।[৫৫]

যমক

ক. আমি তাহাতে **কমলাশ্রম** করিয়াছি–কেবল কমলাকান্তের আশ্রম নহে–সাক্ষাৎ **কমলার আশ্রম**।[৫৬]

বক্রোক্তি

ক. সম্বাদপত্রলেখক নামে ময়রাগণ, গুড়ে সন্দেশের দোকান পাতিয়া, নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে– রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ গতাইয়া দিয়া, হাত পাতিতেছে– মূল্য না পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে। এদিকে তাঁহাদের বিক্রেয় **যশের দুর্গন্ধে** পথিক নাসিকা আবৃত্ত করিয়া পলায়ন করিতেছে।[৫৭]

উপমা

ক. 'অর্দ্ধাবৃতা সুন্দরীর **নীল বসনের** ন্যায় শীর্ণ–শরীরা **নীল–সলিলা তরঙ্গিণী**, সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন'[৫৮]

খ. **কুম্ভীর শাবক** ডিম্ব ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া সাঁতার দিয়া থাকে, শিখিতে হয় না। সেইরূপ **বিদ্যা বাঙ্গালির স্বতঃসিদ্ধ,** তজ্জন্য লেখা-পড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।[৫৯]

গ. কপালের একটি ছোট **উল্‌কি টিপের** মত দেখাইত।[৬০]

ঘ. তাহার মুখের উপর গভীর–**কৃষ্ণ দোদুল্যমান কুঞ্চিতালকরাজি**, গভীর–**কৃষ্ণ ভ্রূযুগ**, এবং গভীর–**কৃষ্ণ চঞ্চল নয়নতারা** দেখিয়া বোধ হইল, যেন পদ্মবনে **কতগুলা ভ্রমর** ঘুরিয়া বেড়াইতেছে– বসিতেছে না, উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার গমনে যেরূপ **অঙ্গ দুলিতেছিল**, বোধ হইল, যেন লাবণ্যের নদীতে **ছোট ছোট ঢেউ উঠিতেছে**[৬১]

রূপক

ক. যেখানে, **পাচকরূপী বিষ্ণু** কর্তৃক, **লুচিরূপ সুদর্শনচক্র** পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই গিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়।[৬২]

খ. যে আকাশে **লুচি–চন্দ্রের** উদয় হয়, সেইখানেই আমার **মন–রাহু** গিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চায়।[৬৩]

৯.৩ ক্রিয়াপদ

কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র সুশ্রাব্য ক্রিয়াপদের যথাযোগ্য ব্যবহারে ভাষাকে নমনীয়তা ও পেলবতা দান করেছেন। এতে ভাষা হয়ে উঠেছে গতিশীল, সজীব ও কাব্যময়।

যেমন–

ক. আমি এই সকল **দেখিতে শুনিতেছিলাম**, এমত সময়ে সহসা **দেখিলাম** যে, ইংরেজ দোকানদারেরা, লাঠি হাতে, দ্রুতবেগে, ব্রাহ্মণদিগের ঝুনা নারিকেলের গাদার উপর **গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া** ব্রাহ্মণেরা নারিকেল **ছাড়িয়া দিয়া**, নামাবলি **ফেলিয়া**, মুক্ত কচ্ছ হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন **করিতে লগিলেন**। তখন সাহেবেরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে **উঠাইয়া লইয়া আসিয়া** বিলাতী অস্ত্রে ছেদন **করিয়া**, সুখে আহার **করিতে লাগিলেন**।[৬৪]

খ. সংসার এ সুখের সাগরে **ভাসাইব**; মেরু হইতে মেরু পর্য্যন্ত সুখের তরঙ্গে **নাচাইব**, আপনি **ডুবিয়া, উঠিয়া,ভাসিয়া, হেলিয়া, ছুটিয়া বেড়াইব**।[৬৫]

১০. *কমলাকান্তের দপ্তর* রচনার শ্রেণি নির্ধারণ

সাহিত্যের শ্রেণি বিভাগের দিক থেকে *কমলাকান্তের দপ্তর* সম্পর্কে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এটি কোন শ্রেণির রচনা? রম্য রচনা, রস রচনা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, না অন্য কিছু? উত্তরে বলা যেতে পারে, এর কোনোটাই নয়। কেননা, ব্যক্তি কমলাকান্ত যেমন ছন্নছাড়া এবং শ্রেণিহারা, *কমলাকান্তের দপ্তর*ও তেমনি কোনো সংজ্ঞা বা জাতধর্ম, নাম দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের *কমলাকান্তের দপ্তরকেও* একটি নিঃসন্দেহে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক সৃষ্টি। এ প্রকৃত উপন্যাসও নয় এবং যথার্থ প্রবন্ধ শিল্পেরও মর্যাদা লাভ করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের বিচার-বিশ্লেষণজাত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

> উহা একটি সম্পূর্ণ সাহিত্যিক রচনা-রূপ; উহাতে গল্প, কাব্য, আত্মচিন্তা, সমাজ-দর্শন, সমালোচনা–একাধারে সকল উপাদান একই ভাবমণ্ডলের মধ্যে অপূর্ব্ব কৌশলে সমাবিষ্ট হইয়াছে, একটা গোটা মানুষের হৃদয় ও মনের সবগুলি মুখ (facess) চারিদিক ঘুরাইয়া দেখানো হইয়াছে। আমরা যে প্রবন্ধের কথা বলিতেছি তাহা উহার একটা লক্ষণমাত্র, সেই জাতীয় প্রবন্ধের উৎকৃষ্ট গুণ উহাতেও আছে; কিন্তু তথাপি গল্পের ঐ আবরণটির জন্য ব্যক্তিটা আড়ালে রহিয়াছে, এবং উহার নিজস্ব গঠন বা রূপ নিজের নিয়মে সার্থক হইলেও, উহাকে প্রবন্ধ বলা যাইবে না।[৬৬]

যদিও সাধারণ প্রথাসিদ্ধ প্রবন্ধের নিরিখে *কমলাকান্তের দপ্তরের* রচনাসমূহ বিচার্য নয়, তথাপি এর কোন কোন অংশে প্রবন্ধের মৌল ধর্ম বা প্রকৃতির আভাস বর্তমান থাকায় বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় এর আলোচনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থের সকল রচনাই কেবলমাত্র তরল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যেই পরিসমাপ্তি লাভ করে নি– কৌতুকরসের আবরণে রূপকধর্মী উপন্যাসসুলভ উপাখ্যানের মধ্যদিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম ও সাহিত্যের পর্যালোচনা করেছেন। কতকগুলো রচনায় ব্যঙ্গরস সম্পূর্ণ গৌণ হয়ে গেছে। বরং পরিহাস-বিদ্রূপ আচ্ছন্ন করে তার পরিবর্তে বঙ্কিমচন্দ্রের মনন-প্রকৃতির নতুন ভাব ও বিচিত্র চিন্তাশ্রয়ী ধ্যান-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশিষ্ট সমালোচক ভবতোষ দত্তের অনুমেয় সিদ্ধান্ত,

> বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর একটি অনন্য সাধারণ রসসৃষ্টিমূলক রচনা হিসাবেই আমাদের কাছে পরিচিত। স্থূল বক্তব্যের চেয়েও এর শিল্পরসটাই আমাদের সাহিত্যে অবিস্মরণীয়তা অর্জন করেছে।...বঙ্কিম-মনীষার এটাই অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে তাঁর রসসৃষ্টি তাঁর যুক্তিবোধকে কোনো দিক দিয়ে প্রতিহত করে না বরং তাঁর কল্পনাকে একটি দৃঢ় বস্তুভিত্তি দেয়।[৬৭]

বস্তুত *কমলাকান্তের দপ্তর*কে সাহিত্যের কোন একটিতে নির্দিষ্ট শ্রেণিতে রেখে বিচার করা যায় না। *কমলাকান্তের দপ্তর* নিজেই নিজের তুলনা। বঙ্কিমচন্দ্রের বলিষ্ঠ রচনাকৌশলে ও চিন্তা-বৈচিত্র্যের অভিনবত্বে এ এক অনন্য সাধরণ স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে।

১১. পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব

কমলাকান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একটা প্রশ্ন জাগে, এর কোনো পূর্বাভাস কোথাও ছিল কিনা। শিল্প হিসেবে কমলাকান্ত যে অভিনব সে কথা সর্বজন স্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যে তখন অনেক কিছুই অভিনব মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস সবকিছুই। কমলাকান্তও তেমনি একটি সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি রূপেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। নবসৃষ্ট বাংলা সাহিত্যের অনেক কিছুই ইংরেজি সাহিত্যের প্রচলিত আদর্শ থেকে পেয়েছি। নতুন যুগের যাঁরা সার্থক সাহিত্যিক তাঁরা সকলেই ইংরেজি সাহিত্যে সুশিক্ষিত। বাংলায় মঙ্গলকাব্য কবিওয়ালার গান এবং পাঁচালীর সকল সম্ভাবনাই তখন নিঃশেষিত। বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে তাঁরা ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও যদি এ ধরনের রচনা পরিকল্পনার অনুপ্রেরণা ইংরেজি সাহিত্য থেকে পেয়ে থাকেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, স্বীকার করতেও দ্বিধার কারণ নেই। *বঙ্গদর্শনে* মাসে মাসে *লোকরহস্য* এবং *কমলাকান্তের দপ্তরের* যে রচনাগুলো প্রকাশিত হয়ে বাঙালি সমাজ-জীবন এবং চরিত্রকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পরিহাস-রসিকতায় অভিষিক্ত করেছে, তার পরিকল্পনা ট্যাটলার এবং স্পেকটেটরে অ্যাডিসন-স্টীলের বিচিত্র গদ্যরচনা থেকেই হয়তো এসে থাকতে পারে।

কমলাকান্তের দপ্তরের ভাব ও আঙ্গিক পরিকল্পনা নিয়ে অভিযোগ ওঠে যে, বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য কোন কোন বিশিষ্ট লেখকের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রধানত ডি কুইন্সির (De Quincey) *The Confessions of an English Opium-Eater* গ্রন্থখানির রচনা-প্রকরণের উল্লেখ করা যায়।

কেবলমাত্র ডি কুইন্সিই নয়, *কমলাকান্তের দপ্তর* রচনায় স্কট (Scott), লী হান্ট (Leigh Hunt) প্রমুখ লেখকগণের প্রভাবও স্বীকার করা হয়। কিন্তু তুলনা করলেই দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র এই পদ্ধতি গ্রহণ করলেও সম্পূর্ণ নতুন উদ্দেশ্যে এবং নতুন সিদ্ধিতে পৌঁছেছেন। প্রকৃতপক্ষে ডি কুইন্সির মত কমলাকান্ত ও আফিম সেবন করে–মিল বলতে বা স্বভাব বলতে এইটুকুই। ডি কুইন্সির পাগল উন্মাদ রোগগ্রস্ত, তার উন্মত্ততা ব্যক্তিগত ঘটনার ফল, তার পাণ্ডুলিপিতেও নিজের সেই কাহিনী বর্ণনা করেছে। এদিক দিয়ে কমলাকান্তের সাথে তার মিল নেই। শ্রী প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন,

> বঙ্গদর্শন ও কমলাকান্তের দপ্তর প্রায় সমার্থক। দুয়েরই সূচনা একই সময়ে, সম্পাদক ও কমলাকান্ত দুজনেই বহুভাবে ভাবুক, বহু চিন্তার চিন্তক, দেশাত্মবাদী ও আদর্শনিষ্ঠ। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকল্প কমলাকান্ত। অনেকে কমলাকান্তের দপ্তরে ডিকুইন্সির আফিঙখোরের জবানবন্দীর ছায়া দেখেছেন। এ ধারণা ছায়ার মতোই অলীক। কেননা, কমলাকান্ত বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত, ডিকুইন্সির রচনা খেয়ালের সমষ্টি মাত্র।[৬৮]

কমলাকান্তের ভাবনা, জীবনদর্শন, দেশপ্রেম, মনুষ্যপ্রীতি ও সৌন্দর্যপ্রেম, তার বেদনাবোধ সবই তার নিজস্ব। কমলাকান্তের সব চেতনা ও বোধের উৎস এবং ভিত্তি বাংলাদেশের চিরকালীন সমাজ পরিবেশ। ভীষ্মদেব খোশনবীস চরিত্র পরিকল্পনায়ও স্কটের প্রভাবের কথা বলা হয়ে থাকে– এখানেও সাদৃশ্য বাহ্যিক। এ প্রসঙ্গে শশীভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য স্মর্তব্য,

> বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র ভাব ও রীতির উপরে ইংরেজি সাহিত্যের কিছু কিছু অস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। এখানে সেখানে বহিরঙ্গে যে সকল মিল রহিয়াছে তাহার কথা বাদ দিলেও মৌলিক আকৃতি-প্রকৃতির সাদৃশ্যও কিছু কিছু মনে আসিতে পারে।

> বঙ্কিমচন্দ্রের পরিহাস এবং বিদ্রূপ সমন্বিত সমালোচনাত্মক প্রবন্ধগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি রচনা সাহিত্যের, বিশেষ করে এডিসন এবং স্টীলের, রচনার সমধর্মী বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ... এডিসন্ এবং স্টীল একজাতীয় হাস্য-রসাত্মক রচনার প্রচলন করিয়াছিলেন, যাহার ভিতর দিয়া তাঁহারা পরিহাসচ্ছলে তৎকালীন সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যে সকল গলদ দেখা দিয়াছিল তাহার মৃদু সমালোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দপ্তরের ভিতরে অনেকগুলি রচনা এই আদর্শে অনুপ্রাণিত। এই সকল সাদৃশ্য এবং সাধর্ম্য সত্ত্বেও 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র উপরে এই সব পাশ্চাত্য লেখকের প্রভাব আমাদের নিকট অতি গৌণ বলিয়া মনে হয়।[৬৯]

কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থের মৌলিকতা প্রসঙ্গে খ্যাতিমান সাহিত্য সমালোচক ক্ষেত্রগুপ্তের অকৃত্রিম মূল্যায়ন:

> বঙ্কিমের কমলাকান্ত একটি অতি উচ্চস্তরের প্রবন্ধগ্রন্থ। এর মধ্যে যারা ডিকুইন্সির Ô*Confessions of an English Opium-Eater'* -এর সাদৃশ্য খোঁজেন তাঁরা বহিরঙ্গরূপেই গুরুত্ব দেন। রচনাটির মৌলিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না ।[৭০]

কমলাকান্তের দপ্তরে কমলাকান্ত নামক আফিমখোর, অপ্রিয় সত্যভাষী ব্যক্তিটির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তি-আত্মার পুরো প্রতিফলন ঘটেছে এমন মনে করা সঙ্গত হবেনা। কেননা, একজন শিল্পীর শিল্পকর্মে তাঁর ব্যক্তি-সত্তাটি সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় না। তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের সামান্যতম অংশের পরিচয়ই সেখানে পাওয়া যায়। তবুও *কমলাকান্তের দপ্তরে* বঙ্কিমচন্দ্রের যে ব্যক্তিচরিত্রটি প্রতিফলিত হয়েছে, তাতে তাঁর আবেগদীপ্ত কবি-প্রাণ, চিন্তাশীল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, অকপট স্বদেশভক্ত আত্মা এবং সর্বোপরি শুভ্রোজ্জ্বল হাস্যরসিক সত্তাটিই আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। *কমলাকান্তের দপ্তর* বঙ্কিমমানসের অভিব্যক্তি না হলেও এতে ঔপন্যাসিক কল্পনা এবং প্রবন্ধচিন্তার একটি সমন্বয়রূপে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধ এবং বীরবলী রচনার সময় থেকে এক শ্রেণির যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সাহিত্যের বিস্তার ঘটেছে, তার জের টানা হয় *কমলাকান্তের দপ্তর* থেকে। কিন্তু *কমলাকান্তের দপ্তরের* সঙ্গে এদের কিছু সাদৃশ্য থাকলেও *কমলাকান্তের দপ্তর* স্বতন্ত্রই রয়ে গেছে। কারণ, এখানে লেখকের ব্যক্তিমন বিষয়বস্তুর উপরে উদ্ধত হয়ে ওঠে নি। যুক্তির শৃঙ্খলা লেখকমন নিরপেক্ষ রূপেই ঋজু স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। তাছাড়া, এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার বীজগুলো প্রকাশ পেয়ে লাভ করেছে ভিন্ন ধরনের গুরুত্ব। বস্তুত, *কমলাকান্তের দপ্তরের* প্রবন্ধগুলোতে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মোড়কে একদিকে প্রকাশিত হয়েছে জীবন ও সমাজের বিবরণ ও বিশ্লেষণ, অন্যদিকে নতুনতর মূল্যবোধ বা আদর্শচিন্তা –এ দুয়ের মিশ্রণে 'কমলাকান্তের দপ্তর' এক অভিনব শিল্প-সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করেছে।

তথ্যসূচি :

---

১. ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিমচন্দ্র: সৃজন ও বীক্ষণ*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৭

২. শ্রী অধীর দে, *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা*, প্রথম খণ্ড, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১৪৭

৩. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *বাংলা সাহিত্যের একদিক*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি,কলকাতা, ১৯৯৩,পৃ. ৯০

৪. অরবিন্দ পোদ্দার, *বঙ্কিম মানস*,পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৪৭

৫. ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিমচন্দ্র: সৃজন ও বীক্ষণ*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯১,পৃ. ৬৭

৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *কমলাকান্তের দপ্তর*, সারোয়ার জাহান সম্পাদিত, প্রথম সংখ্যা–একা 'কে গায় ওই?' অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ১৬
৭. প্রাগুক্ত, 'আমার মন', পৃ. ২৭
৮. প্রাগুক্ত, 'আমার মন', পৃ. ২৭
৯. প্রাগুক্ত, 'আমার মন', পৃ. ২৮
১০. প্রাগুক্ত,'আমার মন', পৃ. ২৯
১১. 'বসন্তের কোকিল', পৃ. ৩৭
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
১৩. প্রাগুক্ত, 'আমার দুর্গোৎসব', পৃ. ৪৯
১৪. প্রাগুক্ত,' একটি গীত', পৃ. ৫৪
১৫. প্রাগুক্ত, ত্রয়োদশ সংখ্যা–'বিড়াল', পৃ. ৫৬
১৬. শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, *বঙ্কিম-বরণ*, বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ,পৃ. ৬
১৭. শ্রী যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী, *বঙ্কিম-সাহিত্য পরিচিতি*, এ.মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং লিঃ–কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৮
১৮. প্রাগুক্ত,একাদশ সংখ্যা, 'আমার দুর্গোৎসব',পৃ. ৪৯
১৯. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৮-৪৯
২০. প্রাগুক্ত, দ্বাদশ সংখ্যা, 'একটি গীত' পৃ. ৫১
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
২৩. প্রাগুক্ত, 'আমার দুর্গোৎসব' পৃ. ৫৪-৫৫
২৪. প্রাগুক্ত,'ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন',পৃ. ২২
২৫. প্রাগুক্ত,'বড় বাজার',পৃ. ৪৭
২৬. প্রাগুক্ত, 'ঢেকি', পৃ. ৬০
২৭. প্রাগুক্ত, চতুর্থ সংখ্যা–পতঙ্গ, পৃ. ২৫
২৮. প্রাগুক্ত,পঞ্চম সংখ্যা, 'আমার মন', পৃ. ২৮
২৯. প্রাগুক্ত, 'আমার মন', পৃ. ২৯
৩০. শ্রী যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী, *বঙ্কিম-সাহিত্য-পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮
৩১. শ্রীশচন্দ্র দাস, *সাহিত্য সন্দর্শন*, অধ্যাপক মুহম্মদ মফিজুল ইসলাম সম্পাদিত, চৌধুরী পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃ. ২১৭
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২২০
৩৩. প্রাগুক্ত,'মনুষ্যফল', পৃ. ১৮
৩৪. প্রাগুক্ত, 'বসন্তের কোকিল',পৃ. ৩৫
৩৫. প্রাগুক্ত, 'ঢেঁকি', পৃ. ৫৮-৫৯
৩৬. প্রাগুক্ত,দ্বিতীয় সংখ্যা, 'মনুষ্য ফল',পৃ. ২০
৩৭. প্রাগুক্ত,পৃ. ২০
৩৮. প্রাগুক্ত, *কমলাকান্তের দপ্তর*, 'পতঙ্গ', পৃ. ২৫
৩৯. প্রাগুক্ত, 'ঢেঁকি',পৃ. ৫৯
৪০. প্রাগুক্ত, 'মনুষ্য ফল', পৃ. ১৯
৪১. প্রাগুক্ত, চতুর্থ সংখ্যা, 'পতঙ্গ', পৃ. ২৪
৪২. প্রাগুক্ত, 'ঢেঁকি', পৃ. ৫৯
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
৪৪. প্রাগুক্ত, প্রথম সংখ্যা, 'একা–কে গায় ওই?' পৃ. ১৬
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
৪৮. প্রাগুক্ত, 'কমলাকান্তের দপ্তর', পৃ. ১৬
৪৯. ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৯, পৃ ৩৭০
৫০. 'আমার দুর্গোৎসব', ৪৯
৫১. প্রাগুক্ত, 'একা–কে গায় ঐ', পৃ. ১৬
৫২. প্রাগুক্ত,' একা–কে গায় ঐ', পৃ. ১৬
৫৩. প্রাগুক্ত, 'বড় বাজার',পৃ. ৪৫
৫৪. প্রাগুক্ত, 'বড় বাজার', পৃ. ৪৫
৫৫. প্রাগুক্ত, 'বিড়াল', পৃ. ৫৬
৫৬. প্রাগুক্ত, 'ঢেঁকি', পৃ. ৫৯
৫৭. প্রাগুক্ত, 'বড় বাজার', পৃ. ৪৭
৫৮. প্রাগুক্ত, 'একা–কে গায় ঐ', পৃ. ১৬
৫৯. প্রাগুক্ত, 'ইউটিলিটি বা উদরদর্শন', পৃ. ২২
৬০. প্রাগুক্ত, 'আমার মন', পৃ. ২৬
৬১. প্রাগুক্ত, 'আমার মন', পৃ. ২৭
৬২. প্রাগুক্ত, 'আমার মন', পৃ. ২৬
৬৩. প্রাগুক্ত, 'আমার মন', পৃ. ২৬
৬৪. প্রাগুক্ত, 'বড় বাজার', পৃ. ৪৬-৪৭
৬৫. প্রাগুক্ত,' একটি গীত', পৃ. ৫৩
৬৬. মোহিলাল মজুমদার, *বাংলা প্রবন্ধ ও রচনারীতি*, কলিকাতা, ১৯৫১, পৃ. ১৭
৬৭. ভবতোষ দত্ত, *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র*, প্যাপিরাস,কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ১৪২
৬৮. শ্রী প্রমথনাথ বিশী, *বঙ্কিম-সরণী*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃ. ৮
৬৯. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, 'বাংলা সাহিত্যের একদিক', [রচনা সাহিত্য] ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ. ১০০
৭০. ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯-৩৭০

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

সুলতানি আমলে বাংলার মুসলমানদের সামাজিক জীবন

ড. আলী রেজা মুহম্মদ আব্দুল মজিদ*

সারসংক্ষেপ: কোন দেশ বা জাতির সামাজিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদান করা অতিবড় পণ্ডিত-গবেষকের পক্ষেও হয়ত সম্ভব নয়। আবার কোন কালের পরিপ্রেক্ষিতে তার সম্পূর্ণ স্বরূপ উদ্ঘাটন করা আরো দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেননা সমাজে বসবাসকারী এই জাতীয় মানুষের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অসংখ্য দিক ও বহুবিচিত্র বিষয় থাকে। উপরন্তু সেগুলির সৃষ্টি ও প্রচলন নির্দিষ্ট কালসীমায় আবদ্ধ নাও থাকতে পারে। সুলতানি আমলে বাংলাদেশের মুসলমানদের সামাজিক জীবন সম্পর্কেও একথা অনেকটা প্রযোজ্য। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এদেশে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণের নানা বংশীয় শাসন চলে। কিন্তু সুলতানি আমলে পারস্পরিক সহাবস্থানের ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত রীতি-নীতির সাথে মুসলিম আর্দশের দ্বন্দ্ব-মিলনের সংঘাত ঘটে। বিদেশি মুসলমানরা যেমন শাসনকার্য পরিচালনা, স্থায়ী বসবাস ও বৈবাহিক সূত্রে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়, তেমনি তাদের আনীত আদর্শও এখানে পালিত হত। যার প্রভাব আদিবাসীর মনেও সংক্রমিত হয়। ফলে মুসলমানি ভাষা ও আদর্শ হিন্দু সমাজেও কিছুটা প্রতিফলিত হয়। আবার হিন্দুপালিত রীতি-নীতির মুসলমান সমাজেও অনুপ্রবেশ ঘটে। বিশেষ করে খাওয়া-পরা, আনন্দ-উৎসব, খেলা-ধুলা, ঘর-বাড়ি নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উভয় সমাজের মধ্যে বেশ কিছু মিল বর্তমান। তদুপরি আলেম-ওলেমা ও সুফি-দরবেশদের প্রভাবে মুসলমান সমাজ ইসলামি আদর্শের একটি স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে। তাছাড়া মুসলমান বিজয়ের প্রাথমিক যুগে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব থাকলেও অনতিবিলম্বে মুসলমান সুলতানগণ সহনশীল ও প্রীতিপূর্ণ আচরণের দ্বারা হিন্দু-সমাজের আস্থা লাভ করেন। সুফি-সাধকদের প্রভাব ও মুসলমান শাসকদের উদার মনোভাবের ফলে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এভাবে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটে।

১. ভূমিকা:

কোন জাতির সমাজজীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তার উৎপত্তি, বিকাশ, বিস্তার, অবস্থান, ভৌগোলিক পরিবেশ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ, এগুলির উপর নির্ভর করেই ঐতিহ্যগতভাবে তার যাবতীয় কাজকর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানাদি দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠে। আবার সভ্যতার ক্রমবিকাশে অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটে। সেসব দিকে লক্ষ্য রেখেই বর্তমান আলোচনাটিকে পারস্পরিক প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুসহ সাজানো হয়েছে।

২. উৎসসমূহ:

মোগল আমলে সরকারি উদ্যোগে ঐতিহাসিক নিযুক্ত করে ইতিহাস চর্চার রীতি প্রবর্তিত হয়। তারও পূর্বে ইতিহাসগ্রন্থ রচনায় দিল্লির সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা দেখা যায়।[১] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রাচীনকালের মতো সুলতানি আমলেও বাংলার ইতিহাস রচনার কোন স্বাক্ষর আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। হয়ত বাংলার সুলতানেরা এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, নতুবা কোন ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হলেও তা আজো অনাবিষ্কৃত থাকতে পারে। ফলে সুলতানি

---

* অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

আমলে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তথাপি দেশি-বিদেশি নানা সূত্রে প্রাপ্ত উপকরণাদির সাহায্যে অধুনা গবেষক ও পণ্ডিতগণ সুলতানি আমলের বাংলাদেশের ইতিহাস নির্মাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। নিম্নে উৎসগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা গেল।[২]

১. আরবি-ফার্সি লিখিত ইতিহাস ও সাহিত্য
২. আরব ভৌগোলিক ও বিদেশি পর্যটকদের লিখিত গ্রন্থ
৩. সুফি সাহিত্য
৪. সমকালীন যুগের বাংলা সাহিত্য
৫. সমসাময়িককালের মুদ্রা ও শিলালিপি।

১. আরবি-ফার্সি ভাষায় লিখিত ইতিহাস ও সাহিত্যঃ

ক. সুলতানি যুগে রচিতঃ মীনহাজ-ই-সিরাজঃ *তবকাত-ই-নাসির*, জিয়া-উদ-দীন বরণীঃ *তারিখ-ই-ফীরুজশাহী*, শামস-ই-সিরাজ আফীফঃ *তারিখ-ই-ফীরুজশাহী*।

খ. মোগল যুগে রচিতঃ আবুল ফজলঃ *আকবর নামা* এবং *আইন-ই-আকবরী*, নিজাম উদ্দিন আহমদ বখশীঃ *তবকাত-ই- আকবরী*, আব্দুল কাদের বদায়ুনীঃ *মন্তখব-উৎ-তাওয়ারীখ*, আব্দুল কাসেমঃ *ফিরিস্তা*, আব্বাস খান সারওয়ানীঃ *তারিখ-ই-খলজাহানী* এবং *মখজম-ই-আফগানী*, আব্দুলাহ্ঃ *তারীখ-ই-দায়ুদী*, আহমাইয়াদগারঃ *তারীখ-ই-শাহী*, ওমর মক্কী ওরফে কাজী দবণীরঃ *জাফর-উল-ওয়ালীহ্-র মোজাফফর ওআলিহ* (আরবি ভাষা), সৈয়দ গোলাম হোসেনঃ *রিয়াজ উস-সালাত*, মুনশী এলাহী বখশঃ *খুশীদ জাহাননুমা*, আমীর খসরুঃ *কিরান-উস-সাদাইন*, কাজী বুকস উদ-দীনঃ *বাহার উল হায়াত* ইত্যাদি।

২. আরব ভৌগোলিক ও বিদেশি পর্যটকদের লিখিত গ্রন্থঃ

ক. আরব ভৌগোলিকদের কয়েকটি পুস্তকঃ সোলায়মানঃ *সিল সিলাত-উত-তওয়ারীগ*, ইবনে খুরদান বিহঃ *কিতাব-উল-মসালিক*, মাসুদীঃ *মুরুজ-উজ-জাহাব*, ইদ্রিসীঃ *নুজহত-উল-মুশত*।

খ. বিদেশি পর্যটকদের বিবরণঃ সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের সময় থেকে বাংলাদেশে আগত চীনা দূতদের সংকলিত বিবরণগুলি এ সম্পর্কে সবচেয়ে তথ্যপূর্ণ উপাদান বহন করে। এগুলির মধ্যে মরক্কোর মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতার *সফরনামা* সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া চীনা দূত মাওয়ান, ফিসিন, হুয়ান সিঙ্গ, ইয়েনসংকিয়েন, ওয়াং তা-ইয়েন প্রমুখের সংকলিত বিবরণগুলিও উল্লেখযোগ্য। এখন বিবরণগুলির ইংরেজি অনুবাদও হয়েছে। এছাড়া নিকলো-দি-কান্তি, ভাস্কোদাগামা, ভারথেমা, বারবোসা, জোয়াও ডিবেরস, সিজার ফ্রেভারিক প্রমুখ ইউরোপীয় বণিক পর্যটকগণ ব্যবসায়-বাণিজ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য তাদের বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

৩. সুফি সাহিত্যঃ

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মপ্রসারে সুফি-দরবেশদের অবদান সবচেয়ে বেশি। মূলত তাঁরাই মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকার প্রতিষ্ঠা করে এদেশের মুসলমানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

তাঁদের জীবনী,আলোচনা ও চিঠিপত্র থেকে বাংলার মুসলমানদের সামাজিক জীবন সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এই সুফি সাহিত্যগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়:

ক. সুফিদের জীবনী: শাহশোয়েব: *মনাকিব-উল-আসফিয়া*, আমীর খুরদ: *সিয়র-উল-আউলিয়া*, আব্দুল হক দেহলভী: *আকবর-উল-আখইর*, আবদুর রহমান চিশতী: *মিরাত-উল-আশরার*, গোলাম সারওয়ার: *খজিনাতুন আসফিয়া*, গওসী: *গুলজারই-আকবর*, মোহাম্মদ সাত্তারী: *রিসালাত উস-সাহাদা* প্রভৃতি গ্রন্থ এ পর্যায়ভুক্ত।

খ. সুফিদের আলোচনা (মালফুজাত): বিখ্যাত সুফি-দরবেশদের আলোচনার সারমর্ম তাদের শিষ্যরা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এই সমস্ত পুস্তকের মধ্যে হাসান আলা সাজ্জী: *ফাওয়াখেদ-উল-ফওয়াদ*, কলন্দর: *খায়র উল-মজলিস*, আমীর খসরু: *আফজল উল-ফাওয়ায়েদ*, বাহাত-উল-মুহিব্বীন: *ফাওয়ায়েদ-উল-সালেকীন*, ফরিদ বিন সালার: *রফিকুল-আরেফিন* উল্লেখ্য।

গ. সুফিদের লিখিত চিঠিপত্র (মকতুবাত): এ পর্যন্ত পণ্ডুয়ার শয়খ নুর কতুব আলম, জৌনপুরের মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী ও বিহারের শায়খ মুজাফ্ফর শামস বলখী এই তিনজন সুফির বেশ কিছু চিঠি আবিষ্কৃত হয়েছে। পত্রগুলিতে সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিবরণ আছে।

৪. সমকালীন যুগের বাংলা সাহিত্য:

বাংলার সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের হাতে রচিত বাংলা সাহিত্য থেকেও মুসলমানদের সামাজিক জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য লাভ করা যায়। যেমন রামাই পণ্ডিতের *শূন্যপুরাণ*, হলায়ূধ মিশ্রের *শেক–শুভোদয়া*, কৃত্তিবাসী *রামায়ণ*, বিপ্রদাস পিপলাই ও বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল*, কবীন্দ্র পরমেশর ও শ্রীকর নন্দীর *মহাভারত*, মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল* এবং শেখ জাহিদের *আদ্য পরিচয়*, শাহ মুহাম্মদ সগীরের *ইউসুফ জোলেখা*, কবি জৈনুদ্দিনের *রসুল বিজয়*, দৌলত উজির বাহরামখানের *লায়লী মজনু*, মুহম্মদ কবিরের *মধুমালতি* প্রভৃতি কাব্য।

৫. সমসাময়িক কালের মুদ্রা ও শিলালিপি:

এ পর্যন্ত সুলতানি আমলে উৎকীর্ণ অনেক শিলালিপি ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ের এই শিলালিপি ও মুদ্রাগুলিতে হাদিস, শ্লোক, সুলতান ও তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা প্রভৃতির নাম ও তারিখ লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলির সাহায্যে প্রত্নতাত্ত্বিক ও মুদ্রা বিশেষজ্ঞরা সুলতানদের কালক্রম নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এগুলি থেকে তারা মুসলমান সমাজ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য আহরণও করেছেন।

উপরিউক্ত উৎসগুলি হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আজ পর্যন্ত সুলতানি তথা সমগ্র মুসলমান আমলের বেশ কয়েকটি ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে। একাধিক ব্যক্তি উচ্চ ডিগ্রি লাভের জন্য এ বিষয়ে গবেষণামূলক মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেছেন। উপরন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিতগণ সুলতানি আমলের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। এগুলিতে সাহিত্যের পটভূমিতে সমসাময়িককালের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। সেখান থেকে সুলতানি আমলের মুসলমানদের সামাজিক জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য লাভ করা যায়।

উপর্যুক্ত উপাদানগুলির সমন্বয়ে সুলতানি আমলে বাংলার মুসলমানদের সামাজিক জীবনের একটি মোটমুটি পরিচয় প্রদান করা সম্ভব।

৩. বাংলাদেশ পরিচিতি

ক. বাংলার উৎপত্তি: 'বাংলা' নামটির উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। ঋগ্বেদের শাখা *ঐতরেয় আরণ্যক* (আনু. খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশত) গ্রন্থে বঙ্গাঃ এবং প্রাচীনতম সংস্কৃত রচনায় গৌড়াঃ, রাঢ়াঃ, পুণ্ড্রাঃ প্রভৃতি গোত্রীয় সমাজের উল্লেখ আছে।[৩] উত্তর ভারতের পভোসায় প্রাপ্ত গুহালিপিতে (আনুঃ ১ম শতক) 'বঙ্গপাল' নামক রাজার উল্লেখ আছে।[৪] মানসোল্লাসে 'গৌড়-বঙ্গাল' নাম আছে।[৫] প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্য চর্যাপদে (আনু. ৭ম শতক) 'বঙ্গালী', বঙ্গালদেশ' নাম লিখিত আছে।[৬] অষ্টম শতাব্দীর বহু শিলালিপিতে 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' নামে দুটি দেশের উল্লেখ আছে।[৭] মোগল সম্রাট আকবরের অন্যতম সভাসদ আবুল ফজল এ বিষয়ে এক মজার কাহিনী বলেছেন, ... এদেশের প্রাচীন নাম 'বঙ্গ'। ...এদেশের রাজারা জমিতে খুব উঁচু 'আল' নির্মাণ করতেন এবং বঙ্গ ও আল এ দু'টি শব্দের সংমিশ্রণে কালক্রমে 'বাঙ্গালা' নামের উৎপত্তি।[৮] কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে 'বঙ্গাল' দেশের নাম থেকেই বাঙ্গালা বাংলাদেশ নামের উৎপত্তি হয়েছে।[৯]

খ. ভৌগোলিক অবস্থা: আগের দিনে দেশ হিসাবে বাংলা বলতে আজকের এই সমগ্র বাংলাদেশকে বুঝাত না– বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে বুঝাত। এমনকি ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ মুসলমানদের বাংলাদেশ বিজয়ের ইতিহাস লিখার সময় রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ বলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছেন।[১০] তাঁর মতে গঙ্গা নদী লখনৌতি রাজ্যকে 'রাঢ়', 'বরেন্দ্র' দু'ভাগে ভাগ করেছে এবং তিনি পূর্ববাংলাকে 'বঙ্গ' বলে উল্লেখ করেছেন।[১১] জিয়াউদ্দীন বরণীও বাঙ্গালা শব্দ দ্বারা পূর্ববাংলাকে নির্দেশ করেছেন।[১২] তুর্কী পূর্বকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, সমতট, পুণ্ড্রা, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল (চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম) ও কামরূপ (আসাম) নামে পরিচিত ছিল।[১৩] তুর্কী আমলেও বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র আলাদাভাবে চিহ্নিত হত।[১৪] পরবর্তী সুলতানি আমলেও বাংলাদেশ গৌড় ও বঙ্গ এই দুভাগে নির্দেশিত হত।[১৫] তবে মোগল আমলে পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলের এক বিস্তৃত এলাকা 'সুবাহ বাঙ্গালাহ' নামে পরিচিত হয়।[১৬] প্রকৃতপক্ষে দেশ হিসেবে বাংলার প্রথম পরিচয় এখানে। পরবর্তীতে বিহার ও উড়িষ্যাও সুবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এভাবে শাসকশক্তির উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের সীমানা প্রায় পরিবর্তিত হত। তবে মোটামুটিভাবে বাংলাদেশের আওতাভুক্ত ছিল এমন অঞ্চলগুলি হচ্ছে, 'উত্তর হিমালয় এবং হিমালয় হইতে নেপাল, সিকিম ও ভুটান রাজ্য, উত্তর পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যকা, উত্তর পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি, পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত, পশ্চিমে রাজমহল ও শাঁওতাল অরণ্যভূমি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।[১৭] প্রাচীন বাংলার গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, সমতট, পুণ্ড্রা, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল, তাম্রলিপ্তি রাজ্যসমূহ এই বিস্তৃত প্রাকৃতিক সীমারেখার মধ্যেই গড়ে ওঠে। যেমন– গৌড়= রাজশাহী-মালদহ-রাজমহল, মুর্শিদাবাদ। রাঢ়= বর্ধমান বিভাগ। সুহ্ম= সুবাহবাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যা (বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী-১৯০৫ খ্রি. পর্যন্ত)। পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র= বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর-কোচবিহার। বঙ্গ= ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা। সমতট= কুমিল্লা, নোয়াখালী।

হরিকেল= চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা। বঙ্গাল= সন্দ্বীপ (বরিশাল), তাম্রলিপ্তি= তমলুক নিয়ে গঠিত।[১৮]

গ. জলবায়ু: নাতিশীতোষ্ণ ও নদীমাতৃক এই বাংলাদেশে শীত-গরম কোনটিই খুব তীব্র নয় এবং এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাত ও নদীর প্লাবনে বাংলার মাঠ-ঘাট পলি দ্বারা উর্বর হয় এবং ভাল ফসল ফলে। কিন্তু অতিবৃষ্টি ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে নিম্ন এলাকায় ঘরবাড়ি ভাঙ্গে ও জলমগ্নতা দেখা দেয়। তাছাড়া কালবৈশাখী, মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগও এখানে ঘটে। বাংলার এরূপ বৈশিষ্ট্য আগের দিনও ছিল। এই আর্দ্র আবহাওয়া আরব-ইরান-তুরস্ক প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের নানা মরু-দেশ হতে আগত মুসলমানেরা মোটেই সহ্য করতে পারত না। একবার দিল্লির সৈন্যরা পাণ্ডুয়ায় মশার উপদ্রবে অতিষ্ট হয়ে সুলতানকে দিল্লি ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।[১৯] কিন্তু তারা শস্যের প্রাচুর্যের জন্য বাংলাদেশের প্রতি আকৃষ্ট হত। তাই রহস্য করে তারা এই দেশের নাম রেখেছিল 'দোজখ-পুর-আজ নিমত'– অর্থাৎ 'ধন সম্পদে পরিপূর্ণ নরক।'[২০]

ঘ. রাজনৈতিক অবস্থা: কথায় আছে 'বাংলাদেশ প্রায় চিরকালই ছিল বিজাতি বিজিত দেশ।'[২১] প্রাচীনকালে মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন এই চার বংশীয় শাসন চলে বাংলাদেশে।[২২] এদের মধ্যে মৌর্য ও পালরা বৌদ্ধ এবং গুপ্ত সেনরা ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী।[২৩] যতদূর জানা যায় মৌর্যরা ৩১৯ খ্রি. অবধি রাঢ়-সুহ্ম-পুণ্ড্র অঞ্চল শাসন করে।[২৪] মহাস্থান লিপিতে মৌর্য শাসনকালে যাবতীয় জনকল্যাণকর নীতি ও সংস্কারের উল্লেখ আছে।[২৫] ৩২০-৬৫০ খ্রি. পর্যন্ত বাংলার বহুঅঞ্চল গুপ্ত শাসনাধীনে ছিল।[২৬] গুপ্তকালে কতকটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অধিকৃত এলাকাগুলি 'ভুক্তি' (প্রদেশ), 'বিষয়', 'মণ্ডল', 'বীতি', 'গ্রাম'- এ বিভক্ত করে প্রদেশপাল বা অন্যান্য নামীয় রাজকর্মচারী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।[২৭] এ সময় থেকে শাসনকর্তাদের প্রথম উপাধি ধারণও শুরু হয়।[২৮] ৬৫১-৭৫৫ খ্রি. পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস অজ্ঞাত।[২৯] ৭৫৬ খ্রি. শুরু হয় পাল রাজত্ব। দীর্ঘ চারশত বছর ধরে বাংলায় পাল রাজত্ব স্থায়ী হয়। সমসাময়িক লিপি দানপত্র প্রভৃতি থেকে জানা গেছে যে, পালযুগে শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল।[৩০] স্বয়ং রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। প্রাদেশিক বিভাগ বিভিন্ন নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে নিযুক্ত কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হত।[৩১] গুপ্ত শাসনের অনুসরণে এরা 'পরমেশ্বর', 'মহারাজাধিরাজ', প্রভৃতি উপাধিও গ্রহণ করেন।[৩২] পাল শাসনামলেই শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, সামরিক বিভাগ, পুলিশ বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগের সৃষ্টি হয় এবং প্রধানমন্ত্রী, অমাত্য, অঙ্গরক্ষ, বলাধ্যক্ষ, দণ্ডশক্তি, দণ্ডিকদূত, গ্রামপতি, কোট্রপাল, সেনাপতি, মহাসেনাপতি প্রভৃতি বহুপদে কর্মচারী নিয়োজিত হয়।[৩৩] সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা, পরধর্ম সহিষ্ণুতা, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান প্রভৃতি গুণাবলী তাদের ছিল।[৩৪] পালদের প্রত্যক্ষ শাসন বিহার-আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।[৩৫] দেবপালের (আনু. ৮১০-৫০ খ্রি.) পরই পাল সাম্রাজ্য দ্রুত সংকুচিত হতে থাকে। তখন রাঢ়, বঙ্গ, সমতটে সেন, কৈবর্ত, ব্রাহ্মণ ও চন্দ্ররা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।[৩৬] রাঢ়ে আগত সেনদের মধ্যে বিজয় সেন (১০৯৭-১১৬০ খ্রি.) সম্ভবত প্রথম স্বাধীন রাজা ছিলেন। বাংলাদেশ ছাড়াও বিহার-উড়িষ্যার কিছু অংশ সেন রাজত্ব্যের অধিকারে আসে। কিছু কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও সেন আমলে মোটামুটি পাল প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। সেন রাজারা অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি প্রভৃতিও ধারণ করে। লক্ষণ সেনের (আনু. ১১৭৮-১২০৩ খ্রি.) শাসনকালে বখতিয়ারের নদীয়া আক্রমণের ফলে বাংলাদেশে হিন্দু

আধিপত্যের অবসান ঘটে এবং প্রথম মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হয়। ক্রমে পূর্ববঙ্গ এবং বাংলার বিভিন্ন অংশে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হয়।

বাংলায় সুলতানি আমলের ইতিহাস বেশ সুদীর্ঘ। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর তুর্কী বিজয় (আনু. ১২০২-০৪ খ্রি. এর মধ্যে) থেকে শুরু করে খলজী (১২২০-২৭ খ্রি.), মামলুক (১২২৭-৮২), বলবনী (১২৮২-১৩০১), পরবর্তী মামলুক (১৩০১-৩৮), স্বাধীন সুলতানি (১৩৩৮-৪২), ইলিয়াস শাহী (১৩৪২-১৪১২), বায়াজিদশাহী (১৪৪২-১৪), গণেশবংশী (১৪১৪-৩৩) পরবর্তী ইলিয়াস শাহী (১৪৩৩-৮৬), সুলতান শাহজাদা ও হাবসী (১৪৮৬-৯৩), হোসেনশাহী (১৪৯৩-১৫৩৮), আফগানী [অর্থাৎ শুর ও কররানী বংশ] (১৫৩৮-৭৫ খ্রি.) শাসনকাল অবধি দাউদখান কররানী (১৫৫৯-৭৫) পর্যন্ত মোট ৪৯ জন শাসক বাংলায় রাজত্ব করেন।[৩৭] তবে হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াস উদ্দীন মাহমুদ শাহ'র (১৫৩৩-৩৮ খ্রি.) সুরবংশীয় শাসক শেরশাহ'র হাতে রাজ্য হারানোর পর থেকেই প্রকৃত পক্ষে বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলের অবসান ঘটে। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবর দাউদখানকে পরাজিত করেন। আমরা সাধারণত বখতিয়ারের কাল থেকে পাঠান সুলতান দাউদ খানের পতন পর্যন্ত সময়কালকে সুলতানি আমল হিসাবে গণ্য করে থাকি।

৬. সামাজিক অবস্থা: পাল রাজারা সাম্যসমাজ নীতির অনুসারী হলেও পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনরা বৌদ্ধপীড়ক ও বর্ণবৈষম্য সৃষ্টি করেছিলেন।[৩৮] তাদের সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না– এমন কি ধর্মকর্মেও প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সুলতানি আমলে মুসলমানরা এরূপ প্রজাপীড়ক বা হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন না। তুর্কী বিজয়ের পর প্রথম দিকে বিজেতা-বিজিতের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিকভাবেই ছিল। কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে নি মুসলমানদের উদারনীতির কারণে। মূলত রাজ্যের স্থায়িত্ব লাভে দেশবাসীর সমর্থনের জন্য বিদেশি মুসলমানদের পক্ষে হিন্দু-নির্যাতন সম্ভব ছিলনা।[৩৯] ব্যক্তি বিশেষে দু'চারজন শাসকের হিন্দু-পীড়ন ও অত্যাচারের কিছু চিত্র থাকলেও সামগ্রিক বিচারে ঐ-কজন শাসক ছাড়া গোটা সুলতানি আমল রাজ্যশাসন, প্রজাপালন ও জনহিতকর নানাকর্মে স্বর্ণোজ্জ্বল ছিল। তারা বহু উচ্চপদস্থ হিন্দু রাজকর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন।[৪০] বাংলা সাহিত্য রচনায় হিন্দুদের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন এবং বৌদ্ধপীড়ক সেনদের মত কাউকে জোরপূর্বক ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করেন নি। শাসক-মহলের এমন উদারতা, অপরদিকে সুফি-সাধকদের আধ্যাত্মিক গুণাবলী ও ইসলাম ধর্মের সাম্য সমাজনীতির প্রভাবেই সারাদেশে ইসলাম গ্রহণের বিপুল সাড়া জাগে। কবির বর্ণনায়, "ধর্মহৈলা জবনরূপী মাতায়েত কালটুপী/ হাতে শোভে ত্রিকচ কার্মান/ চাপিয়া উত্তম হএে ত্রিভুবনে জাগয়ে ভএ/ খোদাএ বলিয়া এক মাস।।/ ব্রহ্ম হৈল্যা মহাম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর/ আদম্ফ হইলা শুলা পানি।/ গণেশ হইলা গাজী কার্তিক হইলা কাজী/ ফকির হইলা জয়মুনি।।/ তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা শেক।/ পুরন্দর হইলা মওলানা।"[৪১]

স্বেচ্ছায় উঁচু জাতের ব্রাহ্মণকে পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণে দেখা যায়, "হিন্দু কুলে কেহ যদি হইয়া ব্রাহ্মণ/ আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।/ হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম/ আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।"[৪২]

রাজ্যের বিস্তারলাভে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ লেগে থাকলেও বাঙালি জাতি রাজনৈতিক ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিল না। তাদের এমন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে সম্রাট বাবরের উক্তিতে, "বাঙালীরা' পদকেই শ্রদ্ধা করে। তারা বলে আমরা তখতের প্রতি বিশ্বস্ত। যিনি সিংহাসন অধিকার করেন আমরা তারই আনুগত্য স্বীকার করি।"[৪৩]

তাছাড়া ধর্মান্তর ও বৈবাহিক সূত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রক্তের সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। ফলে আত্মীয় ও প্রতিবেশীসুলভ প্রীতির সম্পর্ক উভয় সম্প্রদায়ে বিদ্যমান ছিল। যেমন, 'গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা/ দেহ সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম সম্বন্ধে সাঁচা/ নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা/ সে সম্বন্ধে হওত তুমি আমার ভাগিনা।"[৪৪]

কিন্তু ধর্মান্তরীণ মুসলমানরা আচার-সংস্কারে বাঙালিই ছিলেন বলে সহজেই ইসলামি ঐতিহ্যের সাথে বাঙালি সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব মিশ্রণ ঘটে। এমনিভাবে উভয় সংস্কৃতির মিলনমুখী বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে ওঠে সুলতানি আমলের মুসলমানদের সামাজিক জীবন। ফলে দৈনন্দিন নানা কাজে উভয় সমাজের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত কিছু কিছু মিলও পাওয়া যায়।

চ. অর্থনৈতিক অবস্থা: আদিকাল থেকেই বাংলাদেশ কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় খুব সমৃদ্ধ ছিল।[৪৫] এদেশে উৎপন্ন বিভিন্ন মসলা, চাউল, চিনি, গুড় এবং বস্ত্রশিল্পে তৈরি সুতি, রেশমি ও সিল্কের কাপড় বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হত।[৪৬] এগুলি ছাড়াও লবণ, ঘি, তৈল, মাখন, ভেড়া, ছাগল, কলাই, কর্পুর, পান-সুপারি, হরিণ, পারাবত (পায়রা) প্রভৃতি জীবজন্তু ও দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি পণ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৪৭] বিদেশি বণিকগণ সোনা-রূপার বিনিময়ে এসব দ্রব্য ক্রয় করতেন।[৪৮] দ্রব্যমূল্যও খুব কম ছিল।[৪৯] যার জন্য বিদেশি পর্যটকগণ সব সময় এদেশের প্রশংসা করেছেন। ইবনে বতুতা তাঁর বিবরণীতে বাংলাদেশের কিছু কিছু দ্রব্যের বাজার দর উল্লেখ করেন।

১৯৪৮ সালের টাকার হিসেবে সেসব দ্রব্যের দাম নিম্নরূপ দাঁড়ায়:[৫০]

চাউল আনুমানিক		৮ ১/৪ মন	৭.০০ টাকা
ধান	"	২৮ "	৭.০০ "
ঘি	"	১৪ সের	৩.৫০ "
তিলতৈল	"	১৪ "	১.৭৫ "
গোলাপজল	"	১৪ "	৭.০০ "
চিনি	"	১৪ "	৩.৫০ "
মুরগি	"	৮ টি	০.৮৮ "
ভেড়া	"	৮ টি	১.৭৫ "
দুগ্ধবতী গাভী	"	১ টি	২১.০০ "
পায়রা	"	১৫ টি	০.৮৮ "
সূক্ষ্ম সুতিকাপড়	"	১৫ গজ	১৪.০০ "

ইবনে বতুতা এই বাজার দরকে খুব সস্তা বলে অভিহিত করলেও বাংলাদেশের লোকেরা তাঁকে জানায় যে, জিনিসপত্রের দাম তখন খুব বেশি হয়েছিল।[৫১] এথেকে মনে হয় সাধারণ মানুষের আয় কম হলেও তারা বেশ সুখেই ছিল।

৪. বাংলায় মুসলমানদের আগমন ও বসতি স্থাপন:

বাংলাদেশে প্রথম মুসলমান আবির্ভাবের কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রালিপি[৫২], আরব ভৌগোলিক ও পর্যটকদের বিবরণ[৫৩], সুফি-সাধকদের সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী[৫৪] প্রভৃতি উপকরণের সাহায্যে কেহ কেহ মনে করেন ৮ম হতে ১০ম শতাব্দীর দিকে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন এলাকা— তুর্কি, আফগান, মোগল, ইরাক, আরব হতে মুসলমানেরা বাণিজ্য উপলক্ষে বাংলাদেশে আসতেন।[৫৫] কিন্তু অনেকেই আবার এ মত সমর্থন করেন না। কেননা এগুলির পেছনে সুস্পষ্ট কোন তথ্য প্রমাণাদি নাই। তবে মোটামুটিভাবে সকল পণ্ডিতই একমত যে, তুর্কি আক্রমণই বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ নয়। এর পূর্বেই ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচারের (সুফিদের আগমনের কাল সম্পর্কে বিতর্ক আছে) উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সাথে মুসলমানদের যোগসুত্র স্থাপন হয় এবং হয়ত তাদের কেহ এখানে বসতিও স্থাপন করেন।[৫৬] তবে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর বিজয়ের পর থেকেই এদেশে মুসলমান আগমনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কালক্রমে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।[৫৭] প্রসঙ্গত বলা যায় যে, মূলত বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার ও রাজ্যবিস্তার এই ত্রিবিধ কারণে বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমন ঘটে।

৫. সুলতানি আমলে বাংলাদেশের মুসলমানদের সামাজিক জীবন:

ক. বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ

১. সুলতান বর্গ: ১২০২ থেকে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় পৌনে চারশত বৎসর অবধি শাসনকালে বাংলার সুলতানগণ মাত্র কয়েকজন দিল্লির অধীন ছাড়া প্রায় সকলে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তারা শাসনভার পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক উচ্চ পদে বহু হিন্দু কর্মচারীও নিযুক্ত করেন। ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত প্রচেষ্টায় শাসনকার্য পরিচালিত হয়। সুলতানেরা 'শাহ-ই-বাঙ্গালা', 'শাহ-ই-বাঙ্গালীয়ান', 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা', 'সুলতান-উল-আজম', 'সুলতান-উল-মুয়াজ্জম' (অর্থাৎ বড় সুলতান), 'সুলতান-উল-আদিল' (অর্থাৎ ন্যায়-পরায়ন রাজা), 'ইমাম-উল-আজম' (অর্থাৎ বড় নেতা), 'সিকন্দর-উস-সানি' (অর্থাৎ দ্বিতীয় আলেকজান্ডার), 'নাসির-উল ইসলাম ওয়াল মুসলেমীন', গাউস-উল-ইসলাম ওয়াল মুসলেমীন' (অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী), 'খলীফত-উলাহ্ বিল-ইজ্জতে ওয়াল বুরহান' (অর্থাৎ প্রমান ও সাক্ষের সাহায্যে খলীফা), প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন।[৫৮] এতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে তারা স্বাধীন-সার্বভৌম ও ইসলামের ধারকরূপে রাজ্য শাসন করতেন। তবে কাউকে বলপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হত না। সুলতানগণ আইন প্রণয়ন, উচ্চ পদস্থ কর্মচারী নিয়োগ এবং শাসন ও বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।[৫৯]

এগুলি ছাড়াও সুলতানদের কতকগুলি সামাজিক দায়িত্বও ছিল। যেমন:[৬০]

১. নামাজের খুতবা পাঠ করা
২. ধর্মীয় বিধি-নিষেধের সীমা নির্ধারণ
৩. দান তহবিল গঠনে কর আদায়
৪. ইসলাম প্রসারের জন্য যুদ্ধ
৫. বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা
৬. বিদ্রোহীদের শাস্তির বিধান করা।

২. সুলতান নিযুক্ত রাজকর্মচারী শ্রেণি: সমকালীন লিপিমালা থেকে জানা যায় যে, সুলতানগণ রাজকর্মে সহযোগিতার জন্য নানা প্রকার অফিসার পদে মুসলমানদের নিয়োজিত করতেন। যেমন- আমির, উজির (প্রধানমন্ত্রী), ইকতাদার, দবিরই-খাস (প্রাইভেট সেক্রেটারী), সারেক মল্লিক (প্রধান সচিব), সর-ই-লস্কর (সৈন্যধ্যক্ষ), আরিদ-ই-লস্কর (বেতন-দাতা), সিলাহদার (বর্মরক্ষক), কাজী (বিচারপতি), সিকদার, মীর-ই-বাহার (এ্যাডমিরাল), কোতোয়াল (নগর অধ্যক্ষ), জামাদার-ই-গায়র মুহলী (অসাধারণ পোশাকের অধ্যক্ষ), শরাবদার-ই-গায়র মুহলী (অসাধারণ পানীয় অধ্যক্ষ), জামাদার (পোশাক তত্ত্বাবধায়ক), হাজিব (অনুষ্ঠান পরিচালক), এবং দারবান (প্রহরী)[৬১]। এদের মধ্যে কোন কোন অফিসার উচ্চ উপাধিও ধারণ করতেন। যেমন- খান-ই-আজম, খান-ই-জাহান, মজলিস-ই-আলা, মজলিস-আল-মজলিস।[৬২] পাশাপাশি হিন্দুদেরও এসমস্ত রাজপদে নিযুক্ত করা হত এবং তারা বিভিন্ন উপাধি লাভ করতেন।[৬৩]

৩. অভিজাত শ্রেণি: বাংলাদেশে আগত মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে সৈয়দ, উলেমা ও শেখ গণ সমাজে ধর্মনিষ্ঠা শিক্ষানুরাগ ও আদর্শগুণে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন।[৬৪] তারা অর্থ-সম্পদ কিংবা পদ-মর্যাদার অধিকারী না হলেও সমাজের উঁচু-নিচু সর্বস্তরে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। সৈয়দগণ ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর খোদ বংশধর।[৬৫] ফলে মুসলমান শাসকগণও তাদেরকে অত্যন্ত ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করতেন। এঁদের মধ্যে অনেকে সুফি-সাধক বা পীর-দরবেশও ছিলেন। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নিজেই সৈয়দ বংশীয় লোক ছিলেন।[৬৬] তিনি বাংলাদেশের বিখ্যাত সৈয়দ রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী, সৈয়দ মুহাম্মদ তাহির, সৈয়দ আব্দুর রহমান, সৈয়দ মুহাম্মদ রেজা প্রভৃতি সৈয়দগণ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।[৬৭] সাধারণ জনমানসে ইসলামি চেতনার বিকাশ, উন্নতি সাধন, ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার ও শরিয়ত মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনায় সুলতানদের পথ-নির্দেশনা প্রভৃতি কাজে তাঁরা ছিলেন দায়িত্ববান।[৬৮] বিচার বিভাগের কাজী পদে বিশেষ করে এঁদেরকেই নিযুক্ত করা হত।[৬৯] সুলতানি শাসকগণ সম্মান স্বরূপ তাদের জন্য নিষ্কর জমি ও ভাতাদি দিতেন। ওলেমা বা আলেম সমাজ বিশেষ করে ধর্মীয় শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তারা নিজ গৃহে মাদ্রাসা-মক্তব স্থাপন করে দেশে ইসলামি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।[৭০] তাদের অনুপ্রেরণা ও প্রচেষ্টায় বহু মাদ্রাসা ও সাধারণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখরা ছিলেন দেশের ওপর পণ্ডিতশ্রেণি। এঁরা ছিলেন সুফিসাধক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনায় সিদ্ধি পুরুষ।[৭১] শেখ ফরিদ, শেখ জালাল উদ্দিন তাবরিজী, শেখ শরফ উদ্দিন আবু তাওয়ামা, শেখ রেজা বিয়াবানী, শেখ আব্দুল্লাহ কিরমানী, শেখ তাখী সিরাজউদ্দিন, শেখ নাসির উদ্দিন, শেখ আলাউল প্রমুখ সুফি-দরবেশদের নাম বাংলাদেশে অতি প্রসিদ্ধ।[৭২] তাঁদের আস্তনা নামক খানকাগুলি আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সাধনার কেন্দ্র ছিল। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও সেবামূলক কাজে তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

৪. বণিক শ্রেণি: পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, বাংলাদেশ বাণিজ্য-সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল এবং দ্রব্যমূল্য খুব সস্তা ছিল। নদী পথে উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রী গ্রাম থেকে শহরে কিংবা বন্দরে সরবরাহ করা সহজ ছিল। ফলে জীবনধারণের জন্য দেশীয় মুসলমানরা ব্যবসায় নিয়োজিত হতেন। আভ্যন্তরীণ ব্যবসার পাশাপাশি তারা বৈদেশিক বাণিজ্যেও লিপ্ত হতেন।[৭৩] বারবোসার বিবরণে শহরের মুসলমানেরা সকলেই বড় বড় বণিক ছিলেন এবং বাণিজ্য তরি ও পানসি নৌকা ছিল।[৭৪] আরব, ইরান, তুরস্ক, পর্তুগিজ ও চীনদেশীয় বণিকদের সাথে তারা ব্যবসা করতেন।[৭৫] প্রতিবছর বিভিন্ন দেশের প্রায়

৩০/৩৫ টি বাণিজ্য জাহাজ বাংলাদেশে নঙর করত।[৭৬] শহর ও রাজধানীগুলি জলপথের সুবিধার জন্য সাধারণত নদীর তীরেই অবস্থিত হত।[৭৭] শহরগুলির মধ্যে সাতগাঁও, সোনারগাঁও ও চট্টগ্রাম সমুদ্র-বন্দর হিসাবে বিখ্যাত ছিল।[৭৮] এ সমস্ত শহরাঞ্চলে ভাল বাজার বসত।[৭৯] বাজারগুলিতে মুসলমানদের বড় বড় দোকান ছিল।[৮০] ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও গ্রামাঞ্চল থেকে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী এ সমস্ত বাজারে সরবরাহ করত। রপ্তানি জাহাজগুলি বাজার হতে সংগৃহীত মালামাল নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাত। বিদেশিরা আফ্রিকান ক্রীতদাস ও চীনামাটির বাসন এদেশে আমদানি করতেন।[৮১] ব্যবসার মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহৃত হত।[৮২] বাংলাদেশে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার প্রচলন সুলতানদেরই অবদান। তার পূর্বে পাল কিংবা সেন আমলে বিনিময়মাধ্যম হিসেবে কড়ির প্রচলন ছিল।[৮৩] অবশ্য মুদ্রা হিসেবে কড়ির প্রচলন তখনও কিছু কিছু ছিল।

৫. সাধারণ শ্রেণি: সরকারি চাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ছাড়া সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষি কাজ, শিল্পকর্ম, কারিগরি, হাঁস-মুরগি ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুপালন প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত হত।[৮৪] বিশেষত অশিক্ষিত, ধর্মান্তরিত মুসলিমসমাজ ধনসম্পদে দুর্বল ছিল। তারাই গোলা, জোলা, মুকেরি (গোপালক), পিঠারি, কাবারি, তাঁতি, সানাকার (তাঁত নির্মাণকারী), কাগতি, কসাই প্রভৃতি পেশা অবলম্বন করত। ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম এই শ্রেণির মানুষের এক চমৎকার বর্ণনা প্রদান করেছেন, "রোজা নামাজ না করিয়া কেহ হৈলা গোলা/ তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা/ বলদে বাহিয়া না বলয়ে মুকেরি/ পিঠা বেচিয়া নাম ধরাইল পিঠারি/ মৎস বেচিয়া ধরাইল কাবারি/ নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি।/ সানা বানিয়া নাম ধরে সানাকার/ জীবন উপায় তার পাইয়া তাঁতি ঘর।/ পট পড়িয়া কেহ ফিরএ নগর/ তীরকর হয়্যা কেহ নির্মএ শরে।/ কাগজ কুটিয়া নাম ধরাইল কাগতি/ কলন্দর (ফরিক) হয়্যা কেহ ফিরে দিবারাতি।/ বসন রাঙাইয়া কেহ ধরে রঙ্গরাজ/ লোহিত বসন শিরে ধরে মহাতেজ।/ সুন্নত করিয়া নাম বোলাইল হাজাম.../ কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজির ঘটা...।"[৮৫]

খ. ভাষা ও সংস্কৃতি:

১. ভাষা: বাংলাদেশের স্থানীয় মুসলমানদের সর্বজনীন ভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু বিদেশি মুসলমানগণ তাদের মাতৃভাষা আরবি-ফারসি সাথে করেই এদেশে আসেন। তাদের রাজত্ব লাভের ফলে অনিবার্য ভাবেই এই ভাষাদ্বয়ের প্রভাব বাংলাদেশে পড়ে। মুদ্রায় আরবি ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।[৮৬] তবে শিলালিপিতে আরবির সাথে অল্পবিস্তর ফারসি ভাষাও প্রয়োগ হয়েছে।[৮৭] এবং তাতে প্রাপ্ত সরকারি উপাধিগুলি সবই ফারসি।[৮৮] তাছাড়া রাজদরবারে সভাকবি নিয়োগ করে ফারসি ভাষায় কাব্য চর্চাও হয়েছে।[৮৯] এসব তথ্য থেকে পণ্ডিতগণ মনে করেন সুলতানি আমলে এদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফারসি এবং ধর্মীয় সকল ব্যাপারে ব্যবহৃত হত আরবি। চীনাদূত মাহুয়ানের বিবরণীতে দেশের সাধারণ মানুষের ভাষা হিসেবে বাংলার উল্লেখ আছে।[৯০] সরকারি ভাষা হিসেবে ফারসি ব্যবহৃত হলেও দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে বসবাস, পারিবারিক জীবন-যাপন, স্থানীয় জনসাধারণের সংগে সংশ্রব, বাঙালি রমনীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক, রাজকার্যে বাঙালি সহকর্মীদের সহঅবস্থান প্রভৃতি সূত্রে বিদেশি মুসলমানগণও বাংলা ভাষা শিখেছিলেন।[৯১] পাশাপাশি চাকরিলাভ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য অন্তত কিছুসংখ্যক দেশিয় মুসলমানও আরবি-ফারসি শিক্ষা গ্রহণ করতেন।[৯২]

২. শিক্ষাব্যবস্থা: প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তেমন কোন সরকারি বিদ্যালয় ছিল না। সাধারণত বিত্তবানদের বৈঠকখানায়, সুফিদের খানকা-দরগা ও মসজিদে মক্তব বা পাঠশালা ছিল। ধর্মপ্রাণ আলেম বা মৌলবিগণ মক্তবের শিক্ষক ছিলেন।[৯৩] কবি বলেন, "যত শিশু মুসলমান তুলিলা মক্তব স্থান,/ মকদুম পড়ায় পাঠনা।"[৯৪] স্থানীয় ছেলে-মেয়েরা এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একত্রেই লেখাপড়া করত। অর্থাৎ সহশিক্ষার প্রচলন ছিল। যেমন- "সুন্দর বালকগণ অতি সুচরিত,/ এক স্থানে সভানে পড়াএ আনন্দিত।/ সেই পাঠশালায় পড়য় কত বালা,/ সচরিত্র সুলিলিত নির্মল উজ্জ্বলা।"[৯৫] শিক্ষকেরা শিক্ষাদানে মনোযোগী ছিলেন। শিক্ষার্থীদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য বিভিন্ন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল। যেমন– প্রহার করা, ধান বা কাঁটা দিয়ে কপাল চিরে রক্ত ঝরা, সূর্যের দিকে মুখ করে রাখা, বিষপিঁপড়া গায়ে লাগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।[৯৬]

উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বিত্তবান ও আলিম-শেখদের পরিচালনায় বেশকিছু মাদ্রাসা জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল।[৯৭] এছাড়া সুফি-পণ্ডিতদের কয়েকটি খানকাও উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল।[৯৮] তৎকালে লৌখনতি, মহিসুন (রাজশাহী), সাতগাঁও, সোনারগাঁও, বীরভূম, বাকুড়া, বাঘা (রাজশাহী), রংপুর প্রভৃতি স্থানগুলি শিক্ষা-সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।[৯৯] তবে মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ে মেয়েদের সহশিক্ষা প্রায় প্রচলিত ছিল না। বিত্তবান শ্রেণির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল।[১০০]

মূলত ধর্মশিক্ষাই মূল লক্ষ্য ছিল। সেজন্য বাংলা ছাড়া আরবি-ফারসি ভাষাও শিখতে হত। ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি কাব্য, ভূগোল, গণিত, ব্যাকরণ, চিকিৎসা, রসায়ন, আইনশাস্ত্র প্রভৃতি সাধারণ শিক্ষাও দেওয়া হত।[১০১] আসনব্যবস্থা হিসেবে মেঝেতে চাটাই, মাদুর, পাটি, কুশান বা ফরাস বিছানো হত।[১০২] বিভিন্ন বিষয়ে লিপিকরদের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হত।[১০৩] কলাপাতা, তালপাতা কিংবা একপ্রকার তুলোট কাগজে লেখালেখি চলত।[১০৪] বাঁশের কঞ্চি, হাঁস, ময়ূর ও শকুনের পালক দ্বারা কলম তৈরি হত এবং কালি তৈরি হত হরিতকি ও প্রদীপের নির্বাপিত ফুলকা দিয়ে।[১০৫]

সে যুগে শিক্ষকবৃন্দ অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হতেন। ফলে সরকার ও সমাজ কর্তৃক তাঁদের উত্তম পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা ছিল।[১০৬] প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন না কোনভাবে 'ভূমি মঞ্জুরী' লাভ করত। তাছাড়া অভিভাবকরাও শিক্ষকদের প্রচুর পরিমাণে অর্থ দান করতেন। উৎপাদিত ফসলের বিনিময়েও ছেলে-মেয়েরা শিক্ষা লাভ করত। ফলে সঙ্গতভাবেই শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল।

৩. আচার-সংস্কার: দেশীয় মুসলমানরা বাঙালি ছিলেন বলে প্রাচীন আচার-সংস্কার ও রীতি-নীতির সাথে তাদের নাড়ির সংযোগ ছিল। বিদেশি মুসলমানগণ ক্ষমতাবান হলেও তারা সংখ্যালঘু ছিলেন। ফলে সামাজিক জীবনে তারা সংখ্যাগুরু বাঙালি-সংস্কৃতির প্রভাব এড়াতে পারেন নি। তাছাড়া বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েও তারা বাঙালি জীবনাচারণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হন। ফলে মুসলিমসমাজেও দৈনন্দিন কাজ-কর্মে পূর্বপ্রচলিত রীতি-নীতি ও সংস্কারাদি কিছু কিছু পালিত হত। যেমন- বিশেষ বিশেষ কাজে 'মাস-দিন-ক্ষণ-গ্রহ-নক্ষত্র-রাশি'-র প্রভাবজনিত শুভাশুভ মানা হত। সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ* (১৫৮২-৮৪) কাব্যে উল্লেখ আছে, 'শুভক্ষণে বৃদ্ধ নবী কন্যা কৈলা দান।'[১০৭] বিভিন্ন কাজ-কর্মে দিনক্ষণের শুভাশুভ সম্পর্কে পরবর্তীকালে রচিত মুহম্মদখানের *সত্যি কলিবিবাদ সম্বাদ*-এ (১৫৩৫) আরো স্পষ্ট বর্ণনা আছে:[১০৮]

১. স্নান সম্পর্কে: সোমে-গুরু ধন বাঢ়ে মঙ্গলে যে স্নান করে / আউ টুটি চিন্তা উপজএ/ বুধেত ঐশ্বর্য বাঢ়ে ধনী হএ গুরুবারে/ শুক্রবারের স্নান করে লোকে ।/ ইত্যাদি ।

২. বস্ত্র সম্পর্কে: নববস্ত্র শুক্রবারে পিন্দিলে উত্তম বারে/ চিন্তা হোন্তে পরিত্রাণ মনে ।

৩. শুভকর্ম সম্পর্কে: শনি এ মৃগয়া হএ রবিএ গৃহ নির্মএ/ বৃক্ষ যদি রোপে ফলে অতি ।/ শনি পরবাস যাএ বাণিজ্যেত লভ্যপত্র/ মঙ্গলে সংগ্রাম ভাল অতি । শুক্রেত বিবাহ কাজ অতি ভাল শাস্ত্র মাঝ/ পূণ্যকর্ম শুক্রুতে করিব ।

অর্থাৎ সোম, বুধ ও বৃহস্পতিবারে স্নান করলে ধন ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হয় । শুক্রবারে স্নান উত্তম । সেজন্য লোকে শুক্রবারে স্নান করে । মঙ্গল বারে স্নান করলে আয়ু কমে ও দুশ্চিন্তা বাড়ে । নতুন বস্ত্র শুক্রবারে পরিধান উত্তম । তাতে চিন্তা হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় । শনিবারে শিকার ও বাণিজ্য যাত্রা, রবিবারে গৃহনির্মাণ ও বৃক্ষরোপণ এবং মঙ্গলবারে যুদ্ধ অতি উত্তম । তবে এসমস্ত বিশ্বাস বিদেশি মুসলমানসমাজে কতটুকু গ্রহণযোগ্য ছিল তা বলা যায় না । অবশ্য এই সমস্ত আচার-সংস্কারের আদর্শ দিকও ছিল । যেমন গৃহে কুকুর অবস্থান করলে, গরুর গোবর দ্বারা বাড়ি-ঘর লেপন করলে, মেয়েদের মাথায় কাপড় না থাকলে সেগৃহে ফেরেস্তার আগমন হয় না । স্বাস্থ্যগত কারণে হস্তপদের নখ লম্বা রাখাও বারণ ছিল । *নবী বংশ* (১৫৮২-৮৪) কাব্যে এসব ব্যাপারে উল্লেখ আছে ।[১০৯]

৪. খাদ্য: মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে খাদ্য হিসাবে ভাত ও রুটি উল্লেখ আছে । মাছ, মাংস ও বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি তরকারি হিসেবে প্রচলিত ছিল । রন্ধনকার্যে বিভিন্ন প্রকার দেশীয় মসলার প্রচলন ছিল । তাছাড়া মুসলমানরা পোড়ানো বা ঝলসানো মাংসও খেত । বিশেষভাবে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি ও নানা প্রকার পাখির মাংস খেত ।[১১০] তৃপ্তিযোগে খাওয়ার জন্য মুলা, শশা, লেবু ও কাঁচা মরিচ দ্বারা তৈরি সালাত বা আচার পরিবেশিত হত ।[১১১] সাধারণ খাদ্য হিসেবে মাছ ও শাক-সব্‌জিই বেশি খেত ।[১১২] তাছাড়া খিচুড়ি রান্নাও তারা জানত । এবং মুসলমানসমাজে খিচুড়ি খুব প্রিয় খাদ্য ছিল ।[১১৩] নানা প্রকার পিঠা, খই, চিড়া, মুড়ি, মোয়া এবং দুধ থেকে দই, মাখন, ঘোল, ঘি প্রভৃতি তৈরি হত ।[১১৪] মিষ্টান্নদ্রব্যের মধ্যে পায়েস, সন্দেশ, মিছরি, বাতাসা, রসগোল্লা উল্লেখযোগ্য ছিল ।[১১৫] এছাড়া মধু খাওয়ার প্রচলন ছিল । শাহ মুহম্মদ শগীরের *ইউসুফ জুলেখা* কাব্যে মধু খাওয়ার উল্লেখ আছে ।[১১৬]

মুসলিম সমাজে প্রকাশ্যে মদ্যপান রীতি ছিল না । তবে অভিজাত মহলের কেহ কেহ অপ্রকাশ্যে মদ্যপান করত ।[১১৭] বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ভোজসভার পর গোলাপজল মিশ্রিত মিষ্টি শরবত সরবরাহ করা হত ।[১১৮] দেশে উৎপন্ন ইক্ষু, কাঁঠাল, কলা, ডালিম প্রভৃতি ফলমুল মুসলমানরা খেত ।[১১৯] পান খাওয়ার প্রচলন ছিল । অতিথি আগমনে ও ভোজনের পরে মসলাযুক্ত সুগন্ধি পান বিতরণ করা হত । ধূমপানেরও উল্লেখ পাওয়া যায় । যেমন: পানসুপারি: সু বর্ণের বাটাভরি কর্পুর তাম্বুল/ সুগন্ধি চন্দন আদি নানা বর্ণ ফুল ।[১২০]

ধূমপান: চৌদ্দশত দরবেশ চলে আরবোলা হাতে ।[১২১] সুলতানি আমলে বাংলাদেশে চা পানের প্রচলন ছিল না । নবাবি আমলে 'কফি' পানের প্রচলন শুরু হয় ।[১২২] সপ্তদশ শতকের শেষভাগে 'চা' পানের উল্লেখ পাওয়া যায় ।[১২৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অভিজাতশ্রেণির মুসলমানরা সোনার থালায় খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং অনুষ্ঠানাদিতে সোনার থালার সংখ্যা দ্বারা পরিবারের আভিজাত্য বিচার করা হত।[১২৪]

৫. বসতবাটি: চীনা বিবরণে জানা যায় বাংলার সুলতানগণ 'জাঁকজমকপূর্ণ' রাজ-প্রাসাদে বসবাস করতেন। প্রাসাদগুলি ইট-পাথরের মিশ্রণে তৈরি হত। প্রশস্ত পিলার ও উচ্চ সিঁড়ি থাকত। উপরে প্রশস্ত ছাদ পাড়া হত। কক্ষগুলি সাদা চুনকাম করা থাকত। দরজাগুলি তিনগুণ মোটা ও নয় খোপ বিশিষ্ট ছিল। হল ঘরের দুই ধারে দীর্ঘ বারান্দা থাকত। প্রাসাদের চারিদিকে সুরক্ষিত প্রাচীর ও দ্বারে সুসজ্জিত প্রহরী নিয়োজিত হত। প্রাসাদ অভ্যন্তরে পুষ্প-উদ্যান ও জীবজন্তুর ছবি আঁকা থাকত।[১২৫]

সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি কাঠ ও বাঁশ দ্বারা নির্মিত হত। উপরে টালির ঢালু ছাদ থাকত। ফলে বৃষ্টির পানি সহজে গড়িয়ে পড়ত। বিত্তবানদের বাড়ির সম্মুখে ফুলের বাগান ও পুকুর থাকত। মুসলিম মহিলারা পর্দা প্রথা মানত বলে স্নানকার্যে নদীতে যেতে পারত না। ফলে মুসলমান পরিবারের জন্য বাড়ির সংলগ্ন পুকুরের আবশ্যকতা ছিল। এই সমস্ত বাড়ি ভালভাবে তৈরি করতে তখনকার দিনে পাঁচ হাজার কিংবা তার চেয়ে বেশি টাকা খরচ হত। সেগুলি খুব মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হত। ধনী ও দরিদ্রের বাড়ি নির্মাণে পার্থক্য শুধু অর্থ ব্যয়ের উপর নির্ভর করত। যে যত বেশি উন্নতমানের বাঁশ-কাঠ ব্যবহার করত তার বাড়ি ততো সুন্দর ও মজবুত হত।[১২৬] আজও আমাদের দেশে এরূপ বাড়ি ঘর তৈরি হতে দেখা যায়।

৬. ধর্মীয় অনুষ্ঠান: ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে ঈদ-উল-ফেতর, ঈদ-উল-আজহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। হযরত মোহাম্মদ (দ.) এর জন্মদিন, শবে-মেরাজ, শবে-বরাত প্রভৃতি উৎসাবাদিও আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হত। কিন্তু '১০ই মহররম' ছিল শোক দিবস।

রমজান মাসে রোজা পালনের পর শাওয়াল মাসের ১ম তারিখ 'ঈদ-উল-ফেতরের' দিন। এই দিনে ঈদগাহ মাঠে দলে দলে লোক একত্রিত হত এবং ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হত। ধনীরা এই দিনে সামর্থানুযায়ী দরিদ্রদের মুক্তহস্তে দান করতেন। অনেকে টাকা-কড়ি রাস্তার উপর ছড়িয়ে দিতেন।[১২৭] সারাদিন পাড়া-প্রতিবেশি বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ ও একে অন্যকে অভিনন্দন ও আদর আপ্যায়নের মধ্যে অতিবাহিত হত।

ঠিক একইভাবে ১০ই জিলহজ্ব তারিখে 'ঈদ-উল-আজহার' নামাজ বিরাট ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হত। উচ্চস্বরে তকবিরধ্বনি দিতে দিতে লোকজন মাঠে উপস্থিত হত। কিন্তু এই দিনটি ত্যাগের। নবী হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর দুম্বা কুরবানির মহান আদর্শের অনুসরণে নামাজ আদায়ের পর প্রত্যেকে সামর্থানুযায়ী মূল্যের গরু, ছাগল, উট, মহিষ কুরবানি দিত। এই মাংস আত্মীয়-স্বজন গরীব-দুঃখী সকলের মধ্যে বিতরণ করা হত। ঈদের দিনগুলিতে নারী-পুরুষ সকলেই দামি নতুন পোশাকে সুসজ্জিত হতেন। ধনীরা গরীব-দুঃখীদের পোশাক-পরিচ্ছদ উপহার দিতেন।

১২ই রবিউল আউয়াল রসুল (দঃ) এর জন্মতারিখ উপলক্ষে সারাদেশের মসজিদ মাদ্রাসায় ধর্মালোচনার ব্যবস্থা হত। রসুলের জীবনী ও ধর্মীয় বাণী শ্রবণের উদ্দেশ্যে সেখানে মুসলমানরা একত্রিত হতেন। দিনটিতে তারা রোজা রাখতেন, রাত জেগে নামাজ ও দোয়া-দরুদ পড়তেন। এ উপলক্ষে দেশের সুলতান কর্তৃক জাঁক-জমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। তারা মাসটির ১ম থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত ধর্মীয়

আলোচনার জন্য আলেম ও শেখদের নিয়ে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। তাদের সম্মানার্থে উত্তম ভোজ ও উপহারাদির ব্যবস্থা হত।[১২৮]

মুসলিম সমাজে 'শব-ই-বরাত' ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্ম মতে ১৪ই শাবানের এই রাতে আল্লাহ মানুষের রুজি নির্ধারণ করেন। এই রাতে মুসলমানরা আলাহ্‌কে বিশেষভাবে স্মরণ করতেন। কয়েকদিন ধরে তারা রোজা ও রাত্রি জেগে এবাদতে মশগুল থাকতেন। তাছাড়া মসজিদ-মাদ্রাসায় আনুষ্ঠানিকভাবে কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যাও হত। দান–খয়রাত, এবাদত-বন্দেগির সাথে গৃহে আলোক সজ্জা, আতশবাজি ও বিশেষ ধরণের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হত।[১২৯]

১০ই মহররম কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসেনের শাহাদতবরণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে 'মহররম পর্ব' অনুষ্ঠান পালিত হত। ধর্মপ্রাণ নারী-পুরুষ প্রথম দশদিন খুব অল্প আহার-বিহার করতেন, বেশি করে নামাজ পড়তেন ও রোজা রাখতেন।[১৩০] এতে বুঝা যায় তাদের মনে একটি 'নিরব শোকের' ছায়াপাত হত। শিয়ারা তাজিয়া বের করত এবং দল বেধে পরস্পরবিরোধী পক্ষ হয়ে লাঠি-ছোরা প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে খেলা করত।[১৩১] তারা 'হায় হোসেন' 'হায় হাসান' ধ্বনি তুলে ক্রন্দনও করত।[১৩২] অনেকেই নিজের শরীরে আঘাত করে রক্ত ঝরাত।[১৩৩] গৃহের বারান্দায় বা বৈঠকে মঞ্চ তৈরি করে হোসেন পরিবারের দুঃখময় কাহিনী বর্ণিত হত। ফলে সমবেত লোকজন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ত। সুন্নি মুসলমানগণ সাধারণত এসব ব্যাপারে উৎসাহী ছিল না। তারা এটাকে 'নীরব শোকের পর্ব' হিসেবেই পালন করত।[১৩৪]

৭. সামাজিক অনুষ্ঠান: 'জন্ম', 'আকিকা','খাৎনা', 'বিয়ে-সাদি' প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে পুত্রসন্তানের জন্ম উপলক্ষে বিশেষ উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন ছিল।[১৩৫] এতে প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করা হত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা আনন্দভোজে অংশগ্রহণ করতেন। নবজাতক শিশুকে আশীর্বাদ স্বরূপ বিভিন্ন উপহার প্রদান করতেন।[১৩৬] গণক বা জ্যোতিষী ডেকে ছেলের কুষ্ঠি নামাও প্রস্তুত হত।[১৩৭] এমনকি পরিবারের সামর্থানুযায়ী এ-অনুষ্ঠান সপ্তাহকালব্যাপী স্থায়ী হত।[১৩৮]

জন্মের কয়েকদিনের মধ্যে ছেলে-মেয়েদের কেশমুণ্ডন ও নাম রাখার জন্য 'আকিকা' অনুষ্ঠানের আয়োজন হত।[১৩৯] এ অনুষ্ঠানে ভাল মৌলবি দ্বারা সন্তানের উত্তম নাম রেখে কন্যা-সন্তানের জন্য একটি এবং পুত্র-সন্তানের জন্য দুটি মহিষ বা ছাগল উৎসর্গ করা হত। এ-সমস্ত গোস্ত প্রতিবেশী, আত্মীয়বর্গ ও গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করা হত।[১৪০] এ প্রথা বর্তমান সমাজেও প্রচলিত আছে। ছেলেদের পাঁচ-সাত বছর বয়সে 'খাৎনা' দেওয়া হত।[১৪১] এই 'খাৎনা পর্ব'-ও আনুষ্ঠানিকভাবে আমোদ-প্রমোদ, ভোজসভা ও উপহার বিতরণের মধ্য দিয়ে প্রতিপালিত হত।[১৪২] মানবসমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বিয়ে-সাদি। সভ্য সমাজে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে প্রত্যেক নর-নারীকে সংসারজীবনে অবতীর্ণ হতে হয়।

সুলতানি আমলে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ-রীতিতে মেয়েদের জন্য পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল। সেখানে বিয়ের আগে অনাত্মীয় নারী-পুরুষের দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ছিল। *ইউসুফ জোলেখা* কাব্যে আছে, 'তুমি অকুমারী বালা জগত বিদিত/ বিবাহ সম্বন্ধ আগে (স্বামী) দেখা অনুচিত"।[১৪৩] এতে প্রতীয়মান যে পছন্দমত স্বামী-স্ত্রী নির্বাচনের অধিকার সচরাচর নারী-পুরুষের ছিল না। অভিভাবকগণই এ বিষয়ে সর্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করতেন। তাছাড়া বাল্য-বিবাহ ও কন্যাপণ প্রথা প্রচলিত ছিল।[১৪৪] বরপক্ষ কনেকে পণ দিত। বেশি বয়সে বিয়ে-সাদি নিন্দনীয় ছিল। বিয়েতে ছেলেরা ইজার-পাগড়ি ও তাঞ্জাম-চৌগান পরত। যানবাহন হিসেবে শিবিকা বা পালকি ব্যবহৃত হত।[১৪৫] শিক্ষানুযায়ী বরের শাস্ত্রজ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেকের পরীক্ষা হত।[১৪৬] বর ঠকানোর জন্য নানা হেঁয়ালি-ধাঁধাও প্রচলিত ছিল।[১৪৭] আজকের মতই কাজি ও উকিল নিযুক্ত করে ইসলামি বিধানমত বিয়ে হত।[১৪৮] বর-কনে একত্রে বসানোর জন্য ফাঁকা স্থানে সুসজ্জিত মঞ্চ তৈরি হত এবং উপরে চাঁদোয়া টাঙ্গানো হত।[১৪৯] এই মঞ্চের নাম ছিল মারোয়া।। এর মধ্যে বর-কনের মিলন হত।[১৫০] বিয়ের কথা নিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘর দেখা, বর দেখা, কনে দেখা, দিন-তারিখ ঠিক করা, বিয়েভোজ, বরভোজ, কনেভোজ, নানা অনুষ্ঠানাদি চলত।[১৫১] জন্ম, আকিকা, খাৎনা, হাতে খড়ি, গায়ে হলুদ, বিবাহউৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানে আর্থিক সামর্থানুযায়ী নাচ-গান, বাদ্য-বাজনা, রঙ ছোঁড়া, কাদা ছোঁড়া, পুতুল নাচ, যাদু খেলা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হত।[১৫২]

৮. পোশাক-পরিচ্ছদ: বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পে খুব উন্নত ছিল। এখানে নানা প্রকার সুতি, রেশমি ও সিল্কজাতীয় কাপড় তৈরি হত। মুসলমানরা এই সমস্ত বস্ত্রের তৈরি পোশাকাদি ব্যবহার করত। তবে অবস্থার তারতম্যে ধনি-গরিব, মোল্লা-মৌলবিদের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদে তারতম্য ছিল।

সুলতান ও অমাত্যবর্গ অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ আনন্দ-উচ্ছল জীবনযাপন করতেন। তাঁদের জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় জীবনের বর্ণনা বিলাস-বৈভবের স্বাক্ষরই বহন করে। অভিজাত শ্রেণির পুরুষেরা বিশেষ করে ইজার (পায়জামা), আসকান, আলখাল্লা, চাপকান (বিভিন্ন প্রকার লম্বা ঢিলা জামা), কোমর বন্দ, সিনাবন্দ (রুমাল জাতীয় ফিতা-জামার উপর দিয়ে কোমর বাঁধা হত), টুপি, পাগড়ি প্রভৃতি পরিধান করতেন।[১৫৩] সামাজিক ও আর্থিক অবস্থাভেদে এই সমস্ত পোশাক সুতি, রেশমি কিংবা জরির হত। কোনো কোনো পোশাকে সোনা,রূপা, মণি, মুক্তাও খচিত হত।[১৫৪]

সাধারণ ও দরিদ্রশ্রেণির লোকেরা সচারচার কৌপীন (ল্যাঙট) ও গামছা পরে মাঠে-ঘাটে কাজ করত। এবং অন্য সময়ে খাট জামা, সাদা ধুতি, তহবন বা লুঙ্গি পরত।[১৫৫] মাথায় তালপাতা, বেত কিংবা কাপড়ের তৈরি টুপি ও পাগড়ি পরত।[১৫৬] প্রায় সবসময় মাথায় টুপি রাখার রেওয়াজ ছিল।[১৫৭]

পুরুষেরা মস্তক মুণ্ডণ করতেন, চুল ছোট রাখতেন এবং দাড়ি রাখতেন।[১৫৮] ঐশ্বর্যশালীরা রেশমি অথবা সোনালি সুতায় কারুকার্যময় চামড়ার জুতা ও চপ্পল ব্যবহার করতেন।[১৫৯] সাধারণ মানুষ কম দামের জুতা ব্যবহার করত।[১৬০]

মেয়েরা সাধারণত শাড়ি ও অন্তর্বাস (ছায়া) পরত।[১৬১] তবে কোনো কোনো অঞ্চলের মেয়েরা কামিজ ও সালোয়ারজাতীয় কাপড় পরিধান করত।[১৬২] চটক, মটক, গরাদ, ময়ূরপেখম, মেঘডুমুর, নীলাম্বরী, হীরামন, মসলিন প্রভৃতি নামের শাড়ি বিখ্যাত ছিল।[১৬৩]

৯. অলংকার:
নারীমহলে অলংকারের খুব সমাদর ছিল। মেয়েরা মাথায় সিঁথিপাটি, টিকলি, কনেট, হার, তাবিজ, হাতে অনন্ত, বালা, চুড়ি, কঙ্কণ, আঙ্গুলে আংটি, নাকে নোলক, নাকছবি, কানে কুন্তল, কানবালা, ঝুমকা, পায়ে মল, মকর, খাড়, নুপুর, ঘুঙুর, কোমরে কিঙ্কিণী

প্রভৃতি বহুবিচিত্র অংলকার ব্যবহার করত।[১৬৪] *ইউসুফ জোলেখা, লাইলি মজনু, রসুল বিজয়* কাব্যে এই সমস্ত অলংকারাদির উল্লেখ আছে।

১০. প্রসাধনী:

মুসলমান মেয়েরা সাধারণত ফর্সা রঙের বলে প্রসাধনী ব্যবহার করত না। তবে বিয়ে প্রভৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রসাধনীর ব্যবহার ছিল। প্রসাধনী দ্রব্যের মধ্যে সিঁদুর, চন্দন, মেহেদি, কুমকুম, কস্তুরি, কাফুর, কাজল, সূর্মা, তেল, আতর, আগর, ফাগু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছিল। এবং খোঁপা করে চুল বাঁধত।[১৬৫]

১১. নারীর মর্যাদা:

নারীরা পর্দাপ্রথা মানত এবং দিনের বেলা বাড়ির বাইরে যেত না। স্বামীরা স্ত্রীদের প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করত।[১৬৬] কিন্তু প্রায় বেশিরভাগ পুরুষই তিন-চারটি কিংবা তারও বেশি স্ত্রী গ্রহণ করত।[১৬৭] কেহ কেহ হিন্দু মহিলাকেও বিয়ে করত।[১৬৮] তবে হিন্দু মেয়েদের চেয়ে মুসলনমান মেয়েদের মর্যাদা বেশি ছিল। স্বামীরা স্ত্রীদেরকে খুব ভাল ভাল অংলকার-বস্ত্র প্রভৃতি উপহারও দিত।[১৬৯] তথাপি পর্দাপ্রথার রীতি অনুযায়ী মনে হয় যে, মেয়েদের খুব একটা স্বাধীনতা ছিল না।

১২. খেলাধুলা:

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন খেলাধুলার উল্লেখ আছে। তারমধ্যে পুতুলনাচ, বাঘের খেলা, চৌগান, গেরু, দাবা, পাশা, সাঁতার কাটা, নৌকা চালানো, জুয়া, বাজিরাখা, কবুতর উড়ানো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১৭০]

১৩. আদব-কায়দা:

পিতা-মাতা, পির-ওস্তাদ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নানা রীতি প্রচলিত ছিল। যেমন, সালাম দেওয়া, কদমবুচি করা, চোখে চোখ না রেখে নত মুখে কথা বলা ও কিছু নেওয়া, তাদের সম্মুখভাগে না বসা, আগে না চলা, নাম ধরে না ডাকা, উচ্চ স্বরে কথা না বলা প্রভৃতি।[১৭১]

১৪. চিকিৎসা:

আজকের মতো রোগব্যাধির আশু নিরাময়ের জন্য তেমন কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। 'দ্রব্যগুণ, নির্ভর টোটকা চিকিৎসাই ছিল বাস্তব ব্যবস্থা।'[১৭২] ফলে কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি মহামারিতে লোক-সমাজে ভীষণ ভীতি সঞ্চার হত। জটিল রোগে ঝাড়-ফুক, তাবিজ, কবজ, পানি পড়া, তেল পড়া, সিন্নি, সদকা, কাঙাল-মিসকিন ভোজ ইত্যাদি ছিল ভরসা।[১৭৩]

১৫. দাসদাসী প্রথা:

সুলতানি আমলে বাংলাদেশে দাস প্রথার প্রচলন ছিল। সম্পদশালী ব্যক্তিরা নান প্রকার গৃহকর্মের জন্য দাসদাসী নিযুক্ত করতেন। বিদেশি বণিকগণ বিশেষ করে আবিসিনিয়া থেকে ক্রীতদাস আমদানি করত এবং তাদেরকে বাজারে বিক্রয় করা হত।[১৭৪] জানা যায় সুলতান বরুন উদ-দীন বারবকশাহ্ আট হাজার হাবসি দাস আমদানি করে তাঁর প্রাসাদকর্মে নিয়োজিত করেছিলেন।[১৭৫] সুলতান গিয়াস-আল-দীন আজম শাহ্'র সারো, গুল ও নাহার নামে তিনজন দাসী ছিল।[১৭৬] ইবনে বতুতাও আশুরা নামে এক

সুন্দরী ক্রীতদাসী ক্রয় করেছিলেন।[১৭৭] এছাড়া মুসলমান ব্যবসায়ীরা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দরিদ্র পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের কাছ থেকে ছেলে-মেয়ে ক্রয় করে আনত এবং তাদের খোজা বানান হত।[১৭৮] অবশেষে তাদেরকে বিদেশি বণিকদের কাছে বিক্রয় করা হত।[১৭৯] বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইরানিরা এদেরকে নিয়ে গৃহ ও স্ত্রী প্রহরায় নিযুক্ত করত।[১৮০]

১৬. অমুসলমানদের সাথে সম্পর্ক:
শিক্ষিত মুসলমানসমাজ ও সুফি-পিরদরবেশগণ স্থানীয় অমুসলমানদের সাথে প্রীতিপূর্ণ আচরণ এবং ধর্মীয় ব্যাপারে আলোচনা করতেন।[১৮১] ফলে কেহ কেহ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হত।[১৮২] তাছাড়া হিন্দুদেরকেও সরকারি উচ্চ পদে নিযুক্ত করা হত।[১৮৩] এমনকি সামরিক বিভাগেও তাদের প্রবেশাধিকার ছিল।[১৮৪] এতে প্রমাণিত হয় যে, সুলতানি আমলে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ আচরণ বিরাজমান ছিল।

দীর্ঘ পথপরিক্রমায় গড়ে উঠেছে বাঙালি সংস্কৃতির এই ভিত। আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশে যে সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার সাথে মুসলিম সমাজের সমন্বয়ের ফলে যে সুগঠিত ও সুসমন্বিত সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেই সমন্বিত সামাজিকচিত্রের স্বরূপ বাংলাদেশে এখনও প্রবহমান।

তথ্যসূচি:

১. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, সুলতানী আমল (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ১৪
২. *তদেব*, পৃ. ১৪-২৭। এবং *Abdul Karim, Social History of The Muslims in Bengal.*
৩. (Dacca: The Asiatic Society of Pakistan, 1959), PP. ১-১৬.
৪. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য*, (ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশন, ১৯৫৭) পৃ. ১ এবং আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙালা সাহিত্য* (ঢাকা: বর্ণ মিছিল, ১৯৭৮), পৃ. ২
৫. *তদেব*
৬. *তদেব*
৭. *তদেব*
৮. কাজী দীন মুহম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৮) পৃ. ৬
৯. *আইন-ই-আকবরী*, ভল্যুম ২, জেরেট কর্তৃক অনূদিত। উদ্ধৃত কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
১০. *তদেব*
১১. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত* পৃ. ১
১২. *তবকাত-ই-নাসিরাত*, (উদ্ধৃত আবদুল করিম, *তদেব* , পৃ. ১) পৃ. ৭৪
১৩. *তারিখ-ই- ফীরূজাহী*, (উদ্ধৃত *তদেব*, পৃ. ২) পৃ. ১১৪-১৮
১৪. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩
১৫. *তদেব*
১৬. *তদেব*

১৭. *তদেব*

১৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* (তৃতীয় সং, কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, ১৩৬৪), পৃ. ১৩

১৯. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩

২০. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১২

২১. ইবনে বতুতা, *সফর নামা,* এইচ এ আর গিব অনূদিত, (দ্রষ্টব্য: আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১, ১৫০) পৃ. ২৬৭

২২. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৭

২৩. *তদেব*

২৪. *তদেব*

২৫. *তদেব,* পৃ. ৩২

২৬. কাজী দীন মুহম্মদ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৭

২৭. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩২

২৮. কাজী দীন মুহম্মদ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৮

২৯. *তদেব,* পৃ. ২৭

৩০. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৩

৩১. কাজী দীন মুহম্মদ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৮

৩২. *তদেব,* পৃ. ৩০

৩৩. *তদেব,* পৃ. ২৯

৩৪. *তদেব*

৩৫. বিস্তৃত আলোচনা- *তদেব,* পৃ. ৩০

৩৬. Sarker Jadunth, *History of Bengal*, vol-1, (Dacca University, 1948) P. 273.

৩৭. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৪

৩৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. *তদেব,* পৃ. ৫৯-৬১

৩৯. *তদেব,* পৃ. ৩৫

৪০. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৮

৪১. এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর,* (২য় সং, কলকাতাঃ ভারতী বুকস্টল, ১৯৬৬), পৃ. ৪৬৩

৪২. রামাই পণ্ডিত, 'নিরঞ্জনের রুষ্মা', *শূন্যপূরাণ*। উদ্ধৃত দীন মুহম্মদ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৭২

৪৩. *চৈতন্য ভগবত*। উদ্ধৃত আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬

৪৪. *বাবর, আত্মচরিত*। উদ্ধৃত *তদেব*

৪৫. *চৈতন্য চরিতামৃত*। উদ্ধৃত *তদেব,* পৃ. ৭৮

৪৬. কাজী দীন মুহম্মদ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৮

৪৭. *তদেব,* এবং আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১০

৪৮. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* ১ম খণ্ড (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৪৫২

৪৯. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

৫০. *তদেব*, পৃ. ১৪৯

৫১. হিষ্ট্রী অব বেঙ্গল, ভলুম-২ (উদ্ধৃত আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯-৫০) পৃ. ১০১-০২

৫২. *তদেব*, পৃ. ১৫০

৫৩. *তদেব*, পৃ. ৩১-৩৮

৫৪. *তদেব*

৫৫. *তদেব*, পৃ. ৪১-৪৬

৫৬. এনামুল হক ও আবদুল করিম, *আরাকান রাজসভায় বাঙ্গলা সাহিত্য*, পৃ. ৩

৫৭. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

৫৮. *তদেব*, পৃ. ৩১

৫৯. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ৩৯০-৯২

৬০. *তদেব*

৬১. *তারিখ-ই-ফিরুজাই*। উদ্ধৃত এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৯

৬২. Abdul Karim, *Social History of The Muslims in Bengal*. P. 179-81. এবং আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯১-৯৫

৬৩. *Ibid*, P. ১৮০.

৬৪. এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮-৮৯

৬৫. *তদেব*, পৃ. ২৮৯

৬৬. *তদেব*, পৃ. ২৯০

৬৭. *তদেব*

৬৮. *তদেব*, পৃ. ৮৬,৯১

৬৯. *তদেব*

৭০. *তদেব*

৭১. *তদেব*, পৃ. ১৮৯

৭২. *তদেব*, পৃ. ১০৭

৭৩. ৭২.এঁদের সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দ্র. *তদেব*, পৃ. ৯৪-১২৫

৭৪. Abdul Karim, *Loc. Cit*. P. 182.

৭৫. উদ্ধৃত এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*. পৃ. ৪৪৮

৭৬. *তদেব*

৭৭. *তদেব*, পৃ. ৪৪৯

৭৮. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮-৯

৭৯. *তদেব*, পৃ. ৯

৮০. Abdul Karim, *Loc. Cit.* P. 182.

৮১. *Ibid.*

৮২. *Ibid*. P. 134.

৮৩. *Ibid*.

৮৪. *Ibid.*

৮৫. বিস্তারিত বিবরণ *Ibid.* চ. ১৮৫-৮৮. এবং এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৮, ৪৪২-৪৮

৮৬. *চণ্ডীমঙ্গল*। উদ্ধৃত আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সাংস্কৃতিক রূপ*, (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৭), পৃ. ৪১-৪২

৮৭. মুদ্রার জন্য-H.N.Wright, *Catalogue of The Coins in The Indian Muslims,* Calcutta,Vol-II, (Oxford, 1907). উদ্ধৃত- Abdul Karim, *Social History of The Muslims in Bengal*. P.175.

৮৮. লিপির জন্য -A.H. Dani, 'Bibliography of Muslims Inscriptions of Bengal', *Journal of The Asiatic Society of Pakistan,* Vol-II, (1957), D×„Z- Abdul Karim, *Social History of The Muslims in Bengal*. P.175.

৮৯. দ্র. *Ibid.* P. 94-102.

৯০. দ্র. *Ibid.* P. 176.

৯১. দ্র. *Ibid.* P. 177-78.

৯২. দ্র. *Ibid.*

৯৩. দ্র. *Ibid.*

৯৪. এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪

৯৫. মুকুন্দরাম, *চণ্ডীকাব্য*, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২), পৃ. ৩৩৪

৯৬. দৌলত উজির বাহরামখান, *লায়লী মজনু*, (বাংলা একাডেমী, ১৯৫৭) পৃ. ১৭-১৮

৯৭. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

৯৮. এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯

৯৯. *তদেব*, পৃ. ২০২

১০০. *তদেব*, পৃ. ২০৩-১২

১০১. *তদেব*, পৃ. ২২৪

১০২. *তদেব*, পৃ. ২২১

১০৩. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

১০৪. *তদেব*

১০৫. *তদেব*

১০৬. *তদেব*, এবং এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ২৩৩

১০৭. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ২২০-২৩২

১০৮. *নবীবংশ*। উদ্ধৃত-আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, পৃ. ২৩৮

১০৯. মুহম্মদ খান, *সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ*। উদ্ধৃত *তদেব* পৃ. ১১০-১১

১১০. সৈয়দ সুলতান, *নবীবংশ*। উদ্ধৃত- *তদেব*, পৃ. ২৪১

১১১. *Travels of Sebastian Manrique,* P. ২১৭. উদ্ধৃত এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ.২৯৫, ৩২৩

১১২. *তদেব*, পৃ. ৩২৩

১১৩. *তদেব*

১১৪. *তদেব*, পৃ. ৩২৪

১১৫. আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, পৃ. ৪৯

১১৬. *তদেব*

১১৭. উদ্ধৃত- *তদেব*, পৃ. ২১৫

১১৮. এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৪

১১৯. Abdul Karim, *Social History of The Muslims in Bengal*. P.191.

১২০. *Ibid*.

১২১. শাহ মুহম্মদ সগীর, *ইউসুফ জোলেখা*। উদ্ধৃত- আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, পৃ. ২১৯

১২২. দ্বিজ ষষ্ঠীবর, *মনসামঙ্গল*। উদ্ধৃত-*তদেব*, পৃ. ৩৯

১২৩. এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ৩৩০

১২৪. *তদেব*

১২৫. Tarikh-i-Firishtah, Vol-II, PP.301-2 D×,,Z- Abdul Karim, *Social History of The Muslims in Bengal*. P.195.

১২৬. *Ibid*. P. 189.

১২৭. *Ibid*. P. 190.

১২৮. মুর্শিদকুলী খান ঈদ-উল-আজহার দিনে তার দূর্গ হতে ঈদগাহ ময়দান পর্যন্ত দুই মাইল পথে প্রচুর টাকা কড়ি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ আছে। J.A. Bengal Nawabs, P.8 উদ্ধৃত- এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ৩০৯

১২৯. ফজলুলাহ অনূদিত, *মিরাত-ই-সিকান্দার*, পৃ. ১২১। উদ্ধৃত এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ.৩১০-১১

১৩০. আকিক, *তারিখ-ই-ফিরূজশাহী*, (উদ্ধৃত- *তদেব*, পৃ. ৩১১) পৃ. ৩৫-৬৭

১৩১. *তদেব*, পৃ. ৩১২

১৩২. *তদেব*

১৩৩. *তদেব*

১৩৪. এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ৩১২

১৩৫. *তদেব*, পৃ. ৩১২-১৩

১৩৬. *তদেব*, পৃ. ৩১৪

১৩৭. *তদেব*

১৩৮. *তদেব*

১৩৯. *তদেব*

১৪০. *তদেব*, পৃ. ৩১৫

১৪১. *তদেব*

১৪২. *তদেব*

১৪৩. *তদেব*

১৪৪. উদ্ধৃত-আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, পৃ. ২১৩

১৪৫. এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৮-১৯

১৪৬. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নানা স্থানে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে

১৪৭. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭

১৪৮. *তদেব*, পৃ. ৩৫

১৪৯. এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২২

১৫০. *তদেব*, পৃ. ৩২১

১৫১. আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, পৃ. ৩৬

১৫২. *তদেব*, পৃ. ৩৫

১৫৩. *তদেব*

১৫৪. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১ । এবং এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৪

১৫৫. *তদেব*, পৃ. ৪১

১৫৬. *তদেব*, পৃ. ৪১,৩২৫

১৫৭. *তদেব*, পৃ. ৪১,৩২৫

১৫৮. *তদেব*, পৃ. ৩২৫

১৫৯. Abdul Karim, *Loc. Cit.* P.193.

১৬০. এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৫

১৬১. *তদেব*, পৃ. ৩০০

১৬২. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত*. পৃ. ৪১

১৬৩. এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩২৫

১৬৪. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

১৬৫. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯-৪০

১৬৬. দ্রষ্টব্য. *তদেব*. (*ইউসুফ জোলেখা* এবং *নবী বংশ* কাব্যের বিশেষ অংশ উদ্ধৃত হয়েছে) পৃ. ৪০,২১৫-১৬,২৪০

১৬৭. বারবোসা, (উদ্ধৃত- Abdul Karim, *Social History of The Muslims in Bengal*. P.194.) পৃ. ১৪৮

১৬৮. *তদেব*, পৃ. ১৪৭-৪৮ । উদ্ধৃত- *Ibid.*

১৬৯. বিজয়গুপ্ত, *পদ্মপুরাণ* । উদ্ধৃত- *Ibid.*

১৭০. বারবোসা । উদ্ধৃত- *Ibid.*

১৭১. এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৭-২৮

১৭২. আহমদ শরীফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

১৭৩. *তদেব*, পৃ. ৩১

১৭৪. *তদেব*

১৭৫. এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩১ । এবং Abdul Karim, *Social History of The Muslims in Bengal*. P.196.

১৭৬. মুহাম্মদ আবুল কাসিম, *ফিরিশতা, তারীখই ফিরিশতা*, (উদ্ধৃত- আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ৩৯৩) পৃ. ২৯৮

১৭৭. গোলাম হোসেন সলিম, *রিয়াদ আল সালাতীন*,(১৮৯৮), (উদ্ধৃত- Abdul Karim, *Loc. Cit*. P.196.) পৃ. ১০৫

১৭৮. *Ibn Battutah, Rihlat Ibn Battutah, Defremery & Sanguinetti translated, (Paris: 1853-54), Vol. iv, P.212, D×,,Z- Ibid. P.196.*

১৭৯. *Ibid*. P.196.

১৮০. *Ibid.*

১৮১. Barbosa, *The Book of Duarte Barbosa*, Mansel Long worth Dames translated, Vol-II, (London: Hakluyt Society, 1921), P. 147. D×,,Z- Abdul Karim, *Ibid*. P.196.

১৮২. *Ibid*. P. 85-123.

১৮৩. *Ibid.*

১৮৪. এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮-৮৯

১৮৫. তদেব

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

মধুসূদন পরম্পরা

আল ফারুক চৌধুরী*

সারসংক্ষেপ: অতুলপ্রসাদ সেন *বাংলা ভাষা* শীর্ষক কবিতায় লেখেন 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা'। অতুলপ্রসাদ তাঁর এই কবিতায় আমাদের গর্ব করবার মত সাতজন বাঙালি কবির নামোল্লেখ করে গেছেন- 'বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, হেমচন্দ্র, মুধসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র'। এই সাতজনের তিনজন প্রাগাধুনিক, শেষ চারজন আধুনিক কালের কবি- উনিশ শতকে আবির্ভূত। এই পরম্পরার সঙ্গে আরও একজন যুক্ত হবেন, তিনি কবি কায়োবাদ। বর্তমান নিবন্ধটিতে এই পাঁচজন কবি আলোচিত হবেন নানা প্রসঙ্গে। আমাদের মূল লক্ষ্য মধুসূদনের প্রভাব। তবে আলোচনার অনুসঙ্গে রবীন্দ্রনাথও আসবেন। বাংলা সাহিত্য ছাড়াও এতটাই তাঁর ঔজ্জ্বল্য যে, অন্য প্রদেশের ভারতীয় সাহিত্যও তাঁর প্রভায় আলোকিত। উনিশ শতকে যখন আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল, তখন মধুসূদনের রচনা অনেক ভারতীয় কবি ও সাহিত্যিককে অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রথমদিকে বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, গুজরাতি প্রভৃতি কয়েকটি ভাষায় আধুনিকতার লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়েছে। বঙ্গ প্রদেশে সেদিন যে নব চেতনার আলো ফুটে উঠেছিল মধুসূদনের আবির্ভাবে তা উদ্ভাসিত। এই আলোয় অন্যান্য সাহিত্যেও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অনেকেই পথসন্ধান করেছেন। এই জন্য আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে মধুসূদনের গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম। তাই আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে মধুসূদনের প্রভাব কী ও কতটা তার স্বরূপ সন্ধানের লক্ষ্যেই প্রতিপাদ্য নিবন্ধের অবতারণা।

বঙ্কিমচন্দ্র: বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনকে যিনি প্রথম দুর্লভ সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে এক মুহূর্তে কালিদাস, শ্রীহর্ষ, শেক্সপিয়র, ওয়ার্ডসওর্থ, কিট্স, বায়রনের সমগোত্রীয় করে তোলেন, তিনি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম পথিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গদর্শনের পাতায় বঙ্কিমের স্মরণীয় শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হয়েছিল, 'কাল প্রসন্ন- ইউরোপ সহায়-সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও- তাহাতে নাম লেখ, শ্রীমধুসূদন।'[১] বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ললিতা* প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে, মধুসূদনের প্রথম নাটক *শর্মিষ্ঠা* প্রকাশিত হয় ১৮৫৯-এ। মধুসূদন স্বল্পায়ু ছিলেন; তিনি যখন মারা যান, *বঙ্গদর্শন* তখন সবে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে- ১৮৭৩। মধুসূদনের লেখা বারোটি বইয়ের মধ্যে প্রথম নয়টি বই ছাপা হয় ১৮৫৯ থেকে ১৮৬২ সালের মধ্যে- মোট চার বছরের মধ্যে। শেষ তিনটি বই বেরোয় যথাক্রমে '৬৬,'৭১ এবং কবির মৃত্যুর পর ১৮৭৪-এ। মধুসূদনের বইপত্রের তিনচতুর্থাংশ যখন বেরিয়ে গেছে তখন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যের আসরে অবতীর্ণ হন নি- *দুর্গেশনন্দিনী* তখনো রচিত হয় নি, শুধু তাঁর ক্রেডিটে তখন একখানি ক্ষুদ্র কবিতার বই ললিতা।[২]

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মধুসূদনের *মেঘনাদবধ* কাব্যের এক মুগ্ধ পাঠক। তিনি আবৃত্তি করলে পাশে লোক দাঁড়িয়ে যেত। নতুন ছন্দ অমিত্রাক্ষর তাঁকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এতটাই আকৃষ্ট করেছিল যেন একটা ছবি বেশ দেখতে পাই: ললিতার তরুণ কবি বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের কাব্যখানি হাতে নিয়ে উচ্চকণ্ঠে তা থেকে পুলকিত বিস্ময়ে আবৃত্তি করে চলেছেন-

'চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প-মুখে

* Aa¨cK, evsjv wefvM, ivRkvnx K‡jR, ivRkvnx

কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাদিনু, সুভগে,...
অভাগীর আর্তনাদ; প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী?
ফাঁফর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্গন, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী, ছড়াইনু পথে;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি; রক্ষোবধূ,
আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।' [৩]

বঙ্কিমচন্দ্র আবৃত্তি করে চলেছেন, আর সকলে তাঁকে ঘিরে অবাক-কৌতূহলে শুনছে- নতুন ছন্দ, নতুন বাণী, নতুন উপস্থাপন। তখন কি কেউ ভেবেছিল সীতার এই কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা, কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী ক'বছর পরেই *কপালকুণ্ডলা'র* সর্বাঙ্গ জুড়ে উপন্যাসে শোভা পাবে।[৪]

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের চার খণ্ডের মোট একত্রিশ পরিচ্ছেদ। প্রতিটি পরিচ্ছেদই শুরু হয়েছে কোন শ্রেষ্ঠ রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। এই উদ্ধৃতি সংগৃহীত হয়েছে ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য থেকে। বিদ্যাপতির একটি, দীনবন্ধু মিত্রের একটি, মধুসূদনের ছয়টি। মধুসূদন থেকে ছয়টি উদ্ধৃতির মধ্যে *মেঘনাদবধ* কাব্য থেকে তিনটি, *বীরাঙ্গনা* থেকে দুটি ও *ব্রজাঙ্গনা* থেকে একটি। *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের চার বছর আগে বের হয় *মেঘনাবধ* ও *ব্রজাঙ্গনা*; আর তিন বছর আগে বের হয় *বীরাঙ্গনা* কাব্য। এত সাম্প্রতিক লেখাও বঙ্কিমচন্দ্র গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন তা বোঝা যায়। কাব্যের অভিনব শৈলী ছাড়াও সেই কাব্যের মূলবাণী- বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেছিল। মধুসূদনের *ব্রজাঙ্গনা*, *বীরাঙ্গনা*- বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর বেশ কয়েকটি নায়িকা-নির্মাণে প্রভাবিত করে থাকবে। কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিমচন্দ্র তো এক প্রকার তাঁর স্বীকৃতিই জানিয়ে গেছেন।[৫]

*কপাঙ্কুকণ্ডলা'*র চতুর্থ খণ্ডের 'শয়নাগারে' শীর্ষক প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র *ব্রজাঙ্গনা'*র 'সারিকা'র তেরো সংখ্যক কবিতার একটি চরণ উদ্ধৃত করেছেন। 'রাধিকার বেড়ি ভাঙ্গ- এ মন মিনতি।' এটি কবিতার চতুর্থ স্তবক থেকে নেয়া। তৃতীয় স্তবকে রাধা বলেছে-' রাধিকারে বেঁধোনা লো সংসার পিঞ্জরে'। ষষ্ঠ স্তবকে রাধা বলে-'ভাল যে বাসে স্বজনি, কি কাজ তাহার রে- কুল মান ধনে? [৬]

*ব্রজাঙ্গনা'*র শ্রীরাধার ভাবনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের *কপালকুণ্ডলা'*র ভাবনায় মূলগত কোন প্রভেদ নেই। ব্রজের অঙ্গনা শ্রীরাধাকে মধুসূদন 'বঙ্গাঙ্গনা' রূপেই দেখতে চেয়েছেন।[৭] কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার ভালবাসার দুর্নিবার আবেগ এবং আকুলতাই রাধার জীবনের বড় দিক। তাঁর এই উচ্ছ্বসিত ঐকান্তিক সমর্পিত প্রেম তাকে মনে প্রাণে বাধাবন্ধনহীন করে তুলেছে। প্রেমের এই অনুভূতিই পাঠকের কাছে সবচেয়ে বড় সত্য। মধুসূদন তা বুঝেছিলেন।

মধ্যরাত্রে নির্জন সমুদ্রসৈকতে নবকুমারের প্রাণরক্ষা করে, আবার অন্য এক মধ্যরাত্রে ননদ শ্যামাসুন্দরীর জন্য যখন ঔষধ সংগ্রহে ঘরের বইরে পা দেয় তখনই এই নীচতা, কুৎসিত

সংস্কার, এই অবমাননা ও অসম্মান কপালকুণ্ডলার মত রমণীর পক্ষে সমর্থন বা সহ্য করা সম্ভব নয়। মধুসূদনের রাধা বলে- 'রাধিকার বেড়ি ভাঙ্গ- এ মন মিনতি'। [৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকা বলে- 'যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।'

আমরা এখন বিশেষভাবে অনুভব করি- বঙ্কিমচন্দ্রকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে হলে মধুসূদনকে পাশে রাখতেই হবে। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের লেখা তন্নতন্ন করে পড়েছিলেন।[৯]

মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়েছিলেন কীনা, তা জানা যায় না। অথচ *দুর্গেশনন্দিনী*-বঙ্গদর্শনের প্রকাশকালে মধুসূদন জীবিত ছিলেন। সুতরাং না পড়ার কোন কারণ নেই। এই দুইজনের সাক্ষাৎ-সংযোগ না হওয়া ইতিহাসের পক্ষে দুর্ভাগ্যের। ১৮৬৬ তে মধুসূদনের যে চতুর্দশপদী কবিতাবলী প্রকাশিত হয়, তাতে 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' শিরোনামে একটি কবিতা আছে। গুপ্ত কবির তিরোধানের সাত বছর পরেও তাঁর স্মৃতিরক্ষায় কোনো উদ্যোগ ও ব্যবস্থা না দেখে মধুসূদন বিষণ্ন চিত্তে লোকান্তরিত কবিকে উদ্দেশ্যে করে লেখেন,

নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভশ্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ- শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে?[১০]

এই বান্ধবের দল বলতে বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুদের কথা বলতে চেয়েছেন- তা সবাই মনে করেন।

মধুসূদনের জীবিতকালেই ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা করেন The Calcutta Review পত্রে Bengali Literature শীর্ষক একটি দীর্ঘ ইংরেজি প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধ বঙ্কিম রচনাবলীতে সংকলিত। এখানে নাট্যকার মধুসূদন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে।

বঙ্গদর্শনে প্রথম বছরের শেষ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *কিঞ্চিৎ জলোযোগ* বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠ প্রহসনরূপে মধুসূদনের একেই কি বলে *সভ্যতা*'র উল্লেখ করেন। ১২৮০ বৈশাখ, বঙ্গদর্শনে নবীনচন্দ্র সেনের *অবকাশরঞ্জিনী* কাব্যগ্রন্থের আলোচনায় একত্রে টেনে নিয়ে এসেছেন মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রকে। বঙ্কিম নানা প্রসঙ্গে বারেবারেই মধুসূদনকে আধুনিক বঙ্গের শ্রেষ্ঠ যশস্বী কবি বলে উল্লেখ করেছেন।

হেমচন্দ্রের *বৃত্রসংহার* প্রকাশের তিন মাস পর নবীনচন্দ্রের *পলাশির যুদ্ধ* প্রকাশিত হয় (১২৮২)এপ্রিল ১৮৭৫। ১২৮২ কার্তিক বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা লিখেছেন,

> মেঘনাদবধ বা বৃত্রসংহারের সহিত এই কাব্যের তুলনা করিতে চেষ্টা পাইলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়। ওই কাব্যদ্বয়ের ঘটনা সকল কাল্পনিক, অতি প্রাচীনকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া কল্পিত এবং সুরাসুর, রাক্ষস বা অমানুষিক শক্তিধর মনুষ্যগণ কর্তৃক সম্পাদিত; সুতরাং কবি সে ক্ষেত্রে যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া, আপনার অভিলাষ মত সৃষ্টি করিতে পারেন। পলাশির যুদ্ধের ঘটনা সকল ঐতিহাসিক, আধুনিক এবং আমাদিগের মত

> সামান্য মনুষ্য-কর্তৃক সম্পাদিত। সুতরাং কবি এস্থলে শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ, আকাশে উঠিয়া গান করিতে পারেন না। অতএব কাব্যের বিষয় নির্বাচন সম্বন্ধে নবীনবাবুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে পারি না।[১১]

মধুসূদন নিজেও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে *মেঘনাদবধ* কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ লেখার আমন্ত্রণ জানান। ৪ জুন ১৮৬২ বন্ধু রাজনারায়ণকে মধুসূদন লেখেন ÔMeghanad is going through a second edition with notes, and a real B.A has written a long critical preface.[12]

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ই.অ পাশ করেন দ্বিতীয় বিভাগে ৭ নম্বর গ্রেস পেয়ে। পরের বছর ১৮৫৯-এ হেমচন্দ্র সরাসরি আপন যোগ্যতায় ই.অ পাশ করেন প্রথম শ্রেণিতে। অন্যদিকে মুখবন্ধের লেখককে মধুসূদন এভাবেই সম্মানিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আপন যোগ্যতায় হলেন ÔA real poet.'[13]

বঙ্কিমচন্দ্র সারা জীবন মধুসূদনকে যে সম্মান জানিয়েছেন তা ঈর্ষণীয়। অতুল প্রসাদ তাঁর কবিতায় বিদ্যাপতি থেকে শুরু করে নবীনচন্দ্রে এসে শেষ করেন, আর বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহের ভূমিকায় নবীনচন্দ্রের পরে আধুনিক কালের আরও একজন কবির নামোল্লেখ করে যান। শিক্ষিত বাঙালির কবি রূপে বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে পরপর চারজন কবির নাম-নির্দেশ করেছেন। সেই কবিচতুষ্টয় হলো মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ। আর হেমচন্দ্রের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যত অনুকূলতাই থাক, বাংলা কাব্যাকাশে মধুসূদনের পরে যে উজ্জ্বল নক্ষত্র রবীন্দ্রনাথ- তা তিনি জানিয়ে গিয়েছিলেন নিজের গলার মালাখানি সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবির গলায় পরিয়ে দিয়ে।[১৪]

রবীন্দ্রনাথ: মধুসূদন প্রসঙ্গে ঠাকুরবাড়ির শ্রেষ্ঠ রত্ন রবীন্দ্রনাথের কথায় আসা যেতে পারে এবার। রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছিল বাইশ বছর বয়সে এবং তিনি নিজের বিয়ের কৌতুককর বিচিত্র নিমন্ত্রণপত্র[১৫] স্বহস্তে লিখে প্রিয়নাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ প্রিয়জনদের পাঠিয়েছিলেন, সেখানে মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ' কবিতার প্রিয় চরণের অংশ: 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়' এবং পাশে স্বহস্তে মন্তব্য লিখেছিলেন 'আমার motto নহে'। রবীন্দ্রনাথের বিয়ের ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরা বুঝবেন মন্তব্যটির তাৎপর্য।

'আত্মবিলাপ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী; প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে *তত্ত্ববোধিনী* (আশ্বিন সংখ্যা পৃ. ৯৬-৯৭) পত্রিকায়। কবি হিসেবে ঠাকুরবাড়িতে মধুসূদনের যে বিশেষ সমাদর ছিল তা 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' পাঠেই জানা যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করে মধুসূদনের কবি প্রতিভার যে উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠি থেকে তা জানা যায়। মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *মেঘদূত* যখন প্রকাশিত হয় (১৮৬০) মধুসূদনের সাহিত্যচর্চা তখন শুরু হয়ে গেছে। এর দু'বছর আগে বাংলায় নাটক লেখা শুরু করে দিলেও কাব্য রচনায় তখনও তেমনভাবে মনোনিবেশ করেন নি। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে প্রকাশিত হয় 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। এদিক থেকে মনে হয় সম্পূর্ণভাবে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় মগ্ন হওয়ার পিছনে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' পরোক্ষে হয়তো প্রেরণা জুগিয়েছে।[১৬]

আবার বলতে গেলে জোড়াসাঁকো নাট্যশালার সূত্রপাত (১৮৬৫) মধুসূদনের নাটক দিয়েই। সারদাপ্রসাদ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ প্রমুখের চেষ্টায় ঠাকুরবাড়িতে থিয়েটার শুরু হলে অভিনয়ের জন্য প্রথমেই বেছে নেওয়া হয় 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা'কে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই দুটি নাটকেই অভিনয় করেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যেমন 'সংস্কৃত মুগ্ধবোধ'[১৭] ব্যাকরণ পাঠের অভিজ্ঞতা প্রীতিকর ছিল না তেমনি রবীন্দ্রনাথও ব্যাকরণ ও শব্দার্থ শেখানোর জন্য মেঘনাদবধ কাব্যকে ব্যবহার করা নীরস গুরুভারতুল্য মনে করতেন। সেই নীলকমল পণ্ডিতের কাছে পড়ার ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন,

> মেঘনাদবধ কাব্যটি আমাদের পক্ষে আরামের জিনিস ছিল না। যে জিনিসটা পাতে পড়িলে উপাদেয় সেইটাই মাথায় পড়িলে গুরুভার হইয়া উঠিতে পারে। ভাষা শিখাইবার জন্য ভাল কাব্য পড়াইলে তরবারি দিয়া ক্ষৌরি করাইবার মতো হয়–তরবারির তো অমর্যাদা হয়ই, গণ্ডদেশেরও বড়ো দুর্গতি ঘটে। কাব্য জিনিসটাকে রসের দিক হইতে পুরোপুরি কাব্য হিসাবেই পড়ানো উচিত, তাহার দ্বারা ফাঁকি দিয়া অভিধান, ব্যাকরণের কাজ চালাইয়া লওয়া কখনোই সরস্বতীর তুষ্টিকর নহে।[১৮]

মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশের (১৮৬১) পর থেকেই সেই যে বাঙালি ছাত্রদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছিল প্রায় একশো পঞ্চাশ বছর পরে আজও রয়ে গেছে। কাব্যটি অল্পবয়সী ছাত্রদের কেমনভাবে পড়ানো উচিত, আপন জীবনের অভিজ্ঞতায় সে সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতিতে' তিনি লিখেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে তা প্রয়োগ করেছিলেন কিনা স্বাভাবিকভাবে তা জানতে কৌতূহল জাগে আমাদের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের *মেঘনাদবধ কাব্য* পড়াচ্ছেন এমন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে উক্ত কাব্যের প্রশ্নকর্তা হিসাবে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথকে চিনে নেওয়া যায়। অন্তত নীলকমল পণ্ডিতের মতো নিষ্ঠুর হৃদয় ছিলেন না তিনি।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে The National Council of Education প্রতিষ্ঠা হলে Fifth ও Seventh Standard Examination এর ভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্নকর্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। Fifth Standard এর দ্বিতীয় পত্রের প্রথম প্রশ্নটি ছিল মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ থেকে: পঞ্চবটী বনের বর্ণনাংশ উদ্ধৃত করে প্রশ্ন ছিল, 'গোদাবরী তীরে স্থিত রাম ও সীতার কুটীর এমনভাবে বর্ণনা কর, যেন তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছ;....কুটীরের সম্মুখবর্তী তটভাগ কিরূপ, তাহার সমীপবর্তী বনে কি কি গাছ কিরূপে অবস্থিত, কুটীরের মধ্যে কোথায় কি আছে তাহা প্রত্যক্ষবৎ লিখ।'[১৯]

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের Seventh Standard এর প্রশ্নে প্রথম সর্গের দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন ছিল, 'উল্লিখিত কাব্যাংশকে গদ্য কর। যতদূর সম্ভব সংস্কৃত শব্দ পরিত্যাগ করিয়া ভাষা সরল করিতে হইবে।'[২০] এছাড়াও একালের পক্ষে আশ্চর্য একটি নির্দেশ দিয়েছেন, 'গ্রন্থ দেখিয়া লিখিতে হইবে।'

মধুসূদনের কাব্য অবলম্বনে পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গভাষা থেকে সেখানে প্রশ্ন ছিল, 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি ল্যাটিন গ্রীক ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সাহিত্যরচনার প্রথম সাধনা হয় ইংরেজি ভাষায়। এই চতুর্দশপদী বাংলা কবিতায় তাঁর বলবার বিষয়টা কী?'[২১]

অল্প বয়সে *মেঘনাদবধ কাব্য* পাঠের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের কাছে যে মোটেই প্রীতিকর ছিল না 'ছেলেবেলা' গ্রন্থেও তা বলে গেছেন। কেউ কেউ মনে করেন বালক বয়সে 'মেঘনাধবধ কাব্য' পাঠের তিক্ত অভিজ্ঞতাতেই 'ভারতী' পত্রিকায় দু'দুবার কাব্যটির নির্মম সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[২৩] পরিণত বয়সে 'জীবনস্মৃতিতে তাঁর স্বীকারোক্তি ছিল এইরকম। '...কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম।'[২৪]

মোটামুটি ১২৯০ বঙ্গাব্দ থেকে মধুসূদনের কবি প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে খণ্ড কবিতায়, চতুর্দশপদী ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিষয়ে। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভিত্তি ছিল মিশ্রবৃত্তরীতি বা তানপ্রধান ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ উত্তর সাধকের ন্যায় দলবৃত্তরীতি বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দে তাকে প্রয়োগ করে বাংলা ছন্দকে করে তুলেছেন ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

১৩১৪ বঙ্গাব্দে 'সাহিত্য সৃষ্টি' প্রবন্ধে 'মেঘনাদবধ কাব্যের' মূল্যায়নে তিনি বলেছেন, 'তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ডলীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। ...তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।[২৫] পরিণত বয়সে পুনর্মূল্যায়ন করতে যেয়ে আরও বলেছেন, '...মেধনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য।'[২৬]

মধুসূদন অথবা তাঁর কাব্য প্রসঙ্গ আছে এমন কিছু রবীন্দ্রনাথের লেখার অসম্পূর্ণ তালিকা উল্লেখ করা যেতে পারে-

১. ছেলে ভুলানো ছড়া (১৩০১)
২. ব্রতধারণ (১৩১২)
৩. বাংলা ছন্দ (১৩২১)
৪. ঘরে বাইরে (১৩২২)
৫. ভাষার কথা (১৩২৩)
৬. ছন্দের অর্থ (১৩২৪)
৭. প্রতিশব্দ-৪ (১৩২৬)
৮. সুবোধ সান্যালকে লেখা পত্র (১৩২৬)
৯. সাহিত্য সম্মিলন (১৩৩৩)
১০. সাহিত্যরূপ (১৩৩৫)
১১. পথ ও পথের প্রান্তে (১৩৩৬)
১২. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে পত্র (১৯৩০)
১৩. ছন্দের হসন্ত হলন্ত (১৩৩৮)
১৪. ছন্দ বিচার (১৩৩৯)
১৫. ছন্দের প্রকৃতি (১৩৪১)
১৬. ভাষার খেয়াল (১৩৪২)
১৭. কাব্য ও ছন্দ (১৩৪৩)
১৮. ছাত্র সম্ভাষণ (১৩৪৩)
১৯. বাংলা ভাষা পরিচয় (১৩৪৫)
২০. দিলীপ কুমার রায়কে লেখা পত্র।

মধুসূদনের যে দুটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় ছিল তা হল 'আত্মবিলাপ' ও 'বঙ্গভূমির প্রতি।' কবিতা দু'টি তার মুখস্থ ছিল তো বটেই, নানা প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিও দিয়েছেন এর থেকে। একেবারে প্রথম জীবনে লেখা তাঁর কবিতায় মধুসূদনের অল্পস্বল্প প্রভাবও সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না।[২৭]

মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের সীতা কাহিনীর লিরিক অর্থাৎ ভাবের প্রাধান্যও তাকে আকর্ষণ করত। বিশ্বভারতী ভবনে রক্ষিত ৭৭ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি থেকে চতুর্থ সর্গের কিছুটা অনুবাদ এবং দুটি চতুর্দশপদী 'পরিচয়' ও 'কবিবর আলফ্রেড টেনিসন' এর অনূদিত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন শ্রীঅনাথনাথ দাস ও প্রশান্তকুমার পাল। অনুবাদগুলো **১৯১৫** খ্রিস্টাব্দের।[২৮]

From MADHUSUDAN DATTA
Like a pair of doves, nestling
in the leafy seclusion of an
ancient tree, the lord of the
forest, We dwelt in the depth
of the Panchabati grove,
whose peaceful solitude was
like a shadow of paradise
thrown upon the earth,
Lakshman, full of watchful
wisdom, and ready service,
gathered fruits & flowers from
the everrenewing stores of the forest.

ফরাসি সুন্দরী রমণীর উদ্দেশ্যে নিজের পরিচয় দিতে যেয়ে মধুসূদনের ভারতবর্ষের নিসর্গ প্রকৃতির চমৎকার বর্ণনা আছে 'পরিচয়' কবিতায়। এই বর্ণনা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথকেও আকৃষ্ট করেছিল অনুবাদ করতে। অপরপক্ষে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত কবি টেনিসনের সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় হয়েছিল। মধুসূদন 'টেনিসনের' প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তাঁর কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ সেই কবিতা অনুবাদ করে দুই কবিকেই অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আর জীবনের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হয়ে 'বাংলা কাব্য পরিচয়'(১৩৪৫) সংকলনকালে মধুসূদনের স্থানটি যথার্থভাবেই নির্ধারণ করে গেছেন তাঁর ছয়টি কবিতাকে স্থান দিয়ে। আর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের প্রথম দ্বার উন্মোচনকারী মাইকেল মধুসূদন দত্ত।'[২৯]

হিন্দি সাহিত্যে মধুসূদনঃ মধুসূদনের অনুসরণে অমিত্রাক্ষর বা অমিল প্রবহমান পয়ার ছন্দের হিন্দি রূপদানের সর্বপ্রথম প্রয়াসী হয়েছিলেন 'অম্বিকা দত্ত ব্যাসই'। তাঁর কাব্য 'কংসবধ'। বর্তমানে কাব্যটি দুষ্প্রাপ্য।[৩০] শ্রীধর পাঠক সে যুগের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবি। বাংলা অমিত্রাক্ষর বা হিন্দি 'অতুকান্ত' ভাব অনুসারী যতি বিন্যাস এবং গদ্যের মতো দীর্ঘ বাক্যের বিন্যাসে সফলতা লাভ করেন। তাঁর কাব্য 'সান্ধ্য অটন' থেকে হিন্দি মাত্রাবৃত্ত ২০ মাত্রার অমিল প্রবহমান এর কয়েকটি পঙক্তি:

সদ্য উৎফুল-অরবিন্দ নভনীল সুবি–
শাল নভবক্ষ পর জা রহা থা চষা।
দিব্য দিগ্ নারি কী গোদ কা লালসা
থা প্রখর ভূখ কী বাসনা সে প্রহিত!

বিশ শতকের পূর্বে হিন্দি কবিতা লেখা হত প্রধানত ব্রজভাষা, অবধি প্রভৃতি ভাষায়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে 'সরস্বতী' পত্রিকা প্রকাশের পর হিন্দির উন্নতির জন্য তরুণ সাহিত্যিকরা 'সাহিত্য সংঘ' গড়ে তোলেন। তাঁরা ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট সংখ্যায় মাইকেল মধুসূদনের জীবন ও কৃতিত্ব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করেন। এইভাবে হিন্দি জগতে মধুসূদনের প্রতি অনুরাগ ও চর্চা ক্রমে বাড়তে থাকে। মহাবীর প্রসাদের প্রেরণা ও উৎসাহ দানে হিন্দি 'অতুকান্ত' বা অমিত্রাক্ষর রচনার নতুন উদ্যম দেখা দিল।[৩১] লোচন প্রসাদ পাণ্ডেয় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে 'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্যের অংশবিশেষ অনুবাদ করেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত গিরিধর শর্মা তাঁর 'সতী–সাবিত্রী' কাব্যের একটি সর্গ মাত্রাবৃত্ত অমিত্রাক্ষরে রচনা করেন। কবি অযোধ্যা সিংহ উপাধ্যায় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন 'ব্রজাঙ্গনা–বিলাপ', পরে কাব্যটির নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'প্রিয় প্রবাস'।

মধুসূদনের অভিনব কাব্যকৃতি এবং ছন্দ হিন্দি জগতে সর্বাধিক আকৃষ্ট, মুগ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করে কবি মৈথিলী শারণ গুপ্তকে। তিনি খুব ভাল বাংলা জানতেন ও সাহিত্যের অনুরাগী এবং সশ্রদ্ধ পাঠক ছিলেন। হিন্দি কাব্যরসিক পাঠক সমাজকে মধুসূদনের কাব্যরস আস্বাদনের সুযোগ করে দেওয়ার অভিপ্রায়ে 'মধুপ' ছন্দনামের আশ্রয়ে ব্রজাঙ্গনা, মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা কাব্য তিনটি হিন্দিতে অনুবাদ করেন ১৯২৩ ও ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে।[৩২]

মৈথিলী শারণ যথাসম্ভব মধুসূদনেরই আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা করেন। বাংলা অমিত্রাক্ষরে ৮+৬=১৪ মাত্রা আর 'মধুপে'র অমিত্রাক্ষরে ৮+৭=১৫ মাত্রা। অনুবাদগুলি হিন্দি সাহিত্যে সাদরে গৃহীত হয় এবং কয়েকটি করে সংস্করণ হয়। মধুসূদনের কাব্য অনুবাদের সফলতায় উৎসাহিত হয়ে তিনি নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'(১৯১৫) এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' (১৯৬৪) কাব্যও হিন্দিতে অনুবাদ করেন। মধুসূদনের প্রতিভা, কাব্য ও ছন্দের প্রভাবে হিন্দি জগতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। যার পরিচয় আধুনিক হিন্দি কাব্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। মধুসূদনের সৃজনশীল প্রতিভার দান কাব্য ও ছন্দের অভিনবত্ব যেমন হিন্দি সাহিত্য জগতকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছে তাঁর ভারতীয় সাহিত্যে অভিনব প্রবর্তিত সনেট বা চতুর্দশপদী এবং বিচিত্র স্তবক সজ্জার রূপ।

কবি লোচন প্রসাদের মধুসূদনের অভিনব সাহিত্য আঙ্গিকের প্রতি সচেতনতার কথা আমরা জানি। তিনি মধুসূদনের অনুসরণে হিন্দিতে চতুর্দশপদী নাম দিয়ে প্রথম দুটি সনেট রচনা করেন ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে–বাল্যস্মৃতি এবং শ্মশান নামে। কবি হরিঔধ হিন্দিতে সনেট রচনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি হিন্দি ভাষাকে নিত্য নতুন অলংকারে সুসজ্জিত করতে আগ্রহী। তা হলে সনেট লিখে তার ভাণ্ডারের শোভা বৃদ্ধি করব না কেন ?'[৩৩]

এভাবে মধুসূদন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীতে সনেট রচনা করেন মৈথিলী শারণ, জয়শংকর প্রসাদ, সুমিত্রানন্দন পন্ত। হিন্দি সনেটে প্রবহমানতা আছে। মিল ও বন্ধ রচনায় হিন্দি কবিরা স্বাধীনতা দেখিয়েছেন। সুতরাং কবির স্বকীয়তার ছাপ সুস্পষ্ট। এভাবে মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতা হিন্দি কবিতা জগতে নব–সংযোজন এবং উৎকর্ষবিধানের দ্বার খুলে দেয়। ইংরেজি সনেট রচনার সব নিয়মনীতি যেমন মধুসূদন মানেন নি, মধুসূদন কোন কোন ক্ষেত্রে বাঙালির মন ও বাংলা ভাষার প্রকৃতি সুলভ পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, হিন্দি কবিরাও হিন্দির প্রকৃতি অনুসারে চতুর্দশপদী রচনায় মধুসূদনকে পুরোপুরি মেনে চলতে

পারেন নি। সে কারণেই মধুসূদনের সনেট বাংলা চতুর্দশপদী এবং হিন্দি সনেটকারদের রচনা হিন্দি চতুর্দশপদী নামে অভিহিত।

মধুসূদন দত্ত নাটক এবং প্রহসন রচনা করে বাংলার নাট্য সাহিত্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন, তার ঢেউ যথাসময়ে হিন্দি নাট্যসাহিত্য রসিকদের মনেও গিয়ে লাগে। ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র প্রথম এগিয়ে আসেন অনুবাদে। এই ভারতেন্দুর প্রবর্তনায় বালকৃষ্ণ ভট্ট (১৮৪৪–১৯১৪) মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' ও 'শর্মিষ্ঠা' নাটক হিন্দিতে অনুবাদ করেন। তিনি বেশ কয়েকটি প্রহসনও রচনা করেন। তাতে মধুসূদনের প্রহসনের অনুপ্রেরণা এবং প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়।[৩৪] ভারতেন্দুর দ্বারাই অনুপ্রাণিত অপর একজন সাহিত্য সেবী রামকৃষ্ণ বর্মা ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'কৃষ্ণকুমারী' এবং 'পদ্মাবতী' নাটক দুটির হিন্দি অনুবাদ করেন।

এই সময় পণ্ডিত ব্রজনাথ 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুবাদ করেন, 'ক্যা ইসী কো সভ্যতা কহতে হৈঁ' নামে, আর রাধাচরণ গোস্বামী (১৮৫৮–১৯২৫) অনুবাদ করেন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটি 'বুঢ়ে মুঁহ মুঁহা সে' নামে। এই সময় হিন্দিতে প্রহসন রচনার ধারাটি প্রবল হয়ে ওঠে। সুতরাং হিন্দি নাট্যজগতকেও মধুসূদন অনুপ্রাণিত এবং সমৃদ্ধ করেছেন– তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কৃষ্ণকুমারী কেবল বাংলারই প্রথম ঐতিহাসিক ট্রাজেডি তা নয়, সমগ্র ভারতীয় ভাষারই।

হিন্দি কাব্য, কবিতা, ছন্দ, নাটক এবং প্রহসন -এসবের আধুনিকীকরণের মূলে মধুসূদনের যুগান্তকারী প্রতিভার দান বিবিধ ও বিচিত্ররূপে পরিলক্ষিত হয়। কেবল তাই নয় সাহিত্যে ও জীবনে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা সঞ্চারিত হয়েছে হিন্দি জগতে। এই ক্রম শুরু হয় উনিশ শতকের শেষ পাদে 'ভারতেন্দু'র সময়ে এবং তা আজও অক্ষুণ্ন রয়েছে কোন কোন রূপে। অবশ্য মূল রূপের বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটে যাবার ফলে –তা চট করে চেনা কঠিন। একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিলেই তা বোঝা যাবে। আজ বাংলায় এবং ভারতের অন্যান্য ভাষার সাহিত্যে যাকে মুক্তক বলা হয়– তা মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর বা অমিল প্রবহমান পয়ারেরই বিবর্তিত রূপ। হিন্দি কাব্যের জগতে যাকে 'কেচুয়া' বা 'রবড়' বা 'মুক্তছন্দ' বলা হয়– মুক্তকই এবং 'অতুকান্ত' বা অমিত্রাক্ষরেরই বিবর্তনের ফল। অবশ্য এই মুক্তকও আভাসিত হয়েছিল, মধুসূদনের কোন কোন কবিতায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'বিবিধকাব্যে'র ' গদা ও সদা'র রচনাটি বিবেচ্য। অমিত্রাক্ষর এবং মুক্তক যে নাট্য সংলাপ রূপে বাংলায় এবং হিন্দিতে ব্যবহৃত হচ্ছে– তার আভাসও এই 'গদা ও সদা' কবিতাটিতে মেলে।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য: আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে মধুসূদন দত্ত এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। পূর্ব ও পশ্চিমের অনেক প্রাদেশিক ভাষায় তাঁর প্রভাব পড়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন ভাষাতেও তার লক্ষণ অস্পষ্ট নয়। মধুসূদনের কীর্তিকে কবি ও নাট্যকাররা স্বাগত জানিয়েছেন মূলত পথস্রষ্টারূপে। প্রথমত, মধুকবির অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনার দৃষ্টান্ত অনেক ভারতীয় কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে। দ্বিতীয়ত, মেঘনাদবধ কাব্যের মত সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনার অভিনব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন অনেকে। তৃতীয়ত, বীরাঙ্গনা কাব্য ও ব্রজাঙ্গনা কাব্য ভাবে ভাষায় ও দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে এমনই নতুনতর সৃষ্টি যে অন্য ভাষায় তা অনুসরণযোগ্য আদর্শ হয়ে ওঠে। চতুর্থত, পুরাতন বিষয়বস্তু নিয়ে নতুনতর সৃষ্টির দৃষ্টান্ত স্থাপনে মধুসূদন নতুন পথের দিশারী। পঞ্চমত, সীমিত সাফল্য সত্ত্বেও মধুসূদনের

নাটক, বিশেষত প্রহসন রচনার দৃষ্টান্ত পরবর্তী নাট্যকারদের প্রেরণা দান করেছে। মোটকথা, একজন আধুনিক কবি ও নাট্যকাররূপে মধুসূদনের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা রূপেই চিহ্নিত।
মধুসূদনের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত ভারতীয় লেখকদের একটি তালিকা দেখলে বিষয়টি বোঝা যায়।[৩৫]

অন্যান্য ভারতীয় লেখক	ভাষা	সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্র
মাধবানুজ	মারাঠি	কাব্য
রেহালকর	মারাঠি	কাব্য
দোলরাম পাণ্ড	গুজরাতি	কাব্য
ভোলানাথ বাস	অসমীয়া	কাব্য
রমাকান্ত চৌধুরী	অসমীয়া	কাব্য
রাধানাথ রায়	ওড়িয়া	কাব্য
গোকুল চন্দ্র	হিন্দি	নাটক
ব্রজনাথ	হিন্দি	নাটক
বাপু নরসিংহ ভাবে	মারাঠি	নাটক
বালকৃষ্ণ ভট্ট	হিন্দি	নাটক
রামকৃষ্ণ বর্মা	হিন্দি	নাটক

বলাবাহুল্য এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়। মধুসূদনের কাব্য ও নাটকের ভারতীয় অনুবাদকের নামও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। তথাপি অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় মধুসূদনের প্রভাব কেমন পড়েছিল তার একটা পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

মারাঠি সাহিত্যে মধুসূদনের প্রভাব দুর্লক্ষ নয়। মাধবানুজ ও তাঁর শিষ্য একনাথ পাণ্ডুরঙ রেহালকরই বিশিষ্ট। রেহালকর 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য অনুসরণে লেখেন 'বিরহিণী রাধা'। কাব্যটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। মাধবানুজের প্রকৃত নাম কাশীনাথ হরি মোদক। পেশায় ডাক্তার। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ থাকাকালীন বাংলা ভাষা শেখেন ও কবি মধুসূদনের কাব্য রসাস্বাদনে মেতে ওঠেন। তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের কিছু অংশ অনুবাদ করেন। 'সোমের প্রতি তারা' অবলম্বনে লেখেন 'তারেচী প্রণয় পত্রিকা'। 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' অবলম্বনে লেখেন 'শকুন্তলেচী প্রণয় পত্রিকা'। এছাড়া 'প্রেম মাহাত্ম্য', 'সৃষ্টি প্রেম', 'প্রশ্নোত্তর মালা', 'ত্রিবেণী সংগম' প্রভৃতি কবিতা পড়লেই মধুসূদনের প্রভাব অনুভব করা যায়। এই দুই কবিই মধুসূদনের মূল কাব্য পাঠ করে অনুপ্রাণিত হন ও কাব্য রচনায় প্রয়াসী হন তা শুধু মারাঠি নয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ওড়িয়া কাব্যে মধুসূদন দ্বারা প্রভাবিত কবি রাধানাথ রায়ের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করেন 'মহাযাত্রা'। কাব্যের ভাষা, বর্ণনারীতি, ছন্দ নির্মাণ কৌশল মধুসূদকে স্মরণ করায়।

গুজরাতি সাহিত্যে কবি দোলরামের 'ইন্দ্রজিৎবধ' কাব্য (১৮৯০) বিষয়বস্তুবিচারে মধুসূদন দ্বারা প্রভাবিত। তিনিও বীররসে রচনা করতে গিয়ে শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। করুণ রসই একাব্যে প্রধান হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রজিৎ পত্নীর নাম এখানে 'সুলোচনা'। তার আর্তিতে কাব্য শেষ হয়েছে।

অসমীয়া ‘সীতাহরণ’ কাব্যটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কবি ভোলানাথ দাস অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এ কাব্যের নায়ক রাবণ মানবতার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

মধুসূদনের রচনার ক'টি অনুবাদ হয়েছে তা সংখ্যাতত্ত্বের বিষয় হতেই পারে। কিন্তু কবি ও নাট্যকার মধুসূদন ভারতীয় সাহিত্যে কতটা প্রভাব ফেলেছেন তাই প্রধান বিবেচ্য। একথা সহজেই বলা যায় যে মধুসূদনের সাহিত্য উত্তরাধিকারের বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসারিত। কেননা তাঁর নির্মিত পথেই নতুনতর সৃষ্টির দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। তাই মধুসূদন আধুনিক ভারতীয় লেখকদের এক অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। এই ভাবেই তাঁর নাম তাই নিত্য ধ্বনিত যাবতীয় সাহিত্যের প্রান্তে, প্রান্তরে।

কায়কোবাদঃ কায়কোবাদ মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ কবির রচনা দ্বারা প্রভাবিত হন। বিংশ শতাব্দীতে কাব্যের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর রচনা শৈলী তথা আদর্শের কোন পরিবর্তন করেন নি। তিনি বর্তমান রুচি এবং আধুনিক কাব্যের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা না করে বিগত শতকেরই ধারাকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। ‘কায়কোবাদ তাঁর জীবনের প্রায় অর্ধেক কাল বিংশ শতাব্দীতে অতিবাহিত করেছেন, তবুও তিনি মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীরই আদর্শবাহী কবি।’[৩৬]

আধুনিক বাংলা কাব্যক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে কায়কোবাদের স্থান মধুসূদন পরম্পরার একজন বলে চিহ্নিত। তাঁর মহাকাব্য মহাশ্মশান প্রকাশ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আধুনিক বাংলা কাহিনীকাব্য ধারায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিচারের ক্ষেত্রে এই কাব্যটি মূল্যবান। মধুসূদন ছাড়া প্রায় সব কাহিনীকাব্যকারগণ জাতি বলতে হিন্দু জাতির কথাই ভেবেছেন এবং সমগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। কায়কোবাদ তা করেন নি। হিন্দু মুসলমানদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ‘পানিপথের যুদ্ধে’র ঘটনাকে আশ্রয় করে দুই বীর জাতির বীরত্বের কাহিনী সমান সহানুভূতি ও বেদনাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ‘আমার এই কাব্যে আমি কোন সম্প্রদায়ের লোককেই আক্রমণ করি নাই। আমি এই চিত্র নিরপেক্ষভাবেই অঙ্কিত করিয়াছি। মুসলমানগণও বীর পুরুষ, হিন্দুগণও বীর পুরুষ।’[৩৭] পরিশেষে তিনি বলেছেন, ‘এই যুদ্ধে কেউ জয়ী হয় নি’। এটা নিঃসন্দেহে আধুনিক চিন্তা।

মহাশ্মশান অসাম্প্রদায়িক চেতনাজাত, তা বলাই বাহুল্য। এটি জাতীয় গৌরবের মহাশ্মশান। কায়কোবাদের জাতিগত ধারণা যে সম্প্রদায়গত নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় উত্তম পুরুষে রচিত কবির বর্ণনায়–

‘এই সেই স্থান? সেই ভীষণ মহাশ্মাশান?
যেই স্থানে লক্ষ লক্ষ ভারত সন্তান
দিয়া ছিল ধর্মযুদ্ধে আপনার প্রাণ?
যেই স্থানে অগণিত হিন্দু মুসলমান
নিদ্রিত জনমের মতো।[৩৮]

লক্ষ লক্ষ ভারত সন্তান বলতে তিনি হিন্দু মুসলমানকেই বুঝিয়েছেন। এই জন্য তিনি জাতীয় গৌরবের ‘মহাশ্মশান’ বলেছেন। মহাশ্মশানের দ্বিতীয় খণ্ডের সপ্তম সর্গে কবি যে আবেগে দিল্লীর প্রাচীন গৌরবের বর্ণনা করেছেন ঠিক সেই আবেগে দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ সর্গে রামের অযোধ্যা ও রামায়ণের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। কবি গভীর আবেগের সঙ্গে

রামায়ণের মর্মভেদী দৃশ্যও বর্ণনা করেছেন। আবার দ্বিতীয় খণ্ডের নবম সর্গে আগ্রার অতীত সৌন্দর্য বর্ণনা কালে সম্রাট আকবরের প্রশংসা করেছেন। কেননা তিনি হিন্দু মুসলমানকে 'মিলনের স্নেহের নিগড়ে' বেঁধেছিলেন। সদাশিবকে তিনি হিন্দু বীরত্বের প্রতিভূ বলে কল্পনা করেছেন। পানিপথের যুদ্ধে হিন্দুদের বীরত্বই উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত। ঐতিহাসিক সত্য রক্ষার জন্যই কবি মুসলমানদের জয় দেখিয়েছেন। ইতিহাসের সদাশিব অপেক্ষাও মহাশ্মশানের সদাশিব উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হয়েছে কায়কোবাদে।

মহাশ্মশানের কবি পরধর্মে বিদ্বেষী ছিলেন না। কাব্যে ভক্তি সহকারে গঙ্গাস্তব ও কালীস্তব রচনা করেন। হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলমান তপস্বীকে সমান গুরুত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন। প্রেম কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রেও নারীদের সমান মর্যাদায় চিত্রিত করেছেন। জোহরা, হিরণ, লবঙ্গ, সেলিনা, কৌমুদী সবাই কবির সমান সহানুভূতি ও শ্রদ্ধায় চিত্রিত। প্রেমের জন্য আত্মত্যাগে জোহরা কিংবা সেলিনা যেমন, তেমনি প্রেমের জন্য সকল বঞ্চনাকে মেনে নিয়েও হিরণ বা কৌমদী নারীকূলে ধন্যা। এসব নারী চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনায় তিনি ধর্মীয় ভেদাভেদ সৃষ্টি করেন নি। তাই হিরণের কণ্ঠে শুনতে পাই–

'মুসলমান ম্লেচ্ছ নহে, নহে নীচ জাতি,
অনর্থক গালি কেন দেও তাহাদেরে?[৩৯]

এমনিভাবে সদাশিবও সন্ধির প্রস্তাব করে সুজাউদ্দৌলাকে পত্রে জানিয়েছেন,

আমরা উভয় জাতি হিন্দু মুসলমান
ভারতের প্রিয় পুত্র তুচ্ছ স্বার্থতরে
অন্ধহয়ে, না বুঝিয়া বৃথা রক্ত পাতে
দিন দিন ধ্বংসিতেছি শক্তি আপনার।[৪০]

উদার অসাম্প্রদায়িক নীতি অনুসরণ করার ফলে কায়কোবাদের কাব্য সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারায় কায়কোবাদের আসন বিশিষ্ট রূপে চিহ্নিত।

সহজ সরল প্রাঞ্জল বর্ণনায় তিনি বেশ স্বাচ্ছন্দ্য। তাঁর ভাষায় কোন জটিলতা নেই। অলংকার বাহুল্য তিনি পছন্দ করেন না। মহাশ্মশানের ভূমিকায় একথা স্বীকার করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সার্থক অলঙ্কারও প্রয়োগ করেছেন। তাঁর কাব্যে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রভাব স্পষ্ট। বিশেষ করে কিছু কিছু শব্দ মেঘনাদবধ থেকে বারবার ব্যবহার করেছেন। বীরেন্দ্র পুত্র, নীলাম্বুরাশি, ভীষণ দর্শন, বীরেন্দ্র কেশরী, নন্দিনী, বীর চূড়ামনি, শূলপাণি, বীরবর, নিষ্কোষিলা এসব শব্দ মেঘনাদবধ কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে। এমনি 'লবঙ্গ লতা'র উন্মাদিনী অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি ধুতুরার মালার কথা উল্লেখ করেছেন, যা মধুসূদনের বিখ্যাত উপমার 'ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে'- এই পঙক্তি থেকে নেওয়া হয়েছে। কায়কোবাদের কবিমানস সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের মতটি গ্রহণযোগ্য। 'তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর অদর্শবাহী কবি, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক কাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, অথচ যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাব্যভাবের পরিবর্তন ঘটেনি।'[৪১] কারণ তিনি মধুসূদন ও নবীনচন্দ্রকে আদর্শ হিসেবে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন।

মধুসূদনের প্রভাব ও গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে উনিশ শতকের বাংলা কবিতার প্রেক্ষাপটটি মনে রাখা দরকার। সে সময় রোমান্টিক গীতিকবিতা, আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের কবিতায় দেশাত্মবোধ বা জাতীয় ভাবোদ্দীপনার প্রকাশ ঘটে।[৪২] এই সুর দেখি মদুসূদনের কাব্যেও। এই দেশাত্মবোধের সঙ্গে মিশে আছে রামায়ণ থেকে গৃহীত উপাদান ও তার যুগোচিত ব্যবহার। মধুসূদনের পরবর্তী বাঙালি কবিরা দেশপ্রেমকে প্রচ্ছন্ন রাখেন নি। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, চন্দ্রশেখর, দেবেন্দ্রনাথ, কায়কোবাদ, আরও কিছু কবি কমবেশি মাইকেলী রীতির অনুসরণ করেছেন। কিন্তু গীতিকবিতা ও খণ্ড কবিতার ধারায় শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণীয় – 'আমি নামব মহাকাব্য সংরচনে, ছিল মনে, ঠেকল কখন তোমার কাঁকন কিঙ্কিণীতে, কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে'। কিন্তু সনেট ও খণ্ড কবিতায় তাঁর যে গভীর অনুরাগ, নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতার ছাপ তা হাজার গীতেও ভেসে যায় নি। তাঁর স্বদেশমুখী গৃহকাতর বাঙালি মন, বাংলার নদী, প্রকৃতি, তাঁর ধর্মভাবনা, দেশজ সংস্কৃতি নিয়ে সাজানো শতাধিক চতুর্দশপদীর ডালি বিস্মৃতির জলে বিসর্জিত হয় নি, প্রতিমাবিহীন অন্ধকারে ডুবে যায় নি পরবর্তী বাংলা কবিতার মণ্ডপ। 'সূত্রপাত ঘটেছিল মধুসূদনের হাতে; কালান্তরে বিষয় অর্জন করে নিয়েছে সময় বদলের আধুনিকতা, আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে শব্দজগতে, অনুষঙ্গে, বাকপ্রতিমায়। তবু সনেট থেকে গেছে আজো বাংলা কবিতার অভ্যেসে, অনুশীলনে, চর্চায়। সকলের জন্য নয় এ মাধ্যম, বরং অল্প কয়েকজনের জন্য, যাঁরা বিশ্বাস করেন এ হল মিথকথনের শিল্প, আবেগকে সংহত করার আর্ট, নিজেকে বাঁধা–ছকের আঙ্গিকে প্রকাশ করার সাধনা; যাঁরা বিশ্বাস করেন, এর আপাত কঠিন বন্ধনের মধ্যেই কবির অপার মুক্তি।'[৪৩]

রবীন্দ্রনাথ যখন 'বলাকা' পর্বে এসে কবিতায় ভেঙে দিলেন স্তবক–বন্ধনের প্রথাগত সংস্কার, অস্বীকার করলেন মিশ্রকলাবৃত্তে চোদ্দ বা আঠারো মাত্রার পরিমাপকে, তৈরি হল মিশ্রকলাবৃত্ত মুক্তবন্ধ, তখন তারও পূর্বসূত্র হিসেবে আমাদের মনে পড়বেই মধুসূদনকে। মধুসূদনের হাতে বেজে ওঠা অমিত্রাক্ষরকে 'নির্বীজ ঐশ্বর্যে'র উদাহরণ বলেই মনে করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু শঙ্খ ঘোষ 'প্রথম দরজা' রচনাটিতে স্মরণ করে দিয়েছেন পদ্মাবতী নাটকের সংলাপ থেকেই গড়ে ওঠা গৈরিশ ছন্দের কথা। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিরা গদ্যছন্দ পর্যন্ত এসেছেন কবিতার এবং ছন্দের মুক্তির অন্বেষণে, তার পথ প্রস্তুতি মধুসূদনের হাতেই। সম্ভবত ঠিক এইখানটায় বাংলা কবিতার চিরকালীন অপরিশোধ্য ঋণ পথিকৃৎ শ্রীমধুসূদনের কাছে।

তথ্যসূচি:

১. বঙ্কিচন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬, পৃ.৮৮৩

২. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, হেম-মধু-বঙ্কিম-নবীন, কোরক, বইমেলা ১৪০৬,পৃ. ২৭

৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মেঘনাদবধ কাব্য, ৪র্থ সর্গ.

৪. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ.২৮

৫. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ.২৮

৬. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, তেরো সংখ্যক কবিতা

৭. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ.২৯

৮. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, তেরো সংখ্যক কবিতা

৯. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০
১০. মধুসূদন রচনাবলী, সনেট ও খণ্ড কবিতা, ঈশ্বরগুপ্ত
১১. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩
১২. মধুসূদন পত্রাবলী, কোরক, বই মেলা ১৪০৬, পৃ.৩৪
১৩. মধুসূদন পত্রাবলী, কোরক, বই মেলা ১৪০৬, পৃ.৩৪
১৪. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩
১৫. রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র-৮, সংখ্যা-১২, পৃ. ৮
১৬. বিশ্বনাথ রায়, মাইকেল মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ,কোরক, বইমেলা ১৪০৬,পৃ.১৩
১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, হৈমন্তী অখণ্ড সংকলন, ঢাকা, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১৯৯৭ পৃ. ৪১৫
১৮. জীবনস্মৃতি, ১৯৬২ সংস্করণ, পৃ. ৩১-৩২
১৯. রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, বিশ্বভারতী, ১৯৭৬, পৃ. ৭০
২০. রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, বিশ্বভারতী, ১৯৭৬, পৃ. ৭০২
২১. রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, বিশ্বভারতী, ১৯৭৬, পৃ. ৭১২
২২. বিশ্বনাথ রায়, মাইকেল মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, কোরক, বইমেলা ১৪০৬,পৃ.৮
২৩. বিশ্বনাথ রায়, ভারতী পত্রিকা প্রসঙ্গ, ১২৮৪-১২৮৯
২৪. জীবনস্মৃতি, ১৯৬২, পৃ. ৮৩
২৫. সাহিত্য, ১৯৭৪, পৃ. ১০৯-১১০
২৬. বারিদবরণ ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৮৪
২৭. বিশ্বনাথ রায়, মাইকেল মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, কোরক, বইমেলা ১৪০৬,পৃ.১০
২৮. রবীন্দ্র বীক্ষা, সংকলন-২৯, ২২শ্রাবণ, ১৪০৩, পৃ.১৬-১৭
২৯. বিশ্বনাথ রায়, মাইকেল মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, কোরক, বইমেলা ১৪০৬,পৃ.১১
৩০. রামবহাল তেওয়ারী, হিন্দি সাহিত্যে মধুসূদন, কোরক, বইমেলা ১৪০৬, পৃ.২২২
৩১. পূর্বোক্ত, পৃ.২২৩
৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪
৩৩. রামবহাল তেওয়ারী, হিন্দি সাহিত্যের ইতহাস,১৯৮৯
৩৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ
৩৫. বিপ্লব চক্রবর্তী, মধুসূদন ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য,কোরক, ১৪০৬, পৃ. ২৪৫
৩৬. সৈয়দ আলী আহসান, কায়কোবাদ প্রসঙ্গে
৩৭. কায়কোবাদ, মহাশ্মশান, ভূমিকা অংশ
৩৮. কায়কোবাদ, মহাশ্মশান, দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চম সর্গ
৩৯. কায়কোবাদ, মহাশ্মশান, দ্বিতীয় খণ্ড ২১ সর্গ
৪০. কায়কোবাদ, মহাশ্মশান, তৃতীয় খণ্ড ১ম সর্গ
৪১. সৈয়দ আলী আহসান, কায়কোবাদ প্রসঙ্গে
৪২. বিপব চক্রবর্তী, মধুসূদন ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য, কোরক, ১৪০৬, পৃ. ২৪৭
৪৩. সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, চতুর্দশপদীর তিনি, কোরক, বইমেলা ১৪০৬, পৃ. ৮৭

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারীসত্তার বিকাশ

মোহাঃ ওলিউর রহমান*

সারসংক্ষেপ: বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলো পরিকল্পনায় বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। নারীর ব্যক্তিত্ব, রূপ-লাবণ্য, অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং শক্তির প্রাবল্য তাঁর প্রতিভার স্পর্শে উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যে বিকাশ লাভ করে। *দুর্গেশনন্দিনী'র* আয়েষা এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী। *কপালকুণ্ডলা'র* মতিবিবি আপন ভাগ্য গড়তে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী এবং কপালকুণ্ডলার আত্মসম্ভ্রমবোধ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। *মৃণালিনী'র* মনোরমা একদিকে তেজস্বিনী ও প্রতিভাময়ী অন্যদিকে গম্ভীর ও স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন। *বিষবৃক্ষে'র* সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী এবং হীরার ভূমিকা স্বতন্ত্র। ইন্দিরা চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য–সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও পরিহাস নিপুণ নারী। *যুগলাঙ্গুরীয়* উপন্যাসের হিরন্ময়ী, *চন্দ্রশেখর*-এর দলনী বেগম এবং *রজনী'র* লবঙ্গলতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জ্বল। *কৃষ্ণকান্তের উইল*-এর রোহিনী ভোগবাদী এবং ভ্রমর সতী নারীর দৃষ্টান্ত। *রাজসিংহে'র* চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারী ও জেবউন্নিসার চরিত্র চিত্রণেও উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত। কোমল হৃদয় বাঙালি রমণীও যে প্রয়োজনের সময় পুরুষের মত শক্তিধর হতে পারে *দেবীচৌধুরানী'র* প্রফুল-এবং *আনন্দমঠ*-এর শান্তির মধ্য দিয়ে বঙ্কিম এ সত্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর উপন্যাসে একদিকে যেমন শাশ্বত বঙ্গনারীর অবয়ব নির্মিত হয়েছে, অন্যদিকে তিনি বীরাঙ্গনা নারীর স্বরূপ সন্ধান করেছেন। এই বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের নারী চরিত্র অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্রের সাফল্য অসাধারণ।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগে যে কয়জন সাহিত্যিক বাঙালির সাহিত্যভাবনার মূলে প্রচণ্ড রকম নাড়া দিয়েছিলেন এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যের দ্বার উন্মোচন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। উনিশ শতকের বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে মধ্যবিত্ত যুব-মানসে যে তীব্র মনন কর্ষণ হয়েছিল তারই ফলশ্রুতি অমৃতভাণ্ডার নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের আবির্ভাব। বঙ্কিম এবং মাইকেল বাংলার এই দুই মনীষা বাংলাভাষার কাব্য এবং গদ্যসাহিত্যের অচলায়তন ভেঙ্গে এক নতুন ইমারত তৈরি করেছিলেন। আশ্চর্য রকমভাবে লক্ষ্য করা যায় এই দুই দিকপাল সাহিত্যিক প্রথমে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভার শতদলটিকে বিকশিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অচিরেই তারা উপলব্ধি করেন যে, বাংলা সাহিত্যেই তাঁদের প্রতিভা বিকাশের উত্তম ক্ষেত্র। ১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ আষাঢ়, ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুন, মঙ্গলবার রাত্রি নয়টার সময় বঙ্গদেশে, চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত কাঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন।[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের সময় পিতা- যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মেদিনীপুরের ডেপুটি কালেক্টর। মায়ের নাম দুর্গাদেবী। বঙ্কিমচন্দ্ররা চার ভাই– শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। নন্দরানী নামে তাঁদের এক বোন ছিল। তাঁদের পিতা যাদবচন্দ্রের জীবন ছিল বেশ বৈচিত্র্যে ভরা। ফারসি ও ইংরেজিতে দক্ষতা ছিল তাঁর। নিমকমহলে বড় ভাইয়ের সঙ্গে জীবন-যাপনকালে একবার জীবন বিপন্ন হয় যাদবচন্দ্রের। এক সন্ন্যাসীর কৃপায় তিনি বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করেন। এরপরে যাদবচন্দ্রের জীবনে সন্ন্যাসীর অমোঘ প্রভাব পড়ে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর পিতার প্রভাব ছিল অপরিসীম। পিতার মতো বঙ্কিমচন্দ্রেরও সন্ন্যাসধর্মের অলৌকিকত্বের ওপর নিবিড় আস্থা ছিল।

মেদিনীপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ছয় বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র সেখানকার ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় এফ.টিড্ নামে একজন সাহেব এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ মেধা লক্ষ্য করে ছাত্রের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে টিড সাহেব ঢাকায় বদলি হলে তাঁর স্থানে সিনক্লেয়ার নিযুক্ত হন। তিন-চার বৎসর মেদিনীপুরে পড়াশুনা করার পর কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের পুনরায় প্রত্যাবর্তন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন–

> সেখানে (মেদিনীপুরে) তিন-চারি বৎসর কাটিল। সঞ্জীবচন্দ্র অনায়াসে সর্বোচ্চ শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের মধ্যে স্থান লাভ করিলেন। এইখানে তিনি তখনকার প্রচলিত ঔঁহরড়ৎ ঝপযড়ষধৎংযরঢ় পরীক্ষা দিলে, তাঁহার বিদ্যা অর্জ্জনের পথ সুগম হইত। কিন্তু বিধাতা সেরূপ করিলেন না। পরীক্ষার অল্পকাল পূর্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। দশ বছর আট মাস বয়সে ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কাঁঠালপাড়ার নিকটবর্তী নারায়ণপুর গ্রামের নবকুমার চক্রবর্তীর পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হয়। পত্নীর নাম মোহিনীদেবী। শতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি সাতিশয় সুন্দরী ছিলেন। আমার পিতা এই বালিকার অসামান্য রূপের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে গৃহে আনিয়াছিলেন।[২]

মোহিনীদেবী ষোল বছর বয়সে অকস্মাৎ জ্বররোগে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। এই দুঃসংবাদ যশোহরে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এই আকস্মিক খবরে বঙ্কিমচন্দ্র তীব্র শোক পান। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম জীবনে কাব্য সাধনার প্রেরণার মূলে ছিল তাঁর এই বালিকা-বধূ।

দ্বিতীয়বার বিবাহে বঙ্কিমচন্দ্র একান্তই অনাগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তিনি বাবা-মার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করতে পারেন নি। ফলে দ্বিতীয়বার বিবাহে তাঁকে শেষ পর্যন্ত সম্মতি জানাতেই হয়। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয়বার বিবাহ প্রসঙ্গে যে বিবরণ দেন তা উল্লেখযোগ্য:

> ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইবার এক বৎসরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বিপত্নীক হইয়া পিতা-মাতার অনুরোধে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একবিংশতি বৎসর। বঙ্কিমচন্দ্র পঠদ্দশা হইতে লব্ধপ্রসিদ্ধ। একে বি.এ. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারপর দেখিতে সুপুরুষ, একুশ বছরের যুবা আবার তাঁহার পিতৃদেবের এ অঞ্চলে নামযশও ছিল, সুতরাং অনেক পাত্রী জুটিল। বঙ্কিমচন্দ্র এসময়ে ছুটি লইয়া বাটী আসিলেন, সুহৃদপ্রধান দীনবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্থানে স্থানে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পরে একটি পাত্রী মনোনীত করিয়া তাঁহাকেই বিবাহ করিলেন।[৩]

বিপত্নীক হওয়ার আটমাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যখন বিয়ে হয় তখন তিনি যশোহর থেকে বদলি হয়ে মেদিনীপুরের নেগুয়াঁ (কাঁথি) মহকুমায় যোগদান করেন। ১৮৬০ সালের জুন মাসে হালিশহরের বিখ্যাত চৌধুরী বাড়ির বার বছরের কন্যা

রাজলক্ষ্মীদেবীর সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হয়। নেগুয়াঁয় বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬০ সালের ফেব্রুয়ারি হতে নভেম্বর পর্যন্ত নয় মাস ছিলেন। এই সময়ে তাঁর মনে কপালকুণ্ডলা উপন্যাস রচনার বীজ রোপিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। নেগুয়াঁ কাঁথির সন্নিকটে এবং দরিয়াপুর ও চাঁদপুরের অনতিদূরে সমুদ্রও পনেরো-ষোল মাইলের বেশি দূরে নয়। এই সময় একজন সন্ন্যাসী কাপালিক মাঝে মধ্যে রাত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে দেখা করতে আসত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে নানাপ্রকার ভয় দেখাতেন। যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাংলোয় বাস করতেন তখন এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত। চাঁদপুরের কিছুদূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বনজঙ্গল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা ঐ সন্ন্যাসী সমুদ্রতীরে সেই বনে বাস করত। কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ওই স্থান হতে খুলনায় বদলি হন। এই কাপালিকের স্মৃতিই পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রকে কপালকুণ্ডলা উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করে থাকতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর তিন কন্যার নাম ছিল– শরৎকুমারী, নীলাজকুমারী ও উৎপলকুমারী। ১৮৫৮ সালের ৬ আগস্ট বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে নিয়োগ পান। চাকুরি আরম্ভের প্রায় বারো বছর পর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এল পাস করেন তিনি। পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। দীর্ঘ তেত্রিশ বছর চাকুরি করার পর ১৮৯১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর অবসর গ্রহণ করেন। খুলনা, যশোর, মেদিনীপুর, হুগলি, বারাসাত, হাওড়া, আলিপুর, কটক প্রভৃতি স্থানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এবং অন্যান্য পদে কৃতিত্বের সাথে চাকরি করেন।[৪] যশোরে চাকুরি করতে এসেই নাট্যকার দীনবন্ধুমিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) সাথে পরিচয় ঘটে। তাদের বন্ধুত্ব আমৃত্যু বজায় ছিল।

> উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী বঙ্কিমচন্দ্র দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যবোধের ঋত্বিক। বাংলা ভাষায় শিল্পসম্মত উপন্যাস রচনার প্রথম কৃতিত্ব তাঁর। নিষ্ঠাবান হিন্দু। গীতার অনুশীলনতত্ত্বের (জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্ম) ভিত্তিতে হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের অভিপ্রায়ে লেখনী পরিচালনা। সাহিত্যের রসবোদ্ধাদের কাছ থেকে 'সাহিত্য সম্রাট' ও হিন্দু ধর্মানুরাগীদের কাছ থেকে ঋষি আখ্যা লাভ। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে বঙ্কিমচন্দ্র বহুমূত্ররোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর এ রোগেই কলকাতায় ১৮৯৪ সালের ৮ এপ্রিল (২৬ চৈত্র ১৩০০ বঙ্গাব্দ) বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন।[৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহে নারীচরিত্রগুলি তাদের ব্যক্তিত্ব, রূপ-লাবণ্য, সৌন্দর্য অন্তর্নিহিত নারীশক্তির প্রাবল্যে ক্রমবিকশিত নারীসত্তায় রূপান্তরিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)* মূলত ত্রিভুজ প্রেমকথা। যদিও মোগল পাঠানের যুদ্ধের এক খণ্ডাংশ নিয়ে রচিত। আয়েষা, তিলোত্তমা ও জগৎসিংহকে নিয়ে মূলকাহিনী এবং বীরেন্দ্রসিংহ ও কতলুখাঁকে নিয়ে একটি শাখা কাহিনী আছে। দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষা এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী, সে ব্যর্থ প্রেমিকা অথচ কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই–

> "জগৎসিংহ আয়েষার কাছে বলিলেন যে, স্বপ্নে তিনি এক দেবকন্যাকে দেখিয়াছেন যিনি তাহার শিয়রে বসিয়া শুশ্রুষা করিয়াছেন এবং প্রশ্ন করিলেন, সে তুমি না তিলোত্তমা?' শুশ্রুষা কে করিয়াছেন তাহা আয়েষা বেশ জানিতেন। কিন্তু ইহাও তাঁহার স্পষ্ট প্রতীত হইল যে, অচৈতন্য অবস্থায় রাজকুমারের মুখ হইতে যে রমণীর নাম বাহির হইয়াছিল, তাঁহার হৃদয় সেই রমণীর কাছেই বিক্রীত। আয়েষা চিত্ত সংযম করিতে শিখিয়াছিলেন,

> জগৎসিংহের হৃদয়ে নিজের স্থান গ্রহণ করিবার জন্য তিনি তিলোত্তমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গেলেন না। তিনি অতি অল্পকথায় নিজেকে আড়ালে সরাইয়া নিলেন। তিনি কহিলেন, 'আপনি তিলোত্তমাকে স্বপ্নে দেখিয়া থাকিবেন।"

কথা অল্প, অথচ অপরূপ ইঙ্গিতপূর্ণ। আয়েষার চিত্তসংযমের চিত্র অতি কৌশলের সাথে আঁকা হয়েছে। কিন্তু এই সংযমের অন্তরালে যে প্রণয়বিধুর বেদনাকাতর হৃদয় ছিল তা এখানে প্রকাশ লাভ করেছে। যে সময়ে আয়েষা ও জগৎসিংহ একত্র ছিলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র এই অন্তঃসলিলা বেদনাকে রূপ দিতে পারেন নাই। পরে কারাগারে আয়েষা, ওসমান ও জগৎসিংহের যখন সাক্ষাৎ হয় তখন উপন্যাসের গতি অন্যদিকে চলে যায়। আয়েষা তখন ক্রমশ অদৃশ্য হবে। তাই এখানে ওসমানের ব্যঙ্গোক্তির উত্তরে আয়েষাকে দিয়ে গোপন গভীর ভালবাসা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করালেন বঙ্কিমচন্দ্র। ওসমানের প্রশ্নের উত্তরে ঠিক তার পূর্বেই আয়েষা বলেছেন,

> আমার কার্য্য উত্তম কি অধম সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই ...যখন পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তখন ইহার উত্তর দিব। তোমার চিন্তা নাই। ইহার পর ওসমান ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, 'আর যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি?" আয়েষা দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া নিজের প্রণয়জ্ঞাপন করিয়াছেন।[৬]

কপালকুণ্ডলা'র (১৮৬৬) বর্ণিত কাহিনী আকবর বাদশাহের রাজত্বের শেষ সময়ে আরম্ভ হয়েছে। এটি বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রায় সকল বঙ্কিম সমালোচকই এই গ্রন্থটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা বলেছেন। কিছুটা ইতিহাস এবং অধিকাংশ কল্পনার উপর আশ্রয় করার জন্য কাহিনী বিন্যাসে, চরিত্রায়ণে লেখক সর্বত্র জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসে কবিত্ব এবং ঔপন্যাসিক ধর্মের সুষম মিশ্রণ হওয়ার জন্য উপন্যাসটি অসাধারণত্বে উন্নীত হয়েছে।

মতিবিবি কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের অন্যতম নারী চরিত্র। আসল নাম *পদ্মাবতী*। পদ্মাবতী নবকুমারের স্ত্রী। পদ্মাবতীর বাবা রামগোবিন্দ ঘোষাল । যুদ্ধকালে মত্ত পাঠান সৈন্যদের হাতে পড়ে তাকে সপরিবারে মুসলমান হতে হল। সে বাধ্য হয়ে পরিবার-পরিজন ও নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সে পিতার সঙ্গে আগ্রায় চলে যায়। পদ্মাবতী লুৎফুন্নেসা নাম গ্রহণ করে নিজেকে আগ্রার রাজপ্রাসাদে অসংযমী বিলাস ব্যসনের জীবনে নিক্ষেপ করে। সে রাজপুত্র সেলিমকে ভালবেসেছিল। সেলিম সম্পর্কে তার মোহভঙ্গ হওয়ায় সেলিমের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। উড়িষ্যা থেকে ফেরার পথে সে জানতে পারলো সেলিমের বিরুদ্ধে তার চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। এরপরই পান্থনিবাসে নবকুমারের সাথে দেখা। এই পদ্মাবতীই মতিবিবি। সে রাজপুত্র সেলিমকে না পাওয়ায় সর্পিণীর মত ফুঁসে ওঠে। বাল্যকাল থেকেই সে সুখবঞ্চিতা। মরুতৃষা নিয়ে মরীচিকার পেছনে ছুটেছে। ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্য থাকতেও হৃদয় তার চিরশূন্যই রয়ে যায় ফলে স্বামী নবকুমারকে ফিরে পেতে সে সপ্তগ্রামে বসবাস শুরু করে এবং কৌশলে কপালকুণ্ডলার স্বামীকে পেতে চায়। যদিও মতিবিবি নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যেকোন প্রকার ছল-চাতুরী গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে নি। তবুও তার চরিত্রে অপর কতকগুলি বৈশিষ্ট্যও ছিল। বিপদের সময় অচঞ্চল থাকা, পরিহাসপটুতা, বাগ্‌বৈদগ্ধ, নারী হয়েও আপন ভাগ্য গড়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আত্মপ্রত্যয়, এইগুলি তাকে এক স্বতন্ত্রতা দিয়েছে।

কপালকুণ্ডলার মধ্যে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে দিয়ে দেবার বাসনা প্রবল। মানুষের বসতি হতে দূরের সবুজ অরণ্য ও ভৈরবী সেবক কাপালিক সংসর্গ তাকে গড়ে তুলেছে একাকিত্বকামী এক নারীরূপে। তার জীবন ধর্মবিশ্বাস আর অরণ্য সংস্কারে ভরে উঠেছে। ভৈরবীর ওপর এক অবিচল বিশ্বাস ছিল কপালকুণ্ডলার। সে বিশ্বাস করত মানুষের বিধি নির্দিষ্ট। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই সে নবকুমারকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল। যদিও সামাজিক বিয়ের বিধি-বিধান তার সম্পূর্ণ অজানা ছিল। বিয়ে মানুষকে কোমল করে সংসারমুখী করে– এই ব্যাপারটি কপালকুণ্ডলার জীবনে প্রযোজ্য হয় নি। বিয়েকে সে বন্ধন মনে করেছে। শ্যামার প্রশ্নের জবাবে বলেছে– 'যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।' ফলে কপালকুণ্ডলা দাম্পত্য জীবন অভিমুখী হতে পারল না। সমাজবিরহিতা কপালকুণ্ডলার চরিত্র যে কতখানি সরল পবিত্র উদার ও পরোপকারী তা সহজেই অনুমেয়। কপালকুণ্ডলা যে শুধু নবকুমারের প্রাণরক্ষা করেছে তা নয় বিবাহিত জীবনেও স্বাভাবিক অদমনীয় পরোপকারিতার ঘটনা বারবার পাই। নবকুমার তার পত্নী কপালকুণ্ডলাকে বাধা দিলে কপালকুণ্ডলা সহজেই বলতে পারে 'তুমি পরের উপকারের বিঘ্ন করিও না।' শ্যামাসুন্দরীর জন্য স্বামী বশের ঔষধ আনতে একাকী রাত্রে বনের মধ্যে যেতে দেখে কৌতূহলবশত নবকুমার তার সাথে যেতে চাইলে কপালকুণ্ডলা বলেছে– 'আইস আমি অবিশ্বাসিনী কিনা স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।' নিজের প্রতি কপালকুণ্ডলার কোন মমতা নেই। পৃথিবীর প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই। কোন কিছুর সঙ্গেই মায়ার বন্ধন নেই। কপালকুণ্ডলার সমস্যা ছিল প্রেমহীনতা। প্রথম জীবনে যে দুজন পুরুষের সান্নিধ্য পেয়েছে তারা হলেন অধিকারী আর কাপালিক। কাপালিকের কাছ থেকে শিখেছে কালিকা ভক্তি আর অধিকারীর কাছ থেকে শিখেছে পরোপকার প্রবৃত্তি। মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হওয়ার পরও স্বামীর চোখে সন্দেহভাজন হওয়ার জন্য ভবানীর চরণে আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কপালকুণ্ডলার আত্মসম্ভ্রমবোধ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কেবল কপালকুণ্ডলার ক্ষেত্রেই নয় বঙ্কিমের সকল উপন্যাসেই নারী তার স্বতন্ত্র মর্যাদা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি। চরিত্রসৃষ্টি, গঠন-কৌশল, ভাষার ওজস্বিতা ও সাবলীলতা, যেদিক দিয়েই বিচার করা যাক এর গুণের শেষ নেই।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কপালকুণ্ডলার রূপ বর্ণনার মাধমে লেখকের অসাধারণ শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়:

> সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি। কেশভার আবেণীসম্বদ্ধ সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার এদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতে ছিল না– তথাপি মেঘবিচ্ছেদ নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ময়; সে কটাক্ষ এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণ লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনীশক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধ চন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ, ঘণকৃষ্ণ চিকুরজাল, পরস্পরের সান্নিধ্যে কি

> বর্ণ, কি চিকুর উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনীশক্তি অনুভূত হয় না ।[৭]

মতিবিবির রূপ বর্ণনার মাধ্যমেও ঔপন্যাসিক বঙ্কিম নারীর মহিমান্বিত রূপ তুলে ধরেছেন:

> শরীর ঈষদ্দীর্ঘ বটে, কিন্তু হস্তপদ হৃদয়াদি সর্ব্বাঙ্গ সুগোল, সম্পূর্ণীভূত । বর্ষাকালে বিটপীলতা যেমন আপনপত্ররাশির বাহুল্যে দলমল করে, ইহার শরীর তেমনি আপন পূর্ণতায় দলমল করিতেছিল । সুন্দরীর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর । ভাদ্রমাসের ভরা নদী । ভাদ্রমাসের নদীজলের ন্যায় ইহার রূপরাশি টলমল করিতেছিল– উছলিয়া পড়িতেছিল । বর্ণাপেক্ষা, নয়নাপেক্ষা, সর্ব্বাপেক্ষা সেই সৌন্দর্যের পরিপূরক মুগ্ধকর পূর্ণযৌবন ভরে সর্ব্বশরীর সতত ঈষৎচঞ্চল, বিনা বায়ুতে নব শরতের নদী যেমন ঈষৎচঞ্চল, তেমনি চঞ্চল ।[৮]

মৃণালিনী (১৮৬৯) বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ ধরনের উপন্যাস । বখতিয়ার খিলজি যখন মগধ বিজয় করেন তখন মগধের রাজকুমার হেমচন্দ্র তার প্রণয়িনী মৃণালিনীকে পাবার আশায় মথুরায় বাস করছিল । প্রণয় রাজকার্যে বাধা সৃষ্টি করলে হেমচন্দ্র গুরু মাধবচার্য কৌশলে মৃণালিনীকে গৌড়দেশে লক্ষ্মণাবর্তীনগরে হৃষিকেশ নামক এক ব্রাক্ষ্মণের ঘরে রাখল । উপন্যাসে ত্রুটি ও ঘটনার সন্নিবেশ নির্দোষ না হলেও মৃণালিনী নারীর একনিষ্ঠ পতিভক্তির আদর্শ সনাতন গৌরব লাভ করেছে । এর মহিমা যুগে যুগে কীর্তিত হয়েছে । তার দৃষ্টান্ত শেষ পর্যায়ে হেমচন্দ্র মৃণালিনীর কথা না শুনেই তাকে পরিত্যাগ করে যাবে এটা সঙ্গত মনে হয় নি, অথচ বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু রমণীর পতিভক্তিকে উচ্চ আদর্শে তুলে ধরতে চেয়েছেন । হেমচন্দ্র রক্তমাংসের মানুষ । মৃণালিনী দুঃখের আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনা হয়েছে । মৃণালিনী উপন্যাসের মনোরমা চরিত্রের হৃদয় বিশ্লেষণ করতে গেলে রহস্য আরও নিবিড় হয়ে ওঠে । মনোরমার সঙ্গে হেমচন্দ্রের প্রথম যে সাক্ষাৎ হয় তখন দেখা গেল তার সরল বালিকামূর্তি । তারপর হেমচন্দ্র তার আর এক মূর্তি দেখল বাপীতীরে । ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই–

> "যে বাপীকুলে দিনেও সচরাচর কেহ যাইত না, সেইখানে গভীর রাত্রিতে সে স্নান করিয়া চুল শুকাইতেছে । সেইখানকার জল খুব ঠাণ্ডা, তাই তাহার গায়ের জ্বালা দূর হয়; হয়ত প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা রহস্যময়ী মূর্তিতে সে নিজ হৃদয়ের রহস্যের সন্ধান খুঁজিত । হেমচন্দ্র তাহার মনে লজ্জা জাগাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইল । অধিক প্রশ্ন করিলে সে নিশ্চয় বলিত, 'আমি তো উন্মাদিনী' যখন হেমচন্দ্র তাহার নির্দেশ শুনিতে ইতস্তত করিতে লাগিলেন, তখন সে প্রশ্ন করিল, আমাকে বালিকা ভাবিয়া অবিশ্বাস করিতেছ?"

হেমচন্দ্র দেখল মনোরমার ভাবান্তর হয়েছে, সে আর বালিকা নয় । সে ভাবল মনোরমা কী মানুষী । এর পরে পশুপতির সথে মনোরমার সাক্ষাৎ । পশুপতি মনোরমাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছ । সে রহস্যের সন্ধান পেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছেন । পশুপতির বর্ণনা স্পষ্ট 'তোমার দুই মূর্ত্তি– একমূর্ত্তি আনন্দময়ী, সরলা বালিকা· · ·সেই রূপে আমার হৃদয় শীতল হয় । আর তোমার অপর মূর্ত্তি গম্ভীর তেজস্বিনী, প্রতিভাময়ী, প্রখর বুদ্ধিশালিনী এ মূর্ত্তি দেখিলে আমি ভীত হই' । এই শেষের মূর্ত্তিকে পশুপতি সরস্বতীর সঙ্গে তুলনা করেছেন । মনোরমা কখন কোন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করবে তার কোন স্থিরতা নেই । জোর করে কেউ তার বুদ্ধিপ্রদীপ জ্বালিত

করতে পারত না, জোর করে কেউ তা নিভাতে পারে নাই, শুধু তাই নয়– এই ভাবান্তর মুহূর্তের মধ্যে সাধিত হয় যে কখন কিভাবে কি হল পশুপতি অথবা হেমচন্দ্র ধরতে পারেন নাই। সব দিক দিয়া মনোরমা অপূর্ব অনন্য সাধারণ এক নারী চরিত্র। মনোরমা সরলা বালিকা, মনোরমা তেজস্বিনী, প্রতিভাময়ী, মনোরমা উন্মাদিনী আবার গম্ভীর স্থিরবুদ্ধিসম্পন্না। অথচ মনোরমার চরিত্রে কোথাও বৈষম্য নাই, অসামঞ্জস্য নাই। মনোরমা সকল সময়েই মনোরমা; তার ভাবান্তরের মধ্যেও অসঙ্গতি নাই।[৯] মনোরমার প্রতি পশুপতির যে প্রেম, তাতে রহস্য জটিল দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ও মানব প্রবৃত্তি এবং মানব প্রকৃতির গভীর রহস্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিষবৃক্ষের (১৮৭৩) নামেই তার পরিচয়। অসংযত প্রণয় বিষবৃক্ষের বীজ। নগেন্দ্রদত্ত গোবিন্দপুরের একজন বিত্তবান জমিদার। তিনি কর্মোপলক্ষে নৌকাযোগে কলকাতা যাওয়ার সময় ঝড়ের সম্মুখীন হয়ে আশ্রয়ের আশায় নিকটবর্তী গ্রামের এক জীর্ণ-কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করে। সেই কুটিরের একটি কক্ষে তখন মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের শিয়রদেশে উপবিষ্ট সহায়সম্বলহীন তের বৎসরের বালিকা কুন্দনন্দিনীকে দেখতে পায়। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর আশ্রয়হীন কুন্দনন্দিনীকে নিয়ে সে তার বোন কমলমনির কলকাতার বাড়িতে আসে। কিছুদিন পর স্ত্রীর চিঠি পেয়ে সে এই নিরাশ্রয় বালিকাটিকে গৃহে নিয়ে আসে এবং সূর্যমুখীর ভ্রাতৃপ্রতিম তারাচরণের সঙ্গে বিবাহ দেয়। সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনী এবং হীরা এই তিন নারীর ভূমিকা স্বতন্ত্র। বঙ্কিম সূর্যমুখীকে অশেষ গুণে গুণান্বিত করে চিত্রিত করেছেন। নগেন্দ্রনাথ নিজ পত্নী সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ছিল। সে মনে করত–

> সূর্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী। সূর্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্যায় দাসী।[১০]

সূর্যমুখী সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে আমাদের মনে হয় বঙ্কিম সূর্যমুখীকে বাস্তব লোকের নারী না করে আদর্শলোকের পত্নীরূপে কল্পনা করেছেন। কিন্তু কাহিনীতে সূর্যমুখীর ভূমিকায় তাকে অতিরিক্ত বাস্তবজ্ঞানসম্পন্না বুদ্ধিমতী নারী বলেই মনে হয়। সূর্যমুখী কমলমনির গৃহ থেকে নগেন্দ্রনাথের চিঠিতে যেদিন কুন্দনন্দিনীর কথা জানতে পেরেছিল সেদিনই সে বিপদের আশংকা করে কুন্দের সাথে তারাচরণের বিবাহের পরিকল্পনা করে এবং বিপদমুক্ত থাকতে চায়, তারাচরণ যদিও কুন্দের যোগ্য ছিল না। তার স্বামী যে কোন সময় কুন্দের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এই ভয়েই সূর্যমুখী তাড়াতাড়ি কুন্দের বিবাহ দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল। হীরা দেবেন্দ্রকে ভালোবাসে। সে ভালোবাসায় কোন খাদ নাই। যে কোন মূল্যের বিনিময়ে সে দেবেন্দ্রকে পেতে চায়। কুন্দের প্রতি দেবেন্দ্র আকর্ষণবোধ করলে সে কৌশলে নগেন্দ্রনাথের সাথে বিয়ে দিয়ে নিজের পথ পরিষ্কার করে এবং সূর্যমুখীর দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হীরা কুন্দের মুখের নিকট বিষ এনে ধরে এবং কুন্দ বিষপান করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট উপন্যাসের প্রতিটি নারী চরিত্রের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি নারী মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যসাগরে অতি সহজেই অবগাহন করেছেন। *বিষবৃক্ষের* নগেন্দ্রনাথের বর্ণনায় কুন্দনন্দিনীর রূপ-লাবণ্য:

> চক্ষু দুইটি যে কিরূপ, তাহা আমি এ পর্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুইবার একরকম দেখিলাম না; আমার বোধ হয় যেন এ পৃথিবীর সে চোখ নয়; এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল করিয়া দেখে না; অন্তরীক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে নিযুক্ত আছে। কুন্দ যে নির্দ্দোষ সুন্দরী তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়, অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই। বোধহয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্তমাংসের যেন গঠন নয়, যেন চন্দ্রকর কি পুষ্টাসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার সামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না। অতুল্য পদার্থটি তাহার সর্বাঙ্গীন শান্তভাবব্যক্তি– যদি স্বচ্ছ সরোবরে শরচ্চন্দ্রের কিরণসম্পাতে যে ভাবব্যক্তি, তাহা বিশেষ করিয়া দেখ, তবেই ইহার সাদৃশ্য কতক অনুভূত করিতে পারিবে। তুলনার জন্য সামগ্রী পাইলাম না।[১১]

ইন্দিরা (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম সামাজিক উপন্যাস। গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র এবং সমস্যাবলী প্রধানরূপে উপস্থাপিত হয়। ইন্দিরা চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য–সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও পরিহাস নিপুণা নারী। দস্যুহস্তে অপহরণ এবং স্বামীকে বশীভূত করবার উপায়ে সিদ্ধহস্ত। পরিমার্জিত কৌতুক প্রিয়তা, সুভাষিণীর অকৃত্রিম সহানুভূতি গৃহিনীর সন্দেহ প্রবণতা ও পুত্রস্নেহ, ঈর্ষাকাতরতা প্রভৃতির মধ্যে বঙ্কিম একটা সরস জীবনবোধ সৃষ্টি করেছেন।

যুগলাঙ্গরীয় (১৮৭৪) উপন্যাসে হিরন্ময়ী পুরন্দরের প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এটি ছোট গল্পের সমগোত্রীয়। এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ ঘটনার বৈচিত্র্য। কাহিনী বর্তমানের হলেও নায়ক-নায়িকা অতীতযুগের বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত। পুরন্দর ও হিরন্ময়ী প্রেমে যা কিছু অসামাজিকতা বা অসাধারণত্ব আছে তা ইতিহাস দিয়ে আড়াল করা হয়েছে। অতীতের পটভূমিতে বর্তমানের মধুর ও গভীর রস সঞ্চার করায় *যুগলাঙ্গুরীয়* রোমান্স হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রশেখর (১৮৭৪) শৈবলিনী প্রতাপকে ভালবেসেছিল। এ জীবনে তার পক্ষে প্রতাপকে নিজের করে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই জেনেও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছিল। শৈবলিনী এবং দলনী বেগম এঁদের কারো মনস্কামনাই পূর্ণ হয় নি। কিন্তু দলনী ইতিহাস বিশ্রুত বাংলার নবাব মীর কাশেমের পত্নী আর শৈবলিনী বঙ্কিমের কল্পনাপ্রসূত চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অসাধারণ লিপি কৌশলে এই দুই ভাগ্য বিড়ম্বিত নারীর বেদনা একসূত্রে গেঁথেছেন। পাঠক দলনীর ঐতিহাসিক সত্তার কথা ভুলে গিয়ে তার মানবিকগুণের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু দলনী বেগম তাঁর স্বামী মীর কাশেমকে যতটা আন্তরিকভাবে ভালোবাসত শৈবলিনী তার স্বামী চন্দ্রশেখরের প্রতি ততটা নিষ্ঠাবতী ছিল না, সে বিবাহিতা হওয়া সত্ত্বেও একান্তভাবে প্রতাপকেই ভালোবাসত। সে কারণে শৈবলিনীর চরিত্র দলনী বেগম অপেক্ষা অধিক জটিল। বিশেষ করে লরেন্স ফস্টরের সঙ্গে শৈবলিনীর আচরণের মধ্যদিয়ে বোঝা যায় যে, শৈবলিনীকে অপহরণকালে ফস্টরকে বল প্রয়োগ করতে হয় নি। শৈবলিনীর আসল উদ্দেশ্য ছিল প্রতাপের সঙ্গে মিলিত হওয়া। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেই শৈবলিনীই ইচ্ছাকৃতভাবে ফস্টর দ্বারা অপহৃত হয়েছিল। শৈবলিনী নিজেই স্বীকার করেছে ডাকাতির পূর্বেই ফস্টর তার কাছে লোক প্রেরণ করেছিল। শৈবলিনীর আত্মরক্ষার ইচ্ছা থাকলে তখনই সে অন্যত্র পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারত। তা না করে স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে শৈবলিনী পূর্ব প্রেমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এই

কৌশল গ্রহণ করেছিল।[১২] বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর গৃহত্যাগের মধ্যদিয়ে নারীমনের দুর্জ্ঞেয়তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন।

রজনী (১৮৭৭) বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপন্যাসের মতই *রজনীর* একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে। শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহ এবং জন্মান্ধ রজনীর দৈবযোগে দৃষ্টিলাভ উপন্যাসের মূল আখ্যান। উপন্যাসে বৃদ্ধ রামসদয় মিত্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী গৌরবের গরবিণী প্রখর বুদ্ধিসম্পন্না সদাহাস্যময়ী লবঙ্গ সমগ্র আখ্যায়িকায় স্বমহিমায় স্বাতন্ত্র্যেমণ্ডিত হয়েই সুবিরাজিত।

কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮) মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখানে নর-নারীর দৈহিক কামনা, বাসনা, লোভ, ঈর্ষা, ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তিগুলির অনাবৃত প্রকাশ ঘটেছে। উপন্যাসে বাইরের ঘটনা অপেক্ষা পাত্র-পাত্রীর অন্তঃস্থলের মানসিক সংঘাত কাহিনীর গতি-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকাদের মধ্যে রোহিণীই সর্বাধিক আলোচিত। রোহিণী বালবিধবা। ব্রহ্মানন্দের আশ্রিতা ও ভ্রাতৃকন্যা। হিন্দু বিধবা রমণীর পুনর্বিবাহ শাস্ত্রবিরোধী নয়। উপন্যাস রচনার বেশ কিছু বছর পূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টায় হিন্দু বিধবা রমণীর পুনর্বিবাহ আইন প্রচলিত হয়। রোহিণী সুন্দরী, জীবনমুখী, চঞ্চলা। বৈধব্যকে নিয়তির বিধানরূপে স্বীকার করে নিয়ে প্রচলিত সংস্কারের রীতি-নীতি মেনে চলাই যে নারীর কল্যাণের পথ রোহিণী এ ধারণায় বিশ্বাসী ছিল না। রান্না, চুলবাঁধা, সেলাই সব কাজেই দক্ষ সে। হরলাল রোহিণীকে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে উইল চুরি করতে প্ররোচিত করেছিল এবং রোহিণীর নিঃসঙ্গ মনের সুপ্ত কামনা জাগ্রত করেছে। জীবনের তাগিদেই সে উইল চুরি করেছিল, তারপরও হরলাল তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। ফলে গোবিন্দলালের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বারুণী পুষ্করিণীর তীরে ক্রন্দনরতা রোহিণীকে দেখে গোবিন্দলাল করুণাবশত রোহিণীর দুঃখের কারণ জানতে গিয়ে বুঝতে পারে যে রোহিণী তার প্রতি দুর্বলতা পোষণ করে। গোবিন্দলালের অবচেতন মনে রোহিণীর প্রতি অনুকম্পা ক্রমশঃ তীব্র আকর্ষণে পরিণত হয়। ভ্রমর বুঝতে পেরে রোহিণীকে বারুণী পুস্করিণীতে ডুবে মরার উপদেশ দেয়, কিন্তু এই ঘটনা তিনজনের জীবনেই মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। গোবিন্দলাল রোহিণীকে জল থেকে উদ্ধার করে তার পুনর্জীবন দান করে। রোহিণী অকপটে তাঁর জীবনতৃষ্ণার কথা গোবিন্দলালকে জানায়। গোবিন্দলাল চরম সঙ্কটের মধ্যে পড়ে। সে এই সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। সে রোহিণীকে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় পাঠাতে অপারগ হলে স্বয়ং হরিদ্রা গ্রাম থেকে জমিদারি দেখার অছিলায় বন্দরখালি গমন করেছিল কেবল রোহিণীর চোখের আড়ালে থাকার জন্য। এতে ফল হলো অন্যরকম, সকলে জানলো রোহিণী এবং গোবিন্দলালের সম্পর্ককে, তাকে কেন্দ্র করে গ্রাম্যকুলকামিনীদের নানারূপ রটনা ইত্যাদি কারণে স্বামীর প্রতি ভ্রমরের মন বিষাক্ত হয়ে উঠলো। এবং স্বামীকে ভক্তির অযোগ্য মনে করলো এবং স্বামীগৃহ ত্যাগ করে বাপের বাড়িতে গেল। গোবিন্দলাল এসে ভ্রমরকে দেখতে না পেয়ে তার প্রতি বিদ্বেষ এবং রোহিণীর আকর্ষণ আরও তীব্র হল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু এবং তার মাতার কাশী যাওয়ার সংকল্প রোহিণীর সাথে বসবাসে আর কোন বাধাই রইল না।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে নিয়ে প্রসাদপুরের প্রাসাদে আয়েশি জীবন শুরু করে বুঝতে পারল যে, কেবল রূপ সকল সুখের একমাত্র কারণ নয়। রোহিণীর প্রতি আকর্ষণ রূপজমোহ আর গুণবতী ভ্রমরকেই সে প্রকৃত ভালবাসে। অপরপক্ষে রূপবান নিশাকরের প্রতি রোহিণীর আকর্ষণ তার চরিত্রে যেমন গতি দিয়েছে তেমনি তার মনস্তত্ত্বের উপর অধিক ছায়াপাত করেছে। রোহিণীর মধ্যে ছিল পুরুষের ভোগ প্রমত্ত আসঙ্গ লোলুপতা, প্রেম নয়; গোবিন্দলাল তাকে হত্যার প্রস্তুতি নিলে সে বাঁচতে চায়। কারণ তার ভোগ কামনা পরিতৃপ্ত হয় নি। সে বিদায় চেয়েছে কারণ এখনও সে বয়সে নবীন। জীবন রহস্যে বিমূঢ় সৃষ্টির সাফল্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সফল নারী চরিত্রের মধ্যে রোহিণী স্বতন্ত্র, অনন্য। ভ্রমর উপন্যাসের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে রোহিণীর গিল্টি করা সোনার গহনা দেখে সত্যাসত্য যাচাই না করেই স্বামীকে চিঠিতে জানাল সে আর ভক্তির যোগ্য নয়। সুতরাং স্বামীর দর্শনে তার আর কোন সুখ নাই। তাই সে বাপের বাড়ীতে চলে গেল। বালিকাবধূর মতো অত্যন্ত অভিমানী ভ্রমর কাহিনীতে গতিদান করে অনিবার্য পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে বিধবা রোহিণী নিজের যৌবন সম্পর্কে সচেতন। তার এরূপ যৌবন থাকা সত্ত্বেও শুষ্ক কাঠের মত জীবন কাটানো, সম্মুখে শীতল জল থাকা সত্ত্বেও স্পর্শ করতে না পারায় রাত্রিদিন দারুণ তৃষায় হৃদয় পুড়ছে। গোবিন্দলালের ভাষায়– 'বিশালদীর্ঘ বিলম্বিত ঘোরকৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু- তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘে যেন জল বৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত কিন্তু সেই মুদ্রিত পদ্মের উপরে ভ্রুযুগল জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণশোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট– স্থির, বিস্তারিত, লজ্জাভয় বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট গণ্ড এখন উজ্জ্বল– অধর এখনও মধুময়, বাঞ্জুলীপুষ্পের লজ্জাস্থল। গোবিন্দলালের চক্ষে জল পড়িল। বলিলেন, মরি মরি। কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন?' [১৩]

রাজসিংহ (১৮৮২) ঐতিহাসিক উপন্যাস। এ উপন্যাসের যাবতীয় ঘটনা রাজনৈতিক আবহে নির্মিত ও পুষ্ট। চঞ্চলকুমারী রাজকন্যার স্বাভাবিক অবস্থায় রাজসিংহের সাথে মিলনের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু চঞ্চলকুমারী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল যে, সে রাজসিংহ ছাড়া অন্যকে পতিত্বে বরণ করবে না। চঞ্চলকুমারী স্থিরচিত্ত ছিল কিন্তু বাদশাহ আলমগীরের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আন্দোলিত হতে দেখা যায়। একটা নিতান্ত তুচ্ছ ঘটনা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। মোবারক যথার্থ বীর যোদ্ধা ও কুশলী রণনায়ক। মোবারক ও জেবউন্নিসার প্রেম রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে ঘূর্ণিত হয়েছে। নির্মলকুমারী চঞ্চলকুমারীর সখী, এই সামান্য পরিচয় উপন্যাসে আবির্ভূত হলেও অসামান্য ভূমিকা পালন করেছ সে। রাজসিংহ উপন্যাসে চরিত্র বিশ্লেষণের যথোচিত পরিসর ছিল না। এক প্রবল তরঙ্গ বিক্ষোভের মধ্যে ইতিহাস ও মানবহৃদয় উভয়ই আন্দোলিত হয়েছে, তবুও নারী চরিত্রগুলোর স্বাতন্ত্র্যতা অক্ষুণ্ন রয়েছে।

আনন্দমঠ (১৮৮২) সত্যানন্দের নেতৃত্বে সন্তানদলের কার্যকলাপ বৃহৎ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম আমাদের চিন্তার রাজ্যে আঘাত হানে। সন্ন্যাসীরা জীবনবিমুখ আদর্শবাদের ভারবাহক হন নি বরং আদর্শ এবং জীবনধর্মের সঙ্গে সব সময়ই সংগ্রাম করে গেছেন। *আনন্দমঠ* উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলির পরিকল্পনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছেন। শান্তি এবং কল্যাণী এই দুটি স্ত্রী চরিত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী

করে অঙ্কিত করেছেন। বাঙালি রমণীর পক্ষে যা সম্ভব নয় এমন কিছু গুণ শান্তির চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কল্যাণী যেখানে মনে করে স্বামীর ছোট ছোট ধর্মে স্ত্রী সাহায্য করতে পারলেও বড় বড় ধর্মে কন্টক। কিন্তু শান্তি সে ধারণা করে না। সে স্বামীর ন্যায় নিজেও সংসারধর্মে দীক্ষিত হয়ে স্বামীর বড় কাজের সহায়ক হতে পেরেছিল। শান্তি কল্যাণীর মত ধীর, স্থির, গম্ভীর প্রকৃতির কিংবা অপরের উপর নির্ভরশীল নয়। সে কেবল বীরাঙ্গনা নারীই নয়– ছলাকলায় পটীয়সী রহস্যময়ীও বটে। এদিকে শান্তি যেমন পুরুষের মত ইংরেজ ফৌজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে আবার বৈষ্ণবী বেশে ইংরেজ শিবিরে প্রবেশ করে তাদের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেছে। সুগভীর অনুশীলনে কোমল হৃদয় বাঙালি রমণীও যে প্রয়োজনের সময় পুরুষের মত শক্তিধর হতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র *দেবী চৌধুরানীর* প্রফুল-এবং *আনন্দমঠের* শান্তির মধ্য দিয়ে এ সত্য প্রকাশ করেছেন।[১৪]

দেবীচৌধুরানী(১৮৮৪) এই উপন্যাসে ইংরেজ আমলের রাজনৈতিক পটভূমিকায় দেশাত্মবোধের আদর্শ পরিকল্পিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব এই উপন্যাসে কেবলমাত্র আদর্শবাদ ও ধর্মতত্ত্বই প্রধান বাহন হয়ে উঠে নি এতে পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনের দ্বন্দ্বসংঘাতও বিশেষভাবে স্থান লাভ করেছে। উপন্যাসের চরিত্র হরবল্লভ, হরবল্লভের স্ত্রী, ব্রজেশ্বর, ভবানীঠাকুর, নিশি এমনকি প্রফুল্লও আমাদের সমাজজীবনের অতি পরিচিত মুখ। দেবীচৌধুরানী হরবল্লভের একক পরিবারকেন্দ্রিক কাহিনী। এই পরিবারের কয়েকজনকে ঘিরেই কাহিনীর সূচনা ও পরিসমাপ্তি। উপন্যাসের নাম দেবীচৌধুরানী হলেও এ কাহিনীর নায়িকা প্রফুল্ল দেবীচৌধুরানীতে রূপান্তরিত হয়েছিল কার্য-কারণের ভিত্তিতে, ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, অন্তর্নিহিত প্রবণতায় নয়। এ উপন্যাস প্রফুল্লেরই কাহিনী; যাকে সূচনালগ্নেই পাঠকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন লেখক। ভাগ্যবিড়ম্বিতা অথচ স্বাধিকার সচেতন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অতি সুন্দরী এই যুবতী প্রথমেই মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ। ঘটনাচক্রে গভীর বনমধ্যে প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের সাক্ষাৎ পায়। এই মহানপুরুষের সংস্পর্শে কঠোর বৈরাগ্য এবং দেশহিতব্রতের দ্বারা প্রফুল্ল ক্রমে আদর্শ লোকবাসিনী নারীরূপে অঙ্কিত হয়। নিষ্কামধর্ম সাধনার চেয়ে স্বামী প্রেমই ছিল প্রফুল্লের জীবনে অধিক সত্য। প্রেম যেখানে সত্য সেখানে কোনো তত্ত্ব শিক্ষারই প্রয়োজন হয় না। শিল্পের এই সর্বকালজয়ী সত্যটিই প্রফুল্ল চরিত্রের মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

রাধারাণী (১৮৮৬) উপন্যাসে রাধারাণী ও রুক্মিণীকুমারের মধ্যে প্রথম দৃষ্টিতেই যে প্রেম সঞ্চারিত হয়েছিল তা সম্ভব বলে মনে হয় না। রাধারাণী দশ এগার বছরের বালিকা রুক্মিণীকুমার (দেবেন্দ্রনারায়ণ) তখন প্রাপ্তবয়স্ক এবং বিপত্নীক তাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতা ও করুণার সম্পর্ক। দেবেন্দ্রনারায়ণের হৃদয়ের প্রকৃতি যত বেগবান, বুঝার ক্ষমতা তত তীক্ষ্ণ নয়। রাধারাণী একটু একটু করে তার মনের কথা বের করে নিয়েছে আবার একটু একটু করে তার কৌতূহল জাগিয়ে আবার নিবৃত্ত করেছে। সপ্তম পরিচ্ছেদের কথোপকথন অতিশয় সরল ও ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন। রাধারাণীর কৌতূহল আশঙ্কা ও আশা দ্রুতবেগে চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। রাধারাণী অনেক বেশি সংযতবাক ও কৌশলময়ী। সে একবার রুক্মিণীকুমারকে নিজের আরাধ্য দেবতা বলে উল্লেখ করে, কিন্তু তখনই নিজের কথার সরল অর্থ অস্বীকার করে রুক্মিণীকুমারের মনে ধাঁধাঁ লাগিয়েছে।

সীতারাম (১৮৮৭) বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের সঙ্গে *সীতারামের* একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রায় প্রতিটি কাহিনীতে কিছু অলৌকিকতা থাকলেও কোন কাহিনীই সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। কিন্তু *সীতারাম* উপন্যাসে একজন জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্‌বাণীই কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। সীতারামের বিবাহিত স্ত্রী শ্রী তাঁর প্রিয়জনের মৃত্যুর কারণ হবে- কোষ্ঠীর বিচারের এই ফলাফল থেকেই এই কাহিনীর উৎপত্তি। *দেবীচৌধুরাণী* উপন্যাসে প্রফুল্লর গৃহত্যাগ করার পর ভবানী পাঠকের শিক্ষাধীনে অনুশীলন তত্ত্বচর্চা করে দেবীত্বে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু কোনদিনই স্বামীর গৃহত্যাগ করতে চান নি; উপরন্তু কিভাবে স্বামীর সান্নিধ্যলাভ করা যায় তার চেষ্টা করেছে। সে অবশেষে স্বামীর গৃহে স্ত্রীর মর্যাদা নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিল। *সীতারাম* উপন্যাসে ত্যাগের মধ্য দিয়েই মহৎ প্রেমের সৃষ্টি করতে চেয়েছেন বঙ্কিম। শ্রী তার স্বামীকে গভীরভাবে ভালবাসত। তাই স্বামীর পরিণামের কথা ভেবে স্বামীর দৃষ্টির অন্তরালেই থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু অন্তর থেকে স্বামীকে নির্বাসিত করতে পারে নি। এই কারণে সে সর্বদাই মনে মনে স্বামীর সান্নিধ্য কামনা করেছে। শ্রীর মানসিক সংকট কাটানোর উদ্দেশ্যে জয়ন্তী তাকে সন্ন্যাসের শিক্ষা দিলে, কেননা ধর্মানুশীলনের মধ্যে নিয়োজিত থাকলে পার্থিব মোহ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। কিন্তু মানসিক শান্তির কাছে সন্ন্যাসের শিক্ষা পরাজিত হল। নিশ্চিত মৃত্যুর কথা জেনেও শ্রী তার স্বামীর শেষ শয্যায় এসে উপস্থিত হল। এখানেই সে তার বঞ্চিত নারী জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেল। সেই কারণে *সীতারাম* উপন্যাসটিতে জীবনজিজ্ঞাসার এক সার্থক শিল্পগত রূপ প্রকাশিত হয়েছে।

সাপ্তাহিক Indian Fileld পত্রে Rajmohan’s wife *(১৮৬৪)* ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়। পূর্ববাংলার গ্রাম্য জমিদারবাড়ি, উকিল-আদালত-উইল-মামলা, দুশ্চরিত্র জমিদার, জ্ঞাতিকুটুম্ব, পতিব্রতানারী, তেজস্বিনী সাধ্বী, দ্বিতীয়পক্ষের আহ্লাদী বউ, ধনীগৃহের অত্যাশ্চার্য পরিচারিকাকুল, গেঁয়ো ডাকাত গ্রামের মেঠোপথ প্রভৃতি উপন্যাসে প্রাণসঞ্চার করলেও বাংলাভাষায় রচিত না হবার কারণে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় এ উপন্যাস এ যাবৎ বিশেষ বিস্তারিত আলোচিত হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পুরুষ চরিত্রগুলো রূপের প্রতি মুগ্ধ। রূপতৃষ্ণা তথা প্রণয়াকাঙ্ক্ষা একটা প্রবল অপ্রতিরোধনীয় বৃত্তি। ফলে রূপজমোহের রূপবহ্নিতে দগ্ধ নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল, ইন্দ্রিয়বহ্নিতে রোহিণী, দেবেন্দ্রনাথ ও হীরা, ভোগবহ্নিতে সীতারাম এদের সকলেরই পরিণতিতে কাজ করেছে রূপজমোহ। নবকুমারের রূপযৌবনে মুগ্ধ মতিবিবি গভীরতর অধর্মের পথে পা দিয়েছে। মোগল হারেম বিজয়িনীর দুর্জয় রূপাকাঙ্ক্ষাতেই নবকুমারকে মতিবিবি পেতে চেয়েছিল। তার পরিণতি হলো নবকুমারের মৃত্যু, সাথে কপালকুণ্ডলারও। মনোরমার প্রতি পশুপতির অদম্য রূপাকাঙ্ক্ষাই তাকে ধর্মাধর্ম ভুলিয়ে দিয়েছে। মৃণালিনীর রূপমুগ্ধ হেমচন্দ্র গুরু হত্যায় উদ্যত হয়েছে। শৈবলিনীর রূপে চন্দ্রশেখরের জ্ঞানব্রত ভঙ্গ হয়েছে। রোহিণীর রূপে গোবিন্দলাল, কল্যাণীর রূপে ভবানন্দ, সন্তানধর্মে এবং শ্রীর রূপে সীতারাম রাজধর্মে জলাঞ্জলি দিয়েছে, প্রফুল্লের রূপে স্বভাব সংযমী ব্রজেশ্বরের আত্মবিস্মরণ। রূপের দাবানলে আত্মদহন ঘটিয়েছে অভীষ্ট লাভ করতে গিয়ে রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে সন্দেহাতীতভাবে। সুর্যমুখীকে তার স্বামী যখন অবহেলা করেছে তখন সে প্রতিবাদ করে নি। স্বামী যখন অন্য নারীতে মোহগ্রস্থ হয়েছে তখন স্বামীকে কুন্দনন্দিনীর

সাথে বিয়ে দিয়ে সে গৃহত্যাগ করেছে। এখানেই তার নীরব প্রতিবাদ। পক্ষান্তরে ভ্রমরের স্বামী যখন রোহিণীর রূপে মজেছে তখন ভ্রমর স্বামীকে আটকানোর জন্য নানা চেষ্টা করেছে। তবে ভ্রমরও সে অর্থে পতিত স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করে না। যতদিন স্বামী পুজ্য ছিল ততদিনই তার পুজো করেছে।

রজনী উপন্যাসে লবঙ্গলতা বাল্যে অমরনাথকে ভালবেসেছিল। সামাজিক কারণে অমরনাথকে সে অপমান করেছে, কিন্তু সমগ্রজীবনই সে অমরনাথকে ভুলতে পারে নি। ঘর সংসার করেছে স্বামীর সাথে কিন্তু দীর্ঘদিন পর অমরনাথকে দেখে বলেছে 'এ জীবনে তো হলো না পরজন্মে যদি তোমাকে পাই।' পশুপতিকে ভালবাসলেও দেশের প্রতি ভালবাসাতেই মনোরমার চিত্ত উদ্দীপ্ত, ফলে দেশদ্রোহী স্বামীর কাছ থেকে সে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। এভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারীসত্তার ক্রমবিকাশ ঘটেছে অনিবার্যভাবে, অনুলেপনের মাধ্যমে।

তথ্যসূচি:

---

১. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী*, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি-১৯৯১, পৃ. ২৪

২. প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৪-২৫

৩. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৬০-৬১

৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *কপালকুণ্ডলা* (ভূমিকা হরিশংকর জলদাস), মুক্তধারা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি-২০১১, ঢাকা-১১০০, পৃ. ৫

৫. বাংলা একাডেমি, চরিতাভিধান, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি-১৯৯৭, পৃ. ২৪৩

৬. শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *বঙ্কিমচন্দ্র*, রঞ্জণ সেনগুপ্ত, এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড,

৭. ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০ ডিসেম্বর-১৯৮৭, পৃ. ৪৬-৪৭

৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪০

৯. প্রাগুপ্ত পৃ. ৫৪- ৫৫

১০. শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রাগুপ্ত পৃ. ৬৪

১১. ড. অরূপকুমার ভট্টাচার্য *উপন্যাস-শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র*, অমর্ত্য প্রকাশ, ৩২ বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, কলিকাতা-৩৪, ২৬ জানুয়ারি-১৯৮৯, পৃ. ৪৯

১২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বিষবৃক্ষ* (ভূমিকা ও সম্পাদনা: ড. সফিউদ্দিন আহমেদ), তিশা বুকস ট্রেড, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা-২০০৯, ঢাকা, পৃ. ২৭

১৩. ড. অরূপকুমার ভট্টাচার্য, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

১৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *কৃষ্ণকান্তের উইল (*সম্পাদনা: অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী), বুকস্ ফেয়ার, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট-২০০১, ঢাকা-১১০০, পৃ. ২৮

১৫. ড. অরূপকুমার ভট্টাচায, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১২৭-১২৮

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উজানে মৃত্যু: বিষয় ও প্রকরণ

গাজী মাহমুদ হাসান*

সারসংক্ষেপ: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা সাহিত্যের একজন সার্থক ঔপনাসিক, ছোট গল্পকার ও নাট্যকার। একইসঙ্গে তিনি একজন নিরীক্ষাধর্মী দার্শনিক। গল্প, উপন্যাস, নাটক সবখানেই তাঁর নিরীক্ষাপ্রবণতা লক্ষণীয়। আধুনিক নাট্যসাহিত্যে তাঁর অবিসংবাদিত অবদান অবশ্যই স্বীকার্য। *উজানে মৃত্যু* তাঁর এ্যাবসার্ডধর্মী একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। নাটকটির বিষয় ও আঙ্গিকপ্রকরণ এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। [Syed Waliullah at the same time a writer and a philoshoper. Novel, Shortstory and Drama in every form he is an experiment oriented artist.His contribution in the field of modern drama is well recognized. ***Ujane mrittu*** one of his famous drama which was written in absurd form.This article aimed to analize its form and content.]

বাংলা নাট্যসাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউলাহর (১৯২২-১৯৭১) উল্লেখযোগ্য নাট্যস্রষ্টা। আধুনিক নাট্যকার হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য সুচিহ্নিত। তাঁর নাটকের ভাষাশক্তি অমেয়, সংলাপ ভিন্নধর্মী। তিনি সংলাপে ব্যবহার করেন স্বল্পদৈর্ঘ্য বাক্য, যা কাব্যিক ব্যঞ্জনায় তীর্যক, অভিব্যক্তিতে সরস এবং একইসঙ্গে তা কৌতুকরসে পূর্ণ। সব মিলিয়ে তাঁর নাটকের ভাষা ও সংলাপ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও চরিত্রানুগ।

'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক স্তম্ভপ্রতিম কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। 'কল্লোলে'র ধারাবাহিকতা তাঁর ভিতরে প্রবাহিত। ওয়ালীউল্লাহর নাটকের কেন্দ্রমূলে রয়েছে উন্মুখ প্রবৃত্তি আর মনোভাবের বিশ্লেষণ। আছে জীবনের গভীর ব্যঞ্জনা ও প্রতীকধর্মিতা। *উজানে মৃত্যু* সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সর্বশেষ নাট্যকর্ম *উজানে মৃত্যু ডেথ আপ স্ট্রিম* এর ইংরেজি অনুবাদ। একাঙ্কিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় সমকাল পত্রিকায়।'[১] *বহিপীর* ও *তরঙ্গ ভঙ্গ* নাটকে নাট্যকারের সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে। *উজানে মৃত্যু* একাঙ্কিকায় নাট্যকার ব্যক্তিমনের প্রগাঢ় অনুভূতির বিশ্লেষণে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। তা করতে এ্যাবসার্ড ফর্ম ব্যবহার করেছেন। সামাজিক কিংবা পারিবারিক সমস্যায় নিপতিত ব্যক্তি তার অস্তিত্বের তীব্র সংকটমুহূর্তে যে নিভৃতচিন্তায় মগ্ন হয় তার মানসপর্যটনকে লেখক তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন *উজানে মৃত্যু* একাঙ্কিকায়।

ইংরেজি সাহিত্যে আঙ্গিক হিসেবে একাঙ্ক নাটক বহু ব্যবহৃত। বিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে এর চর্চা দেখা যায়। পঞ্চমাঙ্ক নাটক ও একাঙ্কিকার মধ্যে পার্থক্য শুধু আকারগত নয় শ্রেণিগতও। পঞ্চমাঙ্ক নাটকে নাটকীয় ঘটনাবলী পরম্পরাক্রমে বিকশিত হয়। প্রথমাঙ্কে অনাগত কাহিনীর সূচনা বা অতীত ঘটনাবলী বর্ণনা দ্বারা নাট্যকার নাটকীয় ঘটনাস্রোতকে কেন্দ্রিভূত করেন। কিন্তু একাঙ্কিকায় নাটকীয় চরম পরিণতি সামান্য পূর্বমুহূর্তে সংঘটিত হয়। সুতরাং যবনিকা ওঠার পরই দ্রুত গতিতে ঘটনাপ্রবাহ বিস্তার লাভ করে। একাঙ্ক নাটকের প্রারম্ভে ঘটনাপুঞ্জ শান্ত বা বিক্ষুব্ধ দুই ধরনের হতে পারে। একাঙ্ক নাকটে দুই বা

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ততোধিক চরিত্র থাকলেও একটি বিশেষ চরিত্রের বিকাশই নাট্যকারের মুখ্য বিবেচনা লাভ করে। স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চরিত্রগুলি পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাটকীয় চরম পরিণতিকে সম্ভাবিত করে। নাটকীয় ঘটনাপুঞ্জের সাহায্যে কুশীলবগণের বিভিন্ন ধারণা বা কথাবার্তায় নাটকীয় বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়।

গাঠনিক বৈশিষ্ট্যে *উজানে মৃত্যু* একাঙ্কিকা ও নাট্যরীতিতে এ্যাবসার্ড। ড. অজিতকুমার ঘোষ এ্যাবসার্ডের পরিচয়দান প্রসঙ্গে লিখেন:

> এ্যাবসার্ড শব্দের অর্থ যা স্বভাব বিরুদ্ধ, যুক্তি ও পারম্পর্যরহিত, বিরূপ বিসদৃশ ও বিপরীত তাই এ নাটকের রীতিরূপে গৃহীত। এ্যাবসার্ড নাট্যরীতির মধ্যে একটি শূন্যতাবাদী, নেতিবাচক জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। নাট্যরীতি আলোচনার আগে সেই জীবনদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার। জীবন সম্পর্কে প্রত্যয়ের অভাব, জীবনের অস্তিত্ব ও তার পরিণতিতে অনাস্থা, সবরকম মূল্যবোধ সম্পর্কে সংশয়, সর্বব্যাপী এক শূন্যতা, অনিশ্চয়তা ও হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ এসবই হল এই জীবনদর্শনের মূলকথা। এই নেতিবাচক জীবনদর্শনের উদ্ভব হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক আমূল বিপর্যয় থেকে।[২]

বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্র পরবর্তী ক্রমধারার অন্যতম সফল নাট্যকার ছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। নিরীক্ষাপ্রবণতা তাঁর সৃজনমানসের চিরবান্ধব ছিল। জীবনানুভূতি, মানবমনের গহীনের অন্তর্বাস্তবতা, এ্যাবসার্ডিটি, পোড় খাওয়া জীবনের গোপন বেদনার প্রকাশ তাঁর সকল সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মের পরতে পরতে। নাটকের প্রচলিত ছকের বাইরে তাঁর নিঃশব্দ পথ চলা। *বহিপীর* থেকে আরম্ভ করে *তরঙ্গভঙ্গ*, *সুড়ঙ্গ*, *উজানে মৃত্যু* এক একটি নাটক যেন এক একটি হিরকখণ্ড। সাদামাটা দৈনন্দিন জীবন থেকে লেখক কাহিনী, পট নির্মাণ করেন। ধীরে ধীরে প্রবেশ করেন জীবনজিজ্ঞাসার গহীনে। আঁকেন জীবনের বঞ্চনা ও অপ্রাপ্তির ছবি। তাঁর একমাত্র অ্যাবসার্ড নাটক *উজানে মৃত্যু* সম্পর্কে এ কথাটি বেশি প্রযোজ্য। নাটকটির *উজানে মৃত্যু* নামকরণের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় জীবনের এক গভীর দ্যোতনা, জীবনের পরম নিঃসীম স্থায়ী প্রশান্তি। যা মৃত্যুতেই ঠিকানা খুঁজে নেয় জীবনের।

যে জীবনসংগ্রাম মুখর নয় শুধু ভাটির স্রোতের মত প্রবহমান, সে জীবন, জীবন নয়। অন্যদিকে ঊর্মিমুখর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের বিপরীতে বলিষ্ঠ হাতে নৌকা বেয়ে চলাই জীবন। এই নিরন্তর বেয়ে চলার মধ্যদিয়ে জীবন খুঁজে নেয় তার ইপ্সিত গন্তব্য। লক্ষ্যহীন জীবন, জীবন নয়। এখন প্রশ্ন হলো *উজানে মৃত্যু* নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র, নৌকাবাহক, ঊর্মিমুখর তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ স্রোতের বিপরীতে কেনইবা নৌকা বেয়ে চলবে? এ কারণে যে, চলাই তার জীবন। যে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চায় এই বলে যে, বেয়ে চলা কখনোই অর্থহীন নয়।

মানুষের অবিরাম চলমানতা কখনোই অর্থহীন হতে পারে না। কেননা প্রশ্ন সামনে ঝুলে থাকবে– 'পথের শেষ কোথায়, কী আছে পথের শেষে'। তাহলে জীবনের শেষ পরিণতিই কী মৃত্যু? মানুষের সদর্থক বোধ সীমার মাঝে অসীমকে খুঁজে পেতে চায়। অর্থহীনতার মধ্যে অর্থ খুঁজে নিতে চায়। জাগ্রত বিবেক সবসময় অর্থ খুঁজে ফিরে। অন্যদিকে সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত মন বা বিবেক জীবনের সাধারণ কর্মমুখরতার মধ্যেও কোন অর্থ খুঁজে পায় না।

তার সম্ভাব্য গন্তব্য কোথায় সে জেনে নিতে চায়। অজানা পথের যাত্রাকে অশুভ এবং অর্থহীন মনে করে। তারপরও মানুষ বাঁচতে চায়। তবুও কি বাঁচে? কেনই বা সে একগাছা দড়ি হাতে অশ্বথের ডালে নিজেকে সমর্পণ করে। তাকে প্রলুব্ধ করে কোন শক্তি? কিন্তু যে জীবন সব পেয়েছে তবুও কেন সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। আর এটাই বুঝি জীবনের সবচেয়ে গভীর ব্যঞ্জনার দিক, প্রতীকের দিক, অজানা অন্ধকারের দিক।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রায় প্রতিটি লেখায় মৃত্যু প্রিয় প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে। মৃত্যু এবং ট্র্যাজেডি ওয়ালীউলাহর অতি প্রিয়-বিষয়। তাঁর অধিকাংশ রচনার মতো *উজানে মৃত্যু*তেও আরো বীভৎসভাবে মৃত্যুর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। আমরা তাঁর উপন্যাস *চাঁদের অমাবস্যায়* যেমন দেখেছি তেমনি দেখেছি *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসে একজনের কৃত অপরাধে অন্যজন যে নিরাপরাধী তার সাজা হয়। অপরাধীরা পার পেয়ে যায়। *তরঙ্গভঙ্গ* নাটকে আমরা আমিনাকেই তার সন্তান ও স্বামী হত্যায় কাউকে প্ররোচিত করতে দেখি। আজ সে জনতার আদালতে অবনত মস্তকে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। হাকিমের হাতুড়ির শব্দই আমাদের জানিয়ে দেয় তার করুণ পরিণতি। কথায় বলে, Every thing goes to the roots. মাতৃজঠরের নিঃসীম আঁধারে যার শুরু, অজানা অন্ধকার গন্তব্যে তার যাত্রা শেষ। *উজানে মৃত্যু* নাটকটির তিনটিমাত্র চরিত্র: নৌকাবাহক, সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ও কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি। নৌকাবাহক অর্থাৎ একজন গুণটানা মাঝিই এই একাঙ্কের কেন্দ্রীয় চরিত্র। নদীমাতৃক গ্রাম বাংলার পটভূমিকায় এসব চরিত্র লালিত কিন্তু চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে এরা পাশ্চাত্য আলোকে পুষ্ট।

আত্মহত্যা প্রতিভাবানদের জন্য একটা শিল্পের মতো। আর সাধারণ মানুষ! যারা জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত তারাই আত্মহননের পথ বেছে নেয়। কেননা একমাত্র মৃত্যুই পারে সকল হতাশা থেকে মুক্তি দিতে। অনেক ক্ষেত্রে এটা খুব দ্রুত গৃহীত সিদ্ধান্ত হয়। প্রতিনিয়তই আমাদের কামনা বাসনার মৃত্যু ঘটে। আর এ পথ ধরেই আসে ভয়াবহ ঘটনা। প্রচলিত ধর্মবোধ বিশ্বাস, ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা এবং বেঁচে থাকাকে তারা অর্থহীন মনে করে। আর তাইতো একদা সবার অজান্তে অন্ধকার পথে পা বাড়ায়। সৈয়দ ওয়ালীউলাহ *উজানে মৃত্যু*তে Inner reality ও অভিব্যক্তিবাদী চেতনার সার্থক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এ্যাবসার্ড কিংবা একাঙ্ক নাটক এ সূত্রের বাইরে নয়:

> যে কোন আধুনিক নাটকের মতোই *উজানে মৃত্যু*তে ঘটনার বাহুল্য নেই, কাহিনীর আধিক্য নেই- আছে চিন্তার প্রশস্ততা। একজন নৌকাবাহক জীবনযুদ্ধে প্রায় বিপর্যস্ত। নানারকম অসুখ ও দুর্যোগে সে তার স্ত্রী-সন্তান ও জমিজমা হারিয়েছে। এখন সে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়-অনাবিল শান্তি পেতে চায়। সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তির কাছে এ যাত্রা অর্থহীন। তাই সে নৌকাবাহককে তার যাত্রা ক্ষান্ত করতে বলে। কিন্তু কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তির মতে, সব কিছুরই অর্থ আছে-কেননা, সব কিছুর পেছনেই উদ্দেশ্য বা স্বার্থ রয়েছে।[৩]

*উজানে মৃত্যু*র প্রধান চরিত্র হচ্ছে নৌকাবাহক। তাকে কেন্দ্র করেই অপর দুটো চরিত্র আবর্তিত হয়েছে। নাটকের শুরুতেই দেখা যাবে নৌকাবাহক দড়ি দিয়ে নৌকা টানছে এবং ক্লান্তিতে হাঁপাচেছ। জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত নৌকাবাহক সব কিছু হারিয়েছে। তার তিন ছেলে মারা গেছে শান্তশিষ্ট বউ আর বেঁচে নেই। জমিজমা বলতে যেটুকু ছিল কেউ গ্রাস করেছে,

বাকী অর্ধেক পানিতে নিমজ্জিত। নাটকের শুরুতে আমরা দেখতে পাই নৌকা বাহককে, যার দৃষ্টি উড়ন্ত পাখির দিকে। যে উড়ে যাচ্ছে সূর্যের দিকে।

আর এমনি অবস্থায় যে এখন বালি-হাঁসের মতোই কোথাও যেতে চায় নৌকাবাহক। 'কোথাও-না-কোথাও যেতেই হয়। এমন এক সময় আসে যখন না গিয়ে আর উপায় থাকে না।'[৪] এই যেতে চাওয়া আসলে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া। যে মৃত্যু স্বাভাবিক পথে আসে না, আসে কষ্টকর উজান পথে-বালিহাঁস যেমন উত্তপ্ত সূর্যের দিকে উড়ে যায় তেমনি করে। তাই এ মৃত্যু-উজানে মৃত্যু।

> কোনো ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুতে এ জগতের স্বাভাবিক গতি বন্ধ হয়ে যায় না। সাময়িকভাবে তার স্বজনরা দুঃখ প্রকাশ করলেও গাছপালা, নদীতীর, আকাশ, মেঘ সব কিছুই যথানিয়মে চলতে থাকে। কিন্তু মানুষ মরে যায়। নৌকাবাহকও এমনি এক মৃত্যুর শিকার হয়েছে।[৫]

সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তিটি নৌকাবাহকের বাল্যবন্ধু। নৌকাবাহককে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা তার অভ্যাস। সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তির চরিত্র কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তির দ্বারা উদ্ঘাটিত হয়েছে। সে নৌকাবাহককে যাত্রা স্থগিত রাখতে বলে এই কারণে যে, নৌকা চালক হিসেবে সে নিজেও ক্লান্ত। তার মতে এ যাত্রা অর্থহীন। মানুষ তার জীবনকে ভালোবাসে, সে মরতে চায় না। সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি এ আদর্শেই বিশ্বাসী। তাই সে বিশ্রাম নেবার জন্য নৌকাবাহককে বার বার তাড়া দেয়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়:

> শাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি: তোমার সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছে। যারা যায় তারা অকারণে যায় না। নিজের জন্যে না হলেও অন্ততপক্ষে অন্য কারো জন্যে যায়। উদ্দেশ্য একটা থাকেই। তুমি শূন্য নৌকা টানছ, কোথায় যাচ্ছ তাও জান না। এ কি বদ্ধ পাগলামি নয় ? (কণ্ঠের সুর বদলিয়ে, মিনতি করে) আজ সত্যিই বড় গরম পড়বে। কোথাও একটু মেঘের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। একটু হাওয়াও নাই। এখনো যদি বাড়ি ফিরতে না চাও তবে চল নৌকায় গিয়ে সারাদিন বিশ্রাম করি। তা পছন্দ না-হলে তুমি একাই বিশ্রাম কর আর আমি দাঁড় বাই। স্রোতে ভেসে যেতে কষ্ট হবে না।[৬]

সাদা পোশাক পরিহিত চরিত্রটি বৈষয়িক লোক, সে বন্ধুকে বাঁচাতে চায়। তাকে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনতে চায়। কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি নৌকা বাহকের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে তাকে প্রলুব্ধ করে। সেও কয়েকটি মৃত্যুর কথা শোনায়। ডুবন্ত মানুষের মৃত্যুর দৃশ্য অবলোকন করায়। কেননা গভীর দুঃখবোধের কাছে এগুলো ম্লান। কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি একটি মর্মান্তিক গল্প শোনায়:

> কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি : ... ...দুস্থ শোকাচ্ছন্ন ক্রন্দনরত সে-মেয়ে মানুষটির বাহুতে একটি জ্বলন্ত শিক ধরলাম। তারপর তার দিকে তাকিয়ে দেখি আশ্চর্য ব্যাপার! তার কান্না হঠাৎ থেমে গেছে, তার ে
>
> চাখে বিস্ময়ের অন্ত নাই। শুধু তাই নয়, মুখে একটু শব্দও নাই। হঠাৎ সে যেন এমন একটা সত্যের সামনে দাঁড়িয়েছে যার সামনে কান্নাকাটি বা চিৎকার-আর্তনাদের কোন অর্থ নাই। বুঝলেন কথাটা? (সে আবার চলতে শুরু করে।)[৭]

'কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তিটি এভাবেই এই অস্বাভাবিক ঘটনাটিকে স্বাভাবিক বলে চালিয়ে দিয়েছে এবং নৌকাবাহককে প্রলুব্ধ করেছে আত্মহননের পথে। স্মর্তব্য: 'কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি: বড় মজার কথা! সুস্থ-মস্তিষ্ক বিকৃত-মস্তিষ্কের হাতে ধরা পড়েছে। সাধারণ অসাধারণের পাল্লায় পড়েছে।'[৮]

নাটকের অন্তরালশায়ী দার্শনিক অভীপ্সাটিকে আবদুল মান্নান সৈয়দ এভাবে ধরতে চেয়েছেন:

> ছোট এই নাটকটিতে কয়েকটি গভীরার্থবহ শব্দ ছড়িয়ে দিয়েছেন ওয়ালীউল্লাহ্: 'যাওয়া' বা 'যাত্রা', 'কল্পনা','অর্থ ' 'মৃত্যু' 'দুঃখ' 'স্বাভাবিক', 'নৌকা প্রভৃতি। এগুলিই এই রচনার চাবি-শব্দ। যাওয়া বা যাত্রার প্রসঙ্গে আছে প্রথমাবধি, বারংবার। কোথা থেকে আসা, কোথায় যাওয়া-সবই অনিশ্চিত। জন্মের অন্ধকার থেকে মৃত্যুর অন্ধকার অবধি এই যাত্রা, অনিশ্চয়তা ভরা, উদ্দেশ্যহীন, গন্তব্যহীন। কিন্তু কেন উদ্দেশ্যহীন, কেন গন্ত ব্যহীন- এই চেতনার কাঁটা সর্বক্ষণ উদ্যত হয়ে আছে। যাত্রা- এক স্থান থেকে অন্য স্থানে- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রিয় থিম: এ সব সময়ই প্রশ্নচিহ্নিত; জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্নে আকীর্ণ।[৯]

'আলোচ্য নাটকটির তিনটি চরিত্রই প্রতীক-ধর্মী। নৌকাবাহক জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত, সর্বস্বান্ত হয়ে সে আজ নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে চায় অর্থাৎ মৃত্যু-চেতনা তাকে আচ্ছন্ন করে বসে। সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি শুদ্ধতার প্রতীক, সে নৌকাবাহককে নানাভাবে মৃত্যুর পথ থেকে সরে দাঁড়াতে বলে-বিশ্রাম নিতে বলে। কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি চক্রান্তকারী বীভৎসতার প্রতীক, সে নৌকাবাহককে তার ক্লান্তিকর যাত্রা অব্যাহত রাখতে বলে-মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়।'[১০] প্রকৃতপক্ষে কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি নৌকাবাহকের মৃত্যুলীন জীবনদর্শন উদ্ভাসিত করেছেন। বলাবাহুল্য *উজানে মৃত্যুতে* আধুনিক জীবনবোধজাত নিঃসঙ্গতা, প্রবঞ্চনা, হতাশা, মৃত্যুচেতনা নাট্যিক কৌশলে দেখানো হয়েছে। নৌকাবাহক ও দু'জন সাদা-কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি আসলে দুই বিপরীত দর্শনের প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব করছে।

আবেগমুক্ত ও নির্লিপ্ত ভাষাভঙ্গী ব্যবহৃত হয়েছে *উজানে মৃত্যু* নাটকে। এখানে বিদেশি শব্দের ব্যবহার নেই বললেই চলে। চেতনাপ্রবাহ প্রকাশ উপযোগী ভাষারীতিতে গড়ে উঠেছে *উজানে মৃত্যুর* সংলাপ। বাহ্যিকভাবে মনে হয় তিনটি চরিত্রের সংলাপ পরস্পর বিরোধী, কিছুটা এলোমেলো, প্রায়বিচ্ছিন্ন এবং পুনরাবৃত্তির দোষে দুষ্ট। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নিজ নিজ চিন্তা চেতনা বা আদর্শ প্রকাশের ক্ষেত্রে এরা স্বভূমিকায় সক্রিয়। এ্যাবসার্ডের প্রকাশভঙ্গিই এ রকম। উদাহরণত একটা অংশ উদ্ধৃত করছি:

> 'নৌকাবাহক: বাঁশে বিদ্ধ হয়ে মরেছিলো লোকটা। ব্যথা লাগবে বলে কাউকে বাঁশটা বের করতেও দেই নাই। কী ভয়ানক মৃত্যু, মরতে তিনদিন তিনরাত লেগেছিল।
>
> কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি: সামান্য কৌতূহলভরে কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি নৌকাবাহকের মৃতদেহের পাশ দিয়ে হেঁটে, একবার গলা বাড়িয়ে দেখে, তার সত্য-অবস্থা নির্ণয় করে। তারপর সে কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। সে যখন অবশেষে মঞ্চ ত্যাগ করে তখন নেপথ্য হতে

> সাদাপোশাকে পরিহিত ব্যক্তির কন্ঠ শোনা যায়। অন্যদিকে সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তির কাছে তখনও সবকিছু স্বাভাবিক মনে হয়। এবং নৌকাবাহকের আচরণ তার কাছে অর্থহীন মনে হয়।
>
> শাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি: এই! কী মুশকিল! আবার কী হল তোমার? বললাম সময় নাই . . কী! অমন চুপ করে আছো কেন? এসবের সত্যি কোনো মানে হয় না বলছি! এই! এই![১১]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মঞ্চ পরিকল্পনার কৌশল এই একাঙ্কটিতে আমরা ব্যাপকভাবে দেখতে পাই। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাউদ্ভাসিত মঞ্চ এবং নিস্তব্ধ পরিস্থিতি সৃজনের মাধ্যমে নাটকীয় আবহ তৈরির কৃৎ কৌশল স্মরণীয় নির্দেশনা: ‘শীঘ্র নেপথ্যে একটি মানুষের হাঁপানির আওয়াজ শোনা যায়, আওয়াজটি ক্রমশ উচ্চ হয়ে ওঠে। এবার অস্পষ্ট আলো দেখা দেয়। দিনাগমন শুরু হয়েছে।’ আলো ও শব্দ এ দুইয়ের ব্যাপারে নাট্যকারের সচেতনতা লক্ষণীয়। সংলাপের শুরুতে ক্রিয়াভঙ্গীর উল্লেখ অভিনয় কৌশলে খুব সহায়তাকারীর ভূমিকা রাখে। লক্ষণীয় আমাদের আলোচ্য নাটকটি দিবাভাগে শুরু হয়েছে, শেষ হয়েছে সূর্যাস্তের লালচে আভায়। জীবনের শুরু যেখানে আলোতে সমাপ্তি হয়তো নিকষ কালো অন্ধকারে, না ফেরার কোন অজানা গন্তব্যে। মুদ্রার এপিঠ ওপিঠের মত জন্ম, মৃত্যু, বেড়ে ওঠা, সংগ্রাম। পরিণতিও ঠিক নির্দিষ্ট গন্তব্যে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর *উজানে মৃত্যু* নাটকে সংলাপ সৃষ্টিতে অসাধারণ সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট উল্লেখযোগ্য সংলাপ ধরা পড়েছে এভাবে:

> নৌকাবাহক: (জেগে উঠে) না, কোথাও-না-কোথাও যেতেই হয়। এমন এক সময় আসে যখন না গিয়ে আর উপায় থাকে না। স্ত্রী, সন্তান হারিয়ে নৌকাবাহক বেঁচে থাকার সাধ হারিয়ে ফেলেছে। তার মধ্যে মৃত্যু চেতনাও দানা বেঁধেছে। বেঁচে থাকার পুনরাবৃত্তি তার কাছে অর্থহীন।
>
> কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি: আপনি প্রলাপ বকছেন। তবে এ-সব তামাশার প্রয়োজন কী ছিল? তবে ঘরে থাকেন নি কেন এবং আবার বিয়ে করে নতুন বউয়ের চোখের দিকে তাকান নি কেন? সে-চোখে কখনো তারতম্য ঘটে না। তারপর ছেলেপুলে করতেন, অনেক ছেলেপুলে। কিছু মরে গেলেও একেবারে শূন্য হাত যেন না হয়।
>
> নৌকাবাহক: (পূর্ববৎ আপন মনে) অবশ্য ঘরেই থাকতে পারতাম। শান্ত-শিষ্ট একটি মেয়েকে আবার বিয়ে করতে পারতাম। তারপর অনেক ছেলেমেয়ে হত। কিন্তু ওসব কিছু করি নি। তাতে কেবল পুনরাবৃত্তি হত এবং পুনরাবৃত্তির মতো সোজা জিনিস আর কিছু নাই। ... ... কিন্তু তবু আমি বেরিয়ে পড়ি। কারণ কেমন মনে হয়েছিল, সেখানে কোথাও যেন ভুল আছে, কোথায় একটা ফাটল আছে, একটা অদৃশ্য শক্তি আছে যা সবকিছু শুষে নেয়। অদৃশ্য মহাশক্তির কালো হাত সত্যই বড় ভয়ংকর।

শাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি: সব কল্পনা! তুমি ভাবছ গ্রামটি চেন; কারণ তুমি এ-কথা বিশ্বাস করতে চাও যে, তুমি জান কোথায় তুমি যাচ্ছ আর গ্রামটি তোমার পথে একটি সুপরিচিত চিহ্ন। তারপর নৌকাবাহক তার গন্তব্য খুঁজে পায়।

নৌকাবাহক: (এখনো তাকে না শুনে) আর আমি ভেবেছিলাম আমি শুধু পালিয়ে যাচ্ছি। এক প্রান্তর থেকে অন্য প্রান্তরে। জানি না নৌকাটা কেন টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু মানুষ যখন এক প্রান্তর থেকে অন্য প্রান্তরে যায় তখন কিছুতেই কোনো অর্থ থাকে না। অথবা হয়তো নৌকাটির জন্য মনে হচ্ছিল তবু কোথাও যেন যাচ্ছি সব জেনেও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া মুশকিল।[১২]

নাটকটির সংলাপের এই আপাত অসংলগ্নতার প্রসঙ্গে সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন:

> *উজানে মৃত্যু*তে আপাতদৃষ্টিতে কোনো বিষয়বস্তু বা ঘটনা নেই। তবে অন্তর্নিহিত একটি মেজাজ এবং মেসেজ-বাণী-নিশ্চয়ই রয়েছে। লেখক যখন মনে করেন জীবনই যেখানে অর্থহীন সেখানে মানুষের সংলাপে অর্থহীনতা ও অসংলগ্নতা থাকা অস্বাভাবিক নয়, কারণ অযৌক্তিকতাও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই মহাবিশ্বে মানব-অস্তিত্বের আপাত উদ্দেশ্যহীনতা এই নাটিকার চরিত্র তিনটির অসংলগ্ন সংলাপে ধরা পড়ে।[১৩]

'বলা বাহুল্য, *উজানে মৃত্যু*তে আধুনিক জীবনবোধজাত নিঃসঙ্গতা, প্রবঞ্চনা, হতাশা, মৃত্যুচেতনা নাট্যিক কৌশলে দেখানো হয়েছে-নৌকাবাহক ও দু'জন সাদা-কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তির প্রতীকে।'[১৪] এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে আট 'বছর আগের একদিন' কবিতা সেখানে একজন আত্মহত্যা করে লাশ কাটা ঘরে শুয়ে আছে টেবিলের উপরে। কিন্তু তার মৃত্যুর কোন কারণ ছিল না। বধু শুয়ে ছিল পাশে, প্রেম ছিল, তবুও জ্যোৎস্নায় দেখল কোন ভূত। আর তাইতো উটের গ্রীবার মত কোন এক নিস্তব্ধতা এসে তাকে চুপি চুপি জ্যোৎস্না শোভিত রাতে বের করে এক আত্মঘাতী নিকষকালো অন্ধকার পথে। *উজানে মৃত্যু* নাটকে নৌকাবাহক তার স্ত্রী সন্তান হারিয়ে সেও সাংঘাতিক পথে পা বাড়িয়েছে। নৌকাবাহক ও কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তির সংলাপ অনুসরণ করা যাক:

নৌকা বাহক: আশ্চর্য! আমি এমন পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি। (আপন মনে) আমি ভেবেছিলম, আমি কোথাও যাচ্ছিলাম না, উদ্দেশ্যহীনভাবেই চলছিলাম! কিন্তু ঐ যে! অসীম আকাশ আর উন্মুক্ত প্রসারিত ধরণীর প্রান্তে: একান্ত নিরাপদ, একান্ত নিশ্চিন্ত ! না, চোখের ভুল নয়।

কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি: আরে জেগে উঠুন। মনে হচ্ছে আপনার মতিভ্রম ঘটেছে।

নৌকা বাহক: ঐ যে, সে গ্রাম। অতি উজ্জ্বল তবু তারার মতো তাপ শূন্য। দেখলেই বুক জুড়িয়ে যায়।[১৫]

আঙ্গিকগত নিরীক্ষা প্রসঙ্গে সৈয়দ আবুল মকসুদের মন্তব্যটি নির্মম:

> বেকেট, জেনে প্রমুখের দ্বারা ওয়ালীউল্লাহ প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু *উজানে মৃত্যু*তে তিনি যা করলেন তা স্রেফ অনুকরণ। নিরীক্ষার নামে অন্ধ-অনুকরণ, কখনো প্রশংসনীয়

> নয়। যদি মনে করি ওয়ালীউল্লাহর এই নাটিকাটি দ্বারা বাংলাদেশের অন্য নাট্যকারগণও অনুপ্রাণিত হতেন তা হলেও কি এই সাহিত্য কিছুমাত্র উপকৃত হতো? এ ধরনের নতুনত্বের ঐতিহাসিক মূল্য থাকতে পারে আর-কোনো উপকারিতা নেই। এ্যাবসার্ড নাটকের উপযোগী অনেক চমৎকার সংলাপ এতে রয়েছে, কিন্তু তারপরও এটি বাংলা সাহিত্যের একটি খাপছাড়া রচনা বলেই বিবেচিত হবে।[১৬]

মন্তব্যটির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নাটক তো মানুষের জীবনকে ঘিরে, সমাজকে ঘিরে। জীবন কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে অর্থহীন নয়, তাই বলে সচল সজীব জীবনে এ্যাবসার্ডিটির স্থান নেই, তা কিন্তু নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় আবদুল মান্নান সৈয়দের একটি উক্তি: 'এই ছোটো অসম্ভব অর্থগর্ভ (*উজানে মৃত্যু*) রচনাটিতে-এখন মনে হচ্ছে- ওয়ালীউলাহ্‌র সমগ্র রচনার সারাৎসার বীজাকারে প্রোথিত আছে।'[১৭] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নাট্যসাহিত্যে প্রতিভার যে চিহ্ন রেখে গেছেন, ভবিষ্যৎ নাট্যকারদের মাধ্যমে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে তা আরো বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাঁর আবিষ্কৃত পথ ধরেই বাংলা নাট্যসাহিত্য বন্ধন মুক্তির পথ পাবে।। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত দিক থেকে ওয়ালীউল্লাহর *উজানে মৃত্যু* একাঙ্কিকাটি বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

তথ্যসূচি:

১. সিকান্দার আবু জাফর, *সমকাল,* (ঢাকা: ৬ষ্ঠ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০), পৃ.৭২০-৭৩৭

২. ড. অজিতকুমার ঘোষ, *নাটকের কথা,* (কলকাতা: সাহিত্যালোক, ২০০৩), পৃ. ২৫

৩. ড. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক জীবন দৃষ্টি ও শিল্প সৃষ্টি,* (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশনা, ২০০৮), পৃ. ৮২

৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, *উজানে মৃত্যু, (সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্‌র নাটক সমগ্র)* প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ৪০

৫. ড. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক জীবন দৃষ্টি ও শিল্প সৃষ্টি,* (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০০৮), পৃ. ৮৩

৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪১

৭. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৬

৮. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৭

৯. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ,* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৬), পৃ. ৯৪

১০. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪০ ও ৫২

১১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪০, ৪১, ৪৯ ও ৫০

১২. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য,* (ঢাকা: মনন, ২০১১),পৃ. ৩৪২

১৩. সৈয়দ ওয়ালীউলাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৯

১৪. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৪২

১৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৯

১৬. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৪২

১৭. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ,* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৬), পৃ. ৯৪

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

আধুনিকতা ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ড. মোঃ ইব্রাহিম আলী*

সারসংক্ষেপঃ 'আধুনিকতা' শব্দটি বাঙালি জীবন ও সাহিত্যের সাথে সুবচিত হয়ে ওঠে উনিশ শতকের সূচনালগ্নে। আধুনিক বাংলা কাব্যে 'প্রথম বন্ধনমুক্ত প্রমিথিউস' মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-'৭৩)। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মধুসূদন ছিলেন একাধারে নাট্যকার, প্রহসন রচয়িতা, মহাকাব্য রচিয়তা, পত্রকাব্য লেখক, ওড্ রচয়িতা, সনেট ও নীতি কবিতা লেখক। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ, পণ্ডিত, যুগপৎ গদ্য ও পদ্য শিল্পী। তিনি শুধু সার্থক শিল্পীই ছিলেন না, ছিলেন রুচিশীল, প্রতিভাশালী, বিবেকবান, অসাম্প্রদায়িক, উদার, সংস্কৃতিপরায়ণ, বিলাসী, মহৎ হৃদয়ের অধিকারী এবং সর্বতোভাবে আধুনিক মানুষ। এই আত্ম-প্রত্যয়ী শিল্পী ও ব্যক্তিত্বের ছাপ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় মধুসূদনের রচনায়। তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান ও গুরুত্ব মূল্যায়নের অপরিহার্যতা কাল পরম্পরায় স্বীকার্য।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত উনিশ শতকের নবজাগরণের মানস সন্তান। হাজার বছরের বাংলা কাব্যের প্রথাশৃঙ্খল ধারায় তিনিই ছিলেন প্রথম আধুনিক কবি। বিষয়ভাবনা, জীবনার্থ, যুগার্থ এবং প্রকরণ-শৈলীর প্রাতিস্বীকতায় মধুসূদনের রচনা আধুনিকতার শিখরবিহারী; তাঁর যুগোত্তীর্ণ শিল্পপ্রতিভার স্পর্শেই বাংলা সাহিত্য প্রথম পদার্পণ করে আধুনিক বিশ্বের সীমানায়। রেনেসাঁস-উত্তর আধুনিক মানুষের যে বিপুল সম্ভাবনা এবং যে অতলান্ত ব্যর্থতা বস্তুত মধুসূদনের জীবন ও সৃষ্টি তারই রূপক ব্যঞ্জনা। বিষয়বস্তু, কাব্যরীতি, দৃষ্টিভঙ্গি– সর্বত্রই মধুসূদনের বিপ্লবী সত্তার উজ্জ্বল উদ্ভাসন ঘটেছে, যুগের সম্ভাবনা ও ব্যর্থতা তাঁর রচনায় শিল্পিত-ভাষ্যে রূপ লাভ করেছে।[১] এই মহৎ শিল্পীর সৃষ্টি মূল্যায়ন পর্বে রেনেসাঁস ও আধুনিকতা সম্পর্কে স্বল্পব্যাপ্ত ধারণা গ্রহণ প্রাসঙ্গিক ভাবেই অপরিহার্য।

রেনেসাঁস 'মানব সভ্যতার প্রথম বসন্ত'[২] নামে আখ্যায়িত। ইতালি রেনেসাঁসের মাতৃভূমি। চতুর্দশ শতাব্দীতে এর শুভ সূচনা ঘটলেও পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক জুড়ে তা বিকাশ লাভ করে। পরবর্তীতে প্রায় সমগ্র ইউরোপ জুড়েই রেনেসাঁসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এর প্রভাবের ফলেই সংঘটিত হয়– জার্মানিতে রিফরমেশন আন্দোলন, ফরাসিতে ফরাসি বিপ্লব ও ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব। এ সব আন্দোলন ও বিপ্লব মানবসভ্যতার প্রগতিশীল আন্দোলনে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় অভিষিক্ত হয়।

রেনেসাঁস শব্দটি ফরাসি। 'রিনাসচিতা'র অর্থ পুনর্জন্ম। ইতালিতে একে বলা হয় সিনকোসেন্টো। জার্মানিতে রিফরমেশন। যা একসময় ছিল, তারই পুনর্জন্ম।[৩] অধিকাংশের মতে, রেনেসাঁসের প্রধান লক্ষণ হলো দিব্য চেতনার পরিবর্তে মানবিক চেতনা, ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্তে বস্তুজ্ঞান, পারলৌকিক বা অলৌকিক কার্যকারণ পরম্পরার পরিবর্তে ঐহিক বা প্রাকৃতিক কার্যকারণ পরম্পরা, ভক্তির পরিবর্তে যুক্তি, আপ্ত-বাক্যের পরিবর্তে প্রমাণসিদ্ধ বাক্য, অথোরিটির পরিবর্তে লিবার্টি। প্রাচীন গ্রিসে এসব ছিল।[৪] প্রাচীন গ্রিসের এসব বিদ্যা ও আদর্শ খ্রিস্ট-ধর্মের প্রবর্তনের ফলে এক সময় রহিত হয়। খ্রিস্ট-ধর্ম ও চার্চ মানবমুক্তির

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করে দেয়। ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রবক্তাগণ তথা পেত্রার্কা, বোকাচ্চিও, এরাজমুস, রোবার্তো, পোগ্গিও, ফাইলেলফো, লিওনার্দো ব্রুনি, লরেঞ্জা ভাল্লা প্রমুখ ব্যক্তিত্ব প্রাচীন বিদ্যা চর্চার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। এ-বিদ্যা চার্চশাসিত বিদ্যার সাথে ঠিক মেলে না। ধর্মের সাথে মেলে না বলে এর নাম দেওয়া হয় মানবিকতাবাদ বা হিউম্যানিজম।[৫] আর রেনেসাঁসের প্রবক্তাগণকে বলা হয়, হিউম্যানিস্ট। গ্রিক-লাতিন, আরবি-হিব্রু প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার করে এর নির্যাস গ্রহণ এবং তা অনুবাদ ও প্রকাশনায় তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। এ জন্য রেনেসাঁসকে বলা হয়েছে, 'রিভাইভ্যাল অব ক্লাসিক্যাল লার্নিং'।[৬] তবে হিউম্যানিস্টদের প্রাচীন বিদ্যার দিকে প্রধাবিত হবার কারণ, তা ছিল খ্রিস্টধর্ম ও তার ভাবাদর্শ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত একটা বিদ্যা।[৭]

প্রাচীন বিদ্যা চর্চার সাথে সাথে শিল্প-সাহিত্যের সুপ্রশস্ত পথ নির্মিত হয়েছিল রেনেসাঁস যুগে। সৌন্দর্যের নৈসর্গিক ছোঁয়ায় দীপ্ত হয়ে উঠল এ-যুগের শিল্প। ধর্মের সুনির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করে মুক্তির আস্বাদ লাভ করলেন শিল্পী সাহিত্যকরা। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ-যুগের শিল্পী-সাহিত্যিকরা নতুন নতুন মাত্রা সংযোজন করলেন। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, পেরুজি, পিসানো, রাফায়েল প্রমুখ শিল্পীর সৃষ্টি শিল্পকর্ম সৌন্দর্যের আকরে পরিণত হলো। তাই বলা হয় যে, ইতালীয় রেনেসাঁস বহুলাংশে বুদ্ধিবাদ ও নন্দনতত্ত্ব নির্ভর।[৮]

রেনেসাঁস আনে মানবমুক্তি, চিন্তারাজ্যের ব্যাপক স্বাধীনতা; র‌্যাশনিলিজম বা যুক্তিবাদ ছিল রেনেসাঁসের বীজমন্ত্র।[৯] চিন্তারাজ্যের স্বাধীনতা ও যুক্তিবাদ সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্যালিলিও এবং বেকনের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের পথ উন্মুক্ত করল। স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হল। নতুন নতুন আবিষ্কারে ইউরোপ ঋদ্ধ হয়ে উঠল। ফরাসিতে রুশো, ভলটিয়ার প্রমুখ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করলেন। অনিবার্য পরিণতিতে সংঘটিত হলো ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯)। প্রায় চার'শ বছরের বিবর্তনের মধ্যদিয়ে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ভিত গড়ে ওঠে। হিউম্যানিজম, শিল্প-সাহিত্যের বিশুদ্ধ সৌন্দর্য অনুধাবন, রিফরমেশন, বিজ্ঞান ও দর্শনের অগ্রগতি, শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে এর ভিত্তি। অবশ্য এর অনেক আগেই 'দর্শনে, বিজ্ঞানে, নীতিশাস্ত্রে, সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্মে, য়ুরোপে যুগে যুগে নানাভাবে সংঘাত ঘনিয়েছে। এলোমেলো তরঙ্গ বিক্ষোভে সে দিশেহারা হয়েছে। আবার পরক্ষণেই ঋজুমেরুদণ্ড নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার সাহিত্যে এই পরিচয় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সবদেশেই এটা হয়ে থাকে। ভারতেও তার অন্যথা হয়নি।'[১০]

তবে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কারণগত উপাদান সংক্রান্ত আলোচনায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অভিঘাতই সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে।[১১] ডেভিড কফের ভাষ্যানুযায়ী, ভারতবিদ্যার বিদেশী পথিকরা বৃটিশ প্রশাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচ্যবিদ্যার নিবিড় চর্চা শুরু করলে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা হয়।[১২] তাছাড়া পাশ্চাত্য-শিক্ষা, সংস্কৃতি, দর্শনের প্রসারই বঙ্গীয়-রেনেসাঁসের মূল কারণ। এ প্রসঙ্গে সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

> সুষ্ঠু ইংরেজী চর্চার মাধ্যমেই মূলত ইউরোপের সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। অতঃপর এই নূতনতর বিদ্যার সংস্রব ও সাযুজ্যে আমাদের সমগ্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ইতিবৃত্তে বস্তুত বৈপ্লবিক প্রসার, প্রস্ফুরণ ও সৌষ্ঠব সম্ভবপর হয় এবং যা কার্যত গড়ে তোলে এদেশীয় রেনেসাঁসের পটভূমি।[১৩]

যে কারণেই বাংলার রেনেসাঁসের সূত্রপাত হোক না কেন, তা পরবর্তীতে বাঙালি শিক্ষিত সমাজ-মানসে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়। সমাজ-ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য-শিল্প, দর্শন-ইতিহাস, বিজ্ঞান– সকল ক্ষেত্রই পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের প্রভাবে হয়ে ওঠে উদ্ভাসিত। আবহমানকালের বাঙালি হিন্দু সমাজের নানা কুপ্রথা মানবতাবাদী রামমোহনের হৃদয়ে গভীর ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। সতীদাহ প্রথা বিলোপে শুরু হয় সংগ্রাম। তাছাড়া বহু-ঈশ্বরবাদী হিন্দুধর্মের অসারতার যুক্তি তুলে ধরে তিনি প্রচার করেন– একেশ্বরবাদী হিন্দু ধর্ম দর্শনের। ডিরোজিও (১৮০৯–১৮৩১) এবং ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি ও দর্শন চর্চার প্রভাব বাংলার সমাজজীবনে প্রচণ্ড অভিঘাতরূপে দেখা দেয়। কৌলীন্যপ্রথা, বিধবা-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ রদ, বহু-বিবাহ রদ– প্রভৃতি সামাজিক আন্দোলনে উনিশ শতকের বাংলা হয়ে ওঠে আন্দোলিত। জার্মানির রিফরমেশনের আদলে বাংলাতেও সংঘটিত হয় ধর্মসংস্কার আন্দোলন। রেনেসাঁসের প্রভাবে বাঙালি জীবন ও বাংলায় যে নবজাগরণ ঘটে, সে প্রসঙ্গে অন্নদা শঙ্কর রায় বলেছেন–

> রেনেসাঁস এসেছিল মানুষকে সর্বদেশে সর্বপ্রকারে মুক্ত করতে– শাস্ত্রের হাত থেকে, দেবতার হাত থেকে, পুরোহিতের হাত থেকে, কুসংস্কারের হাত থেকে, কুপ্রথার হাত থেকে, অসাম্যের হাত থেকে।[১৪]

রেনেসাঁসের খণ্ডিত ব্যাপ্তির মধ্যে 'আধুনিকতার' বীজ লুকায়িত। ঐতিহ্যের নবমূল্যায়ন করে যা কিছু মানবিক তাকে গ্রহণ এবং মানবিকতা বহির্ভূত যা কিছু তাকে বর্জন করাই 'আধুনিকতা'। যুগোপযোগী সৃজনশীলতাই তার ধর্ম, গতিশীলতাই তার প্রাণ। স্থানুত্ব কোন অবস্থাতেই আধুনিকতা নয়। কালগত গরজেও তা রূপে ও স্বরূপে নতুনত্ব লাভ করতে পারে। আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে আবু সয়ীদ আয়ুব বলেছেন- 'নতুন যুগের মনন ও হৃদয় প্রতিন্যাস যে সাহিত্যের আবর্জিত মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয় সেই সাহিত্য আধুনিক।'[১৫]

জীবনানন্দের মতে, 'নতুন সময়ের জন্য নতুন ও নতুন ভাবে নির্ণীত পুরোনো মূল্য, নতুন চেতনা ও নতুন ভাবে আবিষ্কৃত পুরোনো চেতনার যে একান্ত দরকার শিল্পে ও জীবনে'[১৬] তা-ই আধুনিকতা।

আবার রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, 'কাজটা সহজ নয়। কারণ পাঁজি মিলিয়ে মডারনের সীমানা নির্ণয় করবে কে?'[১৭] তাঁর মতে, 'নদী যেমন বাঁক নেয় সাহিত্যও তেমনি গতি বদলায়।.....সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডারন। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।'[১৮]

আধুনিক বাংলা সাহিত্য পাশ্চাত্য ভাব, কল্পনা, রচনারীতি ও মানসিকতার দ্বারা যতই প্রভাবিত হোক না কেন, এ সাহিত্য স্বকালেও নিজস্ব কুলবন্ধন ত্যাগ করে নি। রবীন্দ্রনাথ যাকে স্বীকরণ অর্থাৎ আত্মীকরণ বলেছেন, সেই মনোভাবের বশেই বাঙালি ইংরেজি–ভাষাবাহিনী বাগদেবীকেও শ্রদ্ধার্ঘ দিয়েছিল। অর্থাৎ 'উনিশ শতকের বাঙালি পাশ্চাত্যের আধুনিক সাহিত্য তার কথারস, কাব্যরস, দ্বন্দ্ব সঙ্কুল নাট্যচিত্র তার মন ও মননের বিচিত্র ধারাকে নিজের জীবনে না হোক অন্তত সাহিত্যে গ্রহণ করেছিল;'[১৯] 'কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভিন্ন আদর্শকে নিজ স্বভাবের অনুকূলে পরিবর্তিত করে নিয়ে'।[২০]

মধ্যযুগের সাহিত্য ধর্মসম্প্রদায় কেন্দ্রিক বলে তাতে কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা ফুটে ওঠবার কোন অবকাশ ছিল না। তা ছিল যুথবদ্ধ গোষ্ঠী চেতনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কিন্তু ইউরোপীয় ঐতিহ্য তার রেনেসাঁস, রিফর্মেশন ও বিজ্ঞানপন্থী আধুনিকচেতনা ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির মনে সর্বপ্রথম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সিলমোহর মুদ্রিত করেছিল। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রধান প্রকাশ ঘটল দু'ভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বা Individuality- র আবির্ভাব এবং মর্ত্য চেতনার স্পর্শ। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির অন্যান্য আধুনিক ক্রিয়াকর্মে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মর্ত্য চেতনার প্রবল অধিকার সূচিত হল।[২১]

১৭৫৭ সালে পলাশীর পরাজয়ের পর যেমন বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে, তেমনি বাঙালি সংস্কৃতির উপরও খুব বড় ধরনের আঘাত আসে। ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত এবং মধ্যস্বত্বভোগী নব্য বাঙালি শ্রেণি জমিদারদের অভ্যুদয় ঘটে। ফলে বাংলাদেশ ও বাঙালি জীবনে এক ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। অর্থাৎ গ্রামভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ রদবদল ঘটে। কৃষি নির্ভর গ্রামীণ সভ্যতার স্থানে গড়ে ওঠে নগর সভ্যতা, শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মাধ্যমে প্রাচীন যুগের অবসান ঘটে– আধুনিক যুগ ও নবীন জীবনচেতনা বাঙালির দুয়ারে করে করাঘাত।

রেনেসাঁস উনিশ শতকে বাংলার নবজীবন জাগরণে বর্ণিল জোয়ার এনে দেয়। বাংলা তথা ভারতবর্ষের রেনেসাঁসের মানসসন্তান রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪–১৮৩৩)। তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে আবাহন করেন। এজন্য শিবনারায়ণ রায় বলেন, 'অসামান্য অস্মিতার জন্য রামমোহন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের আদি-পুরুষ।'[২২]

তাছাড়া ১৭৮৪-তে উইলিয়াম জোন্সের উদ্যোগে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা, ১৮০০-তে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা, ১৮১৭-তে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা, ১৮১৮-তে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ, ১৮২৬-এ হিন্দু কলেজে ডিরোজিও'র শিক্ষক হিসেবে যোগদান, ১৮৩৫-এ মেকলের উদ্যোগে সরকারিভাবে ইংরেজি শিক্ষানীতি গ্রহণ– প্রভৃতি ঘটনা প্রবাহ বাংলার রেনেসাঁস-এর কালপর্ব বিবেচনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। ইউরোপীয় রেনেসাঁস যেমন দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ফসল, বাংলার রেনেসাঁসকে তেমনি সুনির্দিষ্টকালের গণ্ডিতে বিবেচনা করা প্রায় অসম্ভব।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য অর্থাৎ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য মূলত অসীম বৈচিত্র্যসন্ধানী। এই লক্ষণটি উনিশ শতকের সাহিত্যে উত্তর রামমোহনের কাল থেকে ক্রমেই পরিস্ফুট হতে থাকে। মুদ্রাযন্ত্র, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারের নানা আন্দোলন, আধুনিক শিক্ষা, সাহিত্যের নব নব সৃষ্টি প্রেরণা বাঙালি চেতনার বৈচিত্র্যকেই নানাভাবে প্রকাশ করেছে। এই বৈচিত্র্যমুখর আধুনিকতা বাংলা সাহিত্যের যে শাখা পথে বাঙালির মনে প্রবেশ করেছে তার হিসেব নিলে দেখা যাবে শিক্ষা, ধর্ম ও সমাজের নানা সমস্যা উনিশ শতকের গোড়াতেই বাঙালির মনে প্রবল দ্বিধা সংশয় সৃষ্টি করেছিল এবং সেই দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও আন্দোলনের মুক্ত প্রকাশ ঘটল বাংলা গদ্যে এবং পদ্যে।

রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, ভূদেব যে মানসিকতা অবলম্বন করেছিলেন তাতে যুগান্তরের আবির্ভাব সূচিত হয়েছে। ঈশ্বরগুপ্ত রংতামাসার ভাঁড়ামি ও ব্যঙ্গবিদ্রুপের ধুলোট উৎসবে মাতামাতি করলেও তিনিই প্রথম আধুনিক জীবনের কবি। বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল

তার স্বভাবসঙ্গত। অবশ্য কবিশক্তি তাঁর প্রকৃতিদত্ত হলেও শিক্ষা, পরিমার্জনা ও পরিশীলিত মনের অভাবে তিনি স্বাভাবিক রচনাশক্তিকে যথাযথভাবে সৃষ্টিকার্যে প্রয়োগ করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি যে উনিশ শতকের প্রথম যুগ সচেতন কবি তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প।

মাইকেল-হেম-নবীন বাঙালির পৌরাণিক সংস্কারকে বাদ না দিয়ে উনিশ শতকের প্রবণতা অনুসারে দেবদেবী সংঘের বিচিত্র ভাবমূর্তি নির্মাণ করলেন। মধুসূদনের চিত্ততলশায়ী নবযুগের প্রেরণা নবজাগরণের রক্ত শতদলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রেনেসাঁস রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম এই তিনজন বাঙালির সংস্কার ও চেতনার গভীরে প্রবল তরঙ্গ তুলেছিল, কিন্তু মধুসূদনের মতো সমগ্র অন্তর চৈতন্য মথিত করে আর কাউকে Storm and Strange ঝড়ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করতে পারে নি।

সমাজসেবক বিদ্যাসাগর একে বাস্তবরূপ দেয়ার প্রয়াস পান, বঙ্কিম এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় এবং হিন্দু ঐতিহ্য রক্ষায় সচেষ্ট হন এবং ইতঃপূর্বে রামমোহন তাকে ধর্মীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা করেন। রামমোহনের নিকট যা ছিল জ্ঞানের বিষয়, বিদ্যাসাগরের নিকট তাই কর্মমন্ত্র হয়ে ওঠে এবং মধুসূদন তাকেই কাব্যের উপজীব্যরূপে লাভ করেন। এজন্য রামমোহনে বিশিষ্ট যুক্তিনিষ্ঠা, বিদ্যাসাগরে প্রীতি ও সেবা এবং মধুসূদনের মধ্যে প্রাণের অকারণ আবরণ উল্লাস দেখা যায়। উনিশ শতকে জীবনের নানাক্ষেত্রে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি নবজাগণের বাণী নানাভাবে নানারূপে কর্মে ও ভাবে রূপায়িত এবং বাঙালি জীবনকে অপরূপ মহিমায় মণ্ডিত করে তুলেছে।

উনিশ শতকের নবজাগরণের মানসপুত্র মধুসূদন। এই নবজাগরণের ফলে তাঁর চিত্তস্ফুর্তি ঘটে, মানসলোক আশ্চর্য সচকিত হয়ে ওঠে, তিনি নিজের মধ্যে পরম এক শক্তি অনুভব করেন। মানবজীবন তাঁর কাছে অপার রহস্যময় হয়ে দেখা দেয় এবং বিশ্বজগৎ সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্য নিয়ে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের শক্তি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রহরণ যখন বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের সম্মুখে আবির্ভূত, তখন মধুসূদনের গ্রহণশক্তি তা দুই হাতে গণ্ডুষভরে পান করেছিল। একদিকে ঐতিহ্যের প্রতি গভীর অনুরাগ, অন্যদিকে আধুনিকতার শিক্ষায় আপনাকে সমৃদ্ধ করবার প্রতিজ্ঞা তাঁর মনন এবং মেজাজে বিলসিত হয়েছিল। একদিকে পার্থিব ঐশ্বর্য তার হৃদয় উদ্দীপ্ত করেছিল, অন্যদিকে প্রজ্ঞার অপার্থিব ভাব-চেতনা তাঁকে করে তুলেছিল উন্মুখর। তাই কাব্যে এবং নাটকে প্রহসন এবং কবিতায় ইংরেজি এবং বাংলায় গদ্য এবং পদ্য শৈলীতে বাংলা সাহিত্যকে তিনি করলেন অজস্রদানে ঋণী।

মধ্যযুগীয় জড়তা যখন চিন্তা ও চেতনাকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেয় নি, বাংলা গদ্যের যখন পরিপূর্ণ মানস মুক্তি ঘটে নি, কবিতা যখন ঐশ্বর্যের দ্বার প্রান্তে, জাতির হৃদয় যখন নব-জাগরণের কামনায় অধীর, মানবতা যখন অপেক্ষারত, স্বাজাত্যবোধ যখনও কুণ্ঠিত, স্বদেশের মুক্তি যখন আচ্ছন্ন, তখন মধু-চেতনায় জেগেছিল নতুনের উন্মেষ। তাঁর মধ্যে লুকিয়েছিল রেনেসাঁসের অজস্র ধারা। তাকে পরিপূর্ণ করার মানসে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সাহিত্যের ভাব এবং আবেগকে মথিত করে মধুসূদন কালের উপযুক্ত উপহার নির্মাণের সাধনায় ব্রতী হলেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে যে ঐশ্বর্যের বাণী শুনালেন, মাতৃভাষা ও মানবতার যে বাণী বন্দনা করলেন, মধুসূদন তার যেন পরিপূর্ণ রূপ দেবার মানসে আশা এবং অহংকার নিয়ে এগিয়ে এলেন। মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতা অতিক্রম করে

মধুসূদন তাঁর সাহিত্যে এবং জীবনে আধুনিকতার সাধনা করতে লাগলেন। ভাবে, ভাষায়, আঙ্গিকে তিনি বাংলা সাহিত্যে দান করলেন এক অবিস্মরণীয় মহিমা। একাধারে তিনি বহুভাষাবিদ, নতুন জীবন-চেতনার প্রবক্তা, ঐশ্বর্যময় বাণীমূর্তি সাধক বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, ভাষায় নবপ্রাণ সঞ্চারী ভাস্কর, গুরুগম্ভীর শব্দ নিনাদী, শক্তিশালী ঐশ্বর্যময় উপমা উৎপ্রেক্ষা নির্মাণকারী এবং শিল্পসুমধুর সঙ্গীত বৈচিত্র্যের সাধক। তাছাড়া অখণ্ড সৌন্দর্য, বাস্তববাদী, মানবতা চেতনা ও বিপ্লবী জীবন শিল্পীরূপে বঙ্গবাসীর আশীর্বাদপুষ্ট মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয় কীর্তির অধীশ্বর হয়ে আছেন। বিশেষ করে কাব্য সাহিত্যে এ সত্য অধিকতর জাজ্বল্য।

মধুসূদনের প্রতিভা বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রবেশিকা। তাঁর সাহিত্যে বিশেষ করে কাব্যের আঙ্গিকের নবতর সংগঠন ও ভাববৈচিত্র্য আধুনিকতার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাজাত্যবোধ, স্বাধীনতা স্পৃহা, দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, যুক্তিবাদ, আত্মমর্যাদাবোধ, যেমন আধুনিকতার তেমনি মধু প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। কালের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে এবং সাহিত্যের শরীর নির্মাণের দিক থেকে মধুসূদনের সাহিত্য আধুনিক।

নির্মিতির দিক থেকে মধুসূদনের ইংরেজি কাব্যসমূহ ও প্রহসনের জীবন-চেতনা অসাধারণ। তাঁর *শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী*তেও এর লক্ষণ সুস্পষ্ট। মধুসূদনের কাব্যের বিষয়বস্তু প্রাচ্য কিন্তু প্রকাশনীতি ও জীবনবোধ পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসারী। ছন্দ, উপমা, সঙ্গীত, ভাষা সৃষ্টি এবং জীবনদর্শন অভিনব। কবির মানবতাবোধ সবার উপরে ক্রিয়াশীল– তাঁর রাবণ ইন্দ্রজিৎ হলো গ্র্যাণ্ড-ফেলো, রাধা হলো মিসেস রাধা, তারা শূর্পণখা অগ্রবর্তীকালের প্রেমিকা, প্রমীলা কালের বিদ্রোহিনী সত্তা এভাবে তাঁর নারীরা হয়ে উঠেছে মর্যাদাশীলা। *তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য* এবং *মেঘনাদবধ* কাব্যের কাহিনী ভারতীয় পুরানগত কিন্তু নির্মাণ কৌশল হোমার-ট্যাসো-দান্তের অনুসারী, *বীরাঙ্গনা* ওভিদের কলাকৃতির অনুসারী *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* ইতালি-ইংরেজি সনেটের ফরম অনুসারী।

নাটক রচনার সূত্র ধরেই বাংলা সাহিত্যের পটভূমিতে মধুসূদনের আবির্ভাব। অবশ্য এর আগে মাদ্রাজে বসে (১৮৪৮ সালের পর থেকে) তিনি পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য সাধনা শুরু করেন। মধুসূদনের কাব্য আলোচনায় ইংরেজি কাব্য কবিতাও প্রসঙ্গত সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোকপাত করা যেতে পারে। মনিকাঞ্চনে ভরা মাতৃভাষাকে অবহেলা করে মধুসূদন ইংরেজি ভাষায় কবিতা লেখা আরম্ভ করেন। তাঁর প্রথম কাব্য *Captive Ladie* (১৮৪৯)। এ কাব্যের আখ্যান ইতিহাস ও কিংবদন্তীর মিশ্রণ। কনৌজরাজ জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তাকে দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজ হরণ করে নিয়ে যায়। জয়চন্দ্র কন্যাকে পুনরুদ্ধার করে দুর্গে আবদ্ধ করে রাখেন। কিন্তু বীরত্বের প্রতি অনুরাগিনী সংযুক্তা পালিয়ে চলে যায় দিল্লীরাজের নিকট। এতে জয়চন্দ্র গভীর অপমান বোধ করেন। অতপর পৃথ্বিরাজ গজনিপতি মোহাম্মদ ঘোরী কর্তৃক আক্রান্ত হলে জয়চন্দ্র জামাতার সাহায্যে অগ্রসর হন নি, যুদ্ধে দিল্লীশ্বর নিহত হন। এ কাহিনী খানিক ইতিহাস খানিক কল্পনা। এর নির্মিতির একটি নবতর বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়–

> মাইকেলের কলমে গল্পটির পুরাতন ঝোঁক বদলে গেল। যুদ্ধ বিগ্রহ সংকুল প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক নির্ভরতার উপাখ্যানে রূপান্তরিত হয়েছে। নিজের পছন্দ অনুসারে বিবাহ করব, কেবল এই শপথের জন্য রাজকন্যা কতখানি কষ্টই না বরণ করলেন।[২৩]

মাইকেল ধর্মান্তরিত হয়ে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জীবনে সচ্ছলতা হারিয়েছিলেন। কিন্তু কবি ব্যক্তিত্বে, বিষয়ে, ভাষায়, অলঙ্কারে, উপমা-উৎপ্রেক্ষায়, ছন্দে ও বিলাসে বিজয়ী। এর সূত্রপাত এই কাব্য থেকেই:

Yes like That star which on the wilderness
of vasty ocean. woos the anxious eye
of lonely mariner, and woos to bless
For there be hope writ of her brow on high
He rocks not darkling waves nor fears the lightless sky.[24]

সুদূর প্রবাসে থেকেও তিনি দেশের ভাষা, দেশের আচার প্রভৃতির শুদ্ধরূপের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন এবং গভীরভাবে তাদের আকাঙ্ক্ষা করতেন অবচেতনায় তার প্রমাণ মিলবে। মধুসূদন *Visions of The past* কাব্যগ্রন্থে বাংলাদেশের মৃন্ময়ী রূপটিকে তুলে ধরেছেন বর্ণিল বর্ণনায়:

Bengla! on thy sultry plains
Beneath the pillar'd and high arched shade
Of some proud Banyan slumberous hant and cool
Echo in mimic accents mong the Flocks,
Couch'd there in noon tide rest and soft repose
Repeat the deaferning and deaf Thunder'd roar
Of him The royal wonderen of thy woods.[25]

তাছাড়াও মুধসূদনের *Rizia* নামক কাব্য নাট্যেও গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। এটি প্রকাশিত হয়েছিল মাদ্রাজের *ইউরেশিয়ান* পত্রিকায়। *ক্যাপটিভ লেডি'র*, 'সংযুক্তা যথার্থ বন্দিনী আর রিজিয়া দৃশ্যত ভারত সম্রাজ্ঞী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বন্দিনী– হিংসাদ্বেষের কারাগারে বন্দিনী তিনি। প্রাসাদ চক্রান্ত আমির ওমরাহের নিরবছিন্ন ষড়যন্ত্র রিজিয়ার নারী সত্তাকে পিষে মারার চেষ্টা করেছে।'[২৬]

Rizia কাব্য-নাট্যের অন্য দুটি চরিত্র শিরিন এবং লীনা। লীনার সংলাপে কবির দেশপ্রীতি উদ্বেলিত–

My melody voiced Nightingale/ From green Bangla's grove
My land of palmiest grave/ and bluest stream.

রিজিয়ার যে ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ ও নির্ভিক সত্তা Mantiest hert তিনি বারংবার উপলব্ধি করেছেন, তাঁর পরবর্তীকালের *মেঘনাদবধ* কাব্যের প্রমীলা এবং *বীরাঙ্গনা* কাব্যের একাধিক নায়িকা প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছে। দেশপ্রেমের অত্যুঙ্গ প্রকাশ এবং ব্যক্তিত্বের অপরিমেয় বিকাশ যেমন মধুসূদন, তেমনি তাঁর রচনাসম্ভারকে আধুনিকতার মর্যাদা দান করেছে।

নাটক ও প্রহসন রচনায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও কৃতিত্ব স্বল্প পরিসরে উপলব্ধি করা যেতে পারে। মধুসূদনের তাঁর নাটকে পাশ্চাত্য আবহাওয়া সঞ্চারের মাধ্যমে ও নিগূঢ় উপলব্ধি থেকে নাটকের প্লট, বিষয়, ভাষা বিন্যাস ও চরিত্র নির্মাণে ছিলেন সচেষ্ট। নাট্যভাবনায় মধুসূদন

প্রাচ্য অলঙ্কার শাস্ত্রের রীতি পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন, The dicta of Mr. Viswanth of Sahitya Darpan এর পরিবর্তে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন The Great Dramatist of Europe কে। নাটকের কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ প্রতিটি বিষয়েই মধুসূদন গভীর অভিনিবেশ প্রযুক্ত করেছিলেন। বাংলা সংস্কৃত ইংরেজি ছাড়াও পৃথিবীর একাধিক ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল অসাধারণ। যার ফলে সংস্কৃত নাট্যকলার ঐতিহ্য পরম্পরা যেমন তাঁর অধিগত ছিলো তেমনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের গতি-প্রকৃতিও ছিলো করতলগত।

পুরাণকাহিনী অবলম্বনে *শর্মিষ্ঠা* (১৮৫৯) নাটক ব্যতীত মাইকেল পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে *পদ্মাবতী* (১৮৬০), ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে *কৃষ্ণকুমারী* (১৮৬১) নাটক এবং সামাজিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে *একেই কি বলে সভ্যতা* (১৮৬০) ও *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* (১৮৬০) নামক প্রহসন রচনা করেন। এগুলো ছাড়াও মধুসূদন শেষ জীবনে *মায়াকানন* নাটক রচনা করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তবে নাটক হিসাবে তা অন্যান্য নাটকের মতো সার্থকতা লাভ করতে পারে নি।

নাটকের বিষয় নির্বাচনে মধুসূদন যুগপৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। প্রাচ্য কাহিনী অবলম্বনে এবং তৎকালীন অপরিকল্পিত প্লট অথবা দৃশ্যহীন নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে *শর্মিষ্ঠা* নাটকটিকে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৃষ্টি বলে ধরা যায়। *পদ্মাবতী* নাটকে গ্রিক পুরাণের golden apple কাহিনীর ভারতীয়করণ যেমন তাঁর অন্বিষ্ট ছিল, তেমনি *কৃষ্ণকুমারী* নাটকে ভারতীয় কাহিনীর উপরই অর্পিত হয়েছে সমধিক গুরুত্ব। *পদ্মাবতী* নাটকেই মাইকেল প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। তবে এর ভাষারীতি প্রধানত গদ্য।

টডের রাজস্থান থেকে কাহিনীর সারবস্তু গ্রহণ করে তার মধ্যে যুগপৎ Romantic Tragedy ও Historic Tragedy-র প্রাণস্পন্দন প্রবাহিত করে মধুসূদন *কৃষ্ণকুমারী* নাটক রচনা করেছেন। নিকট ইতিহাসকে কাহিনী হিসাবে গ্রহণ করার ফলে মধুসূদনের সচেতন শিল্পীমন নাটকের প্রতিটি ক্ষেত্রেই গভীর অভিনিবেশ প্রয়োগে সক্ষম হয়েছে। দ্বন্দ্ব-সংঘাতে পরিপূর্ণ মানবজীবনের মর্মন্তুদ পরিণতি *কৃষ্ণকুমারী* নাটককে এক উজ্জ্বল মানবীয় মহিমা দান করেছে। তাছাড়াও বাংলা নাটকের পূর্ববর্তী ধারার মধ্যে এ নাটকের মাধ্যমেই মধুসূদন প্লট, চরিত্র, সংলাপ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর শৈল্পিক নিরীক্ষার প্রথম সার্থক প্রতিফলন উন্মোচন করেন।

নাটকের মধ্যে Variety of action এনে প্লটে বৈচিত্র্য সম্পাদন ছিলো মধুসূদনের অন্বিষ্ট। যে, Ôaesthetic storm’ পৃথিবীর অধিকাংশ নাট্যকারকে সম্মোহিত করেছিল, মধুসূদনের বিবেচনায় একমাত্র শেকস্পীয়রই তা থেকে ব্যতিক্রম। সামগ্রিক বিবেচনায় তিনি Ôunity of placeÕ এবং ÔUnity of timeÕ কেই প্লট বিন্যাসের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন।

নাটকের চরিত্রপুঞ্জ যে নাট্যস্রষ্টার সৃষ্টি ক্ষমতায় নবতর অবয়ব অর্জন করে মধুসূদনের *কৃষ্ণকুমারীর* চরিত্র বিন্যাসে তার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিষয়েও তাঁর বিবেচনা ছিল নিগূঢ়। ট্রাজেডির মধ্যে কৌতুকের অনুপ্রবেশ কেবল সমকালীন পাঠক বা দর্শক রুচিরই অনুষঙ্গী ছিল না, কারণ তাঁর ধারণায় ÔThe must beautiful plays in the world are combination of Tragedy and Comedy.Õ[27]

নাটকের সংলাপ কাব্যভাবে আড়ষ্ট না হয়ে চরিত্রানুগ ও কাহিনীর গতি প্রবাহের অনুষঙ্গী হয়ে উঠুক মদুসূদনের ছিল তা-ই অন্বিষ্ট। সেজন্য ডক্টর জনসনের ভাষা উদ্ধৃতি করে তিনি নাটকের ভাষা ও সংলাপের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। ডক্টর জনসন তাঁর প্রস্তাবিত ভাষারীতির সার্থক দৃষ্টান্ত স্বরূপ শেকস্‌পীয়ারের উল্লেখ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে মধুসূদনের বিবেচনা গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক:

> And he commends Shakespeare for having adopted this language; and this advice I mean to adopt except where throughts rise high of their own accord and clothe themselves with loftier diction, and that will be more Tragic parts of the play.[28]

কৃষ্ণকুমারী নাটকের সাফল্যের মধ্যে মধুসূদন প্রত্যক্ষ করেছিলেন জাতীয় নাট্যকলার ভিত্তি-প্রস্তরকে তার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎকে। বস্তুত প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নাট্যকলা ও তার ঐতিহ্য পরম্পরার গভীর অঙ্গীকারে বাংলা নাটকের জন্য এক স্বতন্ত্র নাট্যধারা নির্মাণ ছিলো মধুসূদনের অন্বিষ্ট। ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে মধুসূদন যে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধিকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আর এই সিদ্ধি তাঁকে বাংলা নাটকে তথা বাংলা সাহিত্যের পথ-নির্দেশকের গৌরব এনে দিয়েছে।

বিষয়ের দিক থেকে মাইকেলের সাফল্যের পরিপূর্ণতাকে স্পর্শ করতে সক্ষম না হলেও মূল্যবোধের নবতর অভিক্ষেপে *তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য* (১৮৬০) বন্ধনমুক্ত প্রমিথিউসের প্রাণ উদ্দামতায় স্পন্দিত ও তরঙ্গিত। যদিও মধুসূদন একে আখ্যায়িত করেছেন a story of God's and titans বলে, যাতে human interest তেমন গুরুত্ব পায় নি; তবুও এ প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য স্মর্তব্য:

> মানব-মানবীর চরিত্র না থাকলেই যে মানবরসের অভাব ঘটে তা মনে করা যায় না। কারণ পৌরাণিক উপন্যাসে দেবতা, দানব ও মানবের মধ্যে পার্থক্য এমন কিছু গভীর ছিল না। সুন্দ উপসুন্দের মধ্যে যে বৃত্তিগুলি লক্ষণীয় তা মানবিক বৃত্তি। তাদের অপরাজেয় বিশ্ববিজয়ী হবার কামনা, সাধনা ও সিদ্ধি কামাতুরতা ও কামান্ধজাত আত্মধ্বংস সাধারণ মানব ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত।[২৯]

আধুনিক বাংলা কাব্যে দানব-প্রভাব কবি আত্মার বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ। এতে স্বাদেশিক চেতনার কথাও চিন্তা করা যেতে পারে। *প্যারাডাইস লস্ট* এর পাঠক কবি মধুসূদন দত্ত দানবগণ যে নৃশংসতার প্রতীক তা কখনোই বিশ্বাস করতেন বলে মনে হয় না। আধুনিকতার সবচেয়ে বড় লক্ষণ মানবরস তা *তিলোত্তমা সম্ভব* কাব্যে সমালোচকের মন্তব্যের মধ্যে যৌক্তিকভাবে ধরা পড়েছে। *ক্যাপটিভ লেডি* থেকে *তিলোত্তমা সম্ভব* পর্যন্ত কবির প্রেম সৌন্দর্য এবং স্বপ্নে ভরা। দৃষ্টিভঙ্গীতে মধ্যযুগীয়তা অতিক্রম করে ধর্মনিরপেক্ষতা বিকাশে, দৈত্য চরিত্রদ্বয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অনুঘটনে এবং স্বীয় ব্যক্তিত্বের অপরূপ সমন্বয় ঘটিয়েছেন কবি এ কাব্যে। ভাবের দিক থেকে তাতে আধুনিকতার সব লক্ষণ পরিস্ফুট না হলেও মধুসূদনের *তিলোত্তমা সম্ভব* কাব্যই প্রথম আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রয়াস।

মেঘনাদ বধ কাব্য শুধু মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি নয় সকল যুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। *রামায়ণের* কাহিনী অবলম্বনে রচিত *মেঘনাদবধ* কাব্যের কাহিনী বিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ, পুরাণের নতুন ব্যাখ্যায় অনন্য সাধারণ সৃষ্টি গৌরব লাভ করেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে

বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য *রামায়ণ* থেকে কাহিনী গ্রহণ করলেও উনিশ শতকীয় নবজাগরণ লব্ধ জীবচেতনা এবং পাশ্চাত্য বিষয় ও আঙ্গিকের সমন্বয়ে মধুসূদনের *মেঘনাদ বধ* কাব্য মানবীয় অন্বেষার চিরায়ত প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগীয় নন্দনতত্ত্ব ও কাব্য সংস্কারশাসিত বাংলা কবিতার আধুনিকতায় উত্তরণের শিল্পরূপ হয়ে উঠেছে এ কাব্য।

মেঘনাদ বধ কাব্যের চরিত্রসমূহ তাদের পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করেছে এবং কবির জীবন চেতনার ধারক হয়ে উঠেছে। *রামায়ণের* অসভ্য রাক্ষসকুল সুসভ্য জাতি হিসাবে রূপায়িত হয়েছে। রাবণ *রামায়ণে* রাক্ষস পরস্ত্রী অপহরক বলে নিন্দিত হলেও *মেঘনাদ বধ* কাব্যে সে দেশপ্রেমিক কোমলহৃদয় পিতা, সহানুভূতিশীল স্বামী, ঐশ্বর্যশালী সম্রাট। এ রাবণ বীর হৃদয়বান এবং সর্বোপরি মানবীয় গুণে সমৃদ্ধ।

দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা স্পৃহা উনিশ শতকের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য সাহিত্যের দেশপ্রেমের বাণী সমকালীন শিক্ষিত মানসে দেশপ্রেমের বীজ অংকুরিত করে দিয়েছিলো। মধুসূদনের প্রাণে সে অনুভূতি অত্যন্ত গভীরভাবে জেগেছিলো। তাঁর রাবণের যে বীর্যবত্তা পৌরুষ, সাহস, শৌর্য ও রণপ্রিয়তা তার মূলে ছিল দেশপ্রেম। রাবণ যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় নেতা। সাগর পার থেকে আর্য রামচন্দ্র এসে লংকা আক্রমণ করে অত্যাচার করবেন তা রাবণের কাছে অসহনীয়। মাতৃভূমির শত্রুকে প্রতিহত করবার জন্য তার সমস্ত বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত নয়। দ্বিতীয়ত এ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পশ্চাতে কাজ করেছে আত্মমর্যাদাবোধ। ভগ্নী শূর্পণখা লক্ষ্মণ কর্তৃক লাঞ্ছিতা হয়েছিল, সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যই 'পাবকশিখা-রূপিণী জানকী'-কে অপহরণ করে। তারই ফলে এই যুদ্ধ। অকারণে লঙ্কাযুদ্ধ বাধে নি। শত্রুর আক্রমণ থেকে জন্মভূমিকে রক্ষা আত্মসম্মান রক্ষা, স্বজাতির নিরাপত্তা বিধান রাবণের দায়িত্ব। তাই তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রাবণ শোকার্ত হৃদয়ে রণক্ষেত্র দেখবার জন্য প্রাসাদ শিখরে ওঠে, দেশ মাতৃকাকে রক্ষাহেতু মৃতপুত্রের জন্য গর্বভরে বলেছে:

> যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার/ প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে
> সদা। রিপুদল বলে দলিয়া সমরে,/ জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
> যে ডরে ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক তারে।[৩০]

এ কথাগুলোকে *মেঘনাদবধ* কাব্যের কেন্দ্রীয় আবেগ বলে মনে হয়। মধু হৃদয়েরও এটা একান্ত অন্তরঙ্গ অনুভূতি, রাবণের মুখের কথা তার হৃদয়ের বেদনা তার স্রষ্টারই অনুভূতি।

সমগ্র *মেঘনাদ বধ* কাব্যে রাবণের বীর্যবত্তার পাশাপাশি পুত্র শোকাতুর কোমল হৃদয় পিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বীরবাহুর মৃত্যু দৃষ্টে এবং মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমাপ্তি পর্যন্ত রাবণের পিতৃ-হৃদয়ের হাহাকার ধ্বনি অনুরণিত হয়েছে। যখন প্রাসাদ শিখরে উঠে রাবণ বীরবাহুর মৃত শব দেখে বলে ওঠে–

> হা পুত্র হা বীরবাহু, বীর চূড়ামনি!/ কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
> কি পাপ দেখিয়া মোর রে দারুন বিধি,/ হরিলি এ ধন তুই? হায়রে কেমনে
> সহি এ যাতনা আমি? [৩১]

অথবা

ছিল আশা, মেঘনাদ মুদিব অন্তিমে/ এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;
সপি, রাজ্যভার পুত্র তোমায়, করিব/ মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে ।[৩২]

তখন আর রাবণ আমাদের কাছে রাক্ষস রাজ নয় মানবরসে সিক্ত এই পরিচিত জগতের পুত্রহারা আদর্শ পিতা হয়ে দেখা দেয়। পৌরাণিক কাহিনীতে এরকম মানবীয় গুণ আরোপের জন্য যেমন মধুসূদন তেমনি *মেঘনাদবধ* কাব্য বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক স্রষ্টা ও সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মেঘনাদ চরিত্র বিচিত্র গুণের সমাবেশে রচিত। তিনি কবির প্রিয় ইন্দ্রজিৎ। দেব-দৈত্য নরত্রাস বাসব বিজয়ী যুগপৎ কঠোর এবং কোমল। *রামায়ণের* মেঘনাদের বীর্যাঙ্কুর হতে কবির মনে জন্ম লাভ করলেও এটি মধুসূদনেরই কবিচিত্ত ফুলবন মধুর নির্যাস। প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রস্ফুট কুসুমে কোথাও চিন্তাকীট প্রবেশ করে নি। আর্য রামায়ণের মেঘনাদের সেই দৃপ্ত পশুবল মধুসূদনের মেঘনাদের অপর সকল মহৎ গুণের সমবায়ে এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে, তার ধর্ম বিচার বিতর্কের ধর্ম নয়, তার স্বাভাবিক প্রাণধর্ম পৌরুষের ধর্ম। মেঘনাদ চরিত্রের প্রাধান্য এ কাব্যে অসামান্য, জীবিত বা মৃত যে কোন অবস্থায় তার প্রভাব সমান।

মধুসূদনের রাম-লক্ষ্মণ চরিত্র অনেকটা নিস্প্রভ, ভীরু, কাপুরুষ। দেব চরিত্রগুলো ষড়যন্ত্রকারী, কবির নিকট ঘৃণিত। বিভীষণ বিশ্বাসঘাতক, নীতিজ্ঞান 'নীচ সে দুর্মতি'। এভাবে পৌরাণিক চরিত্রগুলোর নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে মধুসূদনের আধুনিক মন ও মননের পরিচয় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যে নারী চরিত্রগুলোতে নতুন সত্তা ও বৈশিষ্ট্য আরোপ করে মাইকেল আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অধঃপতিত, অসভ্য, অর্ধসভ্য সমাজে যখন ব্রীড়াসঙ্কুচিতা বঙ্গ নারীগণ বার বার অত্যাচারিত হচ্ছিল ঠিক তখনই তাঁর সৃষ্ট নারীরা এক অপরূপ স্বকীয় মাধুর্যে আবির্ভূত হল।

মাইকেলের প্রমীলা এক বিদ্রোহী নারীসত্তা, তাঁর ভাষায় বীরাঙ্গনা। প্রমীলার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা তাকে পুরুষের সহযোগী করেছে, প্রতিযোগী করে নি। তার মাধ্যমেই কবি নারী স্বাধীনতার কথা প্রথম উচ্চারণ করলেন। তাঁর প্রমীলার হুঙ্কারে বীর পুরুষের প্রাণেও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়:

দানব নন্দিনী আমি রক্ষো-কুল বধূ/ রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে? [৩৩]

কিন্তু প্রমীলা ভারতীয় নারীর সৌন্দর্য থেকে এতটুকু বিচ্যুত হয় নি। তার সত্তার মধ্যে মধুসূদন নারীর সত্যিকারের রূপ উন্মোচন করেছেন।

ভারতীয় হিন্দু রমণীর নিকট স্বামী দেবতা, তার কোন অপরাধ থাকতে পারে না, তার উপর কোন অভিযোগ মুখে তো দূরের কথা মনে আনাও পাপ। কিন্তু মধুসূদন এ আদর্শের অনুবর্তী হয়ে মন্দোদরী চরিত্র চিত্রিত করলেও চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের মধ্যে তাঁর আপন মানস

ফুটিয়ে তুললেন। তাই তো চিত্রাঙ্গদা স্বীয় পুত্রের শোক নিবারণ না করতে পেরে স্বামীর উপর অভিযোগ এনে বলেছে–

> কে কহ এ কাল অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি/ লঙ্কা-পুরে? হায় নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে
> মজালে রাক্ষসকুলে মজিলা আপনি।[৩৪]

মধুসূদন ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ঐতিহ্য সচেতনতাও যে আধুনিক মন ও মননের পরিপূরক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মধুসূদন নবীন দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ ও আত্মস্থ করার ফলে অনেক প্রাচীন অভ্যাস, মানবতা ও জীবন বিরোধী ঐতিহ্যকে বর্জন করতে এমন কি ভাঙতে ও ধ্বংস করতেও দ্বিধা করেন নি। এজন্যই তিনি সীতার প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাবনত। অন্যদিকে বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী বিভীষণের প্রতি ঘৃণা গোপন না করেও মধুসূদন বিভীষণপত্নী সরমার প্রতি প্রীতিস্নিগ্ধ মনোভাব প্রকাশে দ্বিধাহীন।

মেঘনাদ বধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে যখন আমরা সীতাকে দেখলাম তখন 'ভাসিছে কনক লঙ্কা আনন্দের নীরে .../ কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু পানে'। সেখানে- 'একাকিনী শোকাকুলা, অশোক কাননে/ কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটিরে/ নীরবে'।[৩৫] এই নীরব কান্নার শব্দ মধুসূদন কান পেতে শুনেছেন। এখানেই প্রিয় রাবণের ট্রাজেডির মূল বীজটিকেও তিনি সযত্নে নিহিত করেছেন এবং নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় রাবণকে অনিচ্ছাকৃত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। এভাবে নারীত্বের মহিমা প্রকাশের মধ্যদিয়েও মধুসূদন আধুনিক কাব্য নির্মিতির পথ প্রশস্ত করেছেন।

শুধু *মেঘনাদ বধ* কাব্যেই নয়, *ক্যাপটিভ লেডি* থেকে শুরু করে *চতুর্দশপদী কবিতাবলীর* মধ্যেও নারীর মূল্য ও সম্মান দানে কবি প্রাণ সচেষ্ট। *ব্রজাঙ্গনা কাব্যে* (১৮৬১) প্রেমিক পরিত্যক্ত প্রেমিকা নারীর উন্মাদ বিরহাবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা ধর্মভাবে নয় বরং বিরহের রোমান্টিক ভাবনায় মথিত হয়ে এ কাব্যের নায়িকা হয়েছে। এখানকার রাধা শ্রীমতি রাধা নয়, মিসেস্ রাধায় পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ রোমান্টিক ওডের ছন্দে এবং স্তবক নির্মাণের ঢঙ্গে প্রেমপিপাসু কবি এই মানবী রাধিকার বিরহাবস্থা বর্ণনা করেছেন।

প্রসঙ্গত কবি বলেছিলেন, When you sit down to read poetry, leave aside all religiou bias. কাব্যের সঙ্গে ধর্মীয় সংস্কারকে তিনি এক করে দেখতে অপছন্দ করতেন। কবি মধুসূদনের সাধনার মধ্যে তাই একটি ধর্মনিরপেক্ষ কবিস্বভাব বিদ্যমান বলে মনে হয়। তখন পর্যন্ত চিরাচরিত ধর্ম স্বভাবকে উপেক্ষা করা সহজ ব্যাপার ছিল না। মধুসূদন তা করতে পেরেছিলেন, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব, তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও নব্যতা। কবি Old Radha এবং তার বিরহ নিয়ে নতুন কাব্য সত্য রচনা করলেন। তিনি সৃষ্টি করলেন Mrs. Radha.

কবির এই বোধ এবং স্বাতন্ত্র্য *বীরাঙ্গনা কাব্যে* (১৮৬২) প্রস্ফুটিত হয়েছে। *বীরাঙ্গনা* বাংলাভাষার প্রথম পত্রকাব্য। পাশ্চাত্য কবি ওভিদের The Heroides or Epistle of The heroines নামক কাব্যের কাছে তিনি ঋণী। একুশখানি প্রণয় রসাত্মক পত্র নিয়ে কাব্যখানা লেখার বাসনা কবির থাকলেও তিনি সবগুলো পত্র সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। এতে ১১টি সম্পূর্ণ পত্র রয়েছে। পত্রগুলোর আখ্যান পুরাণ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। *বীরাঙ্গনা* কাব্যের গঠন কৌশল সম্পর্কে ড. ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন:

> একদিকে নাট্যকাব্যের নাটকের সংলাপ ভঙ্গি, অপরদিকে আখ্যানকাব্যের কাহিনী গৌরব আবার সকলের অন্তর-প্রবাহী একটি লিরিক উচ্ছ্বাস– এই ত্রিস্রোত কাব্যটির গঠন কৌশলকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।[৩৬]

আঙ্গিকের অভিনবত্ব এবং বিষয়ের ভিন্ন ব্যাখ্যা ও রূপায়ণে কবি বাংলা কাব্য ধারায় এক নতুন সংযোজন উপহার দিলেন। এই সংযোজনে মধুসূদন যেমন তেমনি *বীরাঙ্গনা কাব্য* বাংলা সাহিত্যের ধারায় নবীন পথের দিশারী হয়েছে।

বীরাঙ্গনা কাব্য বিষয়ের দিক থেকে মূলত একটি প্রেম কাব্য। মধুসূদনের কাব্যে নারীর প্রেম ও চরিত্রের যে স্বরূপ উপস্থাপিত হয়েছে তা অভাবনীয় বিচিত্র- *বীরাঙ্গনা কাব্যে* বহু ক্ষেত্রেই তা অনুভব করা যায়। তিনি পূর্ব সংস্কার অনুসরণ করেন নি। *মহাভারত, পুরাণ* তাঁর রচনার উপাদান উৎস হলেও অভিমত তাঁর পাশ্চাত্য রঙে রঞ্জিত, নিজ অভিমতে সিদ্ধ। ত্রিশোত্তর যুগের কাব্যের শরীর নির্মাণে যে ইন্দ্রিয় প্রেম প্রাধান্য পেয়েছিল এর অনেক আগেই মধুকাব্যে সুস্থসবল শরীরী প্রেম কামনা *বীরাঙ্গনায়* উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত হয়েছিল। এ কাব্যের প্রতিটি নায়িকার অনুভূতি পার্থিব এবং মানবীয়। দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, সোমের প্রতি তারা, লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পনখা প্রমুখ নায়িকাদের আত্মনিবেদন দৈহিক মিলনের কামনায় জাগ্রত। শকুন্তলা বলেছে, 'পুজিনু প্রথমে পদযুগ'। তারপর মহেন্দ্রনাথ দুষ্মন্ত 'গন্ধর্ব বিবাহছলে ছলিলে দাসীরে।' 'যে নিকুঞ্জে ফুলসজ্জা সাজাইয়া সাধে/ সেবিল চরণ দাসী কানন বাসরে'- এসব বাক্যে গভীর ইন্দ্রিয়ানুভূতি আছে। বস্তুত শরীরী প্রেমের আবেগ এখানে অনুভূত হয়েছে।

এ কাব্যের তারা ব্যতিক্রমধর্মী এবং সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নায়িকা। তারা সোমের গুরুপত্নী। সোম তাঁর কাছে সন্তান-স্থানীয়। তাই সোমের কাছে তারার উপযাচিকা হওয়া সাংঘাতিকভাবে আচরণ বিধি লঙ্ঘন। সমালোচক বলেছেন:

> একটি পত্র সর্বাধিক স্মরণীয়- 'সোমের প্রতি তারা'। তারা গুরুপত্নী চিঠি লিখেছেন উপযাচিকা হয়ে। প্রথমত তিনি বিবাহিত নারীর আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছেন। দ্বিতীয়ত প্রেমাস্পদ হোল তাঁর সন্তান স্থানীয়। তাই নিঃসন্দেহে তারা এক আশ্চর্য ব্যাপিকা নারী। বীরাঙ্গনা কাব্যের অন্তর জগত বিদ্রোহের ইচ্ছায় প্রোজ্জ্বল–তার অনেকখানি শিখা জ্বালিয়েছে তারার পত্র। নারী জাগরণ তখনও বাংলাদেশে প্রত্যাশিত, বাস্তবায়িত নয়। মধুসূদন তরুণ বাংলার বাস্তবে প্রত্যাখ্যাত স্বপ্নসাধ কাব্যলোকে চরিতার্থ করলেন।[৩৭]

রাক্ষস নন্দিনী শূর্পনখার রামানুজ লক্ষ্মণের প্রতি প্রেমপূর্ণ পত্রের সংলাপ মানবীয় গুণ সমন্বিত:

> প্রেম-উদাসীন যদি তুমি গুণমণি,/ কহ, কোন যুবতীর (আহা ভাগ্যবতী)
> রামাকুলে সে রমণী) কহ শ্রীঘ্র করি/ কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু
> বাঞ্ছা তব?[৩৮]

তাছাড়াও *বীরাঙ্গনা* কাব্যে'র মূল বৈশিষ্ট্য চিরানুগত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সে ব্যাপারটি নীলধ্বজের প্রতি জনার পত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে- জনা তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছে–

> কেন/ এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে/ অতিথি? কেমনে তুমি হায় মিত্রভাবে
> পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে/ লোহিত? [৩৯]

সমগ্র *বীরাঙ্গনা* কাব্যে সমাজ বিশ্বাস, মাতৃ-আদেশ বীরধর্ম ইত্যাদির বিরুদ্ধে নায়িকা হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে এবং এ মনোভাবে নাট্যরস প্রশ্রয়িত হয়েছে। আধুনিক কাব্যনাট্য সমালোচকগণ ড্রামাটিক মনোলোগ এবং আবেগ সংঘাত প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন তা আলোচ্য কাব্য প্রসঙ্গে সত্য। আর এই ড্রামাটিক মনোলোগ সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যে প্রথম হিসেবে মধুসূদনের কৃতিত্ব অসাধারণ।

মধুসূদন *চতুর্দশপদী কবিতাবলীর* (১৮৬৬) মধ্যে তাঁর বিশেষ শিল্প চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত এই কবিতাবলীর মধ্যেই তাঁর মানস প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য সমুদ্র মন্থন করে যেসব কলাবিধি বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছিলেন *সনেট বা চতুর্দশপদী* কবিতা তার অন্যতম অমর অবদান। শুধু কবিতার দেহ নির্মাণের কুশলতাই নয়, তার ভাবে যে নব জীবন জাগরণ পেত্রার্কা এনেছিলেন মধুসূদন তা নিজ কাব্য সংসারে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার সনেটে পাশ্চাত্য কবিদের সনেটের শরীর নির্মাণের কলাকৃতি ও রেনেসাঁসের ভাব সাধনা আশ্রয় লাভ করেছে। নব মানবতার সংস্কার মুক্ত চেতনা, স্বদেশের প্রতি মমত্ব, নিজভাষার প্রতি গভীর ভক্তি, নারীর স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান এবং কবিতার আঙ্গিক বিনির্মাণে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের নব সৃষ্টির সার্থক নির্মাতার গৌরব লাভ করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস নিয়ে এলো মানবতা। পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও আদর্শে লালিত মধুসূদন তাঁর চতুর্দশপদীর বহু কবিতাতে এই মানবতাকে গ্রহণ ও তার সাথে একাত্ম ঘোষণা করেছেন। তাঁর এমনই একটি কবিতা *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর* (৮৬ সংখ্যক)।

> বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে/ করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
> দীন সে দীনের বন্ধু!- উজ্জ্বল জগতে/ হেমাদ্রির হেম কান্তি অম্লান কিরণে
> ....
> দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী/ নিশার সুশান্তি নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।[৪০]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানবতাবোধ ও মানব কল্যাণে তাঁর অবদান সুধী সমাজে অগোচর নয়। তথাপি তৎকালীন হিন্দু সমাজে তাঁর দুর্নামের শেষ ছিল না। মধুসূদন এই মহতী মানুষের মঙ্গলাচরণ করে শুধু বিদ্যাসাগরেরই মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তুলেন নি, কবি মানসের একান্ত বিকাশ ও স্বীয় অভীপ্সাও ব্যক্ত করেছেন। এই মানবতামুখী সৃষ্টিই তাঁকে মধ্যযুগীয় আচ্ছন্নতাকে অতিক্রম করে আধুনিক স্রষ্টার ভুষণ পরিয়েছে।

মধুসূদনের দুর্দমনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পাশ্চাত্য এবং তার সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগের ফলে স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি এক উন্নাষিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কবির এ ভুল ভাঙ্গতে বেশি দেরি হয় নি। তাঁর অনুভব- 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়/ তাই ভাবী মনে?' তাই তো দূর প্রবাসে বসে কবির একান্ত মিনতি- 'রেখো মা দাসেরে মনে,/ এ মিনতি করি পদে।' কবির মনে পড়ে যায় স্বদেশ, স্ব-সমাজ, প্রিয়মাতৃভূমির কথা:

> সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।/ সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে
> ....
> নাম তার এ প্রবাসে মজি প্রেমভাবে/ লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে।[৪১]

শুধু তাই নয়, কবির কাছে ভারত ভূমিও 'জননী ভারতী'-

যে দেশে উদয়ি রবি উদয় আচলে/ ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে ..../ সেই দেশে জনম মম; জননী ভারতী
তেঁই প্রেম দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে ।[৪২]

এরকম বেশ কয়েকটি চতুর্দশপদী কবিতাতে স্বদেশের প্রতি গভীর মমত্ব ও ভালোবাসা প্রকাশে কবি চিত্ত অকৃপণ । দেশপ্রেম বাঙালি কবির রচনায় এর আগে এত গভীর ব্যঞ্জনায় ফুটে ওঠেনি ।

কবির অন্বিষ্ট ছিল মিল্টন, বায়রন, ট্যাসো । আর এ জন্যই তিনি কাব্য সাধনার বাহন হিসেবে মাতৃভাষাকে পরিহার করে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করলেন । তারই ফলশ্রুতিতে *ক্যাপটিভ লেডি, ভিসনস অব দ্যা পাস্ট* প্রভৃতি রচিত হলো । কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বুঝতে পারলেন 'নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে/ ভিখারী আমি?' তাই তাঁর জননী লালিত মাতৃভাষা আপন স্বরূপে ও সত্তায় প্রকাশ পেল । *শর্মিষ্ঠা, মেঘনাদ বধ* প্রভৃতি কাব্য থেকে শুরু করে *চতুর্দশপদী* কবিতা রচনার মাধ্যমে তিনি মাতৃভাষার প্রতি গভীর একাত্ম ও তাকে নতুন রূপ দান করলেন। *বঙ্গভাষা* নামক চতুর্দশপদীতে মাতৃভাষাকে অবহেলা করবার অনুশোচনার আর্তি ও নিজ ভাষার সমৃদ্ধি ও সম্পদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে:

হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন/ তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ/ পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি ।
....
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে/ মাতৃভাষারূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে ।[৪৪]

তাছাড়াও এই কবিতাতে মাতৃভূমির প্রতি কবির অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে । মাতৃভাষা, মাতৃভূমি প্রভৃতির প্রতি ভালোবাসায় কবির স্বরূপ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ধরা পড়েছে । এসব চেতনায় কবিকে করে তুলেছে আধুনিক এবং তাঁর সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক সাহিত্য ধারার পথিকৃৎ ।

মধুসূদনের বিচিত্র ও বৈচিত্র্যমুখর সৃষ্টিতে ভাবেই শুধু আধুনিক মন এবং মননের পরিচয় দেন নি এর নির্মাণ রীতিতেও এক যুগান্তকারী শিল্পীসত্তার পরিচয় দিয়েছেন । অর্থাৎ ভাবে, ভাষায়, আঙ্গিকে তিনি বাংলা সাহিত্যে দান করেছেন এক অবিস্মরণীয় মহিমা । যখন পয়ার এবং ত্রিপদীয় একঘেঁয়ে ক্ষীণ ধ্বনিতে বাংলা কাব্য হয়ে পড়ে ছিল নির্জীব, বৈচিত্র্যহীন । কবি ঈশ্বরগুপ্ত আর কবিওয়ালদের প্রচেষ্টাকে সেদিন বাংলা কাব্যের আসলরূপ সন্দেহে বাঙালি তাঁর উপর বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছিল । তদুপরি শেক্স্পীয়র, মূর, মিল্টন, শেলী, বায়রন শিক্ষিত বাঙালিকে করেছিল মুগ্ধ, পাঠক মনকে করেছিল আবিষ্ট । এর চেয়ে বাংলা সাহিত্যের বড় দুর্দিন বুঝি আর আসে নি । এই সময়ে কালের আমোঘ প্রয়োজন মত, একান্ত বিধাতৃ বিধানের মত বাংলা কাব্যসাহিত্যে মধুসূদনের আগমন । নিস্প্রাণ একঘেয়েমি কেটে গিয়ে বাংলা কাব্যে এলো এমন ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, শক্তি ও বৈচিত্র্য যে 'বঙ্গ-জন আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি ।' বাংলা কাব্যে মধুসূদন 'অসম্ভবকে সম্ভব করিলেন.... এ যেন সহসা কোথা হইতে এক দেবতা বা দৈত্য আসিয়া বাংলা কাব্যের কুঁড়ে ঘরখানিকে বিরাট পাষাণ প্রাসাদে পরিণত করিল । বাংলা কাব্যে এই যে সঙ্গীত আরম্ভ হইল উহারই ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির শেষ সূক্ষ্মতম সুর রবীন্দ্র কাব্যেও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে । মদুসূদনের কবিতা দৈববাণীর মত অমোঘ । তাই ইহার গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও ঝংকারে চিরাচরিত

কবিতার মোহময় কল্লোল চিরদিনের মত নিস্তব্ধ হইয়া গেল। পয়ারের পদ্মমধু পান করিয়া বঙ্গভারতীর যে বিতৃষ্ণা হইয়াছিল তাহা দূর হইয়া গেল অমিত্রাক্ষর ছন্দের অমৃত ধারায়। পাষাণীর নিঃসাড় দেহে যেন সহসা চাপল্যের হিল্লোল উঠিল.....ভাবে আসিল গাম্ভীর্য, ভাষায় সজীবতা আর কল্পনায় গগন স্পর্শী অভীপ্সা।'[৪৫]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য, কাব্য ও ভাষা বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। মহাকবি হবার স্বপ্ন ছিল তাঁর মনে, তাই মহাকাব্য পাঠ করেছিলেন খুব অভিনিবেশ সহকারে এবং সংস্কৃত, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, ইটালীয়ান, ইংরেজি ভাষা শিখেছিলেন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে। এ কারণে তাঁর কাব্য শরীর নির্মাণে ইউরোপ সহায় হয়েছিল।

বাংলা কাব্যে মধুসূদনের অবদান অসাধারণ। কাব্যের বিষয়বস্তুতে যেমনই হোক নির্মাণশৈলীতে তাঁর কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। ইউরোপীয় কাব্যকলা ও শিল্পকলা অনুসরণ করে মধুসূদন লিখেছিলেন নাটক, প্রহসন, এপিকলিং, এপিক, পত্রকাব্য, সনেট প্রভৃতি শিল্পকর্ম। বাংলা সাহিত্য ও কাব্যের ক্ষেত্রে এসব ছিল অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। মধুসূদন প্রথম এসব কাব্যাঙ্গিকের অনুশীলন করলেন। কাব্যের দেহ প্রতিমা নির্মাণে যে কলাকৃতির পরিচয় দিয়েছিলেন তা অসাধারণ। শুধু নতুন 'ফর্ম' আমদানি করাই বড় কথা নয় সে 'ফর্ম' কে বাস্তবায়িত করতে হলে যে শৈল্পিক প্রকৌশল প্রয়োজন তারও পরিচয় তাঁর কাব্যসমূহে পাওয়া যাবে।

নতুন ছন্দ অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন মধুসূদনের অমরকীর্তি। তিনি পয়ার ত্রিপদী ছন্দের শৃঙ্খলাবদ্ধ দুর্বল শব্দাবলী এবং গতানুগতিক বাক্য রচনার স্থলে অপূর্ব সম্পদশালী শব্দ ভাণ্ডার সৃষ্টি এবং সবল বাক্য রচনা করে নতুন কাব্যদেহ নির্মাণের সহায়ক হলেন। মধুসূদনই প্রথম কবি যিনি শব্দ সম্পদে বাংলা কাব্যকে নবীন ঐশ্বর্য প্রদান করলেন। একদিকে শব্দের ভাণ্ডারে অজস্র আভিধানিক, তৎসম ও তদ্ভব শব্দ আমদানি করলেন, অন্যদিকে অতীব আন্তরিক লোকজ এবং সহজ শব্দাবলীও ব্যবহার করলেন। কবিতায় অসাধারণ ধ্বনি ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে মধুসূদন অদ্বিতীয় কৃতিত্বের অধিকারী। *মেঘনাদ বধ* কাব্যের সাগর নির্ঘোষ ধ্বনি এবং *ব্রজাঙ্গনা, চতুর্দশপদীর* সঙ্গীত মাধুর্য শতবর্ষ পরের সমালোচকের বিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, দাবি করেছে মুগ্ধ প্রশংসা। মুক্তছন্দ, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যাকরণগত নবতর বৈশিষ্ট্য, অলংকারের নতুন মাত্রা নির্মাণে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। নামধাতুর ব্যবহার, সম্বোধন পদের নবতান্ত্রিক প্রয়োগ কাব্যদেহ নির্মাণে এনেছে এক মুক্তির পরিবেশ। আর ব্যাকরণ ব্যবহারের দিক থেকে মধুসূদন দিয়েছেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। পাশ্চাত্য কবিদের অলংকার প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য তিনি রপ্ত করেছিলেন। তাই রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কাব্যে অলংকার প্রয়োগ এবং রূপকল্প নির্মাণের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা অনেক ক্ষেত্রে মধুসূদনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সুতরাং বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের পটভূমিতে আধুনিকতার প্রাণ-ধর্ম তাঁর সৃষ্টি পরিক্রমার মধ্যদিয়েই প্রথম প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ, কাব্য-সংস্কার ও রীতি প্রকরণ শাসিত বাংলা কবিতা ও নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াস নবতর নিরীক্ষা ও উত্তরণ সম্ভাবনায় গৌরবমণ্ডিত। এক পত্রে মধুসূদন মন্তব্য করেছিলেন, ÔI hope I am a progressive animalÕ। তাঁর এই প্রগতিপন্থা আধুনিক শিল্পচেতনায় তাঁকে নাটকের পূর্ণতা দানে, প্রহসনে বাস্তবজীবন অনুঘটনে এবং কাব্যের বিভিন্ন আঙ্গিক বিনির্মাণে সহায়ক হয়েছিল। যুগের বন্ধন থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। ফলে তাঁর কাব্যসমূহ

লাভ করে নতুন প্রাণের আবেগ। এই প্রাণোচ্ছল ভাব ও আঙ্গিক চাঞ্চল্যের কারণে মধুসূদনের কাব্য আধুনিক।

তথ্যসূচি:

১ বিশ্বজিৎ ঘোষ, *মধুসূদন-সাহিত্যবিচারের* ধারাক্রম, (মোস্তফা নূর-উল ইসলাম সম্পাদিত *সুন্দরম*), ফাল্গুন '৯৬– বৈশাখ'৯৭, পৃ. ২০

২ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, *ইটালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর-২০০, পৃ. ১৫

৩ প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৫

৪ অন্নদাশঙ্কর রায়, *বাংলার রেনেসাঁস*, বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রথম বাণীশিল্প সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১০

৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

৬ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২

৮ সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় রেনেসাঁসে পাশ্চাত্য বিদ্যার ভূমিকা*, সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৮৬, পৃ. ১

৯ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

১০ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা*, উচ্চারণ, ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, আগস্ট ১৯৮৩, পৃ. ২

১১ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

১২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

১৩ সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩-৫৪

১৪ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

১৫ আবু সয়ীদ আয়ুব, *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ১৯৭১, পৃ. ১২

১৬ জীবনানন্দ দাশ, *কবিতার কথা*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৩৬২, পৃ. ১১২

১৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আধুকি কাব্য*, সাহিত্যের পথে, বিশ্বভারতী, প্রথম সংস্করণ ১৩৪৩, পৃ. ১৩১

১৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১

১৯ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

২০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

২১ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

২২ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

২৩ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবন ও সাহিত্য*, পুথিপত্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫, পৃ. ১১১

২৪ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, *মধুসূদন কাব্যগ্রন্থাবলী*, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, পৃ. ৬২৪

২৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮১

২৬ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

২৭ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, *মধুসূদন নাট্যগ্রন্থাবলী*, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯, পৃ. ৮৩১

২৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩০

২৯ ক্ষেত্রগুপ্ত, *মধুসূদনের কবিআত্মা ও কাব্যশিল্প*, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৭, পৃ. ১০৩-১০৪

৩০ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, *মধুসূদন কাব্যগ্রন্থাবলী*, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, পৃ. ১২৭-১২৮

৩১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

৩২ *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৩৬২

৩৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮

৩৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩

৩৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১-২০২

৩৬ ক্ষেত্রগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১

৩৭ সুরেশচন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত, *মধুসূদন রচনাবলী*, কলকাতা, ১৩৯০, পৃ. ২০৩

৩৮ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, *মধুসূদন কাব্যগ্রন্থাবলী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৯-৪৪০

৩৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৭

৪০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৮

৪১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১১

৪২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৭

৪৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯১

৪৪ অধ্যাপক এ. এল ব্যানার্জি সম্পাদিত, *মেঘনাদ বধ কাব্য*, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃ. ১০৯

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কার আন্দোলন

মোঃ শফিকুল আলম*

সারসংক্ষেপ: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু একজন সাধারণ মানুষ নন, একটি প্রতিষ্ঠানও বটে। ব্যক্তির সীমা অতিক্রম করে একটি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার মত সমস্ত জীবনব্যাপী মানুষের সেবা করে গেছেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীর মন থেকে অন্ধকার দূর করে শিক্ষার আলো জ্বালবার জন্য নিজের জীবনের আরাম আয়েশের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সত্যিকারের মানবতা খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্যিকারের শিক্ষাই পারে মানুষের বিবেকবোধকে জাগাতে। তাই তিনি দেশীয় শিক্ষাকে যুগোপযোগী, যুক্তিনির্ভর ও বিজ্ঞানমনস্ক করার লক্ষ্যে সংস্কৃত শিক্ষাকে বাদ না দিয়ে তার সাথে ইংরেজি শিক্ষাকে যুক্ত করে আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন। প্রকৃত শিক্ষিত লোক যে বিবেকের দ্বারা শাসিত হন এবং অতিপ্রাকৃতিক কোন সত্তার ভয়ে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের পরম সুখ লাভের আশায় শুধু ভাল কাজ করেন না, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কোন লোভ, আকাঙ্ক্ষা বা ভয় তাঁকে লক্ষ্য থেকে সরাতে পারে নি। ব্যক্তি জীবনে তিনি কিছুটা জেদী ছিলেন কিন্তু সেই জিদকে লাগাম পরিয়ে তিনি ব্যবহার করেছেন মানবকল্যাণে। স্ব-জাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারই ছিল তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তিনি একাধিকবার চাকুরি ছেড়েছেন, তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের কমকর্তাদের সাথে যুক্তি-তর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং শেষাবধি বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, প্রকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষাই পারে এ জাতির মন থেকে অন্ধকার ও কুসংস্কার দূর করতে। এই লক্ষ্যে তিনি জীবনব্যাপী প্রচুর বিদ্যালয় স্থাপন করে গেছেন। সমাজে নারীর ভূমিকা অগ্রাহ্য করা একেবারেই কঠিন। আর তাই নারী শিক্ষা বিস্তারে তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। শিক্ষা শুধু তত্ত্ববিদ্য বা সনদ অর্জন নয়, তার লক্ষ্য হল প্রকৃত মানুষ হওয়া। সৎ, আদর্শবান ও নৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন একজন পরিপূর্ণ মানুষ হওয়াই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর ব্যক্তি জীবনে এই গুণাবলীই অর্জন করেছিলেন, যা তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। একথা সত্য যে, শিক্ষাভিত্তিক কোন দার্শনিক মতবাদ তিনি সৃষ্টি করেন নি, কিন্তু তাঁর পুরো জীবনটাই ছিল একটি শিক্ষা দর্শনের সিলেবাস। শুধু অনুসন্ধানমূলক একটি মন থাকলেই বুঝা যাবে এ জাতির জন্য তিনি কী ভেবেছেন বা কী করে গেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ছিলেন মূলত একজন শিক্ষক, সৎ মানুষ, কঠোর নিয়মনিষ্ঠ প্রশাসক, লেখক, শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক। উনিশ শতকে বাঙালির পুনর্জাগরণ আন্দোলনে তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ কর্মী। তাঁর আসল নাম ছিল ঈশ্বরচন্দ্র। কিন্তু তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য হিন্দু 'ল' কমিটি তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেন। তিনি সবার কাছে সে নামেই পরিচিত হন। বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ সালে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী। শিশুকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তাঁর মেধার পরিচয় পাওয়া যায় ছোট বেলার একটা ঘটনা থেকে।

বীরসিংহ থেকে কলকাতা শহর, পথ খুব কম নয়। বাঁধানো বড় রাস্তায় উঠে বালক ঈশ্বরচন্দ্র লক্ষ্য করল মাঝে মাঝে পাথর বসানো। বাটনা-বাটা পাটার মত সে পাথর। ঈশ্বরচন্দ্র

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই শিলাগুলো কী বাবা?' ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হেসে বললেন, 'ওগুলো শিল বা পাটা নয়, ওগুলো মাইলস্টোন।' ঈশ্বরচন্দ্র আবার প্রশ্ন করলেন, 'মাইলস্টোন কী বাবা?' বাবা বললেন, 'মাইলস্টোন হল একটা ইংরেজি শব্দ। কলকাতা থেকে প্রত্যেক মাইল অন্তর ওরকম একেকখানা পাথর বসানো আছে। ওখানে লেখা আছে কলকাতা থেকে ওখান পর্যন্ত কতটা পথ। কলকাতা থেকে এক মাইল দূরের পাথরে ইংরেজিতে এক লেখা আছে। আর দেখো এই পাথরটায় লেখা আছে উনিশ। তাঁর মানে কলকাতা এখান থেকে উনিশ মাইল। এর পরে আসবে আঠারো।' পাথরখানা ভাল করে লক্ষ্য করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। একের পিঠে নয়– উনিশ। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, যেতে যেতে ইংরেজি অংক শিখে ফেলতে হবে। কলকাতা তখনো বেশ দূর। আরো দশ মাইল বাকি। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, 'বাবা, আমি ইংরেজি অংক চিনে নিয়েছি।' 'সত্যি? আচ্ছা পরীক্ষা করে দেখা যাক।' কলকাতা আরো নয় মাইল দূরে। নয় নম্বর লেখা পাথরখানা দেখিয়ে ঠাকুরদাস জিজ্ঞেস করলেন, 'কত?' ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, 'নয়।' আট নম্বর লেখা পাথরখানা দেখিয়ে ঠাকুরদাস জিজ্ঞেস করলেন, 'কত?' ঈশ্বরচন্দ্র বললে, 'আট।' ছয় নম্বর পাথরখানা ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখালেন না। পাঁচ মাইলের মাথায় এসে পাথরখানা দেখিয়ে বললেন 'এবার বলো তো এটা কত?' ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, 'বাবা, এটা ছয় হওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু ভুলে পাঁচ লিখে রেখেছে।' ঠাকুরদাস খুশি হলেন। বললেন, 'তুমি সত্যি সত্যি ইংরেজি অংক চিনেছ। ওটা ঠিক আছে। ছয় নম্বর পাথরখানা আমিই তোমাকে দেখাই নি।'[১]

বিদ্যাসাগরকে শিক্ষাদার্শনিক বলা যায় কি-না, সেটা আলোচনার বিষয়। তবে প্লেটো, এরিস্টটল, রুশো, পেস্টালজি কিম্বা হার্বাট যে অর্থে দার্শনিক, সে অর্থে বিদ্যাসাগর দার্শনিক হিসাবে পরিগণিত নন। দার্শনিকরা বিষয় ভিত্তিক আলোচনা, সমালোচনার পর নিজের একটি মতামত প্রকাশ করেন; যা তাঁর মতবাদ হিসাবে পরিচিত হয়, সেভাবে কোন মতবাদ তিনি দিয়ে গেছেন কি-না, জানা নেই। তবে তাঁর সমগ্র জীবন শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে কাজ করে গেছেন, যার জন্য বাঙালি জাতি তাঁকে মনে রেখেছে, সেটিও কোন ক্রমেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। সেই দিক থেকে তাঁকে উঁচু মাপের শিক্ষাবিদ বলা যেতে পারে।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাতত্ত্ব আলোচনার পূর্বে দেখা দরকার তখনকার সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট কী রকম ছিল। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় গ্রামের 'কালিকান্ত' এর পাঠশালায় নয় বছর বয়স পর্যন্ত।[১] এরপর তাঁর বাবা তাঁকে নিয়ে যান কলকাতায় এবং ভর্তি করেন সংস্কৃত কলেজে। পিতা ঠাকুর দাস নিজে পারেন নি বলে চেয়েছিলেন, ছেলে লেখাপড়া শেষ করে গ্রামের টোলের শিক্ষক হবে। পিতার সে ইচ্ছে পূরণ হয় নি, হয়েছে তাঁর চেয়ে ঢের বেশি, যা তিনি আশাই করেন নি। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করেন ১৮২৯ সাল থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত তাঁর একুশ বছর বয়স পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে তিনি নিজেকে সময়ের সবচেয়ে যোগ্য সন্তানরূপে তুলে ধরতে সমর্থ হন। তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য হিন্দু 'ল' কমিটি তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেন। একটি সার্টিফিকেটে তাঁরা বলেন,

> We hereby certify that at an examination held at the Presidency of Fort William on the 22nd April 1839 by the committee appointed under the provisions of Regulation XI 1826 Issur Chunder Vidyasagur was found and declared to be qualified by his eminent knowledge of the Hindoo Law to hold the office of Hindu Law Officer in any of the established courts of judicature.[১]

H.T.Priser,
President, J.W.J ousely

Member of the Committee of examination

বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন ২৯ ডিসেম্বর ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সেরেস্তাদার বা প্রথম পণ্ডিত হিসাবে। বাংলা সাহিত্যে এই কলেজটির অসাধারণ অবদান আছে। উইলিয়াম কেরির তত্ত্বাবধানে একদল মুন্সি বা পণ্ডিত বাংলা গদ্য রচনা করতে উৎসাহিত হন। বিদ্যাসাগর যখন যোগদান করেন তখন এই কলেজটি কেরির সময়ের মত উজ্জ্বল ছিল না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বিদ্যাসাগরের জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শিক্ষা গ্রহণ করতে তিনি কখনও দ্বিধাবোধ করতেন না, এমনকি ছাত্রদের কাছ থেকেও প্রয়োজনীয় বিষয় শিখে নিতেন। জানার প্রতি অদম্য ইচ্ছা থেকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। মি. মার্শাল এর অনুপ্রেরণায় তিনি হিন্দির মত ইংরেজি চর্চা শুরু করেন। হিন্দি শিখেন হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের কাছে এবং ইংরেজি শিখেন দূর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি মাসে ১৫ টাকার বিনিময়ে রাজনারায়ণ গুপ্তের কাছেও ইংরেজি শিখেন। বিভিন্ন ভাষায় পণ্ডিত আনন্দকৃষ্ণ বসুর কাছে তিনি শেকসপিয়ার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। এর ফল স্বরূপ তিনি ইংরেজি ভাষায় প্রচণ্ড দক্ষ হয়ে উঠেন; যার প্রভাব পড়ে তাঁর বিভিন্ন লেখা এবং শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টে।

শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল 'সহজ থেকে জটিল' প্রক্রিয়া অবলম্বন করা। বর্ণ পরিচয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছদের বিজ্ঞাপনে তিনি বলেন, 'ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগ শিক্ষা করিতে গেলে অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটি পাঠ দেওয়া গিয়াছে । অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়, এরূপ বিষয় লইয়া ঐ সকল পাঠ অতি সরল ভাষায় সংকলিত হইয়াছে।'[২] অধিকন্তু বিদ্যাসাগর চতুর্থ থেকে দশম অধ্যায় এর মধ্যে কিছু উপদেশমূলক গল্পও উল্লেখ করেন। যেমন: 'জাদব', 'নবীন', 'মাধব', 'রাম', 'পিতামাতা', 'সুরেন্দ্র' ইতাদি।[২]

বিদ্যাসাগর শিশুদের জন্য অনেক পুস্তক রচনা করেন, যা দ্বারা একটি পরিকল্পিত শিক্ষাদান প্রক্রিয়া পরিচালনা করা সম্ভব। তিনি বর্ণপরিচয়ে সবকিছু এমনভাবে রচনা করেন যে, একটি শিশু ধীরে ধীরে নিজেকে সমাজে খাপ খাওয়াতে পারে। প্রথমে বর্ণপরিচয় দুই অধ্যায়ে, এরপর ধাপে ধাপে কথামালা এবং বোধদয়। এরপর তিনি ধারাবাহিকভাবে উপহার দেন 'আখ্যানমঞ্জরী', 'চরিতাবলী' এবং 'জীবনচরিত'। এই উপায়ে তিনি আদর্শ এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর শিক্ষা দেন।

শিশুদের শিক্ষা দেবার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর সচেতন ছিলেন। সেই কারণে ছাত্ররা অমনোযোগী হতো না। শিশুরা যে ধরনের গল্প পছন্দ করত তিনি সেগুলিই নির্বাচন করতেন। এটা স্পষ্ট যে, তিনি তাঁর আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত এবং আনন্দদায়ক বইগুলোর মাধ্যমে একটি নতুন জাতি গড়তে চেয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সাথে এখানে তাঁর শিক্ষা পদ্ধতির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা প্রক্রিয়ার ভিত্তি ছিল মানবতা, শিক্ষা চিন্তার লক্ষ্য ছিল মানবকল্যাণ। তিনি কোন ক্রমেই ধর্মান্ধ ছিলেন না এবং আধ্যাত্মিকতাকে প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাবাদকে অন্ধভাবে গ্রহণ করেন নি। তাই বলে সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চাকে বাতিল করে দেন নি, বরং সে বিষয়কে মনে প্রাণে আধুনিকীকরণ করতে চেয়েছিলেন। গ্রীক দার্শনিক প্রোটোগোরাস ছিলেন একজন

মানবতাবাদী। তিনি ছিলেন মূলত একজন সোফিস্ট। এই সম্প্রদায় অর্থের বিনিময়ে জ্ঞান বিতরণ করত। বিদ্যাসাগরও একজন মানবতাবাদী শিক্ষাবিদ। পার্থক্য হলো তিনি জ্ঞান বিতরণ করে অর্থ তো নিতেনই না, বরং নিজের বেতনের টাকা গরিব-দুঃখী শিক্ষার্থীদের মাঝে দান করতেন এবং শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্যয় করতেন।

আঠার শতকের শেষ দিকে মিশনারিগণ ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে প্রশাসন বাধা প্রদান করে। কারণ ওয়ারেন হেস্টিংস প্রশাসক হিসাবে রাজনৈতিক কারণে ভারতীয়দের বিশ্বাসে আঘাত করতে চায় নি। ভারতীয় পণ্ডিতগণ তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের পক্ষে মত দেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় *এশিয়াটিক সোসাইটি*। এরই মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস এর তৎপরতায় মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা দানের লক্ষ্যে ১৭৮১ প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা মাদ্রাসা। জোনাথন ডানকান ১৭৯১ সালে বেনারস এ প্রতিষ্ঠা করেন সংস্কৃত কলেজ। ইংল্যান্ডের শিক্ষা পরিচালনা কমিটি সামাজিক এবং বাণিজ্যিক কারণে ওয়ারেন হেস্টিংস এর উক্ত পদ্ধতি অনুমোদন করেন। বাঙালিরা তাদের মর্যাদা উন্নত করতে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ব্যাপক আগ্রহ দেখায়। অপরপক্ষে, পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ মনে করেন যে, ইংরেজি শিক্ষা ভারতীয়দের মন থেকে অন্ধকার এবং কুসংস্কার দূর করবে; যা ১৭৯২ সালে চার্লস গ্র্যান্ট এর বই *অবজারভেশন* এ প্রকাশিত হয়। ১৭৯৩ সালে উইলবার ফোর্স ভারতীয়দের নৈতিক মূল্যবোধের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন এবং কোন আপত্তি না শুনে ভারতে শিক্ষক এবং পুরোহিত পাঠানোর প্রস্তাব করেন।

উনিশ শতকে ভারতে 'প্রাচ্য' এবং 'পাশ্চাত্য' শিক্ষা পদ্ধতি নামক দুই ধরনের সমর্থক গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রাচ্য শিক্ষা পদ্ধতি সমর্থক জনগণ দেশীয় শিক্ষাকে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি সমর্থক জনগণ পাশ্চাত্য শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দেয়ার কারণে এক ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। এই অবস্থায় সরকার নীরব না থেকে পদক্ষেপ নেন। কোলকাতায় শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০০ সালে। একই সময়ে ভারতীয় ব্রিটিশ নাগরিকদের দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ১৮১৩ সালে সরকার এক সনদের মাধ্যমে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরই মধ্যে ভারতীয় জনগণ ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ে। এই সুযোগে মিশনারিরা নিজেদের মত শিক্ষা বিস্তারে মনেযোগী হয়ে ওঠে। মজার ব্যাপার হলো পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও শিক্ষা লাভের জন্য দেশীয় হিন্দু জনগণের উদ্যোগ এবং অর্থ সাহায্যে ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'হিন্দু কলেজ'। কালক্রমে 'প্রাচ্য' এবং 'পাশ্চাত্য' দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্র হয়ে পড়ায় লর্ড বেন্টিঙ্ক এই অচলাবস্থা দূর করতে লর্ড মেকলের হস্তক্ষেপ কামনা করলেন। সবকিছু শুনে লর্ড মেকলে ১৮৩৫ সালের তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন। এটা ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতির ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল; যেখানে তিনি ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন।

'প্রাচ্য' এবং 'পাশ্চাত্য' সমর্থক গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব যখন চরম পর্যায়ে তখন বেন্টিঙ্কএর পরামর্শ এবং মেকলের মতামত একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করতে সাহায্য করে। উনিশ শতকের শুরুতে সরকার শিক্ষা সংক্রান্ত দুটি প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা হল:

১. ১৮১৩ সালে শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান এবং মিশনারিদের কার্যক্রমকে স্বীকৃতি প্রদান

২. ১৮৩৫ সালে সিদ্ধান্ত হয় যে, শিক্ষা হবে পাশ্চাত্য ধরনের এবং মাধ্যম হবে ইংরেজি।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের কার্যক্রম ছিল সীমিত এবং উপর থেকে নিচের দিকে ধাবমান পড়া নীতিতে প্রবর্তিত। যদিও মেকলে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করলেন কিন্তু সময়মত কার্যকর হল না। মাদ্রাসা এবং সংস্কৃত কলেজ যথারীতি চলতে থাকল। রাষ্ট্রীয় ভাষা ফারসির পরিবর্তে ১৮৩৫ সালে ইংরেজি করা হল এবং এর কদর বাড়তে থাকল। ১৮৫৪ সালে উডের ডেচপ্যাচে ইংরেজিকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করে দেয়া হয়, স্কুলগুলোকে রাষ্ট্রীয় অনুদান দেয়ার কথা বলা হয় এবং একই সাথে উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়।

বিদ্যাসাগরের সময়কালটা ছিল রাজা রামমোহন রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাঝামাঝি। বাঙালির নবজাগরণের গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল এটা। ইউরোপীয় সংস্কৃতি এবং জ্ঞান বিজ্ঞান আমাদের আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে এটা সঠিক নয়, বরং বাঙালিরা সেটার সাহায্য নিয়ে এবং অনুসরণ করে নিজেরাই পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই সময় বাঙালিদের মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বাঙালিরা ইউরোপীয় সংস্কৃতি এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে দেশীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটিয়ে একটি উন্নত ও সমন্বিত সাংস্কৃতিক কাঠামো তৈরি করার চেষ্টা করেছিল। পুরো উনিশ শতক ধরে এই প্রক্রিয়া চলছিল, যা শুরু হয়েছিল রাজা রামমোহন রায় থেকে এবং শেষ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়ের মধ্যদিয়ে। যদিও পরিবর্তন থেমে থাকার বিষয় নয়, তবুও আপাত থেমে গিয়েছিল বলে ধরে নেয়া যায়। উক্ত দুই বিখ্যাত সংস্কারকের মাঝামাঝি অবস্থান করে বিদ্যাসাগর সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেন।

বিদ্যাসাগরের জন্মের পূর্বেই বেসরকারি স্তরে পাশ্চাত্য শিক্ষা শুরু হয়ে যায়। শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং হিন্দু কলেজ এরই মধ্যে স্থাপিত হয়েছে; যার লক্ষ্য ছিল প্রভাবশালী হিন্দুদের সন্তানদের ভারতীয় ভাষা, ইংরেজি এবং ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া।[২] কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৭ সালে, যার লক্ষ্য ছিল পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা এবং কলকাতা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ সালে। ১৮২১ সালের মধ্যে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি অনেকগুলো ভাষায় বিশেষ করে ফারসি, আরবি, উর্দু, বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরেজি ভাষায় প্রায় ১২৭৪৬৪ খানা পুস্তক প্রকাশ করে।[২]

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, ভারতীয়দের একপক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে থাকলেও অন্য পক্ষ বাধা দেয়। ১৮২৩ সালে সংস্কৃত কলেজের উন্নতিকল্পে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। রামমোহন রায় তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে লেখা এক চিঠিতে এই সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বরে লেখা সেই ঐতিহাসিক চিঠির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল যার সাথে বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কার আন্দোলনের সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায়। জনগণের পক্ষে রামমোহন রায় বলেন:

> The Sanskrit system of education would be the best calculated way to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British Legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will

> consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry and anatomy with other useful sciences which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe, and providing a college furnished with the necessary books instruments and other apparatus.[2]

বিদ্যাসাগরের সংস্কার আন্দোলনের কথা এলেই যার নাম সবার আগে আসে তিনি হলেন রামমোহন রায় এর অনুসারী হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও যিনি পর্তুগিজ বংশোদ্ভুত হয়েও ভারতীয় নাগরিক। ভারতকে ভালবেসেছিলেন প্রাণ দিয়ে। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। মাত্র তেইশ বৎসর আট মাসের জীবন এবং পাঁচ বৎসরের শিক্ষকতার সময়কালের মধ্যে তিনি সংস্কারের ক্ষেত্রে বলা যায় যুবক সম্প্রদায়ের মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সামাজিক সংস্কার থেকে শুরু করে অদৃষ্টবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্ত্রী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়ে স্বাধীন যুক্তিবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত সব ধরনের সংস্কারমুক্ত মতামত প্রকাশ করতেন এবং ছাত্রদেরকেও এসব বিষয়ে নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে উৎসাহ দিতেন। ডিরোজিওর অনুসারী কয়েকজন যুক্তিবাদী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলায় যে সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় তা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত।[৩] ইয়ং বেঙ্গল পরিচালিত পত্রিকা 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' সামাজিক কুসংস্কার এবং শিক্ষার সমস্যাগুলো প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অল্প কিছু লোকই কেবল মুক্তচিন্তার অধিকারী হয় বেশিরভাগই মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে ধর্মীয় চিন্তাদ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। এরূপ অবস্থায় বিদ্যাসাগর খুঁজতে থাকেন মুক্তির পথ। তিনি রামমোহন রায় এর মত অনুভব করেন, একমাত্র শিক্ষাই পারে তাঁর স্বজাতির মন থেকে অন্ধকার দূর করতে। এজন্য তিনি শিক্ষাসংস্কার এবং শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। বিধবা বিবাহের পক্ষে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেন এবং শিক্ষার মাধ্যমে নারীসমাজের ক্ষমতায়নের চেষ্টা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি কর্মক্ষেত্রে একের পর এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শুধু সরকারি অর্থেই নয় প্রয়োজনে নিজের বেতনের অর্থ খরচ করে এই কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি নারী শিক্ষাকে উদ্বুদ্ধ করতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম এ ডিগ্রিধারী নারী চন্দ্রমুখী বসুকে পুরস্কৃত করেন।

একজন সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েও বিদ্যাসাগর অনুধাবন করেছিলেন যে, বিজ্ঞান ও দর্শনের মত আাধুনিক শিক্ষার জন্য 'টোল', 'চতুষ্পাঠী', 'পাঠশালা' বা শুধুমাত্র সংস্কৃত শিক্ষা যথেষ্ট নয়। তিনি আরও বুঝেছিলেন যে, শুধু প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য শিক্ষাও মুখ্য নয়, বরং একমাত্র বাস্তবধর্মী ও সময়োপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থাই পারে আধুনিক সমাজ গড়তে। শুধু শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ নয় বা শুধু তত্ত্ব শিক্ষা নয়, তিনি আসলে শিক্ষার মাধ্যমে জাগতিক শান্তি এবং সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন চেয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন আমাদের সমাজের প্রয়োগমুখীনতার চেয়ে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক বেশি। সুতরাং আমরা যদি এই সমাজের উন্নয়ন চায় বা আধুনিক উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে চায় তবে আমাদের বাস্তববাদী হওয়ার কোন বিকল্প নেই। আমাদের বিজ্ঞান এবং যুক্তিবিদ্যার চর্চা করতে হবে। তিনি পাশ্চাত্য মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির মধ্যে জীবনের নতুন মানে খুঁজে পান। এই ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ভাববাদী হিন্দু দর্শনের সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হন নি। বাংলা ভাষার উন্নয়নে তিনি

শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় পড়াশুনার উপর জোর দেন। কিন্তু মাতৃভাষার উন্নয়নে কখনও কখনও সংস্কৃত এবং ইংরেজি ভাষার চর্চা করতে বলেছেন। তাঁর শিক্ষা বিষয়ক কর্ম, বিভিন্ন ধরনের চিঠিপত্র, রিপোর্টসমূহ এবং সংস্কার বিষয়ক মতামত সবকিছুই তাঁর সমসাময়িক, সৃষ্টিশীল এবং প্রায়োগিক ধ্যান ধারণা প্রকাশ করে।

বিদ্যাসাগর সহকারী সম্পাদক হিসাবে সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন ১৮৪৬ সালে। যোগদানের পর তিনি তৎকালীন সম্পাদক রসময় দত্তের কাছে শিক্ষা সংস্কার বিষয়ক একটি প্রস্তাবনা পেশ করেন। এটা ছিল তাঁর প্রথম শিক্ষা বিষয়ক চিঠি, যাতে তিনি ঐ কলেজের কারিকুলাম পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু রসময় দত্ত উক্ত প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বিদ্যাসাগরের সাথে তাঁর মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ ১৮৪৭ সালের এপ্রিল মাসে বিদ্যাসাগর চাকুরিতে ইস্তফা দেন।[৩] বিদ্যাসাগর পুনরায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগদান করেন। ১৮৫০ সালে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালঙ্কার জজ পণ্ডিতের চাকুরি নিয়ে মুর্শিদাবাদ চলে যান। ঠিক এমনি সময়ে তৎকালীন শিক্ষা পর্ষদের সম্পাদক বিদ্যাসাগরকে ঐ শূন্য পদ গ্রহণের অনুরোধ জানান। শিক্ষা সংস্কার ও আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তনই ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। আর একে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য ক্ষমতা ও পদমর্যাদা একান্ত প্রয়োজন বিদ্যাসাগর তা ভালো করেই বুঝতেন। কিন্তু সাহিত্যের অধ্যাপক হলেও তাঁর পক্ষে শিক্ষা সংস্কার ও আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন কখনো সম্ভব নয়, তাই তিনি এ পদ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেন। শিক্ষা পর্ষদের সম্পাদক ড. এফ. জে. ময়েট তাকে বার বার অনুরোধ জানালে তিনি বলেন যে, তাকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দিলে তিনি এ পদ গ্রহণে সম্মত আছেন। ময়েট সাহেব তাকে এ ব্যাপারে একটি লিখিত আশ্বাসও দেন। এ আশ্বাসেই তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চাকুরি ছেড়ে ১৮৫০ সালের ৪ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৬ ডিসেম্বর মি. ময়েট সাহেবের কাছে লেখা একটি চিঠিতে সংস্কৃত কলেজের সংস্কারকল্পে এক বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে তিনি ব্যাকরণপাঠ সহজ এবং সংক্ষিপ্তকরণ, ইংরেজি বিভাগের পাঠপরিকল্পনায় ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ, মাতৃভাষায় পড়াশুনার উপর গুরুত্ব প্রদান এবং মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে সংস্কৃত এবং ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বাড়ানোর ব্যাপারে জোর দেন।[৩] এই রিপোর্ট শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হলেও খুশি হতে পারেন নি বাবু রসময় দত্ত। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে যোগদানের ঠিক এক মাসের মধ্যেই তিনি পদত্যাগ করেন।

এই পদত্যাগের সাথে সাথেই সংস্কৃত কলেজ হতে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ উঠিয়ে অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং অধ্যক্ষের পদে কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতকে যোগ্য মনে না হওয়ায় শিক্ষা পর্ষদ বিদ্যাসাগরের নাম প্রস্তাব করে বাংলা সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ বাংলা সরকার গ্রহণ করে বিদ্যাসাগরকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দান করেন।[৩]

বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন সৃষ্টিশীল মানুষ। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, মননশীলতা, কঠোর পরিশ্রম এবং স্বদেশপ্রেম তাকে করেছে এক মহান ব্যক্তি। জীবনের প্রায় সবটুকু সময় তিনি ব্যয় করেছেন সে কাজ করে, যাতে বাঙালিরা ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কুসংস্কারমুক্ত শিক্ষিত জনগণ হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে চলতে পারে। এর জন্য তিনি সামাজিকভাবে বিভিন্ন সময় নিগৃহীত হয়েছেন, কিন্তু পিছপা হন নি। অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পাবার পর শিক্ষা পর্ষদের এর পূর্ণ সমর্থন পেয়ে 'শিক্ষা সংস্কার আমার মহত্তম সৎকর্ম'[৩] বলে তিনি পুরোদমে শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শিক্ষাসংস্কার আন্দোলনে বিদ্যাসাগর যে

কারণে সবচেয়ে বেশি আলোচিত তাহল ১৮৫২ সালের ১২ এপ্রিল তাঁর পেশকৃত শিক্ষা পরিকল্পনা, যা *'Notes on Sanskrit College'* নামে বহুল পরিচিত। ২৬ পরিচ্ছেদ সম্বলিত শিক্ষাবিষয়ক বিস্তৃত ও বিশাল কর্ম যা তাঁর গভীর অনুসন্ধানমূলক দূরদৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে। ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, বিষয় নির্ধারণ, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, কোন কিছুই তাঁর আলোচনা থেকে বাদ যায় নি। এক কথায় আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান, দর্শনকে পাঠ্যভুক্ত করা, মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধন এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা ছিল তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে তিনি ব্যাপকভাবে সিলেবাস পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলেন। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছে প্রথম পাঁচ পরিচ্ছেদে। শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রথম পরিচ্ছেদে।[৩] সংস্কৃত কলেজ উন্নয়ন বিষয়ক চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তী একুশ পরিচ্ছদে। ষষ্ঠ থেকে সপ্তদশ পরিচ্ছদের মধ্যে কারিকুলাম নিয়ে আলোচনা করেছেন। শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন অষ্টাদশ থেকে বিংশতম পরিচ্ছদের মধ্যে এবং শেষ পরিচ্ছদে আলোচনা করেছেন কলেজ প্রশাসন নিয়ে।

মূল পরিকল্পনাটি ইংরেজিতে লেখা। মোট ২৬ টি পরিচ্ছদের মধ্যে এখানে শ্রী বিনয় ঘোষের অনুবাদ করা উল্লেখযোগ্য ১৮ টি পরিচ্ছেদ এখানে তুলে ধরা হলো:

১. বাংলাদেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যারা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিৎ, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।
২. যাঁরা ইউরোপীয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম নন, এবং সেগুলিকে ভাবগম্ভীর, প্রাঞ্জল বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।
৩. যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাঙলা ভাষায় রচনা সৃষ্টি করতে পারবেন না। সেইজন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষার প্রয়োজন।
৪. অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যাঁরা কেবল ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী, তাঁরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাঙলা ভাষায় কিছু প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁরা এত বেশি ইংরেজি ভাবাপন্ন যে, তাঁদের যদি অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত শিক্ষা দেয়া যায়, তাহলেও তাঁরা শত চেষ্টা করেও পরিমার্জিত দেশীয় বাঙলা ভাষায় কোন ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন না।
৫. তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্যে ভালভাবে শিক্ষা দেয়া যায়, তাহলে তারাই একমাত্র সুসমৃদ্ধ বাঙলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।
৬. পরের প্রশ্ন হল, এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজে কী ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে?
৭. সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণে ও সাহিত্যে খুব ভালভাবে শিক্ষা দিতে হবে। সাহিত্যের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে কাব্য, নাটক ও গদ্য সবই থাকবে।
৮. অলঙ্কারশাস্ত্রে তাদের দু-একখানি ভাল বই পড়ালেই চলবে, যেমন 'কাব্যপ্রকাশ' ...ও 'সাহিত্য দর্পণ' গ্রন্থের দু-একখানি অধ্যায়।
৯. ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠ করলে ছাত্রদের সংস্কৃত বিদ্যার ভিত দৃঢ় হবে।
১০. স্মৃতিশাস্ত্রে এইগুলি পাঠ্য হতে পারে: মনুস্মৃতি, মিতাক্ষরা-দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা। এই শাস্ত্রগুলি পাঠ করলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে।

১১. বর্তমানে গণিতশাস্ত্রের পাঠ্য হল লীলাবতী ও বীজগণিত। গণিত বিজ্ঞানের পক্ষে এই দুখানি বই যথেষ্ট নয়। তাছাড়া এমন এক পদ্ধতিতে বই দুখানি রচিত, প্রচলিত ছড়া আর্যা ইত্যাদির সাহায্যে, যে আসল বিষয়বস্তু এক-একটি প্রহেলিকা হয়ে উঠেছে। সহজ বিষয় সরল করে না বলার জন্য ছাত্রদের অনেক বেশি সময় লাগে এই বিদ্যা আয়ত্ব করতে। প্রায় তিন চার বছর ধরে তাদের বই দুখানি পড়তে হয়। বইয়ের মধ্যে দৃষ্টান্ত না থাকার জন্য অনেক 'সমস্যা' ছাত্রদের বোধগম্য হয় না। আসল কথা হল, সংস্কৃত-গণিত ছাত্রদের পড়ানোর মধ্যে কোন সার্থকতা নেই, কারণ এতে ছাত্রদের প্রচুর সময় ও শ্রমের অপব্যয় হয়। সেই সময়টুকু তারা অন্য প্রয়োজনীয় বিষয় পড়তে পারে।

১২. সেইজন্য সংস্কৃতে গণিত শিক্ষা না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

১৩. এ থেকে একথা বুঝলে ভুল হবে যে, আমি শিক্ষার ব্যাপারে গণিতবিদ্যার যথাযথ গুরুত্ব দিই না। তা আদৌ ঠিক নয়। আমি শুধু বলতে চাই যে, সংস্কৃতের বদলে ইংরেজির মাধ্যমে গণিতবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া উচিৎ, কারণ তাতে ছাত্ররা অর্ধেক সময়ে দ্বিগুণ শিখতে পারবে।

১৪. হিন্দু দর্শনের ছয়টি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় আছে– ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পতঞ্জল, বেদান্ত ও মীমাংসা। ন্যায়দর্শনে প্রধানত তর্কবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা, এবং মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ রসায়ন, আলোকবিদ্যা ও বলবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। পতঞ্জল ও মীমাংসা সম্বন্ধেও প্রায় ঐ একই কথা বলা যায়। মীমাংসায় উৎসবপার্বণের এবং পতঞ্জলে ঈশ্বরচিন্তা হল বিষয়বস্তু।

১৫. কলেজপাঠ্য হিসেবে এইসব বিষয় প্রয়োজনীয় কিনা, সে সম্বন্ধে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০ আমি আমার রিপোর্টে যে মত ব্যক্ত করেছি আজও তাই সমর্থন করি।

১৬. "একথা ঠিক যে হিন্দু দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সাথে খাপ খায় না, কিন্তু তা হলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। ছাত্ররা যখন দর্শন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে, তার আগে ইংরেজি ভাষায় তারা যে জ্ঞান অর্জন করবে তাতে ইউরোপের আধুনিক দর্শনবিদ্যা পাঠ করারও সুবিধা হবে তাদের। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে, এদেশের পণ্ডিতদের পক্ষে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে। সমস্ত রকম মতামতের দর্শন ছাত্রদের পড়তে বলার উদ্দেশ্য হল, সেগুলি পড়লে তারা দেখতে পাবে কিভাবে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করেছেন এবং এক দর্শনের পণ্ডিত অন্য দর্শনের ভুলভ্রান্তি দেখিয়েছেন এবং প্রতিপাদ্যের যৌক্তিকতা খণ্ডন করেছেন। সুতরাং আমার ধারণা, সর্বমতের দর্শন পাঠ করবার সুযোগ দিলে ছাত্রদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত গড়ে উঠবে। তার সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে, দুই দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য কোথায় তা তারা বুঝতে পারবে।"

১৭. এই শিক্ষার আর একটি সুবিধা হল এই যে পাশ্চাত্য দর্শনের ভাবধারা আমাদের বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করতে হলে যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা জানা দরকার, তা পণ্ডিতদের আয়ত্বে থাকবে।

১৮. এসব বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকার প্রয়োজন নেই। ছাত্ররা যদি এইগুলি পড়ে তাহলেই যথেষ্ট হবেঃ ন্যায়দর্শন-গোতমসূত্র ও কুসুমাঞ্জলি; বৈশেষিক দর্শন-কণাদের সূত্র; সাংখ্য দর্শন-কপিলের সূত্র এবং কৌমুদী; পতঞ্জল দর্শন-পতঞ্জলের সূত্র; বেদান্ত দর্শন-বেদান্তসার এবং ব্যাসের সূত্র, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ; মীমাংসা দর্শন-জৈমিনির সূত্র। এগুলি ছাড়া ছাত্ররা 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' পড়বে, কারণ তার মধ্যে সব দর্শনের সারকথা পাওয়া যাবে।[৩]

এই পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলার শিক্ষার উন্নয়নে বিদ্যাসাগরের সৃষ্টিশীল চেতনা, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞা, এবং আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সবকিছুই খুব সুন্দরভাবে তথ্য এবং যুক্তিনির্ভর করে উপস্থাপন করেছেন। এদেশে বিদ্যাসাগর এমন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি যিনি প্রকৃতপক্ষে ও যথার্থভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সরকারি শিক্ষানীতির মধ্যে অগ্রাধিকার দিতে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষানীতিতে প্রথমে হিন্দু এবং মুসলমান শিক্ষার উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল, অথচ তাতে বাংলা রয়ে যাচ্ছিল উপেক্ষিত। বিদ্যাসাগর দুই এর মধ্যে প্রয়োজনীয় অথচ সুষম ও সুদূরপ্রসারী মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য ভাণ্ডার আহরণ করেই সুন্দর সাবলীল সর্বভাব প্রকাশক্ষম বিশিষ্ট স্বদেশিরীতির বাংলা ভাষায় তার স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ কামনাই সেই মিলনের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিলেন। তার ফলে মাতৃভাষার প্রতি মনে মনে শ্রদ্ধা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যায় তার জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠবে। মাতৃভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য ইংরেজি থেকে আমাদের ভাব সম্পদ গ্রহণ করতে হবে। আর সংস্কৃত হতে গ্রহণ করতে হবে অফুরন্ত শব্দ সম্ভার। তাই এদেশীয় শিক্ষার্থীদের প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হবে এবং সাথে সাথে ইংরেজি ভাষা চর্চা করলে তবেই প্রকৃত সার্থকতা আসবে।[৩]

তিনি সংস্কৃত কলেজকে একটি সমৃদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে বেশ কিছু সুদূরপ্রসারী ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং দৃঢ়তার সাথে প্রশাসনিক দিক পরিচালনা করেন। বিদ্যাসাগর অধ্যক্ষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যেরা ঐ কলেজে পড়ালেখার সুযোগ পেত না। তিনি এসেই সেই সমস্ত নিয়ম বদলে দেন এবং সবার জন্য সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। এই সময়ের পূর্বে হিন্দু কলেজ এবং কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্ররা ছাড়া সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা মর্যাদাপূর্ণ সরকারি চাকুরি পেত না। তিনি শিক্ষা পর্ষদের সম্পাদকের সাথে দেখা করে যোগ্য ছাত্রদের জন্য সে ব্যবস্থাও করেন।

শিক্ষা পর্ষদের আমন্ত্রণে বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ড. জে. আর. ব্যালেন্টাইন ১৮৫৩ সালের মাঝামাঝি কলকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করেন। তিনি মূলত বিদ্যাসাগরের শিক্ষা পরিকল্পনাটি পরীক্ষণের জন্য এসেছিলেন, কিন্তু উক্ত পরিকল্পনার মৌল উদ্দেশ্যটি বুঝতে না পেরে কিছুটা বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন; যা শিক্ষা পর্ষদও কিছুটা সমর্থন করে বিদ্যাসাগরকে ব্যালেন্টাইন সাহেবের সাথে সমন্বয় করার পরামর্শ দেন। এতে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন এবং শিক্ষা পর্ষদের সম্পাদক ময়েট সাহেবকে লেখেন:

> ড. ব্যালেন্টাইনের রিপোর্ট আমি ধীরভাবে বিবেচনা করে দেখেছি। যদি এই নির্দেশগুলি আমাদের বর্ণে বর্ণে পালন করতে হয়, তাহলে পর্ষদের নির্দেশক্রমে সম্প্রতি আমি নিজের যে পাঠ্যসূচি তৈরী করেছি, এর এবং কলেজে আমার নিজের মর্যাদাই যে ক্ষুণ্ন হবে তা নয়, আমার শিক্ষার কাজে ব্যাঘাত ঘটবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপোযোগিতার অনেকখানি কমে যাবে।... আমার বক্তব্য হলো, আমাদের সংস্কৃত শিক্ষা দিতে দিন, প্রধানত বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য। তার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ব করার সুযোগ দিন। এই সুযোগ পেলে আমি নিশ্চিত হয়ে আপনাকে বলতে পারি যে, পর্ষদের উৎসাহ ও সমর্থনে আমি কয়েক বছরের মধ্যে এমন একদল পণ্ডিত যুবক তৈরী করে দিতে পারবো যারা নিজেদের রচনা ও শিক্ষার দ্বারা দেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিদ্যার প্রসারে আপনাদের প্রাচ্য বিদ্যার অথবা শুধু ইংরেজি বিদ্যার পণ্ডিতদের চেয়ে অনেক বেশি সাহায্য করতে পারবে।[২]

তাঁর তীব্র জেদ ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতিবাদের কাছে শিক্ষা পর্ষদ শেষ পর্যন্ত নমনীয় হয়ে শিক্ষা পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেছিলেন।

১৮৪৬ থেকে ১৮৫৪ সালের মধ্যে বিদ্যাসাগরের চারটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত রিপোর্টে কীভাবে শিক্ষাকে আরও উন্নত ও ফলদায়ক করা যায় তিনি সে বিষয়েই মনোনিবেশ করেছেন। তৎকালীন সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে কোন বিষয়গুলো ছাত্রদের জন্য সহায়ক, সেগুলোই সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। ব্যালেন্টাইন সাহেব Mill এর লজিকের সংক্ষিপ্তসার তৈরি করে ছাত্রদের পড়ানোর পক্ষে মত দেন, পক্ষান্তরে বিদ্যাসাগর মূল বইটি সম্পূর্ণরূপে পড়ানোর পক্ষে মত দেন। ব্যালেন্টাইন Berkley এর `Inquiry' পড়ানোর পক্ষে, কিন্তু বিদ্যাসাগর বলেন, "আমার মত এই যে, পাঠ্য পুস্তকরূপে এই বই পড়ালে সুফলের চেয়ে কুফলের সম্ভাবনা বেশি।" তিনি সব সময় বিরোধিতা করেছেন তা নয় যেমন, Francis Bacon এর `*Novum Organum*' সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছেন।

উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষার বীজ রোপিত হয়। মিশনারিদের উদ্যোগেই প্রথম নারীশিক্ষা প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীতে এই বিষয়টিতে রামমোহন রায়ের অনুসারী এবং ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। বিদ্যাসাগর সেই বিষয়টিতে ভিন্নমাত্রা যোগ করেন। সমাজে তিনি নারীদের সম্মান, মর্যাদা এবং মূল্যায়নের উপর জোর দেন। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নত অবস্থানে তুলে ধরেছেন, যা তদানীন্তন সমাজের জন্য খুবই দরকার ছিল। সরকারি সাধারণ পরিষদের আইন সদস্য জন ইলিয়ট বেথুনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের খুব সখ্যতা ছিল এবং ১৮৪৯ সালে তিনি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যার সাথে বিদ্যাসাগর জড়িত ছিলেন। বেথুন সাহেবের মৃত্যু হলে বিদ্যাসাগর সেই স্কুলের সম্পাদক নিযুক্ত হন। হ্যালিডে সাহেবের বাংলা শিক্ষা সংস্কারের ভূমিকায় তাঁর প্রধান সমর্থক, সহযোগী ও সহায়ক ছিলেন বিদ্যাসাগর। নতুন মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং বেথুন বালিকা বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এরই মধ্যে বিদ্যাসাগর স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাই হ্যালিডে সাহেবের আহ্বানে কর্মযোগী বিদ্যাসাগর অবিচল আত্মবিশ্বাস নিয়ে নারীশিক্ষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বর্ধমানের জৌগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ডি.পি.আই কে জানালে তিনি স্কুলটির জন্য মাসিক বত্রিশ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। এরপর মাত্র সাত মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় অর্থাভাবে এই বিদ্যালয়গুলো পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। কারণ, বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়গুলো খুলেছিলেন বাংলার তৎকালীন লেফটেনেন্ট গভর্ণর হ্যালিডে সাহেবের অনুমতি নিয়ে। হ্যালিডে সাহেব এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমতি না নিয়েই অনুমতি দিয়েছিলেন। অনেক চেষ্টার পর কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যালয়গুলি স্থাপন সংক্রান্ত খরচ দিতে চাইলেও পরিচালনার জন্য নিয়মিত মাসিক খরচ দিতে রাজি হন নি। এই পরিস্থিতিতে নারীশিক্ষা চলমান রাখতে বিদ্যাসাগর চরম সমস্যায় পড়ে গেলেন। কিন্তু ভেঙ্গে পড়লেন না।

মূলত ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত সরকার নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বিশৃঙ্খলা ও অস্বচ্ছলতায় ছিল। এ অবস্থায় নব প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলোর জন্য অর্থব্যয় করার মতো মানসিকতার ঔপনিবেশিক সরকারের ছিল না। বিদ্যাসাগর এই প্রতিকূল পরিবেশে জমিদারদের কাছে সাহায্য নিয়েছেন। ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং সরকারি কর্মচারীরা নিয়মিত সাহায্য করেছেন। তৎকালীন ছোটলাট বিডন সাহেব নিয়মিতভাবে মাসিক ৫৫ টাকা

দিতেন।[২] বিদ্যাসাগর নিজেও যতটা পারতেন সাহায্য করতেন। এ ভাবে সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত সরকারি সাহায্যের মুখাপেক্ষী না হয়েও বালিকা বিদ্যালয়গুলো টিকিয়ে রাখেন। বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক সমাজ ছিল ধর্মীয় গোঁড়ামী আর কুসংস্কারে ঢাকা। সমাজের অর্ধেক নারী। তিনি মনে করেছিলেন এই নারীদের যদি শিক্ষিত করে তোলা যায়, যদি শিক্ষার আলো জ্বেলে তাদের মন থেকে অন্ধকার আর গোঁড়ামী দূর করা যায় তবে বাঙালি আবার তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে এবং বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে বাঁচবে। সেই জন্য তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যান এবং তাঁর চেষ্টা যে সফল হয়েছে তা আজ আমরা সমাজের দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরবর্তীতে শুধু 'বিদ্যাসাগর' নামে যিনি সবার কাছে পরিচিত, সেই নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাঁর কৃতিত্ব। জন্মের পর থেকে একরোখা আর জেদী স্বভাবের এই মানুষটি সদর্থকভাবে তাঁর জেদ প্রকাশ করেছেন আত্মমর্যাদাপূর্ণ একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আর স্বদেশপ্রেমী হিসেবে। জীবনে কখনো অন্যায়কে সমর্থন করেন নি, সুযোগ পেয়ে সুবিধা গ্রহণ করেন নি এবং আত্মসম্মান বিকিয়ে কোন কাজ করেন নি। আজীবন সোচ্চার ছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামী আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। আপাত দৃষ্টিতে তিনি ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠানাদি করেন নি, তবে মানবিকতার প্রশ্নে তিনি অনেক ধার্মিকের চেয়েও মানবিক ছিলেন। গরিব ছাত্রদের অর্থ সাহায্য, পীড়িতের সেবা, মায়ের ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে দুর্যোগপূর্ণ ভয়ঙ্কর দামোদর নদী সাঁতরে পার হওয়া, দেশীয় শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সিলেবাস পরিবর্তন, প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে দ্বন্দ্ব, ইংরেজ সরকারের সাথে প্রতিনিয়ত দেন দরবার করা ইত্যাদি নানা কারণে বিদ্যাসাগর আমাদের মনের মনিকোঠায় চিরদিনের জন্য অমর হয়ে আছেন। তিনি আচরণে, ব্যবহারে কিংবা পোশাকে ছিলেন খুবই সরল অথচ প্রশাসক হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। নিজের কাজ নিজেই করতে পছন্দ করতেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মূল্যবোধ সৃষ্টি ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। নৈতিকতার ক্ষেত্রে বিন্দু পরিমাণ ছাড় দেন নি কখনো। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক প্রবন্ধে লেখেন:

> মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালী নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।[১]

বিদ্যাসাগর ছিলেন মনে-প্রাণে একজন বাঙালি অথচ কর্মে এবং চিন্তায় ইউরোপীয়। তাই বলে ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে অন্ধভাবে অনুকরণ করেন নি। ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শনের আলোকে নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, দর্শন এবং সংস্কৃতি, তথা জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করার মানসে তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন। বিদ্যাসাগরের পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রতি আগ্রহকে অনেকে দেশীয় সংস্কৃতির বিরোধী মনোভাব বলে মনে করলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> বিদ্যাসাগর আচারের দূর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তাঁর আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। যেখানে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতুস্বরূপ হয়েছিলেন সেখানেও তাঁর বুদ্ধির ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যা-কিছু পাশ্চাত্য তাকে অশুচি বলে অপমান করেন নি। তিনি জানতেন বিদ্যার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের দিগ্‌বিরোধ নেই। তিনি নিজে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, অথচ তিনিই বর্তমান ইউরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করবার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং নিজের উৎসাহ ও চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিদ্যা আয়ত্ব করেছিলেন।[৩]

শিক্ষা বিস্তার, সমাজসংস্কার এবং নৈতিক গুণাবলী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমস্ত জীবনব্যাপী যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন তাতে তাঁকে কোন মতেই একজন সাধারণ মানুষ বলা যায় না। তৎকালীন প্রশাসকদের কাছে তাঁর যে ভাবমূর্তি প্রকাশিত হয়েছিল, ইচ্ছে করলে সমস্ত জীবন অত্যন্ত আরাম আয়েশে কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। ভালো পোশাক, ভালো বাসস্থান কিংবা বিলাসী জীবনোপকরণ কোনটিই তাঁর কাম্য ছিল না। পৃথিবীতে তাঁর আগমনই ঘটেছিল সম্ভবত দুঃখী মানুষদের সেবা করা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক করা এবং আধুনিক শিক্ষাবর্জিত জাতিকে সময়োপযোগী শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করা। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'বিদ্যাসাগর শুধু উনিশ শতক নয়, একালেরও পরম বিস্ময়। গ্রীক উপাখ্যানের প্রমিথিউসের মতো তিনি মানব কল্যাণের জন্য জ্ঞানাগ্নি সংগ্রহ করেছিলেন।'[৩] সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ রোধ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সেই যুগেও নারীশিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে অসংখ্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন শিক্ষা বিস্তারের এক অন্যতম নিদর্শন। তিনি দূরদর্শী ছিলেন বলেই ভাবতে পেরেছিলেন যে, জনসংখ্যার অর্ধেকই যখন নারী, তখন নারীদের অশিক্ষিত রেখে শিক্ষিত জাতির প্রত্যাশা বাতুলতা মাত্র। ছাত্রদের ভাল শিক্ষা দিতে গেলে ভাল শিক্ষক প্রয়োজন– এই বোধ থেকেই তিনি শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় (নর্মাল স্কুল) স্থাপনের সুপারিশ করেছিলেন। প্রচলিত সিলেবাসের কোন কোন বিষয় দেশীয় ছাত্রদের জন্য মঙ্গলজনক এবং কোন কোন বিষয় অপ্রয়োজনীয় তা ভেবেই সংস্কৃত কলেজের সিলেবাস সংস্কারকল্পে তিনি ২৬টি অনুচ্ছেদের বিস্তৃত এবং গঠনমূলক এক পরিকল্পনা পেশ করেন। এছাড়াও শিক্ষা পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন রিপোর্টেও তিনি বিজ্ঞতার স্বাক্ষর রাখেন। দৃঢ়চেতা, সংকল্পে স্থির, অনমনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিদ্যাসাগর নিজের সিদ্ধান্ত রূপায়ণে যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন সাহসিকতার সঙ্গে। তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও যেমন ইংরেজি শিক্ষাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তেমনি সংস্কৃত ভাষা ও বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন সমানভাবে। এমনকি শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মাতৃভাষায় পর্যাপ্ত বই না থাকায় পাঠ্যপুস্তক রচনাতেও হাত দেন ঠিক সময়ে। সমাজ থেকে অন্ধকার দূর করার ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার মনে করে শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন একনিষ্ঠভাবে। তিনি ছিলেন সময়ের সন্তান। বর্তমান যুগের এই নৈতিক অবক্ষয়ের সময়ে শুধু মনে হয় আমাদের দেশে যদি বিদ্যাসাগরের মত একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটত তাহলে এ জাতি মুক্তি পেত। আমাদের এখন যে জিনিসটির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেটি হল নৈতিক শিক্ষা, যার অভাবে সবক্ষেত্রে চলছে নৈরাজ্য, অস্থিরতা, দুর্নীতি এবং অপশাসন। যদিও জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এ বিদ্যাসাগর অনুসৃত নৈতিক শিক্ষা স্থান পেয়েছে এবং ২০১২ সালে বিতরণকৃত নতুন পাঠ্যপুস্তকে নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তবুও শুধু উদ্যোগ নিয়ে বসে থাকলে জাতি তার ফল ভোগ করতে পারবে না, বরং তার জন্য দরকার সর্বক্ষেত্রে উদ্যোগের বাস্তবায়নের চেষ্টা করা এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম নৈতিক শিক্ষাকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করা।

তথ্যসূচি:

১. বিপ্রদাশ বড়ুয়া, বিদ্যাসাগর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২

২. Subal Chandra Mitra, Isvar Chandra Vidyasagar – a story of his life and work, Rupa. Co, New Delhi, 2008, page- 17

৩. ড. সফিউদ্দিন আহমদ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্য ও শিক্ষাচিন্তা, রাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ-৫২৪
৪. তীর্থপতি দত্ত (সম্পাদনা), বিদ্যাসাগর রচনাবলী, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ-১২৬১
৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৫০-১২৭৫
৬. সুখময় সেনগুপ্ত, বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষাঃ বাঙালীর শিক্ষাচিন্তা, পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃঃ ৩
৭. যঃঃঢ়://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/ঈধষপঁঃঃধথঝপযড়ড়ষ-ইড়ড়শথঝড়পরবঃু, Retrieved on 11.10.2011
৮. ড. অজিত কুমার (সম্পাদনা), রামমোহন রচনাবলী, কলকাতা, পৃঃ ৪৩
৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, কলকাতা ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৩৩-১৩৪
১০. ১ Subal Chandra Mitra, Isvar Chandra Vidyasagar – a story of his life and work, Rupa. Co, New Delhi, 2008, page- 118
১১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৭-১৫৬
১২. ড. সফিউদ্দিন আহমদ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্য ও শিক্ষাচিন্তা , রাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃঃ ১৫৮
১৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫১
১৪. ইন্দ্রমিত্র, করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃঃ ৭২৩
১৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৬৭-৬৬৯
১৬. ড. সফিউদ্দিন আহমদ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্য ও শিক্ষাচিন্তা , রাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃঃ ১৬৪-১৬৫
১৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৫-১৭৬
১৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪০-১৪৯
১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগরচরিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৪
২০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৩
২১. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, কলকাতা, ১৯৯১, ভূমিকা

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পের বিষয়বৈভব

চন্দন আনোয়ার*

সারসংক্ষেপ: ষাটের দশকে যে কয়েকজন মেধাবী গল্পকারের হাতে বাংলাদেশের ছোটগল্পের নতুন ভবিষ্যৎ নির্মাণ হয়েছিল তাদেরই একজন ছিলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)। বলা চলে, আমাদের ছোটগল্পের নব প্রাণপ্রবাহের প্রধান পুরুষ এই শক্তিমান কথাশিল্পী। জীবনভাষ্য বিনির্মাণে স্বয়ম্ভূচেতনার অধিকারী ইলিয়াস তাঁর গল্পের বিষয় নির্মাণে ছিলেন তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। খুব যে বেশি তিনি লিখেছেন তা কিন্তু নয়। তিন দশকের সাহিত্য সাধনার ফসল হিসেবে আমাদের কথাসাহিত্যে যা মজুদ হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে দুটি উপন্যাস ও পাঁচটি গল্পগ্রন্থভুক্ত গোটা তেইশেক গল্প এবং অপ্রকাশিত কয়েকটি গল্প। এর বাইরে কিছু প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন। অথচ নিজের সম্পর্কে ইলিয়াস বলতেন 'চব্বিশ ঘণ্টার লেখক'। তাঁর গল্পের বুনন ও চিন্তার ঋজুতাই বলে দেয়, কি ভয়ানক রকমের রক্তপাত ও সংঘাতের মধ্যদিয়ে জন্ম হয়েছে ইলিয়াসের প্রত্যেকটি গল্প– যা শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক হতেই দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রমাণবহ। সাহিত্যিক হিসেবে নিজের দায় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই, সত্যিকার জীবন-ই ওঠে এসেছে ইলিয়াসের গল্পে, এসেছে চালু সমাজবাস্তবতা, যেখানে সামান্য পরিমাণও অসততা, ফাঁক-ফাঁকি নেই, বরং কড়ায়-ক্রান্তিতে জীবনের পুরোমূল্য শোধ করতেই লিখে গেছেন এমন প্রথাবিরোধী লেখা। জীবন যে বিষ উগরে ফেলে, সেই বিষ গলাধঃকরণ করে স্বাধীনতা উত্তর জীবনের ঘটমান বাস্তব ছবিটাই এঁকে গেছেন ইলিয়াস। বস্তুত অমৃতে আত্মহারা হতে তাকে কখনই দেখি না।

ইলিয়াসের জন্মের সময় (১৯৪৩) মন্বন্তরের ভয়াল ছোবলে বাংলার জনপদ ও জনজীবনের প্রচলিত ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছিল। দেশভাগ থেকে শুরু করে পরের পাঁচ দশকের ইতিহাসের উত্থান-পতনের সব আলেখ্যই এই শিল্পীর চৈতন্যকে শুধু ছুঁয়েই যায় নি, রীতিমত রক্তপাত ঘটিয়ে গেছে। দ্বিজাতি-তত্ত্বের[১] ভিত্তিতে আগত অসুস্থ ও পঙ্গু স্বাধীনতার সঙ্গে আসে দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ ও কোটি কোটি উদ্বাস্তু মানুষের হিড়িক। 'স্বাধীনতা যে মানুষের মুক্তিকে সঙ্গে করে আনে নি তা বুঝতে বেশিদিন লাগল না', নতুন রাষ্ট্রে ক্ষমতার হাতবদল ঘটে বন্দুকের নলের মাথায়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণবিদ্রোহসহ উত্তাল দুই দশক জুড়ে তুমুল সংঘাত-সংঘর্ষ ও প্রাণপাত এবং শেষে একাত্তরে বিপুল জনগোষ্ঠীর জনযুদ্ধে অংশগ্রহণে 'ফের স্বাধীনতা আসে। এবার স্বাধীনতা নম্বর ২।'[২] স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই জাতিরজনককে সপরিবারে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে নবাগত স্বাধীনতাটাকে পরিণত করে প্রহসনে। 'যে-মুজিবকে ইয়াহিয়ার ঘাতক সৈন্যরাও খুন করতে সাহস পায় নি অথবা তিনবার কবর খুঁড়েও সাহস পায় নি ফাঁসি দিতে, সেই মুজিবই নিহত হলেন তাঁর নিজের দেশের কিছু ষড়যন্ত্রকারী এবং ঘাতকের হাতে।'[৩] এরপরেই নতুন পতাকার দণ্ড হাতে নিয়ে ট্যাঙ্কে চড়ে আসে রাষ্ট্রের 'ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী' এবং 'ট্যাঙ্কের ওপর বসে গণতন্ত্র বিলি করে।'[৩] এভাবেই অর্ধ-শতাব্দি ধরে বন্দুকের নলার মুখে দফায় দফায় রাষ্ট্রের ক্ষমতার হাতবদল ঘটে– যেখানে ব্যক্তির বিকাশও বন্দুকের নলার মুখে কুঁকড়ে থাকে। ইলিয়াসের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের প্রায় সবটুকু সময় জুড়েই এই বাস্তবতার শিকার। তাঁর ভাষায়- 'ঐ যে সেনাবাহিনীর থাবার নিচে পড়লাম, সারাটা যৌবনকাল চলে গেল তারিই সাঁড়াশির ভেতর, আজও তা থেকে রেহাই মিলল না। মার্শাল ল'র জগদ্দল পাথরে চাপা পড়ে যে কিশোর পরিণত হল যুবকে, যৌবনকাল পার করে দিয়ে আজ সে পক্বকেশ প্রৌঢ়, তার বৃদ্ধি কি আর পাঁচটা মানুষের মতো হতে পারে? তার ক্ষোভ, তার গ্লানি, তার ব্যর্থতা, তার অসহায়ত্ব, তার অসন্তোষ- এসবই কি আমার সময়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য।'[১] ফলে ইলিয়াসের কাছে চালু জীবনের শুভরূপ খুব বেশি একটা পাই না। বরং জীবনের যে

* প্রভাষক, বাংলা, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাউশি, ঢাকা

বীভৎসরূপ আমাদেরকে মানুষ হিসেবে ভাবার অন্তরায়, এবং ভয়ানক আতঙ্কে সরে আছি, সেই বীভৎসরূপেরই ঘনিষ্ঠ রূপকার ইলিয়াস। মনে পড়ে, প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' নিয়ে সময়ের খ্যাতিমান কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক লিখেছিলেন যে, ইলিয়াস নাকি বাংলা সাহিত্যে বিষবৃক্ষের রোপণ করেছেন। তাঁর মন্তব্য:

> শ্মশানে মড়া পুড়িয়ে পুড়িয়ে চণ্ডালের যে অবস্থা ইলিয়াসেরও তাই। সবকটি চশমা খুলে বসে আছেন। অথচ আমাদের সাহিত্যে চশমার তো অন্ত নেই। ছেঁদো আবেগের চশমা, ধর্মের, সম্প্রদায়ের রঙিন চশমা, কতো আছে। ইলিয়াসের খোলা চোখের দৃষ্টি সমকালের মূলটুকু দেখে নেয়, তাঁর দাঁত নখ সবই বাজপাখির মতো তড়িঘড়ি ও সোজাসুজি, আর ঠিক সেইটুকুই তিনি লিখতে বসে যান। এইজন্যেই তাঁর লেখায় হাবাগঙ্গারামদের প্রেম নেই। দাম্পত্য, প্রেম, প্রীতি, পিতৃভক্তি, বাৎসল্য ইত্যাদির উপর তিনি যেন বাজ ফেলেছেন।[৩]

অবশ্য বহু বছর পরে সেই বিষবৃক্ষের 'মহীরুহ হয়ে ওঠার কাহিনী' এবং অমৃত ফলনের সুসংবাদও জানিয়েছেন তিনিই– 'আমি বলেছি ইলিয়াস সমস্ত প্রচলিত মূল্যবোধের উপর বজ্রাঘাত করেছেন, আমি এখন বলি মূত্রত্যাগ করেছেন।'[৫]

আধুনিক পুঁজিবাদের সফল প্রক্রিয়া হিসেবে মানুষ ক্রমাগত শেকড়বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। Alienation বা বিচ্ছিন্নতাবাদ গোপন ক্যান্সারের মতই মানুষের অস্তিত্বের কোষ বিনষ্ট করে প্রতিনিয়ত অনিশ্চয়তার পথে ঠেলছে। 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী এবং প্রত্যেক আধুনিক মানুষই এক একটি দ্বীপদৃশ্য'– এই সত্যের আরো জ্যান্ত প্রমাণ মিলে যখন আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশ আর্তচিৎকার করে ওঠেন- 'ছিঁড়ে গেছি-ফেঁড়ে গেছি-পৃথিবীর পথে পথে হেঁটে হেঁটে'। সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর অন্তর্বুনন ম্যাজিকবেগে পাল্টে যাচ্ছে। মানুষ যেন নিজেই নিজেকে আর চিনছে না, এবং নিজের গন্তব্যও যেন নিয়তই সরে সরে যাচ্ছে। 'বিচিত্র সব পরস্পরবিরোধী ও অসঙ্গতিপূর্ণ সব বিশ্বাস, ভক্তি, সংস্কার, মূল্যবোধ, উত্তেজনা, প্রেরণা ও সংকল্পে নিরাপদ সহ-অবস্থানে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি খুঁজে বের করা একশোটা শার্লক হোমসের সাধ্য নেই।'[১] ইলিয়াসের গল্পের বিচিত্র পরিসরে ব্যক্তির নৈঃসঙ্গচেতনা অত্যন্ত প্রকট। সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব যেমন প্রকট, মুক্তি অভীপ্সাও আরো প্রকট। শেকড়ছিন্ন মানুষের একাকিত্বের দুঃসহ যন্ত্রণার ছটফটানি ইলিয়াসের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সমাজ ও সময়ের বৃহত্তর ফ্রেমে বিন্যাস করেছেন ব্যক্তির স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, স্মৃতিময় অতীত ও নির্দয় বর্তমান, জীবনের ক্লেদ, রুগ্নতা, ব্যর্থতা ও সম্ভাবনার কথা।'[৪] নতুন অস্তিত্বের সংকটে পড়ে ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসার স্বরূপ-ই পাল্টে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের বাস্তবতায়। ব্যক্তি এখন আর আস্থা রাখতে পারে না তার প্রচলিত পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রিক কাঠামোয় এদিকে জাতিসংঘ করে সমষ্টির অজুহাতে ব্যক্তিকে করে ফেলা হয়েছে খেলার পুতুল। আর এসবেরই নাটেরগুরু বিজ্ঞানের কি রূপ সে তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হতে নিয়মিতই দেখে আসছি। মানুষের দেখভালের দায়িত্ব এখন বিজ্ঞানের। ফলে ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-বিশ্বাস সবই বিজ্ঞানাগারে কেমিক্যালে পরিণত হয়েছে। অসীম নৈঃসঙ্গবোধে আক্রান্ত মানুষের আর্তস্বরের শৈল্পিক বুনন ইলিয়াস প্রতিটি গল্প। আর যে কারণেই, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মনোরম জীবন নয়, মনোটোনাস তথা অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত মানুষেরাই ইলিয়াসের মনোজগতের অধিবাসী। 'মানসিকভাবে অসুস্থ এক যুবকের অকাল জীবনাবসানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পটিকে তিনি তাঁর প্রথম গ্রন্থের প্রথম গল্পের মর্যাদা দিয়েছেন। সর্বশেষ প্রকাশিত শেষগল্পেও রয়েছে একজন অসুস্থ মানুষ। পক্ষাঘাত কেড়ে নিয়েছে যার চলৎশক্তি।'[৭] তবে এই মনোবিকৃতি 'নেগেটিভ নয় বরং সমূহ সম্ভাবনার জন্ম দেয়। কখনো কখনো সুস্থভাবে যে প্রতিবাদ করা যায় না, মনোবিকৃতির ফলে প্রলাপের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করা সহজ হয়ে পড়ে।'[১১] এই ক্ষেত্রে কমলকুমার মজুমদারের সাথে অনেকে তুলনা করার চেষ্টা করলেও আমরা বলবো বরং মানিক বন্দ্যোপাধ্যয়ের সাথেই

ইলিয়াসের বেশি মিল খায়। কমলকুমার মজুমদারের মধ্যেও জীবনের অসুস্থ-বিকারগ্রস্ততার বর্ণাঢ্য চিত্রায়ণ পাই, তবে তা কোনমতেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায় না এবং প্রশান্তি বঞ্চিত হয় না। এদিক থেকে বলা যায়, মানিকচিন্তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ইলিয়াস। মধ্যবিত্তের ঘরের ছেলে মানিক কাপালিকের মতই নির্দয় হয়ে কলম চালিয়ে গেছেন মধ্যবিত্তের ভিতরের কৃত্রিমতা, অন্তঃসারশূন্যতা, ফাঁক-ফাঁকি, মিথ্যাচার, শঠতার স্বরূপ উন্মোচনে। মানিকের চিন্তার সাথে ইলিয়াসের পার্থক্যের জায়গাটিও চিহ্নিত করা যায় এইভাবে মানিক মধ্যবিত্তের প্রাঙ্গন ছাড়তে পারেন নি শেষ পর্যন্ত, ইলিয়াস একেবারে নেমে এসেছেন সেই জীবনে যেখানে 'মানুষ, মেয়েমানুষ, কুকুর, মেয়েকুকুরের অহিংস' অবস্থান।[৭] স্বপ্ন ও সুন্দরের পোষাক খুলে জীবনকে ন্যাংটো করে এমন জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন ইলিয়াস- যেখানে জীবন অসহ্য বৈরিতা ও নিষ্ঠুরতার শিকার। প্রেম-প্রণয়ের বালাই নেই এই জীবনে। ইলিয়াসের পৃথিবীটাই যেন নষ্ট হয়ে গেছে, উল্টোপথে তাঁর গন্তব্য। জীবনের ক্লেদ, বিষাদ, অন্ধকার দিকটা খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে মানিকের তুলনা আর দ্বিতীয়টি নেই বাংলা কথাসাহিত্যে। তবে, মানিক মানুষের ভেতরে অন্ধকার জগতের খানাতল্লাশি চালাতে গিয়ে নির্মোহ ও নির্বিকার থাকলেও 'নির্লীপ্ত কিংবা নিরপেক্ষ শিল্পী তিনি কখনোই ছিলেন না'[৭]। ইলিয়াস কিন্তু এই বাস্তবতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং নিজে অসম্ভব রকমের নির্মোহ ও নির্লিপ্ত অবস্থানে থেকেছেন। পচনরোগে আক্রান্ত সমাজের সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে সার্জারি ডাক্তারের মতই কেটেকুটে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেখিয়েছেন ভিতরের রোগ। 'বিচ্ছিন্নতাকে নিঃসঙ্গতার বেদনা বলে গৌরব দেওয়ার অসহ্য প্যানপ্যানানি প্রবণতা' ইলিয়াসের ধাতে নেই, বরং রূঢ় হলেও এটাই বাস্তব যে, 'অসুস্থ লোককে রোগী বলে ঠাহর করাই সমীচীন, তার রুগ্ন ও পাণ্ডুর গালে চুমু খাওয়ার মানে হয় না।'[৮] পচনধরা সমাজের পুরোটাই পাল্টে নতুন করে ব্যক্তির অনুকূল সুস্থ একটি সমাজ বিনির্মাণ ইলিয়াসের শিল্পচৈতন্যের প্রধান প্রয়াস। এইক্ষেত্রে, ভীষণ সাহসি ও বৈপ্লবিক শিল্পীপুরুষ ইলিয়াস বাস্তববাদী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও অতিক্রম করে গেছেন; 'এমন যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখার পাশে ইলিয়াসকে দাঁড় করালে ইলিয়াসকে মধ্যবিত্তের চোখ থেকে আরও অশালীন, অভদ্র, দাপুটে বলে মনে হয়। আরও ভীষণ কাপালিক।'[৮]

> বুর্জোয়া সমাজকাঠামোর সৃষ্টি ও বিকাশ পুঁজিবাদের সাহায্যে। পুঁজিবাদের মেরুদণ্ড তৈরি হয়েছে শ্রমিকদের কঠোর শ্রমে। শ্রমশোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত পরাঙ্মুখ পুঁজিবাদী সমাজে তাঁর অন্তর্নিহিত সংকটের ফলেই আজ মারাত্মক চিড় ধরেছে। দুটি মহাযুদ্ধে প্রবলভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত এই সমাজ আজ ড্রাগ সংস্কৃতি ও মরণব্যাধির প্রকোপে পতনের মুখে কম্পমান। এই সমাজ ব্যবস্থায় উদ্ভূত 'ব্যক্তি' একদিন সামন্তপ্রতিষ্ঠানকে অস্বীকার করে নিজের অনুভূতি ও বিবেচনাকে প্রতিষ্ঠিত করার আয়োজন করেছিল। বুর্জোয়া ব্যবস্থার পতনের লক্ষণগুলি আজ এই 'ব্যক্তি'র ক্ষয়ের মধ্যেই সবচেয়ে প্রকট। ক্রমে একা হতে হতে ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ব্যক্তি আজ পরিণত হয়েছে এক নিঃসঙ্গ প্রাণীতে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিকেন্দ্রিতায় নেমে আজ বাঁধা পড়েছে ব্যক্তিসর্বস্বতার দমবন্ধ কোটরে।[৭]

আধুনিক বিশ্বে পুঁজি এখন 'কৃষ্ণের মতই সর্বরূপ' দেখাচ্ছে-কি নগর কি গ্রাম সর্বত্রই। এরই মধ্যে বাংলার ঐতিহ্য ভেঙে গ্রাম কিন্তু উঠে পড়েছে আন্তর্জাতিক ট্রেনে। এখন গ্রামের উৎপাদিত পণ্যের বাজার বিশ্বব্যাপী। দেশের একটি উল্লেখযোগ্য শ্রমজীবী মানুষ বিদেশে গিয়ে নিজেদের ভাগ্য বদলে ফেলছে। ফলে নগদ অর্থের আমদানি গ্রামের জনজীবনকে যেমন আধুনিক ও শহরমুখী করেছে, বিপরীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিজীবী মানুষ ক্রমাগত দুর্বল হয়ে হয়ে সম্বলহারা হচ্ছে। ইলিয়াসের পূর্বে গ্রামের এই অন্তর্বাস্তবতাকে, যা স্বাধীনতা উত্তরকালের বাস্তবতা, সেই বাস্তবতাকে সার্বিকভাবে ধরতে পারেন নি কোন কথাশিল্পীই। বস্তুত স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর কালে পরিবর্তনের যে মাতাল হাওয়া বইছিল, তারই অন্ধস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেন নি বাংলা কথাশিল্পের এই চিন্তক।

অসীম বৈষম্যে ক্ষুব্ধ মানুষের ভিতরের ক্লেদ কত নিচুতে নামতে পারে আর জীবনের কাছে জীবন কি রকম ভয়ানক উপহাসে পরিণত হতে পারে তারই প্রমাণ 'উৎসব' গল্পটি। একই শহরে জীবনের কত বিচিত্ররূপ! একপিঠে কত তার সুখ, অপর পিঠে কত তার বঞ্চনা, এই বাস্তবতা ইলিয়াসের মত আঙুল দিয়ে আর কেউ দেখিয়ে দিয়েছে বলে মনে হয় না। ইলিয়াস শালীনতার কোন বালাই অবশিষ্ট রাখেন নি ভদ্র মানুষদের জন্য। ভদ্রপাড়ার আভিজাত্যের কৃত্রিম পোশাকের আড়ালের খবর তাঁর অজানা ছিল না। তাই ওদের পোশাক খুলে কুকুরের শরীরে পরিয়ে ছেড়েছেন। এক করে দিয়েছেন পুরনো ঢাকার মানুষ–কুকুর, অভিজাত ধানমণ্ডির মানুষ-কুকুর সমাজ। অভিজাত ধানমণ্ডির সভ্য মানুষদের বৌ–ভাতের উৎসব ও মধ্যরাতে কুকুরের রতি উৎসব– দুইটি উৎসবই এক ও অভিন্ন! এর চাইতে আদিমে সভ্যতার ইতিহাস নেমেছে কি না জানা নেই আমাদের। কি বলা যায় এই জীবনকে কিংবা কোন সংজ্ঞায় ফেলা যায়, কুকুরে-মানুষে মিলে মিশে সহবস্থানের বীভৎস এই জীবনকে? প্রাগৈতিহাসিক? ঠিক তাও না। ভিখুর মত শক্তি প্রয়োগে আনোয়ার আলি অক্ষম কিন্তু বাছা বাছা মেয়ে মানুষকে সেও ভিখুর মত গ্রাস করতে মরিয়া। আপাত, চোখের দেখা দেখেই ভিতরের ক্ষুধাটাকে সামলায়। তার অর্থ দাঁড়ায়- আনোয়ার আলির ভিতরে ভিখুর সত্তার পূর্ণরূপ থাকলেও বি.কম পাশ করাটাই তার বাধা। পুরান ঢাকার ঐতিহ্যের আড়ালের আদিম জীবন ও ধানমণ্ডির অভিজাত মানুষদের ইন্দ্রপুরীর খবর জানার পরে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো আনোয়ার আলির অভ্যস্থ জীবনবিন্যাসকে এলোমেলো করে তুললেও বিষাদময় করে তুলে নি। বন্ধুর বৌ-ভাতে আনোয়ার আলির স্বভাবজাত মন যে সামান্য বিচ্যুতি ঘটে, তার জন্য মধ্যরাতে আর একটি উৎসবের আয়োজন করতে হয় লেখককে- কুকুরের রতিউৎসব! 'একদিকে কাঞ্চন-বিত্তে উচ্ছ্বল ধানমণ্ডির অভিজাত জীবন, অন্যদিকে পুরোনো ঢাকার বস্তিসদৃশ নিম্নবিত্তের জীবন- এই বৈষম্যের মূলে রয়েছে ধনতান্ত্রিক সমাজের সীমাহীন শোষণ ও সম্পদ বণ্টনজনিত অসাম্য। গল্পের এই বিপ্রতীপ জীবনচিত্রের রূপায়ণে লেখক হিউমারিস্ট ও স্যাটায়ারিস্ট।'[১৬] নিচে দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক–

পুরান ঢাকার চেহারা:

> গলির নালায় হলদে রঙের ঘন জল ল্যাম্পোস্টের ফ্যাকাশে আলোতে ঘোলাটে চোখে নির্লিপ্ত তাকিয়ে থাকে। নালার তীরে মানুষ আর কুকুরের অপকর্ম কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমায়। আর, আর এই সব লোকজন! পাড়ার অধিবাসীরাও তার বিরক্তির একটি কারণ। নাইট শো ছবি ভাঙতে এখনো আধঘণ্টা, পাড়ার তরুণ সমাজ মেয়ে দেখবে বলে এখন থেকেই পায়তাঁরা কষে। গলির বাঁ দিকে বড়ো, রাস্তায় চলছে জুয়ার জমাট আড্ডা। আহমদিয়া হোটেল এ্যান্ড রেস্টুরেন্টে বিশ বছর আগেকার 'ছোড়ে বাবুল কা ঘর' বিরতিহীন বাজে। এখন রাত্রি সোয়া এগারোটা, আরো ঘণ্টা দুয়েক এই কর্কশ কোলাহলের কাল। (উৎসব/অন্য ঘরে অন্য স্বর)

ধানমণ্ডির চেহারা:

> ধানমণ্ডির রাস্তা সবই চওড়া, মসৃণ, নোতুন ও টাটকা। দুধেল আলোর নিচে গা এলিয়ে তারা আলো পোহায়; শুয়ে শুয়ে দ্যাখে, মাথার ওপর অনন্তকাল বিরাজ করছে রহস্যময় মহাশূন্য। দেশী-বিদেশী মেয়েমানুষভরা গাড়ি এককেটা রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে, উড়াল দিচ্ছে অন্য কোন ইন্দ্রপুরীর দিকে। সম্মানজনক দূরত্ব নিয়ে পকেটে-হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মণিমুক্তাখচিত বড়ো বড়ো প্রসাদ। বোঝা যায় ঐ সব নিষিদ্ধ গ্রহ নক্ষত্রে কোয়ার্টার ডজন হাফ ডজন রূপসী অন্য কোন ভাষায় বাক্যালাপ করে।
>
> (উৎসব/ অন্য ঘরে অন্য স্বর)

নগরের ভিতরের এই ব্যবধানের কারণ হয়ত ইলিয়াস বলেন নি কিংবা বলার দায়িত্বও ছিল না তাঁর। কিন্তু যাদের দায়িত্ব এই ব্যবধান ঘুচিয়ে সাম্যের ভিত্তিতে সম্পদের সুষম বণ্টনের, তাদের বিবেককে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়েছেন। পুরান ঢাকা থেকে ধানমণ্ডির ব্যবধান আর কতই হবে, এইটুকুর ভিতরে-ই জীবনের এতো ব্যবধান! ল্যাম্পপোস্টের ফ্যাকাশে আলোর

বিপরীতে দুধেল আলো, গলির নালা গিঞ্জির বিপরীতে চওড়া, প্রশস্ত, মসৃণ, টাটকা রাস্তা, মানুষ আর কুকুরের কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমানোর বিপরীতে সম্মানজনক দূরত্বের মণিমুক্তাখচিত বড়ো প্রসাদ, রাস্তায় জুয়ার আড্ডার বিপরীতে দেশি-বিদেশি দামি গাড়ি, তরুণের মেয়ে খোঁজার বিপরীতে ইন্দ্রপুরীর সংবাদ, বিশ বছরের পুরোনো হিন্দি গানের বিপরীতে রূপসির অন্য কোন বিষয়ের বাক্যালাপ, সর্বোপরি ভীষণ কোলাহলে যখন পুরান ঢাকার বাসিন্দাদের ঘুম নষ্ট, তখন এয়ারকন্ডিশনে ফুল স্পিডে ফ্যান চালিয়ে নরম গলায় চলে সোস্যালিজমের গল্প। ত্রিশ-চলিশের দশকের পরে বাম রাজনীতি পচন ধরে, এবং ইজমালি ব্যবহার হয় ব্যক্তি স্বার্থের হাতিয়ার হিসেবে। চড়া সাম্যবাদীর একটি লেবেল গায়ে সেঁটে বাম রাজনীতির চৌহদ্দিতে তারা আর থাকে না। ধানমণ্ডির এই অভিজাত জৌলুসি জীবনের বিপরীতে পুরান ঢাকার শালীনতা বিবর্জিত আদিম জীবনের পাশাপাশি বামরাজনীতির এই আদর্শহীনতাও ইলিয়াসের দারুণ কৌতুকের শিকার। ব্যবধান কি কেবল মানুষে মানুষে? ধানমণ্ডির কুকুরের লাইফস্টাইলেও আভিজাত্যের গৌরব। বিয়ে বাড়ির কুকুরের আভিজাত্যের বর্ণনা দিয়েছেন ইলিয়াস এইভাবে:

> বিয়ে বাড়িতেই দাঁড়িয়ে ছিল একজন। কি গম্ভীর তাঁর মুখ, কি তাঁর চেহারা! কি ডাঁটে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছিল মৃদু মৃদু। মনে হয় বাঙলা ফিল্মের জমিদার বাবু দোতলার ব্যালকনিতে ডেক চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে সূর্যাস্ত উপভোগ করছে। এইসব কুকুর দেখলেও মনের মধ্যে ভক্তিভাব জেগে ওঠে। (উৎসব/অন্য ঘরে অন্য স্বর)

পুরান ঢাকার কুকুরের লাইফস্টাইল:

> আর দ্যাখো, পাড়ার কুত্তার বাচ্চাদের একবার দ্যাখো! সব শালা নেড়ি, গায়ে লোম নেই এক ফোঁটা, শরীর ভরা ঘা নিয়ে কেবল কুঁই কুঁই গোঙায়। একেকটা আবার কোনো কোনো ছোটলোকের বাচ্চার মতো যা তা খেয়ে ধ্যাবড়া মোটা হয়েছে, তাকিয়ে থাকে ভাবলেশহীন চোখে, ল্যাম্পোস্ট পেলেই ছিরছির পেচ্ছাব করে।
>
> (উৎসব/ অন্য ঘরে অন্য স্বর)

এমন নিষ্ঠুরভাবে শিল্পীর দায়িত্ব পালনের দৃষ্টান্ত ইলিয়াসের আগে বাংলা সাহিত্যে কেউ করেছে কিনা জানা নেই। মানিকের কথা প্রসঙ্গত বললেও এমন করে সভ্যতার পোষাক খোলে নেবার নিষ্ঠুর কর্মটিতে মানিকের চাইতে আরো বেশি নৃশংস ভূমিকায় ইলিয়াস। তার অর্থ হল, সমাজের কোন বিশেষ অংশ নয়, পুরোটাই পরিবর্তন চান ইলিয়াস। কুকুরের সর্বনাম 'তাঁর' এর উপর সম্মানসূচক চন্দ্রবিন্দু ব্যবহারে স্পষ্টত বলা যায় ইলিয়াস সম্পূর্ণ সচেতন ও সজাগ থেকে বদলের জন্য মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন এই বীভৎস লাইফ স্টাইল। প্রথমে প্রবল ধাক্কা খেয়ে আঁতকে উঠলেও জীবনের এই নিষ্ঠুর সত্যটিকে অস্বীকার করা যায় না! ইলিয়াসের চাঁছাছোলা বক্তব্য ও শালীনতা বিবর্জিত চিন্তাচেতনা আপাত বিচারে অগ্রহণীয়ও হতে পারে। কিন্তু সমাজটাকে বদলাতে হলে তাই করতে হবে। অভিজাত জীবনের চাকচিক্য আর জৌলুসের সাথে পরিচয়ের পরেই আনোয়ার আলির ভিতরের নতুন করে জীবনের অর্থ খোঁজার প্রবণতা এবং অভ্যস্ত জীবনের প্রতি তীব্র অনীহা জন্মে। নিজের স্ত্রীর সৌন্দর্যও উবে যায় এক রাতের বিছানায়। বন্ধুর বৌ-ভাতে অভিজাত-ঝলকানো রূপসিদের বাহারি পোশাক আর যৌনউদ্দীপক চাল-চলন-অঙ্গসঞ্চালনের বিপরীতে নিজের স্ত্রী নিতান্তই আটপৌরে, সময় নষ্টকারী, বিরক্তির উদ্রেককারী এবং 'উপলক্ষ মাত্র' হয়ে যায়। স্ত্রীর 'দুটো ফাঁপা বেগুনের মত স্তনজোড়া' কিছুতেই তার হাতে লাগে না-বরং চোখে ফুটছে বন্ধুর স্ত্রীর টগবগে স্তনজোড়া। 'গল্পটিতে আনোয়ার আলির class consciousness- এর সঙ্গে সেক্সকে যুক্ত করানো হয়েছে। অত্যন্ত দক্ষতায় তিনি দেখিয়েছেন আনোয়ার আলির প্রবৃত্তির রেঞ্জ-এর সীমাবদ্ধতা।"[৭] বাস্তবে, সেক্সও শ্রেণি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[৮] অভিজাত বন্ধুর পত্নী সম্পর্কে আনোয়ার আলির মন্তব্য:

> অথচ পারভেজের বৌটাকে দ্যাখো। পারভেজের বৌও তো বড়োজোর আই এ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। বিয়ের সময় কলেজে কেবল ভর্তি হয়েছিল, পরে আই এ কি পাস করেছে? অথচ দ্যাখো তার কথা বলবার ঢং কি, কি তার তাকাবার কায়দা!
>
> (উৎসব/ অন্য ঘরে অন্য স্বর)

নিজের স্ত্রী সম্পর্কে:

> তার ক্ষোভ হয়, এই মেয়েটা বছর খানেক হলেও তো কলেজে পড়েছে, বিয়ের আগে এমনকি একটু প্রেম মতোনও করলো। অথচ এমন জবুথবু হয়ে থাকে কেন? শাড়ির ভেতর বুক নেই, পাছা নেই, দিনরাত হেঁটে বেড়াচ্ছে একটা বেঢপ কোলবালিশ।
>
> (উৎসব/ অন্য ঘরে অন্য স্বর)

আনোয়ার আলির ভিতরে জেগে ওঠা শ্বাপদ চিন্তা সামান্যও শালীন করে ইলিয়াস কলমে তুলেন নি। বরং যেভাবে বলেছেন তাতেই বিশ্বাস করতে যেন কেমন ঠেকে! জীবনের রূপ সত্যিই কি এমন হয়! পরনারীর প্রতি আনোয়ার আলির এই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণকে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব দ্বারা ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। 'ষাটের দশকের পূর্ব পাকিস্তানের আর্থসামাজিক বিষম শ্রেণিবিন্যাসের বাস্তবতায় আনোয়ার আলির অবস্থান মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান অনেকটাই পিছনের সারিতে। জীবন-জীবিকার, শিক্ষা-সংস্কৃতির নিরিখে সে তার সহপাঠীদের থেকে অনেক পিছিয়ে, আবার প্রতিবেশী নিম্নবিত্ত মানুষদের থেকে কিঞ্চিৎ এগিয়েও; এবং তার রুচি-সংস্কৃতির কোন পরিমার্জনও নেই।'[৭] তাই, কুকুরের অনিরাপদ যৌনসঙ্গমও তার কাছে সুখকর একটি উপভোগ্য দৃশ্য। নিস্তেজ অনুভূতি যখন কিছুতেই উত্তেজিত হচ্ছে না তখন দুটি কুকুরের মৈথুন দৃশ্য তাঁর ভিতরের স্বভাবগত অনুভূতি জাগিয়ে তুলে। ফলে ঘরে ফিরে স্ত্রীর সাথে রমণে লিপ্ত হয়। উৎসবের সুখস্মৃতি বিলীন হয়। এর চাইতে আর বেশিটুকু করা ছিল কি ইলিয়াসের? ক্রোধে, ক্ষোভে, হিংসায়, ক্ষুব্ধ-সংক্ষুব্ধ ইলিয়াস এভাবে কুকুরের মৈথুন আর মানুষের মৈথুনকে এক করে মানুষের সভ্যতাকে এমন এক নতুন মেরুতে ফেলেছেন যে, খুব সহজেই প্রশ্ন ওঠে– মানুষ কি তবে কিছুই অর্জন করতে পারে নি? অধিকন্তু ক্রোধ কতটা ভয়ানক হতে পারে তারই দৃষ্টান্ত মিলে রুটির দোকানি তোতামিয়া ও তার বালক কর্মচারি জুম্মন আলিকে নিয়ে এক জুয়ারির টিপ্পনীতে, 'জুম্মন আলি তো কুত্তার বায়োস্কোপ দেইখা গেলো, এখন তুমি হালায় বায়োস্কোপ মারো জুম্মনরে লইয়া, হেইডা দ্যাখবো ক্যাঠায়।' (উৎসব/ অন্য ঘরে অন্য স্বর)

> একি ভয়ানক প্রতিশোধ, কি শোচনীয় আত্মহনন, কি প্রচণ্ড ঠাঠা উচ্চ হাসি– চোখে জল এসে যায়। এতো শুধু নারীদের ছিন্নভিন্ন করা নয়, আমাদের সমাজকে, দাম্পত্য বন্ধনকে, পারিবারিক পবিত্রতাকে সঙ্গে সঙ্গে বাৎসল্য, স্নেহ–এক কথায় তেল গড়িয়ে পড়া মানিবকতার ধারণাকে মুগুড় দিয়ে চূর্ণ করেছেন ইলিয়াস। মানুষ আর কৃমিকীটের অস্তিত্বের মধ্যে কোন তফাৎ করতে চান নি। মধ্যবিত্ত সংকীর্ণ জীবনটাকে তিনি জুতোপেটা করেছেন। মনে হয় এই অমানবিকতা অনড় ও অপ্রতিকার্য। কি জানি, হয়তো এই অমানবিকতা সম্পূর্ণভাবে মানবিক। অথবা এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে সমাজ।[৭]

রাজধানীর অভিজাত জীবনের বিপরীতে পুরান ঢাকার টানাছেঁড়ার জীবনে ব্যক্তির বিকাশ ঘটে বিকৃতপথে। 'ফেরারী' গল্পের দুর্বল, ভীতু, পলায়নপর হানিফ ও পেশাদার ছিনতাইকারী ডামলালুর বিকৃত বিকাশই প্রকৃত বাস্তবতা কতটা ভয়াবহ তা প্রমাণ করে। ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে এক 'ভূতজ্যোৎস্নায়' সুন্দরী যুবতীর মায়াবিষ্ট পিতা ইব্রাহিম ওস্তাগর উদ্বায়ু রোগে আক্রান্ত হয়ে হ্যালুসিনেশনে সংক্রামিত হলে তা হানিফের মধ্যেও সংক্রেমিত হয়। ঐতিহ্যবাহী ভিক্টোরিয়া পার্ককে ঘিরে প্রাচীন লোকসংস্কার ইলিয়াসের এই গল্পের পটভূমি। 'অলীক দর্শন মায়াবিষ্ট ইব্রাহিম ওস্তাগরের অভিজ্ঞতার সূত্রে সিপাহী বিদ্রোহের শহীদদের ফাঁসির ঘটনা এবং ভিক্টোরীয় পার্কের ঘণ্টাঘরের অনুসর্গে দেশ ও কালের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়! আর বাপদাদার আমল থেকে–অতীত থেকে বর্তমানে ইব্রাহিম ওস্তাগর (এবং অংশত হানিফ) পর্যন্ত তা পরিবাহিত।'[৭] কিন্তু, বর্তমান বাস্তবতায়,

পুরান ঢাকার জীবন প্রণালি কি ভয়ানক অধঃগতিতে নেমেছে তারই দৃষ্টান্ত মেলে ডাক্তার সম্পর্কে যুবক সালাউদ্দিনের মন্তব্যে, 'বড়ো রাস্তাটা পার হলেই তোমার মাগীপট্টি, মতিন হালদার দাওয়াই দিতো খানকি মাগীগো আর খানকিগো ভাউরা থাকে না?–হেইগুলিরে। মাগীপট্টির কেউগার ব্যারাম হইছে তো ডাকো হালায় লম্বুরে। জিন্দাবাহারের মইদ্যে হ্যার নামই অছিলো খানকির ডাক্তার।' যুবক ডামলালু তো পুরোমাত্রায় পামর, কথা-বার্তায়-আচরণ ইতর প্রাণিকেও হার মানায়। হানিফকে সঙ্গে নিয়ে রিক্সা হাইজ্যাক করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফোঁসে ওঠে। হানিফ ভাবে পুলিশের ভয়ে ফিরে এসেছে। বাস্তবে, ছাত্র মাস্তানদের ভয়ে ডামলালু পিছনে হটে।

> 'পুলিসের বাপে আছিলো বে তোতলাচোদা! দেখলি না লম্বা চুল, জুলফিআলা মাস্তানগুলি হালায় ফাইব ফিফটি ফাইব মারতাছে।! ঐগুলি পুলিসের বাপ লাগে, বুঝলি? হালারা ইসটুডেন!'
>
> 'ইসটুডেন? ইসটুডেন কি করবো?'
>
> 'তরে না একখানা চটকানা দিয়া কলতাবাজার পাঠাইয়া দেই তো আরাম পাই বুঝলি? ডামলালু খুব বিরক্ত হয়েছে, 'ইসটুডেন হালারা কি করবো তুমি জানো না, না? কেলাব থাইকা, হোটেল থাইকা সায়েবরা বারাইবো মাল টাইনা, অরা হেই গাড়িগুলি ধইরা মালপানি কামায়, মাগীউগি পছন্দ হইলে ময়দানের মইদ্যে লইয়া হেইগুলিরে লাগায়। অহন বুঝলি হালার বাঙ্গুচোদা, বুঝলি? দিন তো অহন হালায় ইসটুডেন গো, হালায় ইসটুডেনের মারে বাপ!' (ফেরারী/ অন্য ঘরে অন্য স্বর)

এই হচ্ছে, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের ঘটমান রাজনীতি ও সামাজিক বাস্তবতা। নৈতিক অবক্ষয়, লোভ-লুটপাটে স্বাধীনতা উত্তর ছাত্ররাজনীতির ইতিহাস খুব বেশি একটা সুখের ছিল না, যার বর্তমান বাস্তবতা আরো বীভৎস। ক্লাস-বই-কলম ফেলে ছাত্রনেতারা হাতে নিয়েছে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা। টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, লুটপাট, ছিনতাই, ধর্ষণ, খুন ইত্যাদি বীভৎস নারকীয় কাজে নিজেদের জড়িয়ে ছাত্ররাজনীতির ইতিহাসকে কলুষিত করে আসছে একশ্রেণির মেধাহীন লোভী বিপথগামি ছাত্র। আর তাদের দৌরাত্ম্য ও শক্তিমত্তা কি ভয়ানক মাত্রায়– পেশাদার ছিনতাইকারী ডামলালুর পিছনে ফিরবার দৃশ্যই বলে দেয়।

গল্পে হানিফের মনোবিকারের স্বরূপ বেশ জটিল। দুর্বল, ভীতু আপন অস্তিত্বের উপর আস্থাহারা এই যুবকের পলায়নপর মনোবৃত্তির জন্যই মৃত্যুপথযাত্রী পিতার হ্যালুসিনেশন বা অতীন্দ্রিয় দর্শন তার মধ্যেও পরিবাহিত হয়। বাবার মত নিজেও দেখে শাহজাদীকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে কবন্ধ। সেও বাবার বিভ্রমে আক্রান্ত হয়। সেখানে হানিফের সমবয়স্ক ইব্রাহিম দিনমান শুধু সাঁতার কাঁটে। পিতা ইব্রাহিম ওস্তাগরের মৃত্যুতে স্বপ্নচারী যুবক ঘটমান বাস্তবতা থেকে পালিয়ে হন্যে খোঁজেছে নতুন ঠিকানা। পুরান ঢাকার পরিচিত সব রাস্তা-অলিগলি, মহলার পথ ধরে দৌড়াতে থাকে ফেরারি হানিফ। মৃত ইব্রাহিম ওস্তাগর হানিফকে তাড়িয়ে বেড়ায়। সিপাহী বিদ্রোহের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের নীরব সাক্ষী ঐতিহাসিক ভিক্টোরিয়া পার্ক, নবদ্বীপ বসাক লেনের মিষ্টির দোকান-লন্ড্রি, সুভাষ বোস অ্যাভেন্যু পেরিয়ে শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী লেন, রূপচাঁদ লেনের সরু চাপা গলি এবং শুকলালদাস লেন অতিক্রম করতে করতে সিনেমার সেলুললেড ফিতায় বন্দি ছবির মত হানিফের চোখে একের পর এক পর্দা উঠতে থাকে পুরান ঢাকার রাস্তার ধারে গলাগলি করে দাঁড়িয়ে থাকা প্রবীণ বাড়িগুলো, বাড়ির দেয়ালে স্যাঁতসেঁতে কাশ-থুথু ছিটানো পুরু শেওলা-ধরা নোনা, সেই সব বাড়ি থেকে বাতাস ভেসে আসছে কান্না আর বিলাপের করুণ সুর। নিজের চেনা চৌহদ্দির মধ্যে অনির্দেশ্য পথে ছুটতে ছুটতে মধ্যরাতে এক সময় সূত্রাপুর থানার সামনে এসে দাঁড়ায় হানিফ। এবং ভাবে, 'আমি যুদি অহন থানার মদ্যে গিয়া দারোগারে ডাইকা কই 'স্যার, আমার নাম আবদুল হানিফ, আমার বাপের নাম ইব্রাহিম, মরহুম মোহাম্মদ ইব্রাহিম ওস্তাগর, কলতাবাজারের ডামলালু আমার ওস্তাদ লাগে, আমি,

ডামলালুর পার্টির মানুষ,' তো হালার খানকির পোলায় আমারে ধইরা রাইখা দিবো না? রাখবো তো?' বস্তুত পিতার মৃত্যুতে চরম নিরাপত্তাহীনতার বলয়ে পতিত স্বপ্নচারী যুবক দিকবিদিক হয়ে ছুটে শেষে থানাকেই নিরাপদ মনে করেছে এবং পূর্বকৃত অপরাধের সত্যতা স্বীকার করে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। বাস্তবে, যে নিরাপত্তা ও আশ্রয় হানিফ চাইছে, তা কি থানা তাকে দিবে অর্থাৎ রাষ্ট্র তাকে দিবে? পিতার সাথে হানিফের একটি মনোজাগতিক ঐক্য ছিল এবং পিতার মৃত্যুর সাথে সেই ঐক্যের বন্ধন ছিঁড়ে যাওয়া সে অসীম একাকিত্ব যন্ত্রণায় নিপতিত। ইলিয়াস বলতে চাইছেন যে, আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের সূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে ডামলালু ও ছাত্রনেতাদের মত বিবেকমৃত যুবকেরা সদর্পে সমাজে টিকে থাকলেও হানিফের মত অনুভূতি প্রবণ ঐতিহ্যলালিত যুবকের জন্য এই অবস্থা সত্যিই পীড়াদায়ক। তাই বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হানিফের মানবিক মূল্যবোধই ফেরারি সত্তার অন্তর্বাস্তবতা।

জীবনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন বাঁকে বাঁকে তৈরি হয় সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী কিছু বিষয়; তখন খুব কাছের মানুষটিও সব কষ্ট আর ধরে উঠতে পারে না বা বুঝাতে পারে না। সন্তান বড় হয়ে উঠলে মায়ের সাথে অনুভূতির দিক থেকে শেয়ার করার সুযোগ থাকে না। মা পারে না নিজের সন্তানের সব অনুভূতির শেয়ার নিতে বা দিতে। ইলিয়াসের 'যোগাযোগ' গল্পটি এমনি একটি আইডিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। গল্পটি ইলিয়াসের মৌল প্রবণতার কিছুটা বাইরে থেকে, সচরাচর মানবিক দিক থেকেই বিচার্য। আর তাই এই গল্পটিকে হাসান আজিজুল হক কোন প্রকার অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করান নি এবং বাড়তি প্রশংসা পেয়েছে[৯]। মা রোকেয়া যখন তাঁর সন্তানের সামনে দাঁড়ায় এবং ক্রমাগত মায়ের গৌরব দিয়ে খোকনের কষ্টকে বুঝতে চেষ্টা করে তখনই জীবনের একটি নতুন সমীকরণ জেনে যায়। সন্তানের এই কষ্ট শেয়ার নিতে সে অক্ষম। বরং সে যখন বলে, 'খোকন, সোনা, এই যে আমি আইছি, দ্যাখছো, আমি আইয়া পড়ছি তো!' খোকনের তখন মায়ের দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, যন্ত্রণার টানা কাতরানি আরো বেড়ে যায়। 'খোকন দেওয়াল দ্যাখে, স্যালাইন ওয়াটারের ব্যাগ দ্যাখে, অক্সিজেন দেওয়া মেয়েটাকে, দুটো বিছানার পর একটা খাটে শান্ত হয়ে ঘুমায় একটি শিশু তাকেও দ্যাখে, আর এর সঙ্গে চলে ক্রমাগত গোঙানির আওয়াজ।' খোকনের চোখ মূলত; সেই সব জিনিসের প্রতি, যা তার কষ্টের ভাষা বুঝে। মায়ের কোমল পরশ ভিতরের কষ্টকে ছুঁতে পারে না, খোকনও মাকে তাঁর কষ্টের অনুভূতির সাথে শেয়ার করতে পারে না, যতটা না পারে অক্সিজেন দেওয়া মেয়েটাকে দেখে, দুটো বেডের ফাঁকের ঘুমন্ত শিশুটিকে দেখে। গল্পটির মূলবক্তব্যও এই একটিই– পরস্পরের কষ্টের যোগাযোগের তার ছিঁড়ে দিয়েছে সময়।

বিরাট বিশ্বে মানুষ দারুণ একা! সেই সাথে আছে রোগ-শোক-জ্বরা-জীর্ণতা ও মৃত্যু। জীবনপ্রকৃতিই এমন যে, শিশুকে কিশোর, কিশোরকে যুবক, যুবককে প্রৌঢ়ত্বের স্বাদ গ্রহণ করতে হয়, অতঃপর এক সময় মৃত্যুর কাছে নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হয়। কী রক্তের বন্ধন কী সামাজিক বন্ধন, কোন বন্ধনই স্বার্থ বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক নয়– এমনটাই ইলিয়াসের জীবনমূল্যায়ন। শারিরীক ও আর্থিক সক্ষমতা হারিয়ে গেলে একজন মানুষকে যে কোন ইতর প্রাণির চাইতেও করুণ জীবন বরণ করে নিতে হয়। বিশেষ করে, মানুষের জীবনের শেষ প্রহরগুলো কাটে ভয়ানক আর্ত-হাহাকার দিয়ে– যেখানে নিজেরে সম্প্রসারিত রক্ত পর্যন্ত প্রস্থান তথা মৃত্যু কামনা করে। একজন মানুষের বেঁচে থাকার সব আয়োজন যখন ফুরিয়ে আসে– স্বজনবিচ্ছিন্ন অথর্ব হয়ে বিছানায় কাতরায়, মৃত্যু যখন আগল নাড়ে, তখন তার যে মানবিক সহানভূতি প্রত্যাশা থাকে তা আমাদের স্বার্থ নিমগ্ন সমাজে কতটুকু আর পায়! বিবর্ধমান সমাজের মানুষগুলো নিয়মিতই চাহিদা ও চিন্তা পাল্টায়, সেখানে উপযোগিতার মানদণ্ডে আধা-পঙ্গু পক্ষাঘাতগ্রস্ত কামালউদ্দিনের কি এমন মূল্য আছে যে, তার বেঁচে থাকার খুব বিশেষ প্রয়োজন। বরং তার মৃত্যুই ঈপ্সিত। বিশেষত, নিজের স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে যেখানে প্রস্থান করেছে সেখানে যমের সাথে আঁতাত করে দরকারের বেশি বেঁচে আছে এবং কাঙ্ক্ষিত মৃত্যুদূত কিছুতেই তার কাছে আসছে না। মৃত্যুস্বাদ লাভের জন্য মানুষকে লড়াই করতে হয়–

ইলিয়াসের এই বক্তব্যটিই 'দোজখের ওম' গল্পের বিরাট প্রচ্ছদে। কামালউদ্দিনের ভয়ানক প্রার্থনা আমাদের অস্তিত্বের নাড়ি-নক্ষত্রকে একটানে ছিঁড়ে ফেলে:

> ঘন নিশ্বাসে কামালউদ্দিন নিঃশব্দে মোনাজাত করে,' আল্লা, তুমি তোমার বান্দার দিলের খবর রাখো। এই রাইত যানি আমার শেষ রাইত হয়। আমারে এই দোজখ থাইকা উঠাইয়া তুমি যা খুশি করো। কেয়ামত তক আমারে গোর আজাব দাও, মুনকির নকুর আইয়া কেয়ামত তক আমারে আগুনের দোররা মারুক, তাও ভি ভালা, মগর এই হাবিয়া থাইকা আমারে উঠাইয়া লও। এই দোজখের ফজর যানি আমারে চক্ষে দেখতে না হয়।' (দোজখের ওম/ দোজখের ওম)

জীবনের যতো সৎ কাজ সে করেছে সব সোওয়াব সে প্রত্যাহার করে নিতে প্রস্তুত, বিনিময়ে তার কাম্য কেবল মৃত্যু। মানুষের জীবন এমন হয় নাকি? এই প্রশ্নের উত্তর ইলিয়াস কী দিতেন জানি না, আমাদের তো আর দাঁড়াবার জায়গা থাকল না। মানুষের অস্তিত্বের শেকড় সমূলে উৎপাটন করার ইলিয়াসের এই কাপালিক প্রবণতা, আমাদের অনুমোদন পাক না আর পাক, জীবনের বিচিত্র সমীকরণের এই এক সমীকরণ। কামালউদ্দিন এক মানুষ বটে, কিন্তু সে সকল মানুষেরই যুগান্তরের ইতিহাস। গিরগিটির মত বহুরূপে জীবন এসে ধরা দিয়েছে তার কাছে। বাস্তবে, কামালউদ্দিন এক প্রকার মৃত– তার পরিবার জীবিতের খাতা থেকে তার নাম কেটে দিয়েছে। জীবন-সংসারের এই উলঙ্গ বাস্তবতায় কামালউদ্দিনও আকস্মিক জীবনদরদি হয়ে ওঠে। সে মরে নি এবং এখনও বেঁচে আছে– এই জ্যান্ত সত্যকে নতুন করে প্রমাণ করতে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, এবং হুংকার ছাড়ে, 'তর চাচারে কইস, দাদায় অহন তরি বাঁইচা আছে।' 'মৃত্যুপথযাত্রী কামালউদ্দিন সেজন্যে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে সবার ধারণাকে ধুলিসাৎ করে 'কেন বাঁচবে না'র এ প্রশ্ন তোলে। 'দোজখের ওম' গল্পের প্রথম দিকের কামালউদ্দিন শেষপর্বে সদর্থক পরিবর্তিত হয়ে বাঁচার জন্য জীবনশক্তি ফিরে পায়। গল্পে ইলিয়াস এভাবেই চরিত্রকে স্বাধীনভাবে সমস্যা সমাধানে পৌঁছান।'[৮] নিঃসঙ্গতা ও অবাঞ্চিত হওয়ার চাইতে মানুষের জীবনে আর বড়ো দারিদ্র্য নেই। ইলিয়াসের 'অসুখ-বিসুখ' গল্পে ঔষধ বিলাসি বৃদ্ধা আতমন্নেসার অবাঞ্চিত ও নিঃসঙ্গ জীবনই মানসিক বিকৃতির কারণ। একটি পরিবারের ভিত্তি গড়ে দিয়ে জীবনধর্মের নিয়মে নিমজ্জমান আতমন্নেসা এখন চলনশক্তিরহিত এবং অতীতচারী। নিজের আত্মজার অকল্যাণ কামনা, পুত্রবধূকে শিক্ষা দেবার জন্যে পুত্রের মৃত্যু কামনা, মেয়ের ঔষধ চুরি করে খেয়ে অচেতন হওয়া- এইসব মানসিক বিকৃতিজনিত কাণ্ডকীর্তি হাসির খোরাক জোগালেও শেষ পরিণতিতে বিষাদবহ। ক্যান্সার ধরা পড়লে আতমন্নেসার আজন্ম সাধ পূরণের সুযোগ অবারিত হয়। এখন তার ছেলেরা পয়সা পানির মত খরচ করছে। মায়ের নাগালে থরে থরে সাজিয়ে রেখেছে বিচিত্র সাইজ ও রঙের ওষুধ।

> জড়ানো চোখ মেলে ডানদিকে তাকায়, ডানদিকে একটা টুল। টুলের ওপর ওষুধপত্রের লম্বা রোগা মোটা ও বেঁটে শিশি বোতল, ট্যাবলেটের পাতা, টয় গ্লাস, থার্মোমিটার, হটওয়াটার ব্যাগ, আইস ব্যাগ। আতমন্নেসা নিজের অবাধ্য চোখজোড়া প্রায় ধাক্কা দিয়ে সম্পূর্ণ খুলে দ্যাখে, না সব ঠিক আছে। ঐ এক পাশের শিশিটা কি সুন্দর! ওটা একেবারে ধারে রেখে দিলো কে? কার হাত লেগে পড়ে যাবে, দ্যাখো তো! তবু সারি সারি ওষুধ কি সুন্দর দ্যাখ্যায়! না, সব ঠিক আছে! কিন্তু পোড়ার চোখ কি বশে থাকে! কিছুতেই খোলা রাখা যায় না। ওষুধের দিকে দেখতে দেখতে তার চোখ বুঁজে আসে, অন্ধকার জগৎ ফের দুলতে শুরু করে। নিজেই দোলনায় দুলতে দুলতে জড়ানো গলায় আতমন্নেসা জামাইয়ের প্রতি সাদর নিমন্ত্রণ পাঠায়, 'অ নূরু! দামানরে আইতে কইস! কইস আমার বহুত কঠিন বিমার হইছে, একদিন আইয়া দেইখা যাইবো। বহুত কঠিন বিমার! (অসুখ-বিসুখ/ খোঁয়ারি)

মানুষের জীবনের এই এক করুণ ট্রাজেডি, কাঙ্ক্ষিত সুখ তখনই এসে ধরা দেয় যখন জীবননৌকা ভাটির দিকে টান ধরে। আড়ালে আতমন্নেসার শরীরে ঘাতক ব্যাধি বাসা করে নিয়েছে। অস্তপারের সূর্যের দিকে মুখ করে এখন সে পরপারের যাত্রী, অথচ তার সিঁথানে বাহারি ওষুধের সমাহার! চোখ মেলে তাকাবার শক্তিটাও ক্রমেই হরণ করে নিচ্ছে মৃত্যুদূত। কাদম্বরীর মত আতমন্নেসাকে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে প্রমাণ করতে হলো–সতিই সে অসুস্থ ছিল। 'জীবনের নূন্যতম মনোযোগ, ন্যায্য অধিকার থেকে, স্নেহ-মমতা-শুশ্রূষা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় যে চাপা অসন্তোষ ও ক্ষোভ জীবনকে দুর্বিষহ করে– মানবিক বোধকে করে ফেলে বিকৃত সেই ভাবসত্যই সুষম স্থাপত্য আখ্যানিক রূপ পেয়েছে 'অসুখ-বিসুখ' গল্পটিতে।'[৮]

মানুষের জীবন বিচিত্র-দুর্জ্ঞেয় রহস্যের আঁধার। পরস্পর বিরোধী একাধিক সত্তা যুগপৎ-ভাবে থাকে এক জীবনেই। 'পিতৃবিয়োগ' গল্পের পোস্টমাস্টার আশরাফ আলির দ্বৈতসত্তা আমাদের পরিচিত নিয়মতান্ত্রিক চিন্তাকে ভাবিয়ে তুলে! যে মানুষটি পারিবারিক জীবনে কঠোর, কঠিন ও প্রবল দায়িত্ব সচেতনতার মুখোশ পরে মোটের উপরে নিজের সন্তানকে পর্যন্ত বাড়তি প্রশ্রয় দেয় নি কিংবা প্রগাঢ় পিতৃস্নেহের বন্ধন যাতে না গড়ে ওঠে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা যার, সেই মানুষটি বন্ধু ও প্রতিবেশির কাছে খুব হাস্যরসিক, আড্ডাবাজ, শেয়ারিং মাইন্ডেটে। উত্তরমেরু-দক্ষিণমেরুর মত দূরত্বে আশরাফ আলির দুইসত্তা। বস্তুত, সে নিজে থেকে তৈরি করে রেখেছে এই বিভেদ। আর এই বিভেদের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয় তার মৃত্যুর পর মুহূর্তেই। জীবিত আশরাফ আলির নিষ্ঠুর মূর্তি এতটাই ভয়ানক ভীতির ছিল, মৃত নিথর লাশও যেন সেই রূপ নিয়েই আছে, 'আশরাফ আলির কাফনে– মোড়া লাশ লোবান ধূপের গন্ধের তর্জনী তুলে আদিখ্যেতা করতে বারণ করে।' ফলে বাবার জন্য দরদ প্রকাশের কিংবা শোক প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয় ইয়াকুব। 'চোখ দিয়ে অঝোরে পানি ঝরতে শুরু করলে ইচ্ছা হয় 'আব্বা' বলে খুব জোরে একবার হামলে উঠি। কিন্তু জীবিত আশরাফ আলির গম্ভীর ও শীতল মুখের কথা ভেবে, তার আকাঙ্ক্ষিত পিতৃ-সম্বোধন দাঁত ও নোনাজিভের চাপে বেরিয়ে আসে ফোঁপানির মধ্যে। সামনে সব ঝাপসা।' এই সময়েই ইয়াকুব বাবার বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারে, আশরাফ আলি হাসি খুসি, ঠাট্টা-ইয়ার্কির মানুষ ছিল, মানুষের মমতা কেঁদে আঝোরে চোখ ভাসিয়েছে, করিম গাজির আহত মেয়েকে খাওয়াতে বলেছে, 'ও মুনি তুমি না খাও তো বুড়ো ছেলেটা না খেয়েই মরবে', সর্বোপরি করিম গাজির মূল্যায়ন, 'তাঁর রসবোধ বা হাস্যরস বা রসিকতাই তাঁহার চরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ। এখনো আমার চক্ষু দুইখানি বন্ধ করলে তাঁর হাসিমুখের প্রসন্ন মূর্তিখানি আমার সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।' এই বাস্তবতায় মুহূর্তেই উবে যায় ইয়াকুবের পিতৃভক্তি এবং দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে, কোন আশরাফ আলি তার পিতা? সেখানে আশ্রয় করে ক্রোধ ও প্রতিহিংসা। ইয়াকুব ধরে নেয়, বাবা হিসেবে আশরাফ আলি তাকে ঠকিয়েছে- 'না জীবনে না মরণে, লোকটা কোনদিনই পাত্তা দিলো না।' আর এই অতীত বঞ্চনা থেকে ইয়াকুবের ভিতরে ক্রোধের জন্ম হয়। আর এই ক্রোধের মাত্রা কী ভয়ানক পর্যায়ের তার পরিচয় মিলে, মৃত পিতার উপরে শোধ নেবার উপায় হিসেবে কুলখানির দুইদিন আগেই ফিরে যায় চাকুরির কর্মস্থলে। এবং মেজোমামা যখন বলে, 'শোন ইয়াকুব, আমার কথাটা রাখ। কুলখানি সেরেই যা।' প্রতিউত্তরে ইয়াকুব বলেছে, 'কার?', মেজোমামা ফের মিনতির কণ্ঠে বলে,'আজ বাদজোহর মৌলবি আসবে, কোরান খতম হবে; কবর জিয়ারত করবি না?' তখনও শূন্যে চোখ ফেলে একই জবাব দিয়েছে ইয়াকুব 'কার?' অবশেষে মেজোমামা যখন বলে, 'লোকজন মাইন্ড করবে। তোর বাবাকে এখানকার লোক খুব ভালবাসতো' তখন ইয়াকুব বলেছে, 'কাকে?' মৃত পিতার উপরে পুত্রের এই নিষ্ঠুর শোধ নেবার মধ্যদিয়ে ইলিয়াস আমাদের চালু বিশ্বাসের খুঁটি উপড়ে ফেলেছেন, চোখের পর্দা ফেটে রক্ত বেরুবার মত বাস্তবতাকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এখন কার পক্ষে যাবো বা কাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাব– বাবাকে না ছেলেকে, মানবিকতা বিলাসিরাই জবাব দিবেন? আমি বলব, মৃত পিতাকে বঞ্চিতপুত্রের প্রতিপক্ষ করে ইলিয়াস সঠিকটাই করেছেন।

মানুষের জীবনের প্রধান নিয়ামকই হচ্ছে জৈবিক চেতনা। আদি মানব-মানবী আদম হাওয়ার স্বর্গচ্যুতির মূলে ছিল যৌন আকর্ষণ জনিত পাপ। যৌনক্ষুধার অপূর্ণতা মানব-মানবীর জীবনে বয়ে আনে অসীম দীর্ঘশ্বাস ও অপরিসীম অস্থিরতা। বিশেষত, আধুনিক সভ্য সমাজের বাতাবরণে আবদ্ধ নারী-পুরুষের সামাজিক জীবনে যৌনক্ষুধার অপূর্ণতা পূরণের কোন সহজ পথ থাকে না। ফলে অবরুদ্ধ চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নানাবিধ ছিদ্রপথ দিয়ে। সমাজ-ধর্মের চোখরাঙানি কেবলি বাইরের পোষাকি, বাস্তবে মানুষ ভিতরে ভিতরে এখনো আদিম বাসনাটাকে আদিম করেই ভাবতে অভ্যস্ত। আর এই আদিমতা মানবদেহে কী মাত্রায় থাকতে পারে ইলিয়াসের 'তারা বিবির মরদ পোলা' গল্পের তারা বিবির অপূর্ণ যৌনক্ষুধাজনিত অস্থিরতা ও বিকলাঙ্গতা দেখেই প্রতীয়মান হয়। প্রচলিত ধারণার বাইরে এসে ইলিয়াস একেবারে খেলাচোখে নিরাসক্ত থেকে আবিষ্কার করেছেন মানবধর্মের একটি অনিবার্য সত্যকে। সমাজের সৃষ্ট নিয়মে ষাটোর্ধ্ব বয়সের শীর্ণকায় পুরুষ রমজান আলির সাথে বিয়ে হয় পঁচিশ বছরের যুবতী তারা বিবির, অতঃপর আরো বিশ বছর অতিক্রম হয়ে এখন রমজান আলি আশি-বিরাশিতে। অসম যৌন সম্পর্কের ভয়ানক বিলাপের স্বাক্ষী তার ছেলে গোলজার। মাঝরাতেই ঘুম ভেঙে যায় মায়ের যৌন অতৃপ্তিজনিত আর্তবিলাপে। ভাগ্নেরা ঠাট্টা করে বলে, 'মামুজান, নানায় হালায় এই বিয়া যহন করছে তহনই তো ষাট বছইরা বুইড়া। পঁচিশ বছরের ছেমরিটারে লইয়া বুইড়ার বহুত মসিবত, না মামু? বহুত মেহনত হয়, না?' বাস্তবে, তারা বিবির শরীরে যেমন যৌন জোয়ার উজানে উত্তাল ঢেউ তুলছে, বিপরীতে রমজান আলি ততটাই নিষ্প্রভ, অক্ষম। স্বামীর অক্ষমতা ও নিস্প্রভতা তারা বিবির যৌন জীবনকে নিশ্চিত বাঁধাগ্রস্ত করলেও এবং 'স্বীয় জীবনের অতৃপ্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সত্ত্বেও সে বিপথগামী হয় নি', বরং অসহ্য যাতনায় অস্থির হয়ে মধ্যরাতে অক্ষম পুরুষের কাছেই তার বিফল আবদার:

> তারা বিবি রমজান আলিকে জাগাবার চেষ্টা করছে, 'অ গোলজারের বাপ! এক্কেবারে লাশটা হইয়া রইছো, মা? আরে বুইড়া মরদ, খাটিয়ার লাশটাভি লড়েচড়ে, তোমার লড়ন নাই? বিচানা জুইড়া ভ্যাটকাইয়া রইছো, ও গোলজারের বাপ!' এরপর রমজান আলী হয় চুপ করে থাকবে, নাই উঠে তার বালিশের কাছ থেকে হাত পাখাটি নিয়ে বৌকে পেটাতে শুরু করবে, 'খানকি মাগী, তর, মরদানি দ্যাখনের খাউজানি উঠছে, না? র। তরে মরদ দেখাই। তর হাউস মিটাইয়া দেই আয়।' রমজানের দাঁত-পড়া, ঘুম ভাঙা মুখের বাক্য ভালো করে তেতে ওঠবার আগেই মিইয়ে পড়ে, তার হাড্ডিসার হাত দেখতে দেখতে ক্লান্তিতে নুয়ে আসে। (তারা বিবির মরদ পোলা/ খোঁয়ারি)

ধর্ম-সমাজরীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিয়ে নামক সম্পর্কের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে নর-নারী যৌন জীবনের একটি স্বস্তি ফিরিয়ে আনা। কিন্তু সে সম্পর্ক যদি অকার্যকর হয়, যৌনসুখ বঞ্চিত হয়, একপাক্ষিক হয়, কি তার সমাধান তা বলা নেই। অন্যদিকে বিয়ে নামক প্রথা ভেঙে যাবার শক্তিটুকুও থাকে না। অচরিতার্থ যৌনক্ষুধা সমাজকাঠামোর সকল সম্পর্ককেই শিথিল করে তখন। তারা বিবির যৌনসুখ বঞ্চনার লেলিহান আগুনে কেবল রমজান আলি একা নয়, নিজের সন্তান, পুত্রবধূসহ আশেপাশে আরো যারা আছে তারাও পুড়ে। প্রচলিত ধারণার বাইরে তারা বিবির মনোবিকার– বিকারগ্রস্ত মনে অবচেতনভাবেই নিজের সন্তানকে সন্দেহ করে এবং পুত্রবধূর মনে সন্দেহের বীজ পোঁতে অমঙ্গল ডেকে আনে। অপ্রাপ্তি থেকে সৃষ্ট বিকারগ্রস্ত মনের কাছে প্রচলিত নীতি ও মূল্যবোধ অর্থহীন। ফলে পুরো সংসার ব্যবস্থাতেই সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা। অবস্থার বেগতিকে গোলজারকেই ভাবতে হয়, বাপ বুড়ো বয়সে বিয়েটা না করলেই পারতো। এতে লাভ হতো তার নিজের-পৃথিবীতে কোনদিন না আসার সুখ পেতো, অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি লাভ ছিল রমজান আলির 'এই রাত্রিবেলায় ভোগান্তিটা হতো না।' উপরন্তু, রাতের অতৃপ্তির জ্বালা-যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে মায়ের যাবতীয় যৌন উদ্দীপক খিস্তি-খেউড় ছেলেকেই শুনতে হয়। তারা বিবির খিস্তি-খেউড় যতই অসঙ্গত, অস্বাভাবিক, কুরুচির এবং কিছুটা হাস্যকর ঠেকে বাস্তবে এই থেকেই সে একধরণের বিকৃত সুখ পেয়ে থাকে। কাজের মেয়ে সুরুজের মা, আরো দুইজন

বিবাহিত মেয়েকে ঘিরে ছেলের উপরে যে সন্দেহের তীর ক্রমাগত ছুঁড়তে থাকে, তা মূলত তারা বিবির নিজের যৌন অতৃপ্তিজনিত প্রলাপ। কিছু সংলাপ এখানে উদ্ধৃত করা হল:

১. আলী হোসেনের বৌ এক্কেবারে বেশরম মাগীটা–অর লগে কিসের গুজুরগুজুর, ফুসুরফাসুর আমি বুঝি না, না?

২. কামের মাতারি রাখবা তো দিন রাইত খালি তার লগেই রঙ, তার লগেই কথা। সুরুজের মাও, পানি লও; সুরুজের মাও, আমার গাঞ্জি কই? সুরুজের মাও, নাশতা দাও।–ক্যান?–অর বৌ আছে না?

৩. আমার গোলজারের লগে লাঘাইয়া দিবার লাইগা খাদেম পাগলার ভাই কতো তদবির করছে। গোলজারের নজরখানও আছিলো ঐদিকেই। দেইখো বৌ, নিজের লোকসান কইরো না। দেখলা না, বেগানা মরদের লগে কেমুন হাইসা হাইসা কথা কইলো, দেখলা না।

৪. আমি কই ঝুট কথা? তবে জিগাই, বিনয়ের বইনের বিয়া হইছে হিন্দুস্থান, আর বচ্ছরের আষ্টটা মাস উই পইড়া থাকে বাপের বাড়ি ক্যালায়? তবে জিগাই, ক্যালায়? বেজাত মাগিটার লগে বইয়া রইসছ, তর বৌ আছে না? দুই দিন বাদে তোর পোলা হইবো না? তোর শরম নাই? (তারা বিরি মরদ পোলা/ খোঁয়ারি)

প্রসঙ্গত বলা যায়, ফ্রয়েডের লিবিডো চেতনাই তারা বিবির নিয়ন্ত্রণ শক্তি। মানুষের জীবনপ্রবৃত্তির অন্তর্নিহিত মূলশক্তিকে লিবিডো বলেন ফ্রয়েড। মানব মনের তিন স্তর- ইদম, অহম, ও অধিসত্তা। এরমধ্যে প্রকৃতিতে নীতিহীন এবং সুখভোগই ইদমের উদ্দেশ্য। আর এই ইদমের কারণেই তারা বিবির ভিতরে সক্রিয় ও সজীব যৌন উদ্দীপনা বিকল্প প্রকাশ ঘটেছে অবচেতনভাবে। প্রকাশ্য জীবনছকের আড়ালে রক্ত-মাংসের এই শরীর যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়, তাকে টেক্কা দেবার অব্যর্থ প্রচেষ্টার অন্ত নেই নর-নারীর। কিন্তু শেষ বাস্তবতা হচ্ছে, মানুষের রক্ত-মাংসের শরীর অন্তত এই জায়গায় আপোষ করে না। স্বামী যৌনশক্তি প্রদর্শনে অক্ষম, কিন্তু ছেলে যৌনশক্তি প্রদর্শনে সক্ষম যুবক। স্ত্রী ও মায়ের অনুপস্থিতিতে সক্ষম যুবক বাড়ির কাজের মেয়ের সাথে অনৈতিক সম্পর্কে জড়াবে- খুব স্বাভাবিক বলে মনে করে তারা বিবি। ক্রোধে-আক্রোশে রমজান আলি ছটফটায়। অক্ষম-অথর্ব পুরুষের এই ছটফটানি তারা বিবির কাছে মূল্যহীন। রমজান আলির 'স্যাঁতসেতে মাথার ওপরকার লালচে শাদা চুলের কয়েক গোছা চুল আমের শুকনো আঁটির আঁশের মতো লেপ্টে আছে'। তারা বিবি স্বামীর দিকে না তাকিয়ে বরং সলজ্জ ছেলের অবিন্যস্ত 'কাঁপানো কেশরাশি' দেখে পুলক অনুভব করে। অক্ষম রমজান আলি যখন হুংকার ছাড়ে, 'হারামজাদা আহুক, আইজকা লাইতেই অর পাছার মইদ্যে লাথ মাইরা যুদিল খ্যাদাইয়া না দেই।' তারা বিবির তখন নিষ্কম্প কণ্ঠে ধমকায়: 'হইছে!'এবং বলে 'এমুন চিল্লাচিলি করো ক্যালায়? গোলজার কি করছে? পোলায় আমার জুয়ান মরদ না একখান? তুমি বুইড়া মড়াটা, হান্দাইয়া গেছো কব্বরের মইদ্যে, জুয়ান মরদের কাম তুমি বুঝবা ক্যামনে?' (তারা বিবির মরদ পোলা/ খোঁয়ারি)

বস্তুত, শেষ সংলাপেই তারাবিবি তার অবস্থান সুস্পষ্ট করেছে। বাস্তবে, গল্পটির যতটা না বলা হয়েছে ভাষায়, তারও বেশি বলা হয়েছে তারা বিবি আচার-আচরণে, সবচেয়ে প্রকট হয়েছে তারা বিবির মনোজাগতিক সংঘাত-সংঘর্ষ। তারা বিবির তার ছেলের অনৈতিক সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়ে সমাজের বিরুদ্ধে বীভৎস শোধ নিল। দুর্জ্ঞেয় রহস্যের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা মনোবিকারগ্রস্ত এই নারীর সত্যমূর্তি সমাজ ও রুচির বিচারে যতই বীভৎস ও অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হউক না কেন, বাস্তবতাকে অস্বীকার করা উপায় নেই। স্বামীর যৌন অক্ষমতার কারণে ছেলের মধ্যে 'বহুগামিতা এবং যৌন জীবনের সাহসী পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ করে সে এক ধরনের বিকৃত সুখ পেতে চায়।' পুঁজিবাদী সমাজ ব্যস্থায় যৌনবৈষম্যের শিকার তারা বিবি। প্রচলিত আর্থ-সমাজব্যবস্থা ও পারিবারিক বিন্যাসের বিরুদ্ধে, ভোগবাদী ও নপুংসক সমাজে উঁচু স্তরের অধিষ্ঠিত পুরুষদের বিরুদ্ধে তারা বিবির ক্ষোভ বা বিদ্রোহ।

'গোলজার যে কারণে সখিনার প্রতি তৃপ্ত নয়, সুজনের মা যে অর্থনীতির পীড়নে গোলজারের শরণাপন্ন হয় আবার এই কারণে পঁচিশ বছর বয়সী তারা বিবি ষাটোর্ধ্ব রমজান আলির প্রতি তৃপ্ত নয়। প্রত্যেকটি ব্যাপারই সমাজ-সংশিষ্ট এবং প্রত্যেকটিই অবক্ষয়িত সমাজের অব্যবস্থার রগরগে চিহ্ন।'[১]

নাগরিক মধ্যবিত্তের কপটতা, অন্তঃসারশূন্যতা, স্বার্থচালিত চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে ইলিয়াসের কলম বরাবরই ছিল মমতৃহীন চামারের ভূমিকায়। এই জীবনের স্বপ্ন-সাধ-স্বাধীনতা, ন্যায়-অন্যায়-বিবেক শাসন সবই মুহূর্তে মুহূর্তে বিকিকিনি হয় পূঁজিবাজারের শেয়ারের হাত বদলের মতই। ভয়ানক নির্মম সত্যকেও আড়ালে-পিছনে ফেলে মধ্যবিত্ত মানুষ নিজের কৃত্রিম ঠাঁট বা আভিজাত্য বজায় রাখে এবং নিজের স্বার্থ-শর্ত পূরণে হয় মরিয়া। তখন নিজের আত্মজার হত্যাকারীকেও সমীহ করতে হয়। 'প্রতিশোধ' গল্পের প্রবীণ অব্দুল গণি একটি টেণ্ডার পাওয়ার গোপন লোভে সম্পূর্ণ বিবেক ধুয়ে-মুছে ফকফকা করে নিজের আত্মজার হত্যাকারীকেই বাড়িতে জামাই আদরে নিমন্ত্রণ করে। আবুল হাশেম, একসময়ে বামপন্থি রাজনীতির এই ধারক নিজের চাতুর্য আর রাজনীতির ভূঁইফোঁড়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে এখন নব্যপূঁজিপতি। ফলে নিজের স্ত্রী খুনের মত একটি জ্যান্ত খুনকে রোড এক্সিডেন্ট বলে চালিয়ে দিতে তার অসুবিধা হয় না। অ্যাকুরিয়ামে আটকানো মাছের মতই আবুল হাশেম পুরো পরিবারটিকে আটকে ফেলেছে পুজির স্বচ্ছ কাঁচে। শোষণমূলক সমাজের মূল ভিত্তিই হচ্ছে পুঁজি সংগ্রহ– যেখানে অন্যায় অর্জন প্রক্রিয়া, মিথ্যাচার, কপটতা, শঠতা, ছলচাতুরী, প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা, এমন কি নিজের হাতে খুন করা স্ত্রীর নামের বাড়ি দখলেও বিবেক অসুস্থ হয় না। অন্যদিকে স্বার্থের অন্ধ মোহে নিজের আত্মজার খুনিকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ ও তোষামোদ– মধ্যবিত্তের এই ভণ্ডামি অসহ্য রকমের ঠেকে কিন্তু বাস্তবতাটাও যে তাই। এই বাস্তবতায়, বিবেক শাসিত মানুষকে কিভাবে ভয়ানক আত্মিক সংকটে ছুঁড়ে ফেলে তারই দৃষ্টান্ত জীবন হননকারী ওসমান। আবুল হাশেমের উপর তীব্র আক্রোশ, ক্ষোভ ও প্রতিশোধপরায়ণ সে। এর কারণ দ্বিবিধ: প্রথমত, বোন রোকেয়ার হত্যাকারী এই মানুষটা প্রায় নিশ্চিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তারই আকাঙ্ক্ষার নারী বিশেষ অর্থে প্রেমিকা, যাকে সে পশ্চিম পাকিস্তানের নৈসর্গিক বর্ণনা দিয়ে চিঠিও লিখেছিল, সেই নার্গিসকে পুঁজির জোরে পণ্য ক্রয়ের মতই এক প্রকার ছিনতাই করে দখলে নিয়েছে। ফলে সে ভয়ানক প্রতিশোধপরায়ণ। রড মাথার ভিতরে ঢুকিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বের করে কিংবা চলন্ত ট্রাকের নিচে ধাক্কা দিয়ে ফেলে অথবা ছাদ থেকে নিচে ঠেলে সুড়কির উপরে ফেলে ইত্যাদি বিবিধ পরিকল্পনা ও কৌশল আঁটে আবুল হাশেমকে খুন করতে। মূলত, গল্পের পুরোটা জুড়েই চলেছে একটি খুনের প্রস্তুতি। আর এই খুনের প্রস্তুতিই বলে দেয় যে, পুঁজিপতি আবুল হাশেমকে খুন করার মত সামর্থ বা সাহস বা পরিবেশ কোনটাই নেই ওসমানের। অধিকন্তু আবুল হাশেমকে তোয়াজ করে ঘোড়াশাল-টঙ্গি কনসট্রাকশনের কাজ বাগিয়ে নেবার হীনতা দেখে, পিতা-ভাইদের প্রকৃত মুখোশ উন্মোচন হবার পরে ওসমানের সামনে সগৌরবে দাঁড়ায় জীবনবিনাশী ভাবনা। দ্রুত সে আত্মহননের দিকে ছুটে। অবশেষে জীবন দিয়েই ওসমানকে পুঁজির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়। বেঁচে থাকার রসদ ফুরিয়ে গেলে মধ্যবিত্তের ভিতরের কিছু বিবেক শাসিত মানুষ আর কোনমতেই বাঁচতে চায় না। তখন এই কপটতা, ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা, মিথ্যাচারিতা থেকে মুক্তির বিকল্প পথ খুঁজে না পেয়ে এইভাবেই আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠে। ইলিয়াসের এই গল্প অনেকাংশেই মানিক প্রভাবিত। মধ্যবিত্তের ভিতরের এই কপটতা, শঠতা, ছল-চাতুরি, প্রবঞ্চনা মানিকের গল্পের অনেক নায়কদের মতই ওসমান প্রবল প্রতিবাদে ভয়ানক আগ্রাসী। কিছুতেই সে সমঝোতা করবে না নিজের বিশ্বাসের সাথে, নিজের সততার সাথে। তাই বাপ-ভাই খুব সহজেই খুনি, চতুর, লোভী আবুল হাশেমের সাথে হাত মেলাতে পারলেও ওসমানের পক্ষে তা ছিল অসম্ভব। তাই সে শেষ বিপ্লবটা ঘটিয়ে গেল। আত্মঘাতী আলসারের মতই পুঁজি জেঁকে বসেছে তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষদের প্রাণপ্রবাহে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার দ্রুত প্রসারে সন্ত্রস্ত ছিলেন ইলিয়াস; শুধুই শ্লেষ আর বিদ্রুপ করে নয়, বরং রীতিমত প্রতিরোধের আহ্বান তাঁর:

> আমাদের আলসারের ব্যথা দিনদিন অসহ্য হয়ে উঠেছে। স্ফীতোদর সর্বগ্রাসী পুঁজিবাদকে শ্লেষ আর বিদ্রুপ করে এই ব্যথাকে চিরে চিরে দেখার মতো সময় শেষ হয়ে এসেছে, সেই বিলাসিতা আমাদের পোষায় না। পুঁজিবাদের গতর রোজই একটু একটু করে মোটা হচ্ছে, উপমহাদেশের বিভিন্ন পয়েন্টে মোতায়েন তাদের নপুংসক ও পঙ্গু কুকুরগুলোর দাঁতের ধারও বাড়ছে। অবস্থা এমন যে এদের কামড়ে আলসার-ভোগা মানুষের জলাতঙ্ক দেখার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের দিকে তাক করতে না-পারলে আমাদের আলসার ও সম্ভাব্য জলাতঙ্ক থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই।[৯]

পুঁজিবাদের শেকড় উপড়ে ফেলে ব্যক্তির বিকাশের ক্যানেলকে সাফ করে দেবার মনোবাসনা-ই ইলিয়াসের গল্পের বীভৎস বাস্তবতার নেপথ্যের কারণ। বস্তুত, পুঁজিবাদের প্রতি তীব্র বিরূপ ভয়ানক বিরোধে রূপ নিয়েছে ইলিয়াসের শিল্পীসত্তায়। তাই এমন ভয়ানক শ্যেনদৃষ্টি পুঁজিবাদের প্রতি। দুনিয়াজুড়ে পুঁজিবাদের প্রবল আগ্রাসনে বেসামাল নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন বাস্তবতা চিত্রায়িত করতে গিয়ে ইলিয়াস কী রকম ভয়ানক খেলায় মেতে ওঠেন তারই দৃষ্টান্ত 'যুগলবন্দি' গল্পের রিটায়ার্ড পোস্টমাস্টারের বি এ পাস ছেলে আসগর। চোরাপথে বিপুল ইনকাম ও উচ্চবিত্তের বিলাসি জীবনের মোহাবিষ্ট এই যুবক উপরের ওঠার জন্যে এতই মরিয়া যে, ভাগ্যবিধাতার নেক নজর পেতে অনেকটা উপযাচক হয়েই পোষা কুকুর আসগরের খাদ্য তদারকি ও বাউয়েলস ক্লিয়ারে দায়িত্ব নিয়েছে। প্রভু সারোয়ার কবিরের মতই কুকুরেরও একই স্বভাব–সিগারেট না ফুঁকলে বাউয়েলস ক্লিয়ার হয় না। ফলে কুকুরের বাউয়েলস ক্লিয়ারের জন্য সারোয়ার কবিরের মতই সিগারেট ধরায় আসগর। আর তখনই শিকলে একটা শক্ত টান পড়ে অর্থাৎ কুকুরটি পাকস্থলি ক্লিয়ার করছে। আর এই প্রশান্তির ছোঁয়া আসগরের দেহেও চালান হয়ে যায়,'নিশ্চিন্ত হয়ে দ্বিতীয় সিগ্রেটটি ধরিয়ে গোটা তিনেক লম্বা টান দেওয়ার পরেই আসগরের হাতের শিকল শান্ত ও শিথিল হয়ে আসে। আসগর সিগ্রেটে বেশ কয়েকটা সুখটান দেয় আর অনুভব করে যে আসগর খুব আরাম ও তৃপ্তির সঙ্গে বাউলেন্স ক্লিয়ার করছে। শিকলের ধাতব বিনুনি বেয়ে সেই তৃপ্তি আসগরের শরীরে চমৎকার মৌতাত ছড়িয়ে দিচ্ছে।' মধ্যবিত্তের স্বপ্ন-সাধকে নিয়ে এ কি নিদারুণ খেলা ইলিয়াসের! কুকুরের সম্ভোগ, কুকুরের বাউয়েলস ক্লিয়ার সাথে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনবেদ মিলিয়ে এই সাহসি শিল্পী পুরুষ স্পষ্টতই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন। সেইসাথে এই গল্পে আছে জাতীয় জীবনের অন্তর্ঘাত ক্যান্সারের মত জেঁকে বসা দুর্নীতি ও লুটপাট, কাস্টম, পুলিশ ও সরকারি আমলার সাথে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক মন্ত্রীর 'ভাইপো না শালা'র দুর্নীতির চালচিত্র।

পুঁজিবাদের জ্বরে আক্রান্ত বাংলার গ্রামীণ জীবনব্যবস্থাও– সেখানে হাজার বছরের রীতিনীতি ও ঐতিহ্য ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ছে। এর কেন্দ্রে চলে এসেছে মৌলবি আলতাফ আলির মত কূটকৌশলি ও ভূমিখাদকেরা। ইলিয়াসের 'দুধভাতে উৎপাত' গল্পগ্রন্থের 'পায়ের নিচে জল' গল্পটি স্বতন্ত্র বক্তব্য এবং বর্ণনা কৌশলে তাঁর যে কোন গল্পের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। বুভুক্ষু যমুনার বিশাল উদরের প্রসার বাড়ে প্রতি বর্ষায়। উছলে ওঠা পানির কলকলে তখন দুই তীর উত্তাল। তীরবর্তী মানুষদের জীবন, সম্পদ, ঘর-বাড়ি সবই যমুনার উদরে চলে গেলে প্রতি বছরেই বাড়ে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা। তারা তখন আশ্রয় নেয় সরকারের ওয়াপদা বাঁধের উপরে– সেখানেও নিরুপদ্রব নয়। সমাজের ভূমিপতি বিত্তবান মৌলবি আলতাফ আলির রোষের শিকার এবং তার সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনায় উদ্বাস্ত জনগোষ্ঠীর একমাত্র আশ্রয় ওয়াপদার বাঁধ থেকেও উচ্ছেদের কুমতলব আঁটে। একদিকে প্রমত্তা যমুনার নিজের জঠরের জ্বালার মেটানোর নির্দয় উল্লাস, অন্যদিকে সমাজের প্রতাপশালী ধনাঢ্য আলতাফ মৌলবির সবকিছুকে একাই গ্রাস করে নেবার হিংস্রতা– এই দুইচক্রে পতিত বিপুল জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিপন্ন প্রায়। বিরুদ্ধশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে জীবনের প্রতি নিরাসক্ত এরা, যমুনার খাবারের পরিণত হওয়া সাত বছরের সন্তানের মায়ের আর্ত-হাহাকারও কোনপ্রকার দাগ সৃষ্টি করে না। আলতাফ মৌলবির চাতুর্য ও ছল-কৌশল ও নাগরিক আতিকদের

পুঁজিবাদী চিন্তার কাছে বর্গাচাষী কিসমত সাকিদার ও তার পরিবার নিতান্তই খড়কুটোর মত। যমুনা নদী সবকিছু গ্রাস করে নিলেও তার পাড়ে ঠাঁই করে দেয়, কিন্তু আলতাফ-আতিকরা একেবারেই আশ্রয়হীন করে। প্রতিদিনই নতুন ঘর বাঁধা হয় বাঁধের উপরে। 'আবার সেই বাঁধ সেই বাঁধ; বাঁধে সারবাঁধা নতুন ও পুরনো চালাঘর। আবার সেই সব কালোকিষ্টি মানুষ, আবার অপরিচিত আঁশটে গন্ধ।'

নদীবেষ্টিত জনপদের নিগূঢ় বাস্তবতার এমন নির্মোহ উপস্থাপন বাংলা কথাশিল্পে বিরল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মা নদীর তীরবর্তী মানুষদের যে জীবনসংগ্রাম সেখানেও আর যাই হোক বস্তিঘর হলেও কুবের-গণেশদের মাথা গুঁজার ঠাঁই আছে, আর না হয় হোসেন মিয়ার মতো ধনাঢ্য ব্যক্তির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আছে। কিসমত সাকিদারদের তো সেই আশ্রয়টুকুও নেই! যমুনার মতই নির্বিকার ও নিষ্ঠুর আলতাফ মৌলবি সম্পদের অখিলক্ষুধা নিবারণে জন্য প্রতিনিয়তই নতুন নতুন মুখ যোগ হয় দরিদ্র ছিন্নমূলের মিছিলে। 'অর্থনীতির এমন প্রকোপ মমতার বাঁধন, সংস্কৃতির টান, স্বজনের আহাজারি নস্যিমাত্র। এই বৃত্ত থেকে বেরোবার উপায় নেই আতিকদেরও।'[৭] প্রমত্তা যমুনা নদী, ভূমিলোভী আলতাফ মৌলবি, ধানমণ্ডি-গুলশানের অভিজাত আতিকেরা সবাই সমধর্মী। বুর্জোয়া শাসকের কিছু সাহায্য হাত ফসকে এদিকে আসলেও তাতে সুবিধাভোগীর রক্তচোখের অন্ত নেই। মানবিক মূল্যবোধ ও সহানুভূতির অবশিষ্ট বলে কিছু নেই গ্রামীণ জনপদে। 'দুধেভাতে উৎপাত' গল্পে এক মা তার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও পারে নি 'দুধ দিয়ে ভাত দিয়ে কলা দিয়ে গুড় দিয়ে' একমুঠো ভাত নিজে খেতে, দিতে পারে নি সন্তানদের মুখেও। তার একমাত্র কালো গাই দোকান বাকির দেনায় অন্যের দখলে। অন্তিম শয়ানে থেকেই কখনো কাতর হয়েছে, কখনো অবচেতনে দ্রোহী হয়ে চালু সমাজের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ছেলেকে আদেশ করেছে 'বুইড়া মরদটা! কী দ্যাহস? গোরু লইয়া যায়। খাড়াইয়া খাড়াইয়া কি দ্যাহস!' শেষে চরম শোধ নিল এইভাবে:

> জয়নব অবিরাম বমি করে। প্রথমে বের হলো ঘোলাটে সাদা ভাত ও পানি। তারপর কেবল পানি। বিবর্ণ পানির ধারা বেরিয়ে আসে প্রবল তোড়ে। মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের বিরতি দিচ্ছে। বিরতির পর পরই দ্বিগুণ বেগে বমি আসে। বমির পানিতে মেঝে ভেসে যাচ্ছে। ওহিদুল্লাহ অবাক হয়ে বমির পরিমাণ দেখে, মায়ের ভিতরকার সব কিছুই পানি হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে? জয়নবকে যারা অনেকদিন থেকে চিনে তাদেরও এরকম মনে হতে পারে। এ পর্যন্ত খাওয়া যাবতীয় খাদ্য দ্রব্য ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য সে কি পাগল হয়ে গেলো? আজ থেকে ৩৬ বৎসর আগে তার আকিকার গোস্ত থেকে শুরু করে কিছুই তার পেটে থাকছে না। বমির পরিমাণ দেখে মনে হয়, তার বিয়ের আগে বাপের বাড়িতে যা খেয়েছে, নিজের বিয়ের খাবার, বিভিন্ন বকরী ঈদের পর তার স্বামীর নিজের হাতে হালাল করা কোরবানীর গোশ্‌ত, কালো গরুর দুধ দিয়ে কলা দিয়ে গুড় দিয়ে মাখা মোটা ও রাঙা চালের ভাত, খড়ার সময় মাখন ঘোষের পোড়া ভিটা থেকে খুঁজে-আনা মেটে আলু, এমন কি কসিমুদ্দিনের পড়া-পানি পর্যন্ত উগরে দিয়ে সে নিঃশেষিত হচ্ছে। (দুধভাতে উৎপাত/ দুধে ভাতে উৎপাত)

ভয়ানক বীভৎস প্রতিবাদে উন্মত্তপ্রায় জয়নব ভিতরের সব উগলে নির্ভেজাল হয়ে বিদায় নিতে চায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সে পৃথিবীর সব ঋণ শোধ করে যেতে চায়। গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশে তথা ধলেশ্বরীর তীরবর্তী গ্রামটির মানুষের জীবনকাব্যকে ইলিয়াস দিয়েছেন এক ট্রাজিক পরিণতি। যেখানে একজন মৃত্যুগামী মাকে তার সন্তানদের ও নিজের মুখে এক মুঠো দুধ-ভাত তুলে দেবার জন্য লড়াই করতে হয়। এবং শেষপর্যন্ত অপূর্ণ সাধ নিয়েই পৃথিবী ছাড়তে হয়। পুরান ঢাকার মানুষদের ইলিয়াস যেমন দেখেছেন আপন প্রাণশক্তিতে বেগবান, এর বিপরীতে গ্রামবাংলার জনপদের জীবনকে দেখেছেন স্থবির, বিকল ও মৃত্যুমুখী। এখানে বেঁচে থাকার অর্থই হচ্ছে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরানি; জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এখান থেকে নির্বাসিত।

ইলিয়াসের বিশ্বাস-আস্থা-শ্রদ্ধা-দরদ-মনোযোগ সবই পেয়েছে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ। তাঁর মতে 'যাঁকে সম্মান করতে পারি না, তাঁর সমস্যাকে অনুভব করতে পারব না।'[৭] বস্তুত, অর্থনৈতিক বৈষম্যপীড়িত প্রান্তিকমানুষের অধিকারের স্বপক্ষে ছিল ইলিয়াসের কলম। পুঁজিপতি, জমিদার, জোতদারের শোষণে-নিপীড়নে-হরণে-লুটপাটে এক বিপন্নজনপদ বাংলার গ্রামীণ জনপদ। 'দুধভাতে উৎপাত' গল্পগ্রন্থের 'দখল' গল্পটি ইলিয়াসের সাম্যবাদী কমিউনিস্ট চিন্তার ফসল। গল্পের পটভূমিতে আছে মোয়াজ্জেম হোসেনের মত গ্রামীণ শোষক। তার শক্তির উৎস হিসেবে আছে রাষ্ট্রীয় রক্ষিবাহিনী এবং প্রয়োজনে সেনাবাহিনী। বলাবাহুল্য, সময়টা আওয়ামীলিগের প্রথম শাসনকাল। সশস্ত্র রক্ষিবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞে পতিত সদ্যস্বাধীন দেশে সৃষ্টি হয় ভয়ানক এক মানবিক বিপর্যয়। আর এই সুযোগটাকেই ব্যবহার করে মোয়াজ্জেম হোসেনের মত শোষকেরা প্রান্তিকজনগোষ্ঠীর মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সব পথই অবরুদ্ধ করে বুর্জোয়া শাসকের সহায়তায়। অথচ এরাই স্বাধীনতার সময় পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছে এবং দেশ স্বাধীন হলে আওয়ামী লীগের খাতায় নাম উঠিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করেছে রক্ষিবাহিনীকে। ইতিহাসের নির্মম সত্যটিই ইলিয়াসের গল্পে এসেছে বিরাট বিপ্লব ও সম্ভাবনা নিয়ে। মোয়াজ্জেম হোসেনের বড় ছেলে মোবারক হোসেন কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ লালন ও প্রচার করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে। ফলে প্রান্তিক মানুষেরা হয়ে ওঠে অধিকার সজাগ এবং নিজেরা হতে থাকে সুসংগঠিত। ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তান সরকার নির্মম নির্যাতন করে মোবারক হোসেনকে হত্যা করে রাজশাহী কারাগারে। কিন্তু বিপ্লবের যে বীজমন্ত্র কমিউনিস্ট মোবারক হোসেন বপন করে গেল, তা ক্রমেই প্রকাণ্ডরূপে বিরাট বিপ্লবের রূপ নিল এবং প্রান্তিকমানুষেরা রুখে দাঁড়াল গ্রামের জোতদার শ্রেণি ও শাসকদলের সৃষ্ট রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে। নিজের বিত্তের বাইরে এসে শ্রেণিশোষণের শিকার প্রান্তিকমানুষের পক্ষে আন্দোলন, সংগ্রাম এবং শেষে আত্মত্যাগ করে মোবারক হোসেন বাংলার ইতিহাসের মহানায়ক ক্ষুদিরাম বসু, গোপীনাথ সাহা, সূর্যসেন, যতীন দাস প্রমুখ বিপ্লবী শহীদদের সমগোত্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

ধর্মের ভিত্তিতে সাতচল্লিশের দেশভাগ ছিল মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল– এই সত্য আজ আর নতুন করে বলার কিছু নেই। ধর্মের ভিত্ততে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রে শেষ পর্যন্ত ধর্মই হয়ে ওঠে বিকাশের প্রধান অন্তরায়। শাসন-শোষণের মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ধর্ম একটি নগদ ক্রিয়াশীল বটিকা হিসেবে ব্যবহার করে মোটামুটি একটি ফল তারা পেয়েছিল। তাই, পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জাতির জাগরণের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল ধর্মাশ্রয়ী সুবিধাভোগী মানুষ বা ধর্মভিত্তিক সংগঠন। আর এই কারণেই, আলবদর-আলশামস-রাজাকার ইত্যাদি নানা নামে-ব্যানারের তারাই একাত্তরে নরহত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটের নেতৃত্ব দিয়েছে। সুদীর্ঘকালের বিপ্লব-বিদ্রোহ-রক্তপাতের ধারাবাহিকতায় এবং নয় মাসের জীবন-সম্পদের অকল্পনীয় ক্ষতির বিনিময়ে অর্জিত যে স্বাধীনতা তার প্রাপ্তির খতিয়ান অসীম হতাশা ও আর্তচিৎকার। আয়-ব্যয়ের গাণিতিক হিসেবে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু এতো বিরাট ক্ষতির বিনিময়ে প্রাপ্ত সম্পদটি কিছু বিবেকবর্জিত মানুষের ক্ষমতা ও সুখ লাভের প্রধান পুঁজি হয়ে গেল কীভাবে? স্বাধীনতার অব্যবহতি পরে স্থপতিকে সপরিবারে হত্যা করে লোভ-লুটপাটের সদর দরজার একেবারে খুলে নিয়েছে কায়েমি স্বার্থবাদীর দল–তারা এসেছে সেনাব্যারাক থেকে, তারা এসেছে পাকিস্তানি আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে। খুব কি দরকার ছিল স্বাধীনতার–এই প্রশ্নইটিই উঁকি দেয় তখন, যখন দেখা যায় ঘোষিত আল বদরবাহিনীর নেতার গাড়িতে জাতীয় পতাকা ওড়ে, জাতীয় সংসদের পবিত্রতাকে উপহাসে মুচকি হাসে সেই নেতা, সগৌরবে অস্বীকার করে স্বাধীনতা যুদ্ধটাকেই। সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু এই দুভাগে সমাজকে স্তরবিন্যাস করে 'বুর্জোয়া-আরাম আয়েশ করা জীবনের পথ প্রশস্ত' করে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের লুটপাট, ক্ষমতা দখল আর সম্পদের পাহাড় গড়ার জন্য স্বাধীনতার দরকার ছিল না! হাসান আজিজুল হকের মন্তব্যটা তিক্ত হলেও মেনে নিতে আপত্তি নেই– 'এক ভয়াবহ বিষণ্নতা আর ততোধিক ভয়াবহ সর্বগ্রাসী হতাশা ছাড়া এই শব্দ (স্বাধীনতা) আমাদের কাছে এখন আর কোন অর্থ বয়ে আনছে না।'[৯] মূলত, মুক্তিযুদ্ধকে খুব কাছে থেকে দেখা ইলিয়াসের মেধাবী ও নির্মোহ চোখ এড়িয়ে যায় নি মুক্তিযুদ্ধের মহত্ব ও ফাঁক-

ফাঁকি দুটিই। এক মহাকাব্যিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গৌরব। আর সেই বিরাটতত্ব ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরেও মহান ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থিত 'খোঁয়ারি', 'মিলির হাতে স্টেনগান', 'প্রতিশোধ', 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' প্রভৃতি গল্পে।

মুক্তিযুদ্ধ উত্তর বাস্তবতাকে নির্মোহ চোখ ফেলে দেখেছেন ইলিয়াস। যে কারণে, মুক্তিযুদ্ধের নেতিবাচক বিষয়গুলোই প্রধান হয়ে এসেছে। এক বীভৎস নারকীয় তাণ্ডবের পরে স্বাধীনতা নামক যে দুর্লভ সম্পদটির হাতে এসেছিল, তা আর শেষ পর্যন্ত সঠিক বিশ্বাসের জায়গায় থাকে নি। এবং সেই বিশ্বাস কী মাত্রায় হারিয়েছে 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পের মুক্তিযোদ্ধা আব্বাস পাগলার আর্তচিৎকারই তার উদাহরণ। বিকারগ্রস্ত এই যোদ্ধার আর্তচিৎকারের হেতু যে কী- তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশাল প্রত্যয় ও প্রত্যাশার জায়গায় সদ্য স্বাধীন দেশে আশ্রয় নেয় সেই পুরনো লোভ-লুটপাট, আইয়ুবীয় কায়দায় মসনদ দখলের উল্লাস! বাতাসে বোমা-বারুদের গন্ধ তখনও শেষ হয় নি, এরই মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ককে সপরিবারে হত্যা করে পূরণ হয় ক্ষমতা দখল আর লুটপাটের ষোলকলা। এই সুযোগে কিছু নষ্টমানুষও তার বৃত্ত পরিবর্তন করে উঠতি পুঁজিপতির খাতায় নাম লেখায়। একদিকে চলে অস্ত্রের দাপুটে ক্ষমতা কব্জায় নেয়া একশ্রেণির উচ্চাভিলাষী সেনাসদস্যের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য, অন্যদিকে তৃণমূলেও চলে একশ্রেণির অস্ত্রের মহড়া। অস্ত্রের মুখে জিম্মি হয়ে পড়ে সদ্য ভূমিষ্ঠ রাষ্ট্র। আব্বাস পাগলার একটি স্টেনগান চাওয়ার তীব্র আকুতি আমাদের জানান দেয় যে, যুদ্ধ মূলত অসমাপ্ত-ই থেকে গেছে। শিক্ষকতার মত নিশ্চিত নিরাপত্তার পেশা ছেড়ে সে যুদ্ধে নাম লিখিয়ে ইন্ডিয়া চলে গিয়েছিল এবং নানা ফ্রন্টে লড়াই করেছিল, সেই যুদ্ধ এখনও অসমাপ্ত! এতো বিরাট ক্ষতির প্রাপ্তিটা প্রায় শূন্য, বরং 'নবোদিত কায়েমী স্বার্থবাদী' রানারা গজিয়েছে, এই যুবকদের হাত অস্ত্রে রমরমা, গণভবন পর্যন্ত লিংক। দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল যে যুবশক্তি, যুদ্ধ শেষে সেই অস্ত্র ও স্পিরিট সমষ্টির স্বার্থে ব্যবহার হয় নি, বরং ব্যক্তি কখনো সমষ্টির চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। একদিকে নাজুক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে লালবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও রক্ষিবাহিনী ইত্যাদির বিভিন্ন বাহিনীর ব্যানারে সুবিধালোভীরা সম্পদবৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় নেমেছে, অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, চোরাচালান, সামজিক বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক সন্ত্রাস, দুর্নীতি জনজীবনকে বিধ্বস্ত ও বিভ্রান্ত করে তোলে– এই দুই বিপরীত পরিস্থিতি সরকারের 'বিচক্ষণতা ও আদর্শগত শক্তির' অভাবে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে ফের জনযুদ্ধের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই বাস্তবতায়, বিবেকতাড়িত মানুষ স্কুল শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধা মানসিক বিকারগ্রস্ত, এবং বৃহত্তর অর্থে পুরো রাষ্ট্রের প্রতীকে পরিণত হয়েছে আব্বাস পাগলা। গল্পে তার যে বিলাপ, আশাভঙ্গের ভয়ানক ছটফটানি তা তার একার ছিল না, বৃহত্তর বাংলাদেশের মুক্তিপাগল প্রত্যেকের। অধিকন্তু আব্বাস পাগলা একজন মুক্তিযোদ্ধা, সুতরাং তাঁর বেদনার জায়গাটা আরো বড়ো রকমের। ফলে ভণ্ড-কায়েমি স্বার্থবাদী দেশপ্রেমিক ও বিশ্বাসঘাতকদের রুখতে তার পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে! আর এইজন্যেই চাঁদাবাজ রানার কাছে একটা স্টেনগানের ব্যাকুল প্রার্থনা:

> মোড়ের উপরে আব্বাস পাগলা ধপাস করে বসে পড়ে। তাকে হতাশ ও উদ্বিগ্ন দেখায়। 'রানায় আউজকাও দিলো না, না? তার গলায় একটু অভিমান, 'আমার প্রবলেম বুঝবার চায় না। তামাম রাইত আমার ঘরের উপরে মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ছে। কাউলকা বেলা দুইটা বাজলে আমারে সিগন্যাল পাঠাইলো, ইস্পেশাল মেসেঞ্জার পাঠাইছিলো, আমার কানের মইদ্যে লাইট মারিলো পরে চোখের উপরে সাউন্ড পাইলাম, হালায় কি চোখা সাউন্ড, চোখের পাতা আমার খালি ফাল পাড়ে লাইক, লাইক, লাইক এ বাম্পিং স্যভর জেট। কি? না রাইত দুইটা বাজলে দুশমুনে পজিশন লইবো;–কোন জায়গায়?–না, কয় চান্দের ঐ সাইডে। ঐ সাইডটার ভিউ দুনিয়া থাইকা ঠিক ক্লিয়ার আসে না। পাহাড় পর্বতই বেশি, মাউনটেনিয়াস জোন। পাহাড়ের মধ্যে গাত উত আছে না?–দুশমুনে হালায় গাতগুলিরে আর্টিলারি বানাইয়া রাখছে।' (মিলির হাতে স্টেনগান/ দুধে ভাতে উৎপাত)

আব্বাস পাগলা নবনির্মিত জাতির বিবেকের প্রতিনিধি। একাত্তর উত্তর অস্থির সময় ও বিশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থার একটি ফটোগ্রাফিক চিত্র 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পে। স্বাধীনতা কার জন্যে–যদি মানুষ আর মানুষই না থাকে! এখানে অর্থ উপার্জনই মুখ্য, নীতি-আদর্শ-মূল্যবোধচেতনা ফাঁকা গুলির মতই অর্থহীন। পিতা আশরাফ আলিও নির্বিকার, বরং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে। জীবনের সব মূল্যবোধ ও সম্ভ্রমকে বিবেকের বাইরে রেখে আশরাফ আলির পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য অভিজাত হবার স্বপ্নবিলাসে মগ্ন। বস্তুত হাইজাক, চুরি, ডাকাতি, লুটপাট, জোরজবরদস্তি ইত্যাদি উপায়ে অর্থ উপার্জনের প্রথম বৈধতা আসে পরিবারের ভিতর থেকেই। 'অর্থাগম হচ্ছে দেখে এদের 'রক্ষণশীল' বা 'রুচিশীল' বাপ-মাও চুপচাপ থাকাটাকে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন। কারণ কোনো কোনো কর্তব্যপরায়ণ পুত্র তাদের উপার্জনের খানিকটা বাড়িতেও ঢালে।'[১] মিলির ভিতরে জেগে ওঠা বিবেকবোধও বেশি দূর এগোয় না। বিবেকের আইডল আব্বাস পাগলা সুস্থ হয়ে ফিরলে রানার স্টেনগান চুরি করে হাতে তুলে দিতে চাইল মিলি– যেন তার উদ্দিষ্ট বিপ্লব ঘটাতে পারে। কিন্তু সুস্থ আব্বাস মাস্টারের অবস্থান এখন এই বিপ্লবের বিপক্ষে। তার কথায়, 'মিলি, আমি না ভালো হইয়া গেছি। তুমি বোঝো না? আমার ব্যারাম ভালো হইয়া গেছে।' অধিকন্তু চোরগোপ্তা পথে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের প্রত্যাশায় সেও রানাদের দলে যোগ দেবার ইচ্ছা পোষণ করে বলেছে, 'রানা ইচ্ছা করলে আমারে প্রভাইড করতে পারে।' বিকারগ্রস্ত আব্বাস পাগল আর কিছু করতে না পারুক, অন্তত সুস্থ মানবিকতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। চাঁদ–নদীর মত তার ভিতরে যে সুন্দরের অপরিমেয় শক্তির উদ্রেক ঘটেছিল, যে শক্তিবলে একটি স্টেনগান হাতে একাই যুদ্ধে নামতে সে দৃঢ় সংকল্প ছিল, সেই শক্তি নিমিষেই হারিয়ে গেল সুস্থ আব্বাস মাস্টারের মস্তিষ্ক থেকে। লুটপাট ও শোষণমূলক সমাজে একমাত্র পাগল হয়ে সুস্থ মানুষ হতে হয়–নিদারুণ অস্তিত্বের সংকটে মানুষ, বিশ্বাস ভেঙে গেছে বালুঘরের মতই। আশাভঙ্গের ট্রাজেডি স্বাধীনতার স্বাদকে তেতো করে তোলে। তবে এই ট্রাজেডি নিয়তি নির্ভর গ্রীক ট্রাজেডি নয়, ব্যক্তির পাপে সৃষ্ট শেক্সপীরিয়ন ট্রাজেডি। মিলির হাতে স্টেনগান তুলে দিয়ে ইলিয়াস মুক্তিকামী জনতাকে নতুন করে প্রতিরোধের প্রেরণা জুগিয়েছেন। 'মিলির মুক্তিযোদ্ধা ভাই ও তার বন্ধুরা যে অস্ত্র তাদের ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করছিল, সেই অস্ত্র সে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাবাহী তুলে দেবার জন্য সাহসী পায়ে এগিয়ে যায়। এ গল্পে মিলির প্রত্যাশাকে যদিও শেষাবধি অপূর্ণ দেখি–তবু তার এই আকাঙ্ক্ষার উষ্ণতাটুকুই নেতিবাচক পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে সুস্থ আশাবাদের দীপ জ্বালিয়ে রাখে।'[১০]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ও যুদ্ধোত্তরকালের বাস্তবতার নির্মোহ চিত্রায়ণ 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্পগ্রন্থের নামগল্পে। "গল্পের পটভূমি ঢাকা। বর্তমান থেকে অতীতে, নব্বই থেকে একাত্তরে ফিরে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, ত্যাগ ও স্বপ্নকে ছুঁয়ে এ গল্প যুদ্ধ পরবর্তী অরাজকতা, হানাহানি, রঙবেরঙের জাতীয়তাবাদী দলের খেয়োখেয়ি, ধর্মীয় মৌলবাদ ও স্বৈরশাসনের উত্থান ও হিংস্র নখর বিস্তার সবই আভাসিত হয় গল্পে। আবার সেই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের অস্ত্যর্থক দিকগুলি, শহীদদের আদর্শ ও আত্মত্যাগ, দেশবাসীর স্বপ্নদেখাকেও যথাপ্রাপ্য মর্যাদায় তুলে ধরেছেন লেখক। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিতকাল পরেই কত দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পুনর্বাসিত ও শক্তিশালী হয়, কীভাবে তারা ডালপালা বিস্তার করে বাংলাদেশের মাটিতে শেকড় প্রোথিত করে বস্তুত সেটাই এ গল্পের উপজীব্য।'[১০]

গল্পটিতে অসাধারণ একটি প্রতীকী ব্যঞ্জনা আছে– যারা একাত্তরে রাজাকার-আলবদর ছিল, তারাই স্বাধীন দেশটিকে পুনরায় পাকিস্তান করতে সংগঠিত হচ্ছে এবং এদের প্রত্যেকের পায়ের পাতা উল্টো দিকে পিছনে ফিরানো। বস্তুত, পরাজিত শক্তির পুনর্বাসন হতে বেশি সময় লাগে নি। মুক্তিযুদ্ধ ও আত্মত্যাগি মুক্তিযোদ্ধা এবং যারা বেঁচে আছেন তারাই হলেন বলির পাঠা ও নিগ্রহের শিকার। পাকশাসনের চব্বিশ বছরের আন্দোলন এবং একাত্তরের নয়মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিষশেকড় চিরদিনের জন্য উপড়ে ফেলা, কিন্তু বাস্তবতা হলো তার বিপরীত, নব্যসৃষ্ট বাংলাদেশে সেই সাম্প্রদায়িকতার

ঘৃণ্য তৎপরতা আরো শক্ত ভিত পেয়ে ক্ষমতাসীন শাসকের আশ্রয়-প্রশ্রয়-লালনের মধ্য দিয়ে। গল্পের রাজাকার নাজির আলির উত্থানের বিপরীতে দেখা যায় নিগ্রহে, অপমানে, অবহেলায় নির্বিচারে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সন্তানদের নামিয়ে দেওয়া হয়েছে ফুটপাতে। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ইমামুদ্দিনের ছেলে বুলেটের অস্থির ও অসুস্থ জীবন। ভিসিআর এর নিষিদ্ধ ছবির টিকেট বিক্রি, বাসের হেলপারি, হোটেল বয়ের চাকুরি ও সেখানে খাবার চুরি অভ্যাস, টিফিন-ক্যারিয়ারে সাহেবদের ভাত পৌঁছে দেওয়া এবং একটু একটু চুরি শেষে টিফিনসহ উধাও, সর্বোপরি গোলমাল হলেই রাস্তায় গাড়ি ভাংচুর ও টায়ার পোড়ানো এবং হরতালের দিন বোমা ছুঁড়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এক মাসের জেলবাস– এইসবই হচ্ছে স্বপ্নকাতর এক শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের জীবনযাপনের চালচিত্র। আর মুক্তিযুদ্ধের প্রাপ্তিযোগ হিসেবে নাজির আলিদের অবস্থান আরো পাকাপোক্ত হয়েছে। আর যেই কারণেই, শহীদ মুক্তিযোদ্ধার ছেলে বুলেটের স্বপ্নরাজ্যে অসংখ্য বাসিন্দা মিছিলের মত জমায়েত হয়- যাদের প্রত্যেকের পায়ের পাতা পিছনে ফিট করা। জমায়েতদের একজনকে বুলেটের চেনা-‘লালচে ফর্সা মুখ দুধের নহরের মতো দাড়ি এবং দুধের ধারায় একটু ঘিয়ে রঙের আলাখেলা’ পরিহিত নাজির আলি। এবং নাজির আলির নেতৃত্বেই পুরো বাহিনী বুলেটের দিকে তেড়ে আসলে সেও ক্ষিপ্ত হয়ে মূত্রত্যাগ করে।

> লোকটির পায়ের জোড়া মেরামত করতে হলে ও গুলো আগে ফেলে দেওয়া দরকার–এই বিবেচনায় বুলেট ওদিকে কী ছুঁড়বে তাই নিয়ে বেশ ভাবনায় পড়ে। সে তার প্যান্টের এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ায়, কিছুই নেই দেখে ভাবনা আরো বাড়ে। এই রকম ভাবতে ভাবতে তার বড্ডো পেচ্ছাব চাপে। হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশনের বা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের বা সরকারের কোন পাবলিক টয়লেট নাই। পেচ্ছাবের বেগ বাড়ে। একরকম বাধ্য হয়েই বুলেট ছাদ থেকে হলুদ প্রস্রাবের ধারা বইয়ে দেয় নিচের দিকে। এরমধ্যেই সে তাগ করেছে গাল থেকে দুধের নহর বইয়ে দেওয়া ঘিয়ে রঙের আলখেল্লাওয়ালা ওল্টানো পায়ের পাতা।
>
> (জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল/ জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল)

স্বাধীনতার শত্রুর শক্তির বিরুদ্ধে এতো ঘৃণা ও প্রতিবাদের নিদর্শন বিরল দৃষ্টান্ত বলা যায়। যে বিষবৃক্ষের শেকড় উপড়ে ফেলার জন্য এতো বিরাট ক্ষতি, সেই বিষবৃক্ষের শেকড় অজান্তে থেকে গেছে। ফলে নতুন করে স্বাধীনতা বিরোধিরা মাথা উঁচাতে থাকে। ফলে একটি স্বপ্ন ও প্রত্যাশার জায়গায় স্থান করে নেয় হতাশা, নৈরাশ্য, নৈরাজ্য, লুটপাট, ক্ষমতা দখলের হিংস্রতা। ইলিয়াসের গল্পের শরীরের ভাষা ও চেতনা প্রমাণ করে, বাহ্যিকভাবে দেশ স্বাধীন হলেও বাস্তবিকপক্ষে এখনও তা রয়ে গেছে অধরাই।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির গরমিলে অতিমাত্রায় হাতাশা আক্রান্ত একদল যুবক দুর্নীতি ও শোষণের সাথে জড়িয়েছিল রাজনীতির ছদ্মাবরণে। আর তাদের আস্ফালন ও দাপুটের শক্তি জুগিয়েছে একশ্রেণির কেন্দ্রিয় নেতা। রাজনৈতিক প্রচার–প্রসারের– আধিপাত্যর জন্যে সেন্ট্রাল পয়েন্টে থাকা অমৃতলালের বাড়ি প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগে একপ্রকার জোর করেই ভাড়া নিতে মরিয়া ফারুক, যার প্রতি নির্দেশ আছে কেন্দ্রিয় নেতা মানিকের। অমৃতলালের পোড়খাওয়া জীবন অনেক কিছুরই সরব স্বাক্ষী। মানিকের ‘আপিম’ গল্পের আপিমখোর হীরেনের মতই অমৃতলাল গাঁজায় নেশাগ্রস্ত হয়ে হ্যালুসিনেশনের মধ্যদিয়ে সব সুখকর অতীতকে দেখে, নিজের বাঁচার প্রেরণা জাগায়। নিজের মতের পক্ষে অটল বর্মের মত দাঁড়াতে পারে এই কারণেই। জনকল্যাণের রাজনীতির নামে ভাড়া নিয়ে একদিন যে বাড়িটা দখলে নিয়ে নিবে এই সত্য ভাল করেই জানা আছে অমৃতলালের। নিয়তির কী নির্মম খেলা, যারা আজ অমৃতলালের উপরে অন্যায় চাপ প্রয়োগ করছে, তাদের এই বনেদি বাড়িতে প্রবেশের অধিকারও ছিল না একদিন। তার ভাষায় ‘চিনুম না ক্যান, বেশি ছটফট করে আসাদুল্লার পোলায়, খইচ্চরা ছ্যামড়াটা। আসাদুল্লার বাপে কতো পইড়া রইছে হেই বারান্দার মইদ্যে, ঘরে ঢুকবার সাহস করছে?’ রাবণের লঙ্কাপুরী আগলে রাখার মত

অমৃতলাল তার এই পিতৃভিটা আঁকড়ে আছে। কিন্তু বৈরিতার মধ্যে নিয়ত বসবাসের কারণে সে নিজে এবং পুত্র সমরজিত মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ ও ক্লান্ত। স্বপ্নকাতর পিতা-পুত্রের বসবাস খোঁয়ারির মধ্যে জীবনযাপন অস্বাভাবিক। 'একটি বনেদি হিন্দু পরিবার বংশ পরম্পরায় যে বিশাল জীবনার্থকে লালন করে, যে স্বপ্নের প্রাসাদ নির্মাণ করে, যে জলমাটিহাওয়ায় বেড়ে ওঠে সেখানে এক ভ্রান্ত রাজনীতি ঝড়ে তৃণখণ্ডের মতো উড়ে যায় মানুষ। ধর্মীয় আবরণ এদের প্রধান শত্রু। সে কারণেই এ বিশাল বনেদি প্রাসাদে সমরজিত একা, বোতলের পর বোতল টেনেও নিস্তার নেই।'[১] সংখ্যালঘু এই বনেদি পরিবারের পরিণতি এতোদূর হলে সামগ্রিক দেশের নৈরাজ্যের প্রেক্ষাপট কী পরিমাণে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল তা চিন্তারও বাইরে।

যেখানে একটা শোষণমূলক সমাজকাঠামো থাকে, সেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ দুর্বল জনগোষ্ঠির পরিণতি স্বভাবতই ভয়ানক। সেখানে যদি যোগ হয় ধর্ম তবে তো বলাই বাহুল্য। সাতচল্লিশের দেশভাগেরকালে বাংলাদেশের হিন্দুজনগোষ্ঠীর বিরাট অংশই সীমানা অতিক্রম করে ইন্ডিয়া চলে গিয়েছে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে। যারা থেকেছিলেন, তাদেরও একটা বড়ো অংশকে চলে যেতে হয়েছে একাত্তরে। ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে স্বভাবতই ভয়ানক হবে ভিন্নধর্মের সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষের নিয়তি–পরিণতি। ইলিয়াসের 'খোঁয়ারি' গল্পের অমৃতলাল ও তার চল্লিশ ছুঁইছুঁই ছেলে সমরজিতের আত্মবিলাপ ও একাকিত্বই এই সত্য প্রমাণ করে। নেশাগ্রস্ত অমৃতলাল এবং তার বাড়িতে আগত সমরজিতের তিন বন্ধুর হ্যালুসিনেশনের মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে স্বাধীনোত্তর সময়ের নির্মম কতগুলো ক্ষতচিহ্ন। 'স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার যে প্রবল উন্মাদনা বা জাতীয়তাবাদি নেশা মুক্তিযুদ্ধ পর্বে বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে দেখা গিয়েছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরই সেই নেশা কেটে গিয়ে অদ্ভুত এক খোঁয়ারিতে পরিণত হয়।'[১১] মোটের উপরে স্বাধীনতাটাই হয়ে পড়েছে একশ্রেণির কপট রাজনৈতিক নেতার লুটের হাতিয়ার। সদ্যস্বাধীন দেশে একটি বনেদি সংখ্যালঘু পরিবারকে যেভাবে মানসিক ও বাহ্যিক চাপ প্রয়োগ করেছে রাজনৈতিক নেতা ফারুক ও মানিকেরা, তখন স্বাধীনতার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। পাকিস্তানিরা চলে গেল, কিন্তু শোষণ আরো বাড়ল। অমৃতলালের মত বহুদর্শি মানুষের পক্ষে তা মানা ছিল অসম্ভব। দেশকে ভালবেসে, বাস্তুভিটা আগলে থেকে যাওয়া অমৃতলালের আত্মীয়-পরিজনের আর কেউ নেই এখানে। বিশাল আয়তনের পুরাতন বাড়ি, যা যুদ্ধের নয় মাস তছনছ করেছে দুর্বৃত্তরা। একান্নবর্তী বনেদি পরিবারের এই বিস্তৃত পরিসরের বাড়িটি একসময় ছিল জনমানুষের কোলাহলে মুখর। বর্তমানে ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। নেশাগ্রস্ত দুই পিতা-পুত্রের বসবাসের বাইরেও পরিত্যক্ত ঘর অসংখ্য। আমিষ রান্নার ঘর, নিরামিষ রান্নার ঘর, ঠাকুরের ভোগের জন্য রান্নাঘর এবং আলাদা জলের জন্য ঘর এবং সেই ঘরে কুয়ো ইত্যাদি এসব এখন মূল্যহীন, উপহাসতুল্য। আর কি পরিমাণ পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য তার প্রমাণ-জাফরকে প্রসাবের জন্য সমরজিতের যে জায়গাটি দেখিয়ে দিয়েছে তা ঠাকুরের ভোগের রান্না ঘর। সেই ঘরে ঠাকুরের পবিত্রজলের কুয়োর টিনের উপরে প্রস্রাব করেছে জাফর। ভয়ানক এক মাতম আত্মাবিচ্ছেদের শিকার মানুষগুলোর ভিতরে; একই পরিবারের দুই অংশ দুই দেশে, ফলে দুই জনপদের জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র পরস্পরের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। যার কোন সমাপ্তি নেই। মাটি ভাগ হলেও আকাশ, প্রকৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য সবকিছুই থেকে গেছে অভিন্ন। 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পে তিন প্রজন্মের তিন জনের উপস্থিতি– যাদের অনুভূতি, জীবন বীক্ষা নিয়ে ইলিয়াস রীতিমত আবিষ্কারের নেশায় মত্ত। বিশেষত, এইক্ষেত্রে দেশত্যাগী প্রদীপই তাঁর তুরুপের তাস। বাস্তবতা পিসীমাদের প্রতিকূলে। প্রমাণ হিসেবে গল্পে দেখানো হয়েছে– উঠতি বয়সের কিছু বখাটের উৎপাতে কিশোরী মেয়ে স্কুলে যেতে পারছে না, তারাই বিভিন্ন ঠুনকো অজুহাতে চাঁদার নামে টাকা ছিনিয়ে নিচ্ছে। ননীর ছেলে অমিতের বিছানায় অসংখ্য পর্নোছবি, যেখানে 'একেকজোড়া পুরুষ ও মহিলা বেশ জটিল ও অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে যৌন সঙ্গমে' নিয়োজিত। এই বাস্তবতায়, ইলিয়াস দুই হাতে ধরতে চেয়েছেন দুই দেশের অভিন্ন একটি জীবনকে। একহাতে তাঁর

ননী গোপাল ও তার পোড় খাওয়া পরিবার, অন্য হাতে শ্রীকান্ত ধাঁচের ভবঘুরে প্রদীপ, আর বুক দিয়ে আগলে ধরেছেন মাসিমাকে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর প্রত্যেকটি গল্পে-ই জীবনকে ও সমাজকে নিয়ে নতুন এক নিরীক্ষায় মেতে উঠেছিলেন, যা বাংলাসাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন, এবং বাংলা কথাশিল্পের ঘরানায় তৈরি করেছে স্বতন্ত্র এক সমীকরণ। কুকুর-মানুষের মৈথুন দৃশ্য, ময়দানে নিয়ে গিয়ে মাগি লাগানো, নিজের যৌন অতৃপ্তির জন্য খিস্তি-খেউড় এবং নিজের সন্তানের অনৈতিক সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেওয়া, নিজের সন্তানের মৃত্যু বা অমঙ্গল কামানা, পিতার দ্বৈধ সত্তা ও মৃত পিতার উপর পুত্রের নির্মম প্রতিশোধ, আত্মজার হত্যাকারীকে প্রশ্রয় দেওয়া ও মৃত্যুর কামড় দিয়ে পুঁজিবাদকে আঁকড়ে ধরা, কুকুরের বাউয়েলস ক্লিয়ারের সুখ মানুষের শরীরে চালিত হওয়া, সংসারে নিঃসঙ্গ ও অবাঞ্ছিত হয়ে কৃতপুণ্যের বিনিময়ে মৃত্যু কামনা ও শেষে বেঁচে থাকার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা, ছিন্নমূলের শেষ আশ্রয় সরকারি বাঁধ থেকে উচ্ছেদের প্রচেষ্টা, মধ্যবিত্তের কপটতা, শঠতা, ছল-চাতুরি, বামপন্থি রাজনীতির নামে ভণ্ডামি ও স্বার্থপরতা, একমুঠো দুধভাত নিজের ও সন্তানের মুখে তুলে দেবার জন্যে মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের তীব্র আকুতি এবং শেষে সাধ অপূর্ণ থেকে যাওয়া, প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জেগে ওঠা, সংখ্যালঘু হিন্দুজনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতন-শোষণ, ঠাকুর ঘরে মূত্রত্যাগ, সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ে সাম্প্রদায়িক সংঘাত, পরাজিত শক্তির পুনরুত্থান, নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাস্তুহারা মানুষের কর্ম সংস্থান ও আবাসনের সংকট, যুদ্ধজয়ী সৈনিক ও যোদ্ধাদের সঠিক দিকনির্দেশনার অভাব, নয় মাসের লুটপাটের সুযোগে একশ্রেণির হাতে কাঁচা সম্পদ, সুশাসনের অভাব, রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া, ক্ষমতাসীনদের অদূরদর্শিতার কারণে যুদ্ধোত্তর নাজুক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা ইত্যাদি বেশ কয়েকটি কার্যকারণ মিলে একাত্তর পরবর্তী সংক্ষুব্ধ সময়ের বাংলাদেশই ইলিয়াসের গল্পের প্রধান প্রসঙ্গ। বিষয়বৈচিত্র্যের ফর্দ দেখেই বলা যায়, মানবিকতা বিলাসি ন্যাকা মুখোশধারী বুদ্ধিজীবী বা সমাজপতিদের কিংবা রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের অথবা ধর্মের পোশাক পরিহিত সনাতন মানুষের চিন্তায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নতুন সমীকরণ দাঁড় করিয়েছেন।

তথ্যসূচি:

১. ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনের উদ্বোধীন অনুষ্ঠানে (২২মার্চ) সভাপতির ভাষণে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ধর্মের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতবর্ষ খণ্ড করার প্রস্তাব করেন, যা ইতিহাসে 'দ্বিজাতি-তত্ত্ব' হিসেবে খ্যাত। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই সাতচল্লিশের দেশভাগ হয়েছে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ড. মো. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস: ১৯০৫-১৯৪৭* (ঢাকা : তাম্রলিপি,২০০৮), পৃ. ২৪০-৪১

২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *আমি ও আমার সময়, রচনাসমগ্র ৩* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, প্রপ্র ২০০৪, দ্বিতীয় মুদ্রণ২০০৯), পৃ. ২৮৭

৩. গোলাম মুরশিদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর: একটি নির্দলীয় ইতিহাস* (ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন,২০১০) পৃ. ২২০

৪. আখতারুজ্জামন ইলিয়াস, পৃ. ২৮৮

৫. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, পৃ. ২৮৬

৬. হাসান আজিজুল হক, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ, রচনাসংগ্রহ-৪* (ঢাকা:সাহিত্যিকা, ২০০৩) পৃ. ১০৪

৭. হাসান আজিজুল হক, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষের অমৃতফল, রচনাসংগ্রহ-৫* (ঢাকা: জাতীয়সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৩) পৃ. ২০৫

৮. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে রাগী চোখের স্বপ্ন রচনাসমগ্র ৩,* পৃ. ৫৪

৯. চঞ্চলকুমার বোস, *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯) পৃ. ৩০০

১০. সরদার অব্দুস সাত্তার, *কথাসাহিত্যের আঙিনায় দাঁড়িয়ে* (ঢাকা: সুচয়নী পাবলিসার্স, ২০১০) পৃ. ২৩৮

১১. সরিফা সালোয়া ডিনা, *হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প* '(অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, বাংলাবিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, নভেম্বর২০০৩) পৃ. ৩৮৭

১২. বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত তৈরি হয়েছে তাতো চুরি-চামারি-সন্ত্রাস-দুর্নীতি এসব করেই বিত্তবৈভব গড়ে তুলেছে।...এদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা, সম্মান থাকা, কোনো নরম মনোভাব থাকা-কোনো সৎ লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়। কাজেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতো অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে এইসব সহ্য করা তো সম্ভব না। এছাড়া এরা মিথ্যাবাদী। এই মিথ্যাবাদী মধ্যবিত্তকে কি ইলিয়াস ঃড়ষবৎধঃব করতে পারে? বদরুদ্দীন উমরের সাক্ষাৎকার, বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: আলাউদ্দিন মণ্ডল, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: নির্মাণে বিনির্মাণে* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯) পৃ. ৫৫৪
১৩. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, পৃ. ৫৮
১৪. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, পৃ. ২৯১
১৫. হাসান আজিজুল হক, 'সাহিত্যের নতুন সীমানা', *রচনা সমগ্র–৫*, পৃ. ১১৯
১৬. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, পৃ. ২৫৩
১৭. চঞ্চলকুমার বোস, পৃ. ২৯০
১৮. শহীদ ইকবাল, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মানুষ ও কথাশিল্প* (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০০৯), পৃ.৭১
১৯. সরিফা সালোয়া ডিনা, পৃ. ৩৩৮
২০. আলাউদ্দিন মণ্ডল, পৃ. ২২৫
২১. হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ, পৃ. ১০৫
২২. আলাউদ্দিন মণ্ডল, পৃ. ২৪১
২৩. ইলিয়াসের সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে সম্পূর্ণ গল্প 'যোগাযোগ'। তাঁর লেখায় যতরকমের খুঁত আমি ধরেছি তার প্রায় একটাও আমি এই গল্পটি সম্পর্কে উচ্চারণ করবো না। এই গল্পে কোন ছবিই অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় নয়, লক্ষ্য সম্পর্কে কোথাও দ্বিধা নেই, ভিতরের সূত্রগুলি ন্যায়বদ্ধ। হাসান আজিজুল হক, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ*, পৃ. ১১০
২৪. শহীদ ইকবাল, পৃ. ৮৯
২৫. আলাউদ্দিন মণ্ডল, পৃ. ২৬৩
২৬. শহীদ ইকবাল, পৃ. ১৩
২৭. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, পৃ. ১৬৪
২৮. শহীদ ইকবাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭
২৯. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, পৃ. ২৪
৩০. হাসান আজিজুল হক , দুষ্পাঠ্য কররেখা: *আমাদের কথাসাহিত্য*, রচনা সংগ্রহ–৪, পৃ. ৩১
৩১. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, পৃ. ১৭
৩২. সরদার আবদুস সাত্তার, পৃ. ২৪৬
৩৩. আলাউদ্দিন মণ্ডল, পৃ. ৪৫৬-৫৭
৩৪. শহীদ ইকবাল, পৃ. ১৫৩
৩৫. আলাউদ্দিন মণ্ডল, পৃ. ২৫১

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকসাহিত্য

ড. মাযহারুল ইসলাম তরু

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী জাতি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে রাজবংশী এক উল্লেখযোগ্য জনজাতি। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, রাজবংশীরা বহুকাল যাবত এদেশে বসবাস করে আসছে এবং তাদের রয়েছে সুপ্রাচীন ইতিহাস। ক্ষত্রিয়ত্ব আন্দোলনের জন্য প্রসিদ্ধ রাজবংশীদের আরো রয়েছে গৌরব করার মতো সম্পদ লোকসাহিত্য। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকসাহিত্যের একটি পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করব। তবে তারপূর্বে সংক্ষেপে রাজবংশীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এবং এদেশে তাদের আগমন ও বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয়: রাজবংশীদের উৎপত্তি বিষয়ে Dr. Buchanan Hamilton, Sir Herbert Risley, B.H. Hudgson, E.T. Dalton, W.W. Hunter, G.A. Grierson প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও ইংরেজ সিভিলিয়ান পণ্ডিত মতামত উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের মতামত থেকে জানা যায় যে, রাজবংশীরা দৈহিক গঠনের দিক থেকে আদি মঙ্গোলয়েড (Proto Mongoloid) শ্রেণিভুক্ত। তবে তাদের মঙ্গোলয়েড রক্তের সঙ্গে বেশ কিছুটা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে বলেও মতামত পাওয়া যায়। তাঁদের মতে, কোচ ও পলিয়া জাতিগোষ্ঠীর রক্তমিশ্রণজাত সম্প্রদায় হচ্ছে রাজবংশী। আর ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতামত থেকে জানা যায় যে, তারা বৃহত্তর বোড়ো (Bodo) ভাষাগোষ্ঠীর একটি সম্প্রদায়। বর্তমানে রাজবংশীরা বোড়ো ভাষা হারিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বললেও তাদের ভাষাকে পণ্ডিতগণ কামরূপী ভাষা বা রাজবংশী ভাষা বলে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান রাজবংশী ভাষাতে এখনও বোড়ো ভাষার সংমিশ্রণ, বোড়ো ভাষার উৎসজাত শব্দাবলী ও বোড়ো ভাষার অপভ্রংশ শব্দ পরিলক্ষিত হয়।

রাজবংশী জাতিসত্তার বিকাশ: ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত যেসব নৃতাত্ত্বিক গবেষক, ইংরেজ সিভিলিয়ান, চিকিৎসক, ঐতিহাসিক ও নৃবিজ্ঞানী রাজবংশীদের ওপর গবেষণা ও মন্তব্য করেছেন তাঁরা সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কোচ ও পলিয়া জাতিগোষ্ঠীর রক্তমিশ্রণজাত সম্প্রদায়ই হচ্ছে রাজবংশী, যারা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিতে আন্দোলন করেছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। এই রাজবংশীরাই পরবর্তীকালে নিজেদের 'ক্ষত্রিয় রাজবংশী' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। গবেষকদের গবেষণালব্ধ মন্তব্য থেকে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কীভাবে, কোন সময়কালে এবং কোন প্রেক্ষাপটে কোচ-পলিয়ারা রাজবংশী নামে নতুন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে? এ প্রসঙ্গে খুব সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হল।

E.A Gait এর মতে, কোচ রাজবংশের পিতৃপুরুষ হলেন হরিয়া মণ্ডল। তিনি ছিলেন গোয়ালপাড়া জেলার চিকনা গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর পুত্র বিশ্বসিংহ নিজের শৌর্য ও চাতুর্যগুণে ভুঁইয়া দলপতিদের পরাজিত করে পশ্চিমে করতোয়া থেকে পূর্বে বড়নদী পর্যন্ত নিজ রাজত্ব বিস্তার করেন। তিনি পরবর্তীকালে তাঁর রাজধানী চিকনা গ্রাম থেকে সরিয়ে কুচবিহারে আনেন। বিশ্বসিংহের পর তাঁর পুত্র নরনারায়ণ কুচবিহারের সিংহাসন লাভ করেন এবং পিতার অনুসরণে শৈবধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। তিনি হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির উত্থানকল্পে ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে অহমদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। কিন্তু পিচল গড়ের যুদ্ধে একদল ব্রাহ্মণ

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তিনি ভীষণভাবে পরাজিত হন। নরনারায়ণ আবার ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে অহমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে অহমরাজ তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন। ফলে তেজপুর কোচরাজ নরনারায়ণের হস্তগত হয়। তাঁর রাজত্বকালে রাজত্বের উত্তরার্ধে উপজাতীয় ধর্মাচার-অনুষ্ঠান ছিল প্রধান, অপরদিকে দক্ষিণার্ধে হিন্দুধর্মীয় পুজা ও আচার এতই প্রসরিত ছিল যে, সেখানে ব্রাহ্মণকে পুরোহিত পদে বরণ করা হয়েছিল। কিন্তু রাজশক্তির প্রশ্রয় এবং প্রবল সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও কোচ রাজত্বের প্রথমার্ধে উপজাতীয় আদিবাসীগণের হিন্দুকরণ (Hinduization) প্রক্রিয়া মাত্র অর্ধপথে অগ্রসর হয়েছিল। অর্থাৎ রংপুর জেলার কোচদের মধ্যে উপজাতীয় বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি ব্যাপকভাবে ঘটেছিল। এ অঞ্চলের অনেক কোচই শূকরের মাংস খাওয়া, মদ্যপানের অভ্যাস ও বিধবার পুনর্বিবাহের প্রথা বর্জন করেন। এদের মধ্যে যারা প্রায় সম্পূর্ণভাবে হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থা ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা কোচদের সঙ্গে সমাজিক সম্পর্ক বজায় না রেখে নিজেদের রাজবংশী হিসেবে পরিচয় দিয়ে স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশে আগমনের ইতিহাস: কোচ-রাজবংশীদের প্রাচীন বসতি ছিল তিব্বত ও ব্রহ্মদেশীয় পাহাড়ি ও মালভূমি এলাকায়। পরবর্তীকালে তারা আসাম থেকে বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারী প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, রাজবংশীরা এসব এলাকা ছাড়াও মালদহ, দার্জিলিং, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোর ও পাবনাতে ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার (বৃহত্তর ময়মনসিংহ) থেকে জানা যায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমাংশে বসবাসরত রাজবংশীরা ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে রংপুরের দুর্ভিক্ষের কারণে এখানে অভিবাসন ঘটায়। সমসাময়িক কালেই যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও বৃহত্তর ঢাকার মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং পাবনা এলাকায় বসতি স্থাপন করে বলে ধরে নেয়া যায়।

বাংলাদেশে রাজবংশীদের বর্তমান অবস্থা ঃ বাংলাদেশে রাজবংশীরা উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় অধিক পরিমাণে বসবাস করেন। উত্তরাঞ্চলের যে সমস্ত জেলাতে রাজবংশীরা বসবাস করেন সে সব জেলা হচ্ছে-রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পাবনা। এছাড়াও দেশের অন্যান্য জেলাগুলোর মধ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, যশোর, মাগুরা, সাতক্ষীরা ও খুলনায় রাজবংশীদের বসবাস রয়েছে। তাছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে দেশের অন্যান্য জেলাগুলোতেও কিছু কিছু রাজবংশী পরিবার বসবাস করে আসছে।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমান বাংলাদেশ সীমানা এলাকায় তখন এদের বসবাস ছিল ৫,১৫,৩১৪। ১৯২১ ও ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা অঞ্চলে এদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৭,২৭,১১১ এবং ১৮,০৬,৩৯০। ১৯৫১ ও ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারীতে রাজবংশীদের হিন্দু হিসেবে গণনা করায় এদের প্রকৃত সংখ্যা পাওয়া যায় না। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারীতে রাজবংশীদের আলাদাভাবে গণনা করা হলেও অল্পশিক্ষিত, অসচেতন গণনাকারীদের গণনা ও রাজবংশীরা হিন্দু ধর্মবলম্বী হওয়ায় আলাদাভাবে শুধুমাত্র যশোর, টাংগাইল ও জয়পুরহাটে ৭,৫৫৬ জনকে রাজবংশী হিসেবে গণনা করা হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ সীমানাঞ্চলে রংপুর ও দিনাজপুরে রাজবংশীদের সংখ্যা সর্বাধিক হওয়া সত্ত্বেও রংপুর ও দিনাজপুরে রাজবংশীদের উপজাতি হিসেবে গণনা করা হয় নি। তাছাড়া ঢাকা, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, খুলনা ও কুষ্টিয়া জেলাতে প্রায় ২০,০০০-৩০,০০০জন রাজবংশী বসবাস করে।

তাদের সংখ্যাও ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় নি। এসব কারণে বর্তমানে কত সংখ্যক রাজবংশী বাংলাদেশে বসবাস করেন তার সঠিক পরিসংখ্যান দেয়া সম্ভব নয়।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী রাজবংশীরা ছিল একটি স্বতন্ত্র ধর্মমতে বিশ্বাসী। নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, রাজবংশীরা যোড়শ শতাব্দীর পর থেকে যখন একটু একটু করে হিন্দুধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে তখন থেকেই তাদের সমাজের মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে, তবে ধীর গতিতে। সেই সময় থেকেই বলা যেতে পারে তাদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিকতা থেকে পিতৃতান্ত্রিকতায় প্রবেশ করে ও সমাজ ব্যবস্থায় নারীর চেয়ে পুরুষের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে বেশ কিছু সংখ্যক কোচ রাজবংশী (যারা রাজা নরনারায়ণের অনুসারী) তাদের পূর্বধর্ম ত্যাগ করে হিন্দুদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে রাজবংশীরা তাদের ভাষার বৈচিত্র্যকে ধরে রাখতে পারে নি। মূলভাষা হারিয়ে ফেলে তারা কালক্রমে কামরূপী বাংলা গ্রহণ করেছিল। তবে রাজবংশী সম্প্রদায়ের সমাজ ও সংস্কৃতি অনুসন্ধান করলে এদের ভাষার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। এই বৈশিষ্ট্যটি পাওয়া যায় রংপুর, দিনাজপুর, কুচবিহার ও আসাম এলাকায়। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায় বিশেষ করে যশোর, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুরে এই বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

রাজবংশীরা চাকমাদের মতো বিকৃত বাংলায় কথা বলে। তাদের সৃষ্ট লোকসাহিত্যের ভাষাও অনুরূপ। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণ করতে এদেশে বসবাসরত রাজবংশীরা তা বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করে রাখে। রাজবংশীদের লোকসাহিত্যের আলোচনায় একথা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। এবারে আসা যাক রাজবংশীদের বর্ণাঢ্য লোকসাহিত্যের আলোচনায়।

লোকসাহিত্য মানবজাতির সংস্কৃতির একটি মূল্যবান উপাদান। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির ইতিহাস এবং সংস্কৃতির বিকাশে লোকসাহিত্যের অবদান রয়েছে। যে কোন জাতির স্মৃতি-সম্ভার পরীক্ষা করলেই আমরা অনেক উপাখ্যান, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন এবং সঙ্গীতের সন্ধান পাবো। তাই লোকসাহিত্যকে অস্বীকার করে কোন জাতির সংস্কৃতিতে বিশ্লেষণ করা চলে না। লোকসাহিত্য স্বতঃস্ফূর্ত ও কৃত্রিমতা বর্জিত। বাংলাদেশ লোকসাহিত্যে সমৃদ্ধ একটি দেশ। রাজবংশী এদেশের একটি উল্লেখযোগ্য জনজাতি। সংখ্যায় অল্প হলেও এজাতি লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানে ঋদ্ধ। আমার রাজবংশী সমাজের লোকসাহিত্যকে নিম্নলিখিত ৮টি শাখায় বিভক্ত করে আলোচনার প্রয়াস পাবো-

১. লোকসঙ্গীত (Folk Songs)
২. লোকনৃত্য (Folk Dance)
৩. লোকনাট্য (Folk Drama)
৪. লোককাহিনী (Folk Tales)
৫. ছড়া (Rhymes)
৬. প্রবাদ (Proverbs)
৭. ধাঁধা (Riddles)
৮. লোকসংস্কার (Folk Superstitian)

লোকসঙ্গীত

লোকসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত জীবন্ত শাখা হচ্ছে লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। তবে ভাব, চিত্র, কাহিনী অবলম্বনে ছন্দময় সুরাশ্রিত রচনাকে লোকসঙ্গীত বলা যেতে পারে। জর্জ হারজগ (Gearge Herzog) বলেন, "Folksongs are best defined as songs which are current in the repertory of a folk group". অন্য একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, it is oral circulation that the best general criterion of what is folksong. ড. ওয়াকিল আহমদ-এর মতে সংজ্ঞাগুলো স্পষ্ট ও অর্থবাহী নয়। তাঁর মতে, লোকসমাজে পুরুষাণুক্রমে প্রচলিত ও সুর সংযোগে প্রচারিত রচনাই লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'যাহা একটিমাত্র ভাব অবলম্বন করিয়া গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোকসমাজ কর্তৃক মৌখিক প্রচারিত হয় তাহাকেই লোকগীতি বলে।'

লোকসঙ্গীত অপেক্ষা জনপ্রিয় সঙ্গীত বাংলা সাহিত্যেই শুধু নয়, বিশ্বসাহিত্যেও নেই। কারণ লোকসাহিত্যের সঙ্গীতে আছে গণমনের অকপট অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তির আবেদন অত্যন্ত গভীর ও হৃদয়গ্রাহী। লোকসঙ্গীতে আছে সরল স্বাভাবিক জীবনের মনোরম আলেখ্য আদর-সোহাগের অনুপম মাধুর্য। Folklore এর সকল বিষয়ের মতো লোকগীতিও মৌখিক সাহিত্য এবং সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। এর লিখিত কোন রূপ নেই। পল্লীবাসীর মুখে মুখেই এর রচনা, মুখেই প্রচার ও কেবলমাত্র তাদের স্মৃতির মধ্যেই এর অবস্থান। অনুভূতি এদের জনক।

রাজবংশীদের সঙ্গীতকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। (ক) ধর্মীয় ও যাদুপ্রভাবজাত সঙ্গীত এবং (খ) ধর্মনিরপেক্ষ সঙ্গীত।

ক) ধর্মীয় ও যাদুপ্রভাবজাত সঙ্গীত

১. যাদুপ্রভাবজাত প্রার্থনামূলক সঙ্গীত: লৌকিক দেবতার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের পশুপ্রাণীর আক্রমণ, জরাব্যাধি, যেমন- বসন্ত, কলেরা প্রভৃতির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রার্থনামূলক সঙ্গীত গাওয়া হয়। বাঘাই সিরনি, বনবিবির, হুঁদুমার গান, হ্যাঁচড়া পূজার গান, জাগগান, সোনারায়, গোরক্ষনাথের গান, মনসার, গান, মেছেনি-তিস্তা বুড়ির গান প্রভৃতি যাদুভাবজাত প্রার্থনমূলক সঙ্গীত।

২. **ধর্মাচারমূলক সঙ্গীত:** রাজবংশীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে, গ্রাম মাঙ্গলিক পূজা-উপলক্ষে, পূজার থানের সম্মুখে ও সামাজিক মঙ্গল কামনায় গৃহে গৃহে এই সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। যেমন- চৈতেদেল উপলক্ষে চড়ক পূজার গান, ত্রিনাথের গান, ভাবগান, কীর্তন গান ইত্যাদি ধর্মচারমূলক সঙ্গীতে যাদুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

৩. **কৃষিব্রতমূলক সঙ্গীত:** কৃষিজ ফসল পোকা-মাকড়ের হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এই সঙ্গীত গাওয়া হয়। যেমন- কার্তিক পূজার বা কাতি পূজার গান, ষাট পূজার গান, হাট ঘুরানীর গান ইত্যাদি কৃষিব্রতমূলক সঙ্গীত।

খ) ধর্মনিরপেক্ষ সঙ্গীত

১. কর্মউদ্দীপনামূলক সঙ্গীত: কর্মে উদ্দীপনা ও প্রেরণা যোগানোর উদ্দেশ্যে মাঠে ঘাটে এই গান গাওয়া হয়। এই গানগুলো অবশ্য গ্রামীণ গানের আসরেও গাওয়া হয়। যেমন- ধুয়ো গান।

২. প্রেমমূলক সঙ্গীত: সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রেমজ অনুভূতি থেকে এসব গান গাওয়া হয়। হৃদয়ের বিরহ, বিরাগ, মান-অভিান, গোপন-অভিমান প্রভৃতির উদ্দেশ্যে এসব গান সৃষ্টি হয়েছে, যেমন- ভাওয়াইয়া, চটকা, ক্ষীরোল ইত্যাদি।

৩. আচার-সংস্কারমূলক পারিবারিক সঙ্গীত: পারিবারিক জীবনে রাজবংশীরা বিভিন্ন ধরনের আচার-উৎসবের উদ্দেশ্যে এই সঙ্গীতগুলো গেয়ে থাকে, যেমন- সাধভক্ষণ, বিবাহসঙ্গীত, রজঃসংক্রান্তির গান, অন্নপ্রাশনের গান প্রভৃতি।

যাদু প্রভাবজাত প্রার্থনামূলক সঙ্গীত

হুঁদুম দেও-এর গান: রাজবংশী সমাজে যে সঙ্গীত এখনো আদিম ঐতিহ্যবাহী হিসেবে প্রচলিত রয়েছে, সেটি হচ্ছে হুঁদুম দেওএর উদ্দেশ্যে নৃত্যগীত। হুঁদুম শব্দটি তৎসম শব্দ 'উদক' এর অপভ্রংশ। উদক শব্দের অর্থ বৃষ্টি। আর দেবতার অপভ্রংশ হচ্ছে দেও। হুঁদুম দেও অর্থাৎ বৃষ্টির দেবতা। চৈত্র-বৈশাখ মাসে খরা-অনাবৃষ্টিতে চারিদিক যখন খাঁ খাঁ করে তখন বৃষ্টির জন্য দেবতাকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে রাজবংশী সমাজের মেয়েরা একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত গীতগুলোই স্থানীয়ভাবে হুঁদুম দেও-এর গীত নামে পরিচিত। রাজবংশীদের বিশ্বাস হুঁদুম দেও নগ্নতাকে ভয় করে তাই নগ্ন হয়ে নৃত্য করলে বৃষ্টির দেবতা হুঁদুম বৃষ্টি বর্ষণ করে ক্ষেতের ফসল সবুজ করে তুলবে। তাই মেয়েরা নগ্ন হয়ে নৃত্য ও গীতে অংশগহণ করে। হুঁদুম দেও-এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত গানগুলোর ভাষা অশ্লীল। নিম্নে দুইটি গানের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হলো।

১. হুদং দেওরে হুদং দেও / হাগি আসছি পানি দেও
হামার দেশোতে নাই পানি / হাগা টিকায় বারাবানি
হুদং দেওরে হুদং দেও
তোমার দেশোতে নাই পানি
হাগা টিকায় বারাবানি
হুদং দেওরে হুদং দেও
হাগি আসছি পানি দেও
হুদং দেও-এর সাত ভাই
কারো প্যাটোত পানি নাই
এক ভাইয়ের আছে পানি
তারে ধরে টানা টানি।

২. আয়রে দেওয়া গর্জি
ধান চাল থাক ভিজি
আয়রে দেওয়া শো শেয়া
মাং নিয়া থাক ভাসেরা
আয়রে দেওয়া ডাকিয়া
ধান চাল যাক ভাসিয়া
আয়রে দেওয়া ডাকিয়া
দই চিড়া দেং মাখিয়া।

প্রেমমূলক সঙ্গীত

ভাওয়াইয়া: মূলত বিরহ-বিচ্ছেদের গান। পল্লীর যুবতী নারীর প্রেমার্তি, মিলন-ব্যাকুলতা ও বিচ্ছেদ বেদনা ভাওয়াইয়া গানের উপজীব্য। ভাওয়াইয়া গানের কেন্দ্রীয় ভাব নারীর প্রেম,

সে কুমারী কন্যা হোক, কিংবা যুবতী বধূর পরকীয়া প্রেমই হোক। এসব গান কোনো না কোনো পুরুষকে সম্বোধন করে নারীর আর্তি, হৃদয়ের আকুলতা, বেদনা, নৈরাশ্য প্রকাশিত হয়। মাহুত, মৈষাল, চ্যাংড়া, নাইয়া, বৈদ, সাধু, বাউদিয়া ইত্যাদি শ্রেণীর পুরুষকে সম্বোধন করে গানগুলো সৃষ্টি হয়েছে। রাজবংশীদের এই ভাওয়াইয়া গান শুধু উত্তরবঙ্গের নয় সারা বাংলাকে প্লাবিত করেছে। গানগুলোতে কোন পৌরাণিক চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। কালা-কানাই নামের যে চরিত্র পাওয়া যায়, সে কানাই ব্রজের কৃষ্ণ নন, পল্লীর নামহীন কোনো যুবক।

ভাওয়াইয়া গানের বহু স্থানীয় নাম আছে। যেমন মাহুতের গান, মৈষাল বন্ধুর গান, গাড়ীয়াল বন্ধুর গান, কানাইর গান, পাথারিয়া গান, দোতরার গান ইত্যাদি। তাছাড়া ভাওয়াইয়া বিশেষজ্ঞগণ এ গানকে চিতন ভাওয়াইয়া, ক্ষীরোল ভাওয়াইয়া, দরিয়া ও দীঘলনাসা ভাওয়াইয়া, মৈষালী ভাওয়াইয়া প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। দৃষ্টান্ত-

গান-১

ও বাপই নিঝালু
হওয়া বিয়াওটা অল্পতে তুই আউলিয়া দিলু।।
ও মুই তখনে কইচোং কথাগুলাত না দিলু তুই কান
ঘন পাকে ঘটক বেজার করলু অপমান
এ সুন্দর কইয়াটাক যে তুই হাতে হাতে হারালু।।
উচিত কতাত দোস্ত বেজার এত করি কনু
তোর পাচোত কতা কয়া মুইও দোষী হনু
এলা কেমন হইল বাপ দাদার নাম নিজ হাতে ডুবালু।।
ধার হাওলাতে পড়শি বেজার না দেখে তোর ভিতি
সাগাই বেজার চুচরা মাছোত্ করে কাতি কুতি
রস গেল তোর বয়স গেল বিয়াও করির না পালু।

গান-২

ও মোর হইচেরে জাতের হায়া
অল্প বয়সে বিয়াও করিয়া
ওরে ভাই তওবা কর আমার মত
এমন ভুল আর কর না।
বেটার আশায় একে একে পাঁচোটায় হইল বেটি
রাইত পোয়াইলে দিনমনটা কান্দনের কাউর হাটি
(আরো) হেন্‌হেনানি পেন্‌পেনানি
ব্যারামে আর ফুরায় না।
একপালা ছাওয়ার পিতলান তাতে একলা বাড়ি
এ সুন্দর আছিলো বউটা কুড়িতে হইল বুড়ি
মোর হাউসের দিন হাতাসে গেল
জীবনে সুখ হইল না।
আধ ভোরতে কামোত যাঁও মুই সাঝোত আইসোং ঘুরি
তৈয়ার চাইরটা খাবার না পাঁও আন্দংরে হাত পুড়ি
খাইতে নিতে পত্তি সাঁঝে

কাড়াকাড়ি ফুড়ায় না।

গান-৩

আস্তে করিয়া টানেন ছিপরে সাধু
বড়শীর ছিড়িবে সুতা
ঘাট চিনিয়া সুযোগ বুঝিরে সাধু
বড়শীত মারিবেন খোটা।
খাল পাগাড়ের অল্প জলে
চায়া থাকেন সাধু বড়শী ফেলেরে
ছোট মাছে টোপ গিলিলে সাধু
নড়িবে বড়শীর পাতা।
গহীন জলে থাকে বড়রে মাছ
না মানেরে সাধু আগ আর পাছরে
টোপ গিলিয়া সাতার খেলেরে সাধু
জলোত ভাসেয়া মাথা।
হাউস করিয়া ফেলে বড়শী
সারাদিন সাধু রইলেন বসিরে
ধরা মাছ তোর পালেয়া গেলরে সাধু
হয় নাইরে টোপ গাথা।

গান-৪

ওকি গাড়ীয়াল ভাই
প্রাণ কান্দে মোর নাইওরের লাগিয়া
বাবার দেশের গাড়ীয়াল রে তুই, মানং ভাই বুলিয়া
কয়া দেইস মোর দুঃখের কথা
(ঐনা) বাবার আগোত যায়ারে গাড়ীয়াল
প্রাণ কান্দে...
বন্ধুধন মোর দূরদেশে
(ও মোক) একলা ঘরোত থুইয়া
কেমনে যে ভুলিয়ারে আছে
(ঐনা) কোলার ছাওয়ার মায়ারে গাড়ীয়াল
প্রাণ কান্দে...
গাড়ী বয়া যান রে গাড়ীয়াল বাড়ীর বগল দিয়া
মন করে মোর তোলাপারা
(ঐনা) ঘুন্টির বাইজ শুনিয়ারে গাড়ীয়াল
প্রাণ কান্দে...

গান-৫

স্ত্রী	:	ও মোর গাড়ীয়াল ও
পুরুষ	:	ও মোর সুন্দরী লো
স্ত্রী	:	আইজ কেনে মোর কথা বুঝি

মনোত পড়িচে।
পুরুষ : এইবারে মোর জাতের আক্কেল
হয়ারে গেইচে।।
আর না যাই মুই দূরদেশ
খাটি খাটি জাহান শেষ
দিন যায়া একবেলা খাইচোং
আন্দনের আলসিতে।।
স্ত্রী : ও মোর গাড়ীয়ালও
ছেয়াত বইসো হাঁকাও গাও
গাও খান ধুইয়া পন্তা খাও
থাউক তো আগোত টোপলাটা মুই
দেকিম এলায় পাচে।।
কাইল আচিলো আসির কতা
আইজ আসিলেন বাড়ী
আন্দা ভাত মোর বাসিয়া হয়া
হাড়িত আছে পড়ি
তোমার চিন্তাতে মোর ভোগ তিয়াস
সউগ ছাড়ি পালাইচে।।
পুরুষ : ও মোর সুন্দরী ও
বুচ্চোং তোর মনের কতা
কবার না নাগে।
স্ত্রী : দোহাই ধর্মের মাথা খান
আর না যান বৈদেশে।

লোকনৃত্য

রাজবংশী নৃ-গোষ্ঠীর লোকসাহিত্য বিচিত্র লোকনৃত্যে সমৃদ্ধ। নাচ-গান অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো এদের জীবনের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নাচ-গানের মধ্যদিয়েই তারা সমস্ত দিনের ক্লান্তি অবসাদ দূর করেন, মুছে ফেলেন জীবনযন্ত্রণা, খুঁজে পান আনন্দ; ভালবাসার সুখ-দুঃখ নাচ-গানের মাধ্যমে তারা প্রকাশ করেন। রাজবংশী সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাদের প্রতিটি নাচই বলা যায় আচারমূলক। ব্রতনাচ তাদের মধ্যে অন্যতম। ব্রতনাচে সংসার ধর্মে, পরিবারের সুখ সমৃদ্ধির কামনা করা হয়। লৌকিক ধর্মাচারণে গাজন-নাচ, কীর্তন নাচ, ব্রত নাচ, ধুপ নাচ, প্রভৃতির প্রচলন আছে। বিভিন্ন পূজা পার্বনে যেমন-দূর্গাপূজা, কার্তিক পূজা ও কালী পূজার রাজবংশী যুবক ও রমণীরা কখনো বিধবা ও বৈরাগীরা ধূপদানীতে ধূপ জ্বালিয়ে হাতে নিয়ে ঢাক-কাঁসরের তালে নৃত্য করেন তাকে 'ধূপনাচ' বলে অভিহিত করা যায়। রাজবংশী নৃত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেয়া হলো।

১. বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে বৃহত্তর রংপুর জেলার হুঁদুম দেও অনুষ্ঠানে রাজবংশী কৃষক রমণীরা রাত্রিবেলায় অকর্ষিত ক্ষেত্রে নগ্ন হয়ে নৃত্য করেন।

২. কোনো কোনো অঞ্চলে চৈত্র-বৈশাখ মাসে খরা দেখা দিলে গ্রামের মেয়েরা একত্র হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল-ডাল মাগন করেন। মেয়েদের মধ্যে একজন 'রাজা' হয় ও একজন

'রাণী' । রাজা রাণীর মাথায় একজন ছেড়া ছাতা বা গ্রাম্য মাথাল ধরেন । অপর একজন ভাঙা টিন বাজায় ও সাথে মেয়েরা গীত গান ও নৃত্য করেন ।

৩. অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাসের শেষ মঙ্গলবার গ্রাম মাঙ্গলিক থানে গাইটে পূজার সময় থানের সামনে রাজবংশী সমাজের কির্ত্তনীয়াগণ হরিনাম সংকীর্তণ ও নৃত্য করেন ।

৪. রাজবংশী সমাজে শুভ বিবাহের পরদিন যখন বধূকে নিয়ে বর তার নিজ গৃহে ফিরে আসেন তখন বরের বাড়িতে বধূকে বরণ করার জন্য রাজবংশী রমণীগণ বধূবরণ নৃত্য করে থাকেন ।

৫. রাজবংশী সমাজে শিবপূজার গাজন নৃত্যের সময় রং মেখে সঙ সেজে রাজবংশী যুবকেরা বিভিন্ন ভঙ্গিতে নৃত্য করেন । যুবকেরা মহিলারূপ ধারণ করেন । তাদের গৌরী বলে ।

৬. রাজবংশী জনগণ তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায়, মা-কালীর নিকট কোনো সমস্যা থেকে মুক্তি কামনায় এবং গ্রামের মঙ্গল কামনায় ভোগরাজ শেষে গ্রামব্যাপী প্রতিটি বাড়িতে উঠোনে জল ঢেলে কাদামাটি নৃত্য করেন, ও হরিনাম সংকীর্তন করেন থাকেন ।

লোকনাট্য

'লোকনাট্য' গ্রাম্য লোকমুখে উচ্চারিত নাম নয় । ফোকলোর কিংবা লোকসাহিত্য অথবা নাটকের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মাধ্যমেই এ শব্দটির প্রচলন ও প্রসার । লোকনাট্য সম্পর্কে নানান গবেষক নানা মতামত ব্যক্ত করেছেন । লোকসংস্কৃতিবিদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক । কোনো পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক কাহিনী তার ভেতর প্রবেশ করা সঙ্গত নয়, তার কাহিনীতে পূর্ববর্তী কোনো ধারা কিংবা ঐতিহ্য থাকে না । মানিক সরকারের মতে, লোকাশ্রিত কাহিনী, আশ্রিত চরিত্র অনুযায়ী উক্তি-প্রত্যুক্তি সহজ, সরল বলিষ্ঠতার সঙ্গে লোকগীতি, নৃত্য, স্বল্পসংলাপ এবং লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানের মাধ্যমে ঋজু দৃঢ় ভাবভঙ্গীর দ্বারা লোকাকীর্ণ উপযুক্ত আসরে অভিনয়ের সাহায্যে যা প্রকাশ হয় তা সাধারণ অর্থে লোকনাট্য (ফোকড্রামা) । এককথায় বলা যায়, লোকরুচিরঞ্জক এবং লোকজীবন ভিত্তিক কাহিনী অবলম্বনে যে সহজ সংলাপসমৃদ্ধ রচনা যন্ত্রসঙ্গীত, ঐকতান প্রস্তাবনা, বন্দনা, চরিত্র, নৃত্য, সঙ্গীত, কথা, হাস্যকৌতুক প্রভৃতির সমন্বয়ে উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় তাকে লোকনাট্য বলে ।

নৃ-গোষ্ঠী রাজবংশীদের লোকনাট্যের ধারা বেশ বেগবান । রাজবংশী সমাজ জীবনে যেসব ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, পৌরাণিক, লোককাহিনীকে আশ্রয় করে যাত্রা, পালাগান, নাটক, কবিগান প্রচলিত আছে তা সবই লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত । গ্রামের মাঝে কোনো উন্মুক্ত জায়গায়, কিংবা কোনো বাড়ির উঠোনেই বৃহৎ আঙিনায় আচ্ছাদিত আসরে নাচ, গান, বাজনা, সংলাপ অভিনয় সহযোগে এসব লোকনাট্য পরিবেশিত হয় । এসবের মধ্যে রয়েছে যাত্রা, পালাগান, কবিগান, ভাবগান, পৌরাণিক ও ধর্মীয় পালা যেমন- রাজা হরিশচন্দ্র পালা, রাধাকৃষ্ণের মানভঞ্জন, নিমাই সন্ন্যাস, গোরাচাঁদের সংসার ত্যাগ শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস, বেহুলা লক্ষীন্দরের পালা, বিজয়-বসন্ত পালা প্রভৃতি । এছাড়া বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তাদের সমাজজীবনে ঐতিহাসিক ও সামাজিক কাহিনী অবলম্বনে যেসকল যাত্রাপালা রচিত হয়েছে সেগুলো সহজেই স্থান করে নিয়েছে । এসব যাত্রাপালায় তারা নিজেরাই অভিনয় করেন, তাদের সমাজের বিভিন্ন গ্রামে মঞ্চস্থ করে থাকেন । এসব যাত্রাপালার মধ্যে রয়েছে-

সাবিত্রী-সত্যবান, পঞ্চপাণ্ডবের যুদ্ধ, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, সোহরাব-রুস্তমের যুদ্ধ প্রভৃতি। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে এসব বিভিন্ন আঙ্গিকে ও রূপে রচিত ও পরিবেশিত পালাগানগুলোকে লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত এসব বিভিন্ন আঙ্গিকে ও রূপে রচিত ও পরিবেশিত পালাগানগুলোকে লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। রাজবংশী সমাজে যেসব পালাগান অনুষ্ঠিত হয় তা সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ ও শিক্ষামূলক। নিচে একটি লোকনাট্যের একটি দৃশ্য নমুনা হিসাবে উল্লিখিত হলো:

রাজা হরিশচন্দ্র
বা
শ্মশান মিল

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

স্থান : বিশ্বামিত্র ঋষির আশ্রম।
কোমণ্ডল হস্তে বিশ্বামিত্র ঋষির প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র : অযোধ্যার রাজা হরিশচন্দ্র পৃথিবীর সবার আদর্শ মহাপুরুষ, কিন্তু আমি তাকে পরীক্ষা করব। হরিশচন্দ্র, তুমি যে কেমন দানবীর অযোধ্যাপতি-তোমার ভীষণ পরীক্ষা। কোপিঞ্জল-

কোপিঞ্জলের প্রবেশ

কোপিঞ্জল : (নেপথ্যে) আজ্ঞে-প্রভূ?
বিশ্বামিত্র : যাও কোপিঞ্জল, আমার তপোবন হতে পূজার পুষ্প তুলে নিয়ে এস।
কোপিঞ্জল : তথাস্তু গুরুদেব।
কোপিঞ্জল প্রস্থান। পরে বিশ্বামিত্র প্রস্থান রাজ হরিশচন্দ্রের প্রবেশ
হরিশচন্দ্র : (সিংহাসনে উপবেশনে) যা ধারণার অতীত, কল্পনার অতীত, ঐশ্বর্য্যে অধিশ্বর হয়ে পৃথিবী দাতা বলে পরিচিত হওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

শৈব্যারাণীর প্রবেশ

শৈব্যা : (নেপথ্যে)-কি হয়েছে নাথ?
হরিশচন্দ্র : শুন রাণী, আজ আমার মনটা অতি চঞ্চল হয়ে হয়ে পড়েছে। আমি এখনি মৃগয়া শিকারে যাত্রা করব। তুমি অন্তঃপুরী প্রবেশ কর।

হরিশচন্দ্রের প্রস্থান

শৈব্যা : আজ আবার মহারাজ কোথায় চল্লেন তা-কিছু জানতে পারলুম না। ভগবান-স্বামীর কোনো অমঙ্গল না হয়। (শৈব্যার প্রস্থান)

ছড়া

ছড়া সাহিত্যের তথা লোকসাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন। প্রত্যেক দেশের লোকসাহিত্যেই ছড়া একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। লিখিত সাহিত্যে যখন স্বকীয় ভাব-সুষমামণ্ডিত হয় নি, যখন আধফোটা ছিল, বস্তুজ্ঞান ছিল অত্যন্ত হালকা বা অগভীর, তখনই এই ছড়া সাহিত্যের সৃষ্টি।

ছড়া শিশুতোষ রচনা হিসেবে পরিচিতি। শিশুর মনোরঞ্জন, অবসর যাপন, জ্ঞান ও নীতি শিক্ষা ইত্যাদি কারণে ছড়ার চর্চা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে লৌকিক ছড়া কোনো শিশুর জন্য রচিত হয় নি, শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক, বয়স্ক সকল শ্রেণীর জন্য রচিত।

ছড়া লোকসাহিত্যের শুধু আদিমতম শাখাই নয়, সবচেয়ে জনপ্রিয়ও বটে। লোকসঙ্গীত, ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদির মতো ছড়া বর্তমানকালেও বহুল প্রচলিত সমাদৃত ও জীবন্ত। এর জনপ্রিয়তার কারণ বিবিধ-

১. ছড়া মূলত আবেগ-অনুভূতিজাত-বুদ্ধিজাত নয়।
২. ছড়া চর্চায় সব বয়সের নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে থাকে।
৩. ছড়ার বিষয় বৈচিত্র্য আছে; লঘু-গুরু সব ধরণের বিষয় এবং হাস্য, করুণ নানারকমের রস নিয়ে রচিত।
৪. ছড়ার নিজস্ব ছন্দ আছে যা গতিশীল ও শ্রুতিমধুর।
৫. ছড়া আবৃত্তি সুখকর; এতে সঙ্গীত গীত হয়, ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হয়, প্রবাদ প্রসঙ্গত বলা হয়।
৬. ছড়ার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি সরল, এজন্য তা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।
৭. ছড়া চিত্রবহুল ও ধ্বনি তৃপ্তিকর বলে স্মৃতিতে ধরে রাখা সহজ হয়।
৮. ছড়া চিত্ত বিনোদনের নির্মল মাধ্যম, নৈতিকতার বিচারে তা শ্লীল ও রুচি সম্পন্ন।
৯. ছড়ার মধ্যে চিরত্ব আছে। বিশ্বের সব দেশে ও সব সমাজে ছড়ার প্রচলন আছে। এই সার্বজনীনতা ও সর্বকালীন গুণে ছড়া পুরাতন হয়েও নতুন। ছড়ার জনপ্রিয়তার যে নয়টি গুণের কথা বলা হলো এগুলো ছড়ার বৈশিষ্ট্যরূপেও আখ্যায়িত করা যায়। ছড়া পদ্যে রচিত। অন্ত্যমিল যোগে স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত ছড়ার অবয়ব দুই থেকে আট/দশ চরণ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

রাজবংশী লোকসাহিত্য ছড়ায় সমৃদ্ধ। তাদের সমাজে প্রচলিত ছড়াগুলোতে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান। এসব ছড়াগুলোর মধ্যে ক্রীড়া বিষয়ক, নৈসর্গিক ও ছেলেভুলানো ছড়াই সমধিক প্রচলিত। এখানে কয়েকটি রাজবংশী ছড়া উদ্ধৃত করা হলো -

ঘুমপাড়ানি ছড়াঃ ঘুম পাড়ানি ছড়াগুলো শিশুদের ঘুম পাড়ানোর সময় সুর ও তালে তালে পড়া হয়। স্বভাবতই সুর করে আওড়ানো ছড়াগুলো শিশুমনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন শিশুরা আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে। যেমন-

১. খুকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী আইলো দেশে
বুলবুলিতি ধান খায়েছে খাজনা দেব কিসে
ধান ফুরালো পান ফুরালো খাজনার উপায় কি
আর কয়ডা দিন সবুর কর রসুন বুনিচি।

২. ঘুম পাড়ানি মাসী পিসি আমাগের বাড়ি আইসো
খাট নেই পালং নেই চোখ পাইতে বসো
বাটা ভরা পান দিছি গাল ভরে খাও
খুকির চোখি ঘুম নেই ঘুম দিয়ে যাও।

৩. আয়রে আয় টিয়ে লাফ ঝাঁপ দিয়ে
আমাগের খুকা পান খায়েছে শাউড়ী বাধা দিয়ে।

লোককাহিনী

লোককাহিনী শুধু গল্পরসের আধার নয়, যেকোন জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যের দর্পণ বিশেষ। বাংলাদেশের রাজবংশী সমাজে প্রচলিত রয়েছে অসংখ্য মূল্যবান লোককাহিনী। এসব লোককাহিনীর বিচার-বিশ্লেষণে বিশ্বের অপরাপর প্রান্তের লোককাহিনীর টাইপ মটিফ ইনডেক্সের অপূর্ব সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ইংরেজি Folktale শব্দকেই বাংলায় লোকতত্ত্ববিদরা লোককথা, লোককাহিনী ইত্যাদি নামে অভিহিত করে থাকেন। লোককাহিনীর বিষয়-বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লোকতত্ত্বাবিদরা একে উপকথা, ব্রতকথা, পুরাণকথা, নীতিকথা, ব্যঙ্গকথা, রোম্যান্সকথা ইত্যাদি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। রাজবংশী সমাজে প্রচলিত লোককাহিনীগুলোও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত।

উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোককাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে জীব-জানোয়ারকে অবলম্বন করে। জীব-জানোয়ার প্রধান গল্পকেই সাধারণত উপকথা বলা হয়ে থাকে, পাশ্চাত্যে যাকে বলে Animal Tale. লোককাহিনীর দ্বিতীয় ধারায় রয়েছে রূপকথা, যাদুশক্তি, রোমাঞ্চকর ঘটনার প্রাধান্য। ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় কোনো কিছু জয় করা, বোকা রাক্ষসকে পরাহত করা, রাজকন্যাকে উদ্ধার ও বিবাহ করার ঘটনায় যার সমাপ্তি। এছাড়া লোককাহিনীতে হাসির গল্পেরও প্রাধান্য রয়েছে। বোকা জামাতা, বোকা জোলা, বোকা নাপিত, বোকা ভূত যার প্রতিপাদ্য বিষয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা রাজবংশী সমাজে যেসব লোককাহিনী প্রচলিত রয়েছে তার অধিকাংশই পূর্বোক্ত তিনটি শ্রেণীর অন্তর্গত। এখানে রাজবংশী সমাজে বহুল প্রচলিত একটি লোককাহিনী উদ্ধৃত করা হলো।

কাঠবিড়ালীর গায়ে ডোরা দাগ

রামচন্দ্র যখন সীতাকে উদ্ধার করতে লঙ্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, তখন পথিমধ্যে সমুদ্র পার হয়ে তবেই লঙ্কায় পৌঁছানো সম্ভব। রামচন্দ্র চিন্তিত হলেন– কী করা যায়! চিন্তা করতে করতে হঠাৎ দেখলেন যে, সমুদ্রের জলে গা ভিজিয়ে কাঠবিড়ালী বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে সেতুর কাছে গিয়ে ধুয়ে সেতু তৈরির জন্য বালু ফেলছে। তখন রামচন্দ্র সাহস পেলেন। তিনি কাঠবিড়ালী, হনুমানদল, বানররাজ সুগ্রীবের সহায়তায় সমুদ্রে সেতু বেঁধে ফেললেন। কাঠবিড়ালী সেতুবন্ধনে সহায়তা করা ও সাহস দেওয়ার জন্য রামচন্দ্র খুশি হয়ে কাঠবিড়ালীকে আশীর্বাদ করেছিলেন, "যত উঁচু থেকে তোর পতন ঘটুক না কেন তোর মৃত্যু হবে না"। তাই উঁচু মগডাল থেকে কাঠবিড়ালী পড়ে গেলেও মরে না। আর রামচন্দ্র আশীর্বাদ করার সময় কাঠবিড়ালীর পিঠে আঙুল বুলিয়েছিলেন। সেইজন্য সেই আশীর্বাদের চিহ্নস্বরূপ আঙুলের দাগের স্মৃতি আজও কাঠবিড়ালীর পিঠে রয়ে গেছে।

শামুকের জন্মকথা

রাজা হরিশচন্দ্র মুনিঋষির দানের দক্ষিণা দিতে গিয়ে সর্বস্ব খোয়ানোর পর ভাগ্যবিপাকে পড়ে তাঁকে ডোমের শূকর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। প্রতিদিন শূকরের বিষ্ঠা

পরিষ্কার করতে তাঁর খুব অসুবিধা হতো। তাই ধর্ম ঠাকুরকে স্মরণ করে হরিশচন্দ্র বললেন, 'আগামীকাল থেকে আমি আর শূকরের বিষ্ঠা পরিষ্কার করতে পারব না। ধর্মঠাকুর তুমি খোঁয়াড় পরিষ্কার করার ব্যবস্থা কর।' পরের দিনে রাজা হরিশচন্দ্র দেখলেন যে, শূকরের বিষ্ঠা গেঁড়ি শামুকের রূপ ধরে খোঁয়াড়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই থেকে গেঁড়ি শামুকের জন্ম হলো।

সাপের একচোখ কানা ও কান না থাকা

মা মনসা যখন সর্পকুলকে বিষ দিয়ে পৃথিবীতে ছেড়ে দিলেন, তখন সর্পকুল মানুষকে দংশন করে প্রচুর মানুষ মেরে ফেলতে লাগল। তখন মানবকুল দেবের দেব মহাদেবের শরণাপন্ন হল এবং সাপের অত্যাচারের কাহিনী জানাল। মহাদেব সর্পকুলকে অভিশাপ দিয়ে এক চোখ কানা করে দিলেন এবং সাপের কান তুলে নিলেন, যাতে মানুষের কোনো শব্দ শুনতে না পারে, এবং পৃথিবীর যেন একপাশ দেখতে পায়। তখন থেকে সাপের অত্যাচার কম হলো ও সাপের এক চোখ কানা হলো।

সৃষ্টি কাহিনী

ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম যখন কিছুই সৃষ্টি হয় নি, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুমহেশ্বর মাটি সৃষ্টি করে জলে ফেলে দিলো। সেই সময় কুম্ভনীর পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসে জলের পরে ভাসছিল। তারপর শক্তি ও প্রভু রতিক্রিয়ায় মিলিত হলে সেই বীর্য থেকে ব্রহ্মার বাম অঙ্গে কন্যার জন্ম হলো এবং সেই কন্যাকে দক্ষ (শিব বা মহাদেব) বিয়ে করলে তাদের থেকে একশ' কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তারপর কন্যাগুলোকে কোশ্বরের সাথে বিয়ে দিলে ইন্দ্র, শশী, চন্দ্র, পবন, বরুণ প্রভৃতি জন্মিল। তারপর আস্তে আস্তে পৃথিবীতে মানবকুল সৃষ্টি হলো।

এরকম অনেক পুরাকথা এদের সমাজে প্রচলন আছে। তারা প্রতিটি প্রাকৃতিক ও জীবন্ত বস্তুতে ভগবান নিহিত রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। তাছাড়া তেত্রিশ কোটি দেবতা আছে, যাঁরা মানবকল্যাণে নিয়োজিত এরকম ধারণা ও বিশ্বাস তাদের ভেতর গভীরভাবে নিহিত আছে। সেসব কারণে পণ্ডিতগণ এই ধরণের বিশ্বাসকে সর্বপ্রাণবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

রূপকথাঃ চালাকের গল্প

এক চালাক লোক ছিল। সে শুধু কথার প্যাঁচে ফেলে মানুষকে ঠকাত। সে একদিন নাপিতের নিকট চুল কাটাতে গেল। তো, নাপিত তাকে বিভিন্ন ধরনের চুল কাটার বিবরণ ও মূল্য জানাল। নাপিত বলল, যে, শুধু কানের দুপাশের চুল ছাঁটালে চার আনা, সমস্ত মাথার চুল ছাটলে আট আনা, বাটি বসিয়ে ছাঁট দিলে তার মূল্য পড়বে আট আনা, আর মাথামুণ্ডন করলে চার আনা। তখন চালাক লোকটি প্রথমে তার কানের দু'পাশের চুল কাটতে বলল। নাপিত সুন্দর করে চুল কেটে দিল। তারপর চালাক লোকটি আয়নায় নিজের মাথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার পর সমস্ত মাথার চুল কাটার কথা বলল। নাপিত ছাঁট দিতে দিতে নাপিতের বিকেল গড়িয়ে গেল। এদিকে নাটিপের অন্যান্য খরিদ্দার ফেরৎ চলে যাচ্ছে। নাপিত তো মহাখুশি। মনে মনে ভাবছে যে, একজন ভাল খরিদ্দার পেয়েছি। অনেক টাকাই হয়ত দেবে সে। অবশেষে বাটি ছাঁট শেষ হলে সে মাথায় চুল কাটানের পছন্দ হয় নি বললো। নাপিতকে ধমক দিয়ে বলল, কি চুল কেটেছ তুমি। একদম পছন্দ হয় নি আমার। তুমি মাথা টাক করে দাও। নাপিত ধমক খেয়ে টাক করে দিল। চালাক লোকটি পকেট থেকে চার আনা বের করে নাপিতকে দিতে গেল কিন্তু নাপিত নিল না। বলল, আপনাকে চার

রকমের চুল খুব আরাম দিয়ে কাটিয়েছি। আমাকে দ্বিগুণ মূল্য দিতে হবে। কিন্তু চালাক লোকটি দিতে না চাইলে আস্তে আস্তে অনেক লোক জড় হল। নাপিত সব কথা খুলে বলল। কিন্তু চালাক লোকটি বলল আপনারাই দেখুন আমাকে সে মাথামুণ্ডন করে দিয়েছে। এর মূল্য চার আনা। আমি তো সেই চার আনাই তাকে দিচ্ছি। আপনারা দেখেন, নাপিত কেমন বোকার মতো আমার কাছে অন্যায় দাবি করছে। তখন উপস্থিত সকলে চালাক লোকটিকে সমর্থন করল এবং নাপিতকে তিরস্কার করে চার আনা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলল।

চালাক সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করতে লাগল। এখন বেলা তো প্রায় অস্তে যায়। এদিকে পেটে তো খুব ক্ষুধা। চার আনা পয়সা ছিল তা তো নাপিতকে দিতে হলো। এখন খাব কী করে! ফন্দি আঁটতে আঁটতে হাঁটতে লাগল। অবশেষে একটা চালাকি বের করে ফেলল। তারপর ময়রার দোকানে গিয়ে বসে ময়রাকে বলল, 'দাদা, আপনার রসগোল্লার গামলায় তো অনেক মাছি বসেছে। ওগুলো না তাড়ালে তো রসগোল্লা নষ্ট হবে। আপনি বিশ্রাম নিতে থাকেন আমি আপনার মিষ্টির মাছি তাড়াচ্ছি। আপনি আরাম করে ঘুমান।' ময়রার দোকানে একটা ছেলে ছিল। তাকে চালাক লোকটি ডেকে খুব সখ্যতা গড়ে তুললো এবং বলল, 'আমার নাম মাছি, তুমি আমাকে মাছি বলে ডাকবে। ঠিক আছে?' ছেলেটি বলল, 'আচ্ছা'। তখন ছেলেটিকে বলল, 'তুমি গ্লাস ধুয়ে একগ্লাস জল নিয়ে এসো। খুব পিপাসা পেয়েছে।' ছেলেটি জল আনতে গেল। তখন চালাক লোকটি ময়রাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে রসগোল্লা সাবাড় করতে লাগল। ছেলেটি এসে দেখে যে টাক লোকটি সব রসগোল্লা খেয়ে ফেলছে। তখন সে ময়রাকে ডাকতে ডাকতে বলল, 'কাকা, ময়রা কাকা, মাছি সব মিষ্টি খেয়ে গেল।' তখন ময়রা চোখ না মেলেই খ্যাক করে উঠল। বলল, 'খাকগে। মাছি আর কতটুক খাবে। তুই আমার ঘুমের ব্যাঘাত করিস নে।' ছেলেটি ভয়ে আর কিছু বলল না। চালাক লোকটি সব রসগোল্লা খেয়ে জল খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে বাড়ির দিকে রওনা হলো। ময়রা ঘুম থেকে উঠে গামলায় মিষ্টি না দেখে চিৎকার করতে লাগল। তখন ছেলেটি বলল, 'আপনাকে তো বললাম যে, মাছি সব মিষ্টি খেয়ে গেল। আপনি তো উঠলেন না। বললেন, মাছি আর কতটুক খাবে। তাই আমি আর কিছু বলিনি।' ততক্ষণে টাক লোকটা সব মিষ্টি খেয়ে চলে গেছে। তখন ময়রা চালাক লোকটির চালাকি বুঝতে পেরে কপাল চাপড়াতে লাগল। আমি দেখেশুনে বাড়ি এলাম। আমার কথাটা ফুরালো, নটে গাছটা মুড়ালো।

প্রবাদ ও প্রবচন

প্রবাদ-প্রবচনগুলো লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। একটি জাতির বুদ্ধিমত্তা, কর্মকুশলতা ও চিন্তাধারার পরিচয় মেলে তাদের প্রবাদে। এগুলো প্রথম উৎপত্তি ঘটে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত মানুষের মুখে মুখে এবং পরবর্তীতে ধীরে ধীরে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। তবে প্রবাদ-প্রবচনগুলোর কে আদিস্রষ্টা এবং কোন সময়কার রচনা, তা কোনো দিন-ক্ষণ-ব্যক্তি বিশেষের বেড়াজালে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে সুনীল কুমার'দের অভিমতটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, প্রবাদের আদিকথা যাহাই হোউক না কেন, খুব সম্ভব এই প্রবাদের প্রভাব তখনই মানুষের মনে স্বতঃউৎসাহিত হইয়াছিল যখন তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুভূতি আপন মরম বেগে সহজ ভাষায় নিঃসৃত হইয়াছিল। প্রথম যিনি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার জ্বালা পরম্পরার অসহ্য, রথ দেখা ও কলা বেচার পরম্পরানুষঙ্গিক সন্তোষ দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার অনুপযোগী দুঃসাধ্যতা অথবা অতিভক্তি চোরের লক্ষণের সহজ কৌতুক অনুভব করেছিলেন, তিনি তাঁর প্রত্যক্ষভাবটি

দৈনন্দিন সাধারণ বুদ্ধির টুকরা হিসেবে বিবৃত করে যে ক্ষিপ্র টীকা-টিপ্পনি কেটেছিলেন তা ক্রমে অভ্যস্ত বাক্যে জনশ্রুতিতে বা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল।

প্রবাদ সম্পর্কে প্রচলিত সংজ্ঞাগুলো থেকে কতকগুলো তথ্য পাওয়া যায় -

১. প্রবাদে জাতির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা (Long Experience) পরিণত বুদ্ধি (Elder wisdom), নিটোল নীতিবাক্য (Terse Didactive Statement), অলিখিত বিধি (Unwritten Low of morality) এবং লোকমনে প্রবাহিত সত্যিকথন (Words conveying a truth to the mind) প্রকাশিত হয়।

২. প্রবাদের অবয়ব হলো একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য (A short sentence), স্ফটিকীকৃত রূপ (Crystalized Forms) ও শব্দগুচ্ছের সমন্বয় (Combination of words).

৩. প্রবাদ জাতির ঐতিহ্যাশ্রিত (Currnet in Traditions).

৪. উপমা, বক্রোক্তি, বিরোধাভাস, অতিশয়োক্তি, অলংকারের ভাষায় (By a figure, periphrases, Antithesis of hyperbole) প্রবাদে প্রকাশিত হয়।

রাজবংশী লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশজুড়ে রয়েছে প্রবাদ-প্রবচন। এসব প্রবাদে অশিক্ষার ছাপ থাকলেও সেগুলোর সহজ নির্মাণ শৈলী এবং প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গি আর বিষয়ের আকর্ষণীয় মাধুর্য হৃদয়কে আন্দোলিত করে তোলে। প্রবাদগুলোর মধ্যে ছন্দের ব্যবহার অনুধাবনীয়। ছন্দ ও কবিতার নিদর্শন হিসেবে ও প্রবাদগুলো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বিচিত্র বিষয়ের রাজবংশী প্রবাদ রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে কয়েকটি প্রবাদ উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. নদীর জল ঘোলা ভাল, জাতের মেয়ে কালো ভাল।
২. য্যামন ছাগল, তেমনি তার খুটো।
৩. মিয়া বিবি রাজী, তো কি করবে কাজী।
৪. যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই।
৫. নিজে বাঁচলে বাপের নাম।
৬. মার চেয়ে মাসী ভাল, আমি বলি তারে ডাইনী।
৭. গতর না খাটালে সোয়ামীও জ্বলে।
৮. ভাতারে আনলি ধন, গিন্নী লক্ষ্মী হন।
৯. হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে, কান্দলি কি আবার মেলে?
১০. সাধলি জামাই খায় না পিঠে, শেষে মরে তাওয়া চেটে।
১১. মানষির কুটুম আইলে গেলি, গরুর কুটুম চাটলি চুটলি।
১২. পুঙায় নেই চামড়া, দুধদে খায় পাকা আমড়া।
১৩. ফেল কড়ি মাখ তেল।
১৪. মারিতো গণ্ডার, লুটিতো ভাণ্ডার।
১৫. অতি সিয়ানার গলায় দড়ি, কুঁচে খায় লাঠির বাড়ি।
১৬. পুঙায় নেই চাম, সেনাপতি নাম।
১৭. হাগে ছোঁচে না, পাদে গলা জলে যায়।

১৮. নিত্য রুগীর ঔষধ নেই, নিত্য ভিখারীর ভিক্ষা নেই।
১৯. লোম বাছতে কম্বল উজাড়, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।
২০. সাধে কি বিড়াল গাছে ওঠে।
২১. ডায়ো জানে গুড়ের খোঁজ।
২২. পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে।
২৩. হয় মুচি কানাই বোষ্টমী ক, মুচি-বোষ্টমী কইসনে।
২৪. বামুন গেল ঘর, নাঙল তুলে ধর।

ধাঁধা

ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি প্রাচীন শাখা। 'ধন্দ' শব্দ থেকে ধাঁধা শব্দের উৎপত্তি। অর্থ-সংশয় দুরূহ সমস্যা ইত্যাদি। ধাঁধার প্রতিশব্দ 'হেঁয়ালী' যা সংস্কৃত প্রহলিকা শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। ধাঁধা রহস্যপূর্ণ ভাষায় রচিত হয়। এটি মূলত একটি জিজ্ঞাসা। আর জিজ্ঞাসা বলে এর একটি উত্তর আছে। উত্তরটি ধাঁধার ভাষায় পরোক্ষভাবে বিরাজ করে। মূল বিষয়কে আড়াল করে শব্দের জালে বুনে তা করা হয়। উত্তরদাতাকে এই উপমা-রূপক প্রতীকের রহস্যভেদ করে উত্তর দিতে হয়। ধাঁধা চর্চায় কমপক্ষে দুজনের উপস্থিতির প্রয়োজন হয়- একজন ধাঁধা ধরে, অপরজন উত্তর দেয়। ধাঁধার পুরোচিত্রটি যেমন পরোক্ষ, তেমনি বিভ্রান্তি কর। এটি নির্মাণে মস্তিষ্কের অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। উত্তরদাতাকে চিন্তা করে বা মাথা ঘামিয়ে উত্তর দিতে হয়। তাই ধাঁধা Formulated thought বা নিগূঢ় চিন্তার ফল। বাংলাদেশের বিভিন্ন গোত্রের আদিবাসীরা বিবাহ কৃষিকাজ, মৃতদেহ সৎকার মন্ত্রাচার ও ধর্মানুষ্ঠানে ধাঁধার অনুশীলন করে থাকে। বাংলাদেশের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে ধাঁধার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এবারে কয়েকটি রাজবংশী ধাঁধার উল্লেখ করা যেতে পারে।

রাজবংশী সমাজে অজস্র ধাঁধা রয়েছে যেগুলো তারা বিয়ের আসরে বরপক্ষকে জিজ্ঞাসা করে নাজেহাল করত। এই রেওয়াজ এখনো সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় নি। এখনো তাদের সমাজে অবসরে বসে, ধান পাকা ও কাটার সময় ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হয়। অবশ্য এখন আর এগুলোকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, কিংবা অপদেবতা তাড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না। নিছক আনন্দ উপভোগের জন্যই এগুলো তারা বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাদের সমাজে ব্যবহৃত কতকগুলো ধাঁধার নমুনা দেওয়া হলো:

১. কাঁচায় ন্যালব্যাল পাকায় সিন্দুর উত্তর যে না
কতি পারে তার মা খায় পাকা ইন্দুর। উত্তরঃ পালেদের হাড়ি

২. আট পাকা ষোল হাটু মাছ ধরতে যায় লাটু
গাঙে ফ্যালে জাল, মাছ ধরে খায় চিরকাল। উত্তরঃ জাল

৩. নাক দিয়ে খায় মুখ দিয়ে হাগে। উত্তরঃ ঘুণি

৪. যোগী নয়, সন্ন্যাসী নয়, মাথায় হুতাশন
ছেলে নয়, পিলে নয় ডাকে ঘন ঘন।
চোর নয়, ডাকাত নয় বর্শা মারে বুকে।
কন্যা নয় পুত্র নয় চুমো খায় মুখে। উত্তরঃ হুক্কা

৫. কোন জীব সকালে চার পায়ে হাঁটে
দুপুরে দুই পায়ে হাঁটে,
সন্ধ্যায় তিন পায়ে হাটে? উত্তর: মানুষ

৬. কোন ছাতা সবচে ছোট । উত্তর: ব্যাঙের ছাতা

৭. টানলে কমে, কাটলে বাড়ে
এমন জিনিস কি আছে সংসারে? উত্তর: সিগারেট/বিড়ি ও পুকুর

৮. ইড়িং বিড়িং তিড়িং ভাই
চোখ দুটো তার মাথা নাই? উত্তর: কাঁকড়া

৯. লাল মিয়া হাটে যায় দুই গালে থাপ্পড় খায় । উত্তর: মাটি পাতিল

১০. কথায় আছে, কাজে নেই, দেখাও যায় না । উত্তর: ঘোড়ার ডিম

১১. চার পায়ার উপরে নিপায়া নাচে
দুপায়া রইছে ডালে ।
আইখ্যার উপর পইখ্যার বাসা, জল দিয়াছে
চালে শুন কন্যা বিবরণ বাঘের পাড়া জলে ভাসে
কি কারণ । উত্তর: গোবরে বাঘের পায়ের ছাপা

১২. খাওয়ার জিনিস নয় তবু সর্বলোকে খায়
ছেলেপিলে খালি পরে কেন্দে ঘরে যায় ।
বৃদ্ধ লোকে খালি পরে, করে হায়
হায় যুবলোকে খালি পরে ফিরে ফিরে চায় । উত্তর: আছাড় খাওয়া

লোকসংস্কার

রাজবংশী লোকসংস্কারে লোকবিশ্বাস ও বিধি নিষেধের প্রভাব অপরিসীম । যা উক্ত সমাজের চেতনায় ও মননে আজো অনেকটা প্রভাবশীল । বাস্তব প্রমাণ সাপেক্ষ বা বাস্তব কার্যকরণ সম্পর্কযুক্ত আর কার্যকরণ সম্পর্কহীন অসংখ্য লোকবিশ্বাস রাজবংশী সম্প্রদায়ের শিক্ষিত-অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে, কোথাও কোথাও বা অঞ্চল জুড়ে লোকদের আচারে ব্যবহারে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে । নিম্নে বেশক'টি রাজবংশী লোকবিশ্বাস ও বিধি নিষেধ উদ্ধৃত করা হলো:

১. রাত্রে কোনো বাড়িতে পেঁচা ডাকলে সে পরিবারের অমঙ্গল সন্নিকট বলে মনে করা হয় । পেঁচার ডাক শুনতে পেলে বাড়ির মেয়েরা চুলার আগুনে লৌহশলাকা উত্তপ্ত হতে দিলে সে-দোষ কেটে যায় বলে তারা বিশ্বাস করে ।

২. সাঝেঁর প্রদীপ জ্বালানোর পর কারো সাথে টাকা পয়সা লেনদেন করা ভাল নয় ।

৩. রাত্রিকালে আয়না দেখা ভাল নয় । রাত্রে আয়নায় মুখ দেখলে অমঙ্গল হয় ।

৪. কোনো আলোচনার মধ্যে টিকটিকি টিক্ টিক্ করে শব্দ করলে সে আলোচন সঠিক বলে ধারণা করা হয়।

৫. রাত্রিকালে গাছের পাতা ছেঁড়া বা গাছ কাটা দূষণীয়।

৬. রাত্রিকালে সাপকে দড়ি বলতে হয়। কাউকে সাপে কাটলে কাটি ঘা হয়েছে বলতে হয়। নতুবা তাকে বাঁচানো যায় না বলে বিশ্বাস আছে।

৭. বিবাহিতা মেয়েরা চুল খোলা রাখলে স্বামীর আয়ু কমে বলে বিশ্বাস করা হয়।

৮. অবিবাহিত ছেলে-মেয়েরা পা লম্বা করে রেখে ভাত খেলে তাদের শ্বশুর বাড়ি দূরে হয়। অর্থাৎ দূরবর্তী এলাকায় তাদের বিয়ে হয় বলে বিশ্বাস।

৯. চুল্লিতে আগুন জ্বালানোর পর সামান্য লবণ ছিটিয়ে পোড়ালে তরকারি অধিক স্বাদ হয় বলে তারা মনে করেন।

১০. চন্দ্রগ্রহণের সময় কোনো গর্ভবতী স্ত্রীলোক কোনো কিছু কাটা-ছেঁড়া করলে তা তার গর্ভস্থ সন্তানের উপর প্রতিফলিত হয়। সে সন্তান কোনো না কোনো অঙ্গহীন বা খুঁত হয়ে জন্মগ্রহণ করে বলে তারা বিশ্বাস করেন।

১১. ভাগ্নে-ভাগ্নীরা মামার বাড়ির পোড়া ভাত খেলে তাদের বিয়েতে বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস আছে।

১২. প্রতি রাত্রে শিশুর জ্বর আসলে চামচিকের হাড় বেঁধে দিতে হয় নতুবা বাদুরের উচ্ছিষ্ট ফল খাইয়ে দিলে আর জ্বর থাকে না।

১৩. শিশুরা হঠাৎ ভয় পেলে তাকে ভরা কলসীতে 'বাউলী' বা বেড়ি পুড়িয়ে পানিতে ডুবিয়ে সেই পানি খাইয়ে দিতে হয়, অথাবা সেই পানি ঘরের চালে ফেলে দিয়ে পানির নিচে আতঙ্কিত ছেলে মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিলেই আর কোনো ক্ষতি হয় না।

১৪. আঁতুর ঘরে শিশুর জিহ্বায় সাদা সাদা দাগ পড়ে, এবং একে 'ফাঁকাপড়া' বলা হয়। মধু জিহ্বায় মেখে দিলেই তা সেরে যায়।

১৫. দুধ-চোরা গাভী ঠিকমতো দুধ না দিলে ব্রাহ্মণের পরিত্যক্ত পৈতা গাভীর গলায় বেঁধে দিলে ঠিকমতো দুধ দেয়।

১৬. গাভী বাচ্চা প্রসব করতে দেরি করলে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে তুলে রাখা ধানের খড় খাইয়ে দিলেই তাড়াতাড়ি বাচ্চা হয়।

উল্লিখিত লোকবিশ্বাস ও বিধি-নিষেধগুলো রাজবংশী লোকসাহিত্যের এক অমূল্যসম্পদ। এই সমস্ত লোকবিশ্বাস ও বিধি নিষেধসমূহ আজকের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত রাজবংশী সমাজের মধ্যে খুব একটা ক্রিয়াশীল না হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত রাজবংশীদের মধ্যে বা রাজবংশী লোকসমাজের আচারে-ব্যবহারে, চিন্তনে মননে, চেতনে-অবচেতনে, ব্যক্তির বিশ্বাসে এর প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

উপসংহার: বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন জাতি ও আদিবাসী উপজাতির সংস্কৃতিতে নানা ধরনের পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। রাজবংশী সমাজের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে। ইতোমধ্যে রাজবংশীদের বেশ কিছু সাংস্কৃতিক উপাদান বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সার্বিকভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতিতে আজ চরম সংকট চলছে। এই সংকটের মাঝে রাজবংশী সমাজ নিজেদের গৌরবময় ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার

ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগলেও, মন মানসিকতার দিক থেকে তারা এখনও দুর্বল হয়ে পড়ে নি। তাই রাজবংশী সমাজের ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহকে টিকিয়ে রাখতে তথা এর উৎকর্ষ সাধনে জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও বিরিশিরি উপজাতীয় কালচারাল একাডেমীর পাশাপাশি সুশীল সমাজকেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

তথ্যসূচি:

---

১. আদমশুমারী রিপোর্ট, ১৯৯১

২. অধ্যাপক মিখাইল নেস্তর্খ, মানব সমাজঃ প্রজাতি, জাতি, প্রগতি, মীর প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪

৩. Col. Edward Tuite Dalton CSI, Descriptive Ethonology Of Bengal, Government of Bengal, 1872.

৪. Dr. Buchanan Hamilton, Account of District of Zila Rangpur, MSSEURD, India Office Library.

৫. Herbert Risley, Tribes and Castes of Bengal, Voll. 1&2, Calcutta, 1891.

৬. H. Hudgson, Essay on the koch, Bodo and Dhimal Tribes, in Journal of the Asiatic Society, Calcutta, 1849.

৭. W.W Hunter, A Statistical Account of Bengal, Voll. 1 to 10, London 1876.

৮. G.A. Grierson, Linguistic Survey of India, Delhi, 1903.

৯. E.A. Gait, Census of India, Assam, 1901.

১০. H.H. Risely, The People of India, Culcutta, 1887.

১১. সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (৪র্থ মুদ্রণ), কলকাতা, ১৯৯০

১২. অশোক বিশ্বাস, বাংলাদেশের রাজবংশী: সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৫

১৩. মোহম্মদ মহসীন (সম্পাদিত), মানুষ, এফআইভিডিবি, ঢাকা, ২০০৩

১৪. মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন কাসিমপুরী, লোকসাহিত্যে ছড়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮

১৫. ড. ওয়াকিল আহমদ, লোকসাহিত্য, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭০, সম্পাদক: সিরাজুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩

১৬. George Herzog, Standard Dictionary of Folklore, Mythology and legand (SDFML), Vol. 1. Newyork 1949, Maria Edward leach (Ed.)

১৭. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬২

১৮. সৈকত আসগর, বাংলার ঐতিহ্য লোকনাট্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

১৯. আলমগীর জলিল, রাজশাহীর ছড়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৩৭০

২০. মোহাম্মদ হানিফ পাঠান, বাংলা প্রবাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬

২১. ড. মুহম্মদ আবদুল খালেক, মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে লোক উপাদান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৫

২২. মানিক সামস, বাংলাদেশের প্রবাদ-প্রবচন, লোকসংস্কৃতি, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, রাজশাহী, ১৪০২

২৩. সুশীল কুমার সম্পাদিত বাংলা প্রবাদ, ২য় সংস্কারণ, কলকাতা, ১৩৫১

২৪. Maria Edward leach ed. Standard Dictionary of Folklore, Mythology and legend (SDFML) Vol. 1. Newyork, 1949

২৫. ড. মাযহারুল ইসলাম তরু, বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসঙ্গীত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩
২৬. সমর পাল, উত্তরের ঐতিহ্য, বর্ণসজ্জা, রংপুর, ২০০৩
২৭. রবীন্দ্রনাথ মিশ্র, রংপুরের ভাওয়াইয়া, ভাওয়াইয়া একাডেমী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম, ২০০৩

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

অসহযোগ আন্দোলনে রাজশাহীর সাংস্কৃতিক কর্মসূচি

ড. মোঃ মোস্তফা কামাল*

সারসংক্ষেপ: ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে এই যুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধের সরাসরি ফল স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী জেলার মুক্তিকামী জনগণের অনন্য ভূমিকা রয়েছে। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহীর গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, 'রাজশাহী ছিল আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাইলপোস্ট'। মুক্তিযুদ্ধে এখানে সংঘটিত অনেক গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা অহংকার, মহিমা ও বীরত্বগাথায় পরিপূর্ণ। তাই মুক্তিযুদ্ধের এসব ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার গুরুত্ব অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক পর্যায়ে সংগ্রহ করা এসব বস্তুনিষ্ঠ ও খুঁটিনাটি তথ্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যও একান্তভাবে অপরিহার্য। তাছাড়া এসব তথ্য সংরক্ষণ করা আমাদের জাতীয় দায়িত্বও বটে। কেননা যে জাতি তার অতীত জানে না সে জাতি একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে পারে না। তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পটভূমি সৃষ্টিকারী অসহযোগ আন্দোলনে ব্যাপকভাবে ভূমিকা পালনকারী রাজশাহীর সাংস্কৃতিক কর্মসূচি এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

রাজশাহীর অধিবাসীগণ ব্রিটিশ আমল হতে শুরু করে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করা পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী ও স্বাধিকার আন্দোলন-সংগ্রামে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। উনিশ শতকের শেষার্ধে রাজশাহীতে জমিদারদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'রাজশাহী এসোসিয়েশন' বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতি ও নাট্যচর্চার মাধ্যমে এখানকার জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়। এই এসোসিয়েশনের একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০)। তিনি 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর একনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এখানকার জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারবোধ জাগিয়ে তোলেন এবং পরবর্তীতে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার সূচনা ঘটে।[১] ফলে এখানকার জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীতে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষের মতো রাজশাহীতেও 'বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলন' বা 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে এক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বাধে।[২] মূলত এটি ছিলো একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। তবে রাজশাহীর কবি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রজনীকান্ত সেন[৩*] (১৮৬৫-১৯১০) এতে অংশ গ্রহণ করলে এটি একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। তিনি কয়েকটি দেশাত্মবোধক গান রচনা করে ও তাতে কণ্ঠ দিয়ে এই আন্দোলনে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করেন। এর ফলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাজশাহীর সর্বস্তরের সাধারণ জনগণ এবং কৃষক, মাঝি, তাঁতি, কামার, কুমার, জেলে, ধোপা, কুলি,

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজশাহী

মজুর প্রমুখ পেশাজীবী ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সদস্য এই আন্দোলনে শরিক হয়ে এটিকে সফলতার দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হন।[২] ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ হতে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির পরিবর্তে বাংলাদেশ পুনরায় 'পাকিস্তান' নামক আর এক ঔপনিবেশিক শক্তির পদানত হয়। এই ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে রাজশাহীর জনগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সাংস্কৃতিক কর্মসূচিও চালিয়ে যেতে থাকে। তাই আমরা দেখতে পাই বৃহত্তর রাজশাহী জেলার নাচোলের 'তেভাগা আন্দোলন'[২] ও 'ভাষা-আন্দোলন'[২] রাজশাহীতে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। এভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মসূচির সাথে প্রবল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দ্বারা রাজশাহীর জনগণ প্রচণ্ড পাকিস্তান বিরোধী বাঙালি জাতীয়তাবাদের দীক্ষা নেন। পরবর্তীতে তারা ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের মিছিল-মিটিংয়েও অনেক দেশাত্মবোধক গান গাওয়াসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এছাড়া এসময় কাগজের কিংবা টিনের তৈরি চোঙ্গার সাহায্যে ট্রাকযোগে সারা শহর ঘুরে ঘুরে এবং মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে গণসঙ্গীতও গাওয়া হতো। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' ঘোষিত হলে দেশে একটি রাজনৈতিক উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। এই উন্মাদনায় রাজশাহীর জনগণ স্বতঃফূর্তভাবে যোগ দেন এবং এতে তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যোগ করে বাঙালির এই স্বাধিকার আন্দোলনকে সর্বোচ্চ মাত্রায় নিয়ে যান। তাই পরের বছর (১৯৬৭ খ্রি.) অর্থাৎ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের 'পহেলা বৈশাখ' বা 'নববর্ষবরণ' অনুষ্ঠানে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো জনসমাগম ঘটে। এই অনুষ্ঠান উদযাপনের মাধ্যমে পাকিস্তানি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বাঙালি সংস্কৃতির এক প্রকাশ্য প্রতিবাদী রূপ ও বিদ্রোহী ভাব ফুটে ওঠে।[১] এছাড়া রাজশাহীবাসী বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও লেখনির মাধ্যমেও এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আরো জোরদার করতে থাকেন। এক্ষেত্রে *'পূর্বমেঘ'* নামে একটি প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকার কথা উল্লেখ করা যায়। এই পত্রিকাটি ১৩৬৭ থেকে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির যে আগ্রাসন শুরু হয় তার বিরুদ্ধে পূর্বমেঘের ভূমিকা ছিল সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলন কিংবা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় বিভিন্ন মিটিং-মিছিলের শুরুতে কিংবা শেষে সমবেত স্বরে বিভিন্ন উদ্দীপনাময় গণ-সঙ্গীত গাওয়া হত। এরপর আসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সৃষ্টির চূড়ান্ত পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 'অসহযোগ আন্দোলন'-এর ডাক দেন।[৩] বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে এই অসহযোগ আন্দোলনে রাজশাহীর জনগণ কালোত্তীর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন ।

পদ্ধতি

এই প্রবন্ধটি একটি তথ্য উদ্ঘাটনকারী প্রক্রিয়া বিধায় এটি প্রণয়নে প্রাথমিক ও সহায়ক এই দু'ধরনের উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের তথ্য বলতে বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী কিংবা প্রত্যক্ষকারীর জবানবন্দি। সহায়ক উৎসের তথ্য বলতে পরবর্তীকালে

প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার, জার্নালের প্রতিবেদন, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, বিভিন্ন ইতিহাস ও ইতিহাসাশ্রিত গ্রন্থ, প্রচারপত্র, স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ, জীবনী গ্রন্থ, সাময়িকী, পুস্তিকা ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত তথ্যকে বোঝায়। সুতরাং এই প্রবন্ধটি প্রণয়নে এমপিরিক্যাল (Empirical) ও ঐতিহাসিক (Historical) উভয় পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে।

অসহযোগ আন্দোলন

১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান অকস্মাৎ এক বেতার ভাষণে ৩ মার্চ ঢাকায় আহূত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের আসন্ন অধিবেশন অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিতকরণের ঘোষণা দেন।[৩] এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ ঢাকার তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানে[১] এক জনসভায় লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন কর্মসূচির ডাক দেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই আন্দোলন কর্মসূচি 'অসহযোগ আন্দোলন' নামে পরিচিত। ৭ মার্চ হতে শুরু হওয়া এই আন্দোলন কর্মসূচি পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ২৫ মার্চের 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক ব্যাপক বাঙালি নিধন অভিযান পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।[৪] এই আন্দোলনের মাধ্যমে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রশাসনের উপর বঙ্গবন্ধুর একচ্ছত্র প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে এতে এই অঞ্চলের প্রশাসনের উপর পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়।

সাংস্কৃতিক কর্মসূচি: গণসঙ্গীত, শোভাযাত্রা, মুক্তমঞ্চ ও উন্মুক্ত ট্রাকে নাটক পরিবেশন

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পটভূমি সৃষ্টিপর্বে অসহযোগ আন্দোলনে রাজশাহীর সাংস্কৃতিক কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে তাতে বেশ উদ্দীপনামূলক ভূমিকা রাখেন। এসময় তাঁরা দেশাত্মবোধক গান, গণসঙ্গীত, নাটক, শোভাযাত্রা ইত্যাদি কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে জনগণকে আন্দোলন-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন।[১] এসব কর্মসূচির মাধ্যমে পাকিস্তানিদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মুক্তিযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাজশাহীতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুক্তির মন্ত্রে জনগণকে উজ্জীবিত রাখার কৌশল গৃহীত হয়।[৫]

৪ মার্চ ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গীত শিল্পীরা পথে পথে জাতীয় উদ্দীপনাপূর্ণ গণসঙ্গীত পরিবেশন শুরু করেন।[৫] ১২ মার্চ ওস্তাদ আবদুল আজিজ বাচ্চুর সুরবাণী সঙ্গীত বিদ্যালয়ের শিল্পীসহ গোটা রাজশাহী জেলার শিল্পী, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকরা রাজশাহীর রাজপথে নেমে আসেন এবং তারা সারা শহরের পথে-ঘাটে ঘুরে স্বাধীনতার সপক্ষে দেশাত্মবোধক গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। এর ফলে জনগণের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। এদিন তাঁরা একটি শোকমিছিলও বের করেন।[৫] ব্যানার ও প্লেকার্ড শোভিত মিছিলকারীরা এসময় 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি গায়। মিছিল শেষে তারা একটি পথসভায় মিলিত হয়। এই পথসভায় বক্তৃতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মযহারুল ইসলাম বলেন, 'বর্তমান আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য শিল্পী, লেখক ও সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'[৫] এই সভা হতে চলমান আন্দোলনে জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিদিনই মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া গণসঙ্গীত ও নাট্যানুষ্ঠানের কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়। এদিন ছাত্রলীগও ভুবনমোহন পার্কে একটি জনসভার আয়োজন করে।[৫] ফলে যতই দিন যেতে থাকে ততই এই আন্দোলনে সাধারণ ছাত্র-জনতার সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে আন্দোলন তীব্র থেকে আরো তীব্রতর হতে থাকে। ১৪, ১৫ ও ১৬ মার্চ রাজশাহীর শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক প্রমুখ সংস্কৃতিকর্মীগণ ব্যাপকভাবে রাস্তায় নেমে এলে এই আন্দোলনে অভূতপূর্ব গতি সঞ্চার হয়। অন্যদিকে ১৭ মার্চ রাজশাহীতে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।[৫] এদিন 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' সারা শহরে উদ্দীপনামূলক গণসঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।[৫] ২২ মার্চ রাজশাহীর সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বগণ মিলে রাজশাহী আর্টস কাউন্সিলে 'রাজশাহী শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন।[৫] এর আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হন যথাক্রমে মোস্তাফিজুর রহমান গামা ও মো. আবদুর রশিদ। এই সংগ্রাম পরিষদের অন্য সদস্যরা হলেন আতাউর রহমান[৫], আবদুল আজিজ বাচ্চু, আনোয়ারুল ইসলাম, অনিল বন্ধু রায় এবং সকল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ।[৫] এই কমিটি প্রায়ই মিটিংয়ে বসে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও তাদের করণীয় কাজ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করে। কমিটির পরবর্তী কয়েকটি সভা সুরবাণী সঙ্গীত বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই পরিষদের উদ্যোগে প্রতিদিন সকালে-বিকালে শহরের পথে পথে গলায় হারমোনিয়াম বেঁধে উন্মুক্ত মঞ্চে ট্রাকযোগে দেশাত্মবোধক গান, গণসঙ্গীতসহ নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হতে থাকে।[৫] তাছাড়া এই সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা মুক্তমঞ্চ নাটক ও উন্মুক্ত ট্রাকে নাটক পরিবেশন করেন। গীতিকার ও সুরকাররূপে এসব কর্মকাণ্ডে মোস্ত াফিজুর রহমান গামা ও আবদুল আজিজ বাচ্চুর অবদান অবিস্মরণীয়। এসব অনুষ্ঠানে সুরবাণী সঙ্গীত বিদ্যালয়, সঙ্গীত শিক্ষা ভবন, সূর্যশিখা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, কাকলী ইত্যাদি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা নিরলসভাবে অংশগ্রহণ করেন।[৫] বলা যায় এদের এসব দেশপ্রেমমূলক সাহসী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষকে চূড়ান্ত স্বাধিকার আন্দোলনে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্দীপ্ত করে।

২৫ মার্চ রাতে রাজশাহীর আন্দোলন সংগ্রামের প্রাণকেন্দ্র ভুবন মোহন পার্কে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মোস্তাফিজুর রহমান গামার রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক 'রক্ত কথা বলে'[৫] অভিনীত হয়।[৬] তবে নাটকটি শুরু হওয়ার আগে দেশাত্মবোধক গণ-সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন আনোয়ারুল ইসলাম ও অনীল বন্ধু রায়। নাটকটি দেখতে সেদিন প্রচুর জনসমাগম হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহ করাসহ নাটকটি মঞ্চায়নে সহযোগিতা করেন জাফর ইমাম, বদিউল আলম ভুলু, হাসানুজ্জামান খোকা, আতাউর রহমান, মো. আবদুর রশিদ প্রমুখ। এতে অভিনয় করেন মোঃ আব্দুর রশিদ, বদিউল আলম ভুলু, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ আকবর হোসেন, মোঃ জাহিদ হোসেন, মোঃ আমজাদ হোসেন, আফসার মৃধা, আবদুর রশিদ (বিনোদপুর), ফারুক আজম, টগর, গোলাম পাঞ্জাতন, ইমরুল কায়েস, নূর আহম্মেদ, সোহরাব উদ্দিন লালু, মানিক (শিশু শিল্পী),

আতাউর রহমান, জাফর ইমাম[৫], ছানা, ননী, মতি, মুস্তাকিম, পলি, লালু মিয়া, আকবর প্রমুখ।[৫] এতে পলি, গীতা ও গৌরী নামে ৩ জন নারীও অভিনয় করেন। গীতা ও গৌরীকে নাটোর হতে আনা হয়।[৫] পলি ছিলেন রাজশাহীর স্থানীয় বাসিন্দা। এই নাটকে মোঃ আব্দুর রশিদ, আফসার মৃধা, ইমরুল কায়েস পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তার ভূমিকায় অভিনয় করেন। মোঃ আব্দুর রশিদ 'হুক্কা খান' (সেনাপতি টিক্কা খান) চরিত্রে অভিনয় করেন। মোঃ আমজাদ হোসেন, ফারুক আজম স্বাধীনতা বিরোধীদের ভূমিকায় অভিনয় করেন। বাকিরা সবাই মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ ভূমিকায় অভিনয় করেন। নাটকটির রূপসজ্জা, আলোকসম্পাত ও আবহসঙ্গীতে ছিলেন যথাক্রমে দুখু মাস্টার ও লালু, আবদুর রশিদ এবং আবদুল আজিজ বাচ্চু।

নাটকটি অভিনীত হওয়ার মাঝামাঝি সময়ে রাজশাহীতে খবর পৌঁছায় যে, ঢাকার নিরীহ ও ঘুমন্ত মানুষের উপর পাকিস্তান বাহিনী হায়েনার মতো হামলা শুরু করেছে।[৫] এসময় উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে সাময়িক উত্তেজনা দেখা দেয়। নাটক চলবে কি চলবে না তা নিয়ে উদ্যোক্তাগণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েন। ফলে উপস্থিত সবার মধ্যে কিছু সময়ের জন্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এমন পরিস্থিতিতে নাট্যকার মোস্তাফিজুর রহমান গামা মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'রাজশাহীর ছাত্রজনতা, কামার-কুমোর, সর্বস্তরের জনতা ঢাকা আক্রান্ত হয়েছে। এখন সারা দেশে আগুন ছড়িয়ে পড়বে। তাই সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে।'[৫]

তিনি আরো বলেন, 'যারা মানুষকে হত্যা করে তারা পশু। ওরা যদি মানুষ হত্যা করতে পারে আমরা সেই পশুকে হত্যা করবো।' নাটক শেষে আতাউর রহমান ও মোস্তাফিজুর রহমান গামা সকলকে সতর্ক থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে বলেন। তাঁরা উপস্থিত জনতাকে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য যার যার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানান। আসলে এই নাটকটি ছিলো পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়ার প্রেরণা স্বরূপ। এই নাটকের একজন দর্শকের মতে,

> নাটকে দেখানো হল সারা বাংলাদেশে আন্দোলন চলছে। আন্দোলন রূপ নিল সশস্ত্র সংগ্রামে। তরুণরা গড়ল মুক্তিবাহিনী। মরণপণ লড়াই করে আনলো ওরা স্বাধীনতা। দর্শক শ্রোতাদের রক্ত টগ বগিয়ে উঠল।"[৫]

আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ এর পটভূমি সৃষ্টি পর্বেই রাজশাহীর নাট্যকর্মীরা স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন যা আমাদের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। এক্ষেত্রে অবশ্য নাট্যকারের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করতেই হয়। বাংলাদেশ একদিন অবশ্যই স্বাধীন হবে, তবে এজন্য এদেশের আপামর জনগণকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে– নাট্যকার তার অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তা ঠিকই বুঝতে সক্ষম হন এবং শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়। এক্ষেত্রে নাট্যকার ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসাবে মুক্তিকামী বাঙালির সামনে আবির্ভূত হন।[৫] জানা যায় নাটকটি দেখে মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে অনেক যুবকই পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।[৫]

বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের জন্য আবেগ ও প্রেরণা সঞ্চারকারী এই নাটকটি ২৬ মার্চ রাজশাহীতে 'অপারেশন সার্চ লাইট' কার্যক্রম শুরু হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মঞ্চস্থ হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এরূপ অনন্য ঘটনা দ্বিতীয়টি আর ঘটেনি। এই নাটকটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে একজন যোদ্ধা লিখেছেন,

> আজ ভাবতে অবাক লাগে একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে ওই নাটকে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা যেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের হুবহু উদ্ধৃতি। শুনেছি রাম জন্মের একশ বছর আগে নাকি ঋষি বাল্মিকী রামায়ণ রচনা করেছিলেন। 'রক্ত কথা বলে' নাটকটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার আগেই রচিত এবং মঞ্চস্থ হয়। সেদিক থেকে বলা চলে 'রক্ত কথা বলে' নাটকটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের রামায়ণ- এই নাটকে অংশগ্রহণকারী রাজশাহীর নাট্যশিল্পীরা আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।[৫]

নাটকটি সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে এই নাটকের একজন অভিনেতা[৫] লিখেছেন, ভাবতে অবাক লাগে তখনও আমরা জানি না দেশের ভবিষ্যত কোনপথে? অথচ নাট্যকার কাহিনী নির্মাণ করলেন- সমগ্র দেশে আন্দোলন চলছে, আন্দোল রূপ নিল সশস্ত্র সংগ্রামে, তরুণরা গড়লো মুক্তিবাহিনী, মরণপণ লড়াই করে ওরা আনলো স্বাধীনতা।[৫]

এই নাটকে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজশাহীর নাট্যশিল্পীরা সেদিন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যে ভূমিকা রেখেছিলেন তা ছিলো অতুলনীয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই ধরনের দ্বিতীয় ঘটনার নজির পাওয়া যায় না। রাজশাহীর শিল্পী সমাজ প্রাণ হারানোর ঝুঁকির মধ্যেও নাটকটি মঞ্চায়ন করে ইতিহাসে এই অনন্য নজির স্থাপন করেন। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যথারীতি এই ঘটনাটি অনুল্লেখিত থেকেছে। কোনো গবেষক বা লেখকের লেখায় এই ঘটনার তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এই নাটকটির জন্য এর উদ্যোক্তাদের কম মূল্য দিতে হয় নি। এর জন্য পরবর্তীতে অন্তত দু'জনকে প্রাণ দিতে হয়েছে। রাজশাহী শহরের চণ্ডিপুরের ঠিকাদার হাসানুজ্জামান খোকা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই নাটক মঞ্চায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি নাটকটি মঞ্চায়নে সার্বিক সহযোগিতার পাশাপাশি আর্থিক সাহায্যও করেছিলেন। এই নাটক মঞ্চায়নের পর মধ্যরাতে বাসায় ফিরলে পাকিস্তান বাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিচালনার সময় তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। এরপর তিনি আর ফিরে আসেন নি। '*আজাদ*' পত্রিকার তৎকালীন রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি ও রাজশাহী জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবু সাঈদও এই নাটক মঞ্চায়নের ব্যাপারে আর্টস কাউন্সিল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত নীতি নির্ধারণী সভায় জোরালো সমর্থন দিয়েছিলেন। এই অপরাধে তাঁকে পাকিস্তান বাহিনীর নির্দেশে রাজাকাররা ২৮ জুন তাঁর রাজশাহী শহরের বাসা থেকে আটক করে।[৫] আরেকটি তথ্যে জানা যায় সংবাদ সংগ্রহের মিথ্যা অজুহাতে পাকিস্তান বাহিনীর সমর্থক দালাল সাংবাদিকরা তাঁকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যায়।[৬] এরপর তারা তাঁকে রাজশাহী সার্কিট হাউসে নিয়ে অত্যাচার নির্যাতন করতে থাকে। সেখানে অবর্ণনীয় নির্যাতন

শেষে তাঁকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। এখানে এক অধ্যাপকের বাড়িতে আটকে রেখে এক সপ্তাহ জুড়ে তাঁর ওপর নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হয়। পরবর্তীতে ৫ জুলাই অন্য ১৫ জন বন্দির সাথে তাঁকে শহিদ শামসুজ্জোহা হলে নিয়ে আসা হয়। এখানে তাঁকে হত্যা করা হয়।[৫]

বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে যুগান্তর সৃষ্টিকারী ঘটনা হচ্ছে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। আর এই যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে 'অসহযোগ আন্দোলন' চলাকালে রাজশাহীর সাংস্কৃতিক অঙ্গন যেভাবে জেগে উঠে তা ছিলো অভূতপূর্ব এবং অনন্য। জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের সাথে সম্পূরক কর্মসূচি হিসেবে রাজশাহীতে সাংস্কৃতিক আন্দোলনও সমানতালে সোচ্চার ও অবিরামভাবে চলতে থাকে। এটা রাজশাহীর মানুষের প্রাগ্রসরমান সাংস্কৃতিক মনন ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিচায়ক। এই আন্দোলনে রাজশাহীর শিল্পীরা নানাভাবে এগিয়ে আসে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের প্রতি ঘৃণা জানাতে। এসব সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে রাজশাহীর শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ সব বয়সী শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। এসব সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে প্রবল দেশাত্মবোধ গড়ে ওঠে এবং তাঁরা স্বাধিকার আন্দোলনে ব্যাপকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এরই ফলশ্রুতি পরবর্তীতে তাঁরা ব্যাপক সংখ্যায় দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এতে মূল্যবান অবদান রাখতে সক্ষম হন। বাঙালিরা (ত্রিশ লাখ) শহিদের এক সাগর রক্ত ও তিন লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম ও জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত করতে সক্ষম হয়। এর ফলে বিশ্বের বুকে জন্মলাভ করে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। এই ত্রিশ লাখ শহিদ ও তিন লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনের অনেকেই রাজশাহীর অধিবাসী যা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে রাজশাহীকে মহিমান্বিত করেছে।

তথ্যসূচি:

১. ১৮৫১ সালে ব্রিটিশ 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেনযথাক্রমে রাধাকান্ত দেব ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্র. ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাসকথা (১৭০৭-১৯৪৭)*, ২য় পত্র (কলিকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৫), পৃ. ২৭৩; অন্যদিকে ১৮৭২ সালের ২১ জুলাই 'রাজশাহী এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রথম নাম ছিলো 'রাজশাহী এসোসিয়েশন অব জমিন্দার্স'। দ্র. http://www.banglapedia.org/lttpdocs/HTB/104593.htm; মণি বাগচি, *আচার্য যদুনাথ: জীবন ও সাধনা*, ১ম প্রকাশ (কলিকাতা: জিজ্ঞাসা প্রকাশন, ১৯৭৫), পৃ. ২০।

২. ১৯০৪ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গকে (বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ) দু'ভাগে ভাগ করা হলে এক অভূতপূর্ব আন্দোলনের সৃষ্টি হয় যা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত।

৩. রজনীকান্ত 'কান্তকবি' নামে পরিচিত।

৪. ১৮৫১ সালে ব্রিটিশ 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেনযথাক্রমে রাধাকান্ত দেব ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্র. ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাসকথা (১৭০৭-১৯৪৭)*, ২য় পত্র (কলিকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৫), পৃ. ২৭৩; অন্যদিকে ১৮৭২ সালের ২১ জুলাই 'রাজশাহী এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রথম নাম ছিলো 'রাজশাহী এসোসিয়েশন অব জমিন্দার্স'। দ্র. http://www.banglapedia.org/lttpdocs/HTB/104593.htm; মণি বাগচি, *আচার্য যদুনাথ: জীবন ও সাধনা*, ১ম প্রকাশ (কলিকাতা: জিজ্ঞাসা প্রকাশন, ১৯৭৫), পৃ. ২০।

৫. ১৯০৪ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গকে (বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ) দু'ভাগে ভাগ করা হলে এক অভূতপূর্ব আন্দোলনের সৃষ্টি হয় যা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত।

৬. রজনীকান্ত 'কান্তকবি' নামে পরিচিত।

৭. রজনীকান্তের অসংখ্য গানের মধ্যে সাড়া জাগানো গানটি হলো 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়/ মাথায় তুলে নেরে ভাই'। এ গানটি সারা বঙ্গকে আন্দোলিত করে।

৮. প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বর্গাচাষি কর্তৃক উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকের পরিবর্তে দুই-তৃতীয়াংশ পাওয়ার লক্ষ্যে জমির মালিকদের বিরুদ্ধে ১৯৪৬-৪৭ সালের দিকে সারা বঙ্গে পরিচালিত এক ব্যাপক কৃষক আন্দোলনকে 'তেভাগা আন্দোলন' বলে। বঙ্গের ১৯টি জেলায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। তবে ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলনকে 'ভারতীয় দালালদের আন্দোলন' বলে অভিহিত করে। দ্র. http:// www.banglapedia.org/lttpdocs/HTB/102126.htm

৯. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি উর্দুর পরিবর্তে মাতৃভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ঔপনিবেশিক পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের জারি করা ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে ঢাকার রাজপথে বাঙালি ছাত্ররা মিছিল বের করে। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ এই মিছিলে গুলি চালালে সালাম, বরকত, জব্বার, রফিকসহ নাম না জানা অনেক ছাত্র-জনতা শহিদ হন। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে নেয়। এই আন্দোলনকে ভাষা আন্দোলন বলে।

১০. *দৈনিক সোনালী সংবাদ* (রাজশাহী), ১৪ এপ্রিল ২০০৯।

১১. ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রদত্ত এক বেতার ভাষণে ৩ মার্চ ঢাকায় আহুত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের আসন্ন অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিতকরণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের ডাক দেন বাংলাদেশের ইতিহাসে তা 'অসহযোগ আন্দোলন' নামে পরিচিত। এই আন্দোলন পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ২৫ মার্চের 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক বাঙালি নিধন অভিযান পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রশাসনের উপর বঙ্গবন্ধুর একচ্ছত্র প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে এতে এই অঞ্চলের প্রশাসনের উপর পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়।

১২. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৭), পৃ. ৫৫৮।

১৩. তদানীন্তন রেসকোর্সের বর্তমান নাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

১৪. অবিভক্ত পাকিস্তানের সর্বশেষ সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল টিক্কা খানের পরিকল্পনা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত মধ্যরাতে হানাদার পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক ঘুমন্ত ঢাকাবাসীর উপর পরিচালিত কাপুরুষোচিত ও বর্বরোচিত সামরিক অভিযানের নাম 'অপারেশন সার্চলাইট'। ইতিহাসের বর্বরতম এই অভিযানে সে রাতে অর্ধ লক্ষ নিরীহ ও নিরপরাধী বাঙালির প্রাণহানি ঘটে এবং তাদের সম্পদের বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়। এই অভিযান চলাকালে বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনগণের অবিসম্বাদি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করা হয়। একই সময়ে পাকিস্তান সেনারা ঢাকার বাইরে রাজশাহী, যশোর, খুলনা, রংপুর, সৈয়দপুর, কুমিল্লা, সিলেট, কুষ্টিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শমসেরনগর ও চট্টগ্রাম ইত্যাদি সেনানিবাসবিশিষ্ট শহরেও ঘুমন্ত বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দ্র. এএসএম সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা* (ঢাকা: পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ২০০০), পৃ. ২৭-২৯; রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম), *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে* (ঢাকা: অনন্যা, ১৯৮৯), পৃ. ১১১-১১৭; ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস: ১৯৪৭-৭১* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৩), পৃ. ২৩৫-২৩৬; হাসান হাফিজুর রহমান, সম্পা. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, ১৪শ খণ্ড (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২), পৃ.

৩৬৫-৯৩; Siddiq Salik, *Witness to Surrender* (Oxford: Oxford University Press Ltd., 1978), pp.71-90|

১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক* (ঢাকা), ২৩ মার্চ ১৯৭১; *দৈনিক নতুন প্রভাত* (রাজশাহী), ২৬ মার্চ ২০০৮।

১৬. মো. মোস্তফা কামাল, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: প্রেক্ষিত রাজশাহী জেলা", অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ২০১১, পৃ. ৭১।

১৭. বড়ভাই (ছদ্মনাম, প্রকৃত নাম মাহতাব উদ্দিন), সম্পা. *রাজশাহী বিভাগীয় মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি সমাবেশ-২০০৩: স্মরণিকা* (রাজশাহী: কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ২০০৩), পৃ. ১৬।

১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ মার্চ ১৯৭১; *আজাদ* (দৈনিক, ঢাকা), ১২ মার্চ ১৯৭১; *দৈনিক পাকিস্তান* (ঢাকা), ১৮ মার্চ ১৯৭১।

১৯. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৮ মার্চ ১৯৭১।

২০. *তদেব*।

২১. ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন।

২২. তদেব।

২৩. সাক্ষাৎকার: সারওয়ার হোসেন বাবলা, ঝাউতলা, লক্ষীপুর, রাজশাহী, তারিখ: ১০ জানুয়ারি ২০১০; ২০০৭ সালে এক অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা মাহতাব উদ্দিন আমাকে একই তথ্য জানিয়েছেন। আরো দেখুন, মো. আবদুর রশিদ, 'পঁচিশে মার্চ একাত্তরে ভুবনমোহন পার্কে নাটক', অন্তর্গত, মনসুর আহমদ খান, সম্পা. *মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ. ২৫।

২৪. আতাউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম সবাক ছবি 'মুখ ও মুখোশ'-এর একজন অভিনেতা ছিলেন।

২৫. মো. আবদুর রশিদ, 'পঁচিশে মার্চ একাত্তরে ভুবনমোহন পার্কে নাটক', অন্তর্গত, খান, সম্পা. *মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী*, পৃ. ২৫; *দৈনিক সোনালী সংবাদ*, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৩।

২৬. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৮ মার্চ ১৯৭১।

২৭. এসম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধা শরীফ উদ্দিন তাঁর ডায়রিতে লিখেছেন, 'ক'দিন থেকে দেখছি রাজশাহীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক শিল্পী গোষ্ঠি উঠে পড়ে লেগেছে। তারা প্রতিদিন পথ অনুষ্ঠানে ও ট্রাকযোগে গণ উদ্দীপনামূলক গণসঙ্গীত ও পথ নাট্য পরিবেশন করে বেড়াচ্ছেন। সত্য তাদের প্রশংসা করার ভাষা আমার জানা নাই।' দ্র. মাহতাব উদ্দিন, 'মোঃ শরীফ উদ্দিনের ডাইরী থেকে: মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব কথা ও রাজশাহী পুলিশ লাইনের যুদ্ধ" অন্তর্গত, *সাপ্তাহিক গণখবর* (রাজশাহী), ৫- ১১ মে ১৯৯৬।

২৮. মো. আবদুর রশিদ, 'পঁচিশে মার্চ একাত্তরে ভুবনমোহন পার্কে নাটক', অন্তর্গত, খান, সম্পা. *মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী*, পৃ. ২৫। দ্র. মাহতাব উদ্দিন, 'বিশ্বাস করুন যুদ্ধ শুরুর আগেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়', অন্তর্গত, অনিক ইসলাম, *প্রজন্ম: ৭১ এর সাহিত্য পত্রিকা*, বাড়ি-১, রোড-১, পারিজাত আবাসিক এলাকা, রাজশাহী, ২০০৭, পৃ. ৭; তবে একজন মুক্তিযোদ্ধা তাঁর বিভিন্ন লেখা ও সাক্ষাৎকারে এই নাটকের নাম 'রক্তের রং লাল' বলে উল্লেখ করেছেন। সাক্ষাৎকার: সারওয়ার হোসেন বাবলা, ঝাউতলা, লক্ষীপুর, রাজশাহী, তারিখ: ১০ জানুয়ারি ২০১০; দ্র. *দৈনিক সোনালী সংবাদ*, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৩; আরেকজন লেখকও এই নাটকের নাম 'রক্তের রং লাল' বলে উল্লেখ করেছেন। দ্র. অধ্যাপক ফজলুল হক, 'রাজশাহী শহরে সাংস্কৃতিক আন্দোলন', অন্তর্গত, মো. মাহবুবর রহমান, সম্পা. *রাজশাহী মহানগরী: অতীত ও বর্তমান*, ১ম খণ্ড, (রাজশাহী: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২), পৃ. ৫১৮।

২৯. অবশ্য অন্য একজন লেখক এই নাটকের রচয়িতা হিসেবে আতাউর রহমানের নাম উল্লেখ করেছেন। দ্র. অধ্যাপক ফজলুল হক, 'রাজশাহী শহরে সাংস্কৃতিক আন্দোলন', অন্তর্গত, মো. মাহবুবর রহমান, *রাজশাহী মহানগরী: অতীত ও বর্তমান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৮-১৯। তবে মাহতাব উদ্দিন এই নাটকটি ত্রয়ী

রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, '... আনোয়ারুল ইসলামের কাছে জেনেছি নাটকটির রচয়িতা হিসেবে আতাউর রহমানের নাম ব্যবহার করা হলেও সংলাপ রচনায় তিনি ও গামা ভাইও ভূমিকা রাখেন। সেদিক থেকে নাটকটি ত্রয়ী রচনা।' দ্র. মাহতাব উদ্দিন, 'বিশ্বাস করুন যুদ্ধ শুরুর আগেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়', অন্তর্গত, অনিক ইসলাম, *প্রজন্ম: ৭১ এর সাহিত্য পত্রিকা*, রাজশাহী, ২০০৭, পৃ. ১১-১২।

৩০. তিনি কুখ্যাত এনএসএফ কর্মী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির বিরোধিতায় নামেন এবং পাকিস্তান সেনাদের সহযোগিতা করার অনেক অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। পাকিস্তানিদের দালাল হিসাবে মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত তালিকায় তাঁর স্থান ছিলো চতুর্থ নম্বরে। প্রথম ছিলেন আয়েন উদ্দিন, দ্বিতীয় জামাত নেতা আফাজ মোক্তার, তৃতীয় ডা. জোবায়দা। দ্র. মাহতাব উদ্দিন, 'বিশ্বাস করুন যুদ্ধ শুরুর আগেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়', অন্তর্গত, অনিক ইসলাম, *প্রজন্ম: ৭১ এর সাহিত্য পত্রিকা*, রাজশাহী, ২০০৭, পৃ. ১১; প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য জাফর ইমাম ও ডা. জোবায়দা ছিলেন দম্পতি। পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর জাফর ইমাম জাতীয় পর্যায়ের একজন ক্রীড়া সংগঠকে পরিণত হন এবং তাঁর নামে রাজশাহী টেনিস কমপ্লেক্সের নামকরণ করা হয় 'জাফর ইমাম টেনিস কমপ্লেক্স'।

৩১. মো. আবদুর রশিদ, 'পঁচিশে মার্চ একাত্তরে ভুবনমোহন পার্কে নাটক', অন্তর্গত, খান, সম্পা. মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী, পৃ. ২৫; সাক্ষাৎকার: সারওয়ার হোসেন বাবলা, ঝাউতলা, লক্ষীপুর, রাজশাহী, তারিখ: ১০ জানুয়ারি ২০১০; মাহতাব উদ্দিন, 'বিশ্বাস করুন যুদ্ধ শুরুর আগেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়', অন্তর্গত, অনিক ইসলাম, *প্রজন্ম: ৭১ এর সাহিত্য পত্রিকা*, পৃ. ১৩।

৩২. গীতা ও গৌরী সহোদরা ছিলেন। তবে এই নাটকে অংশ নিতে নাটোর থেকে আসার কথা ছিলো পুতুল ও অপর্ণা নামক দু'জন প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রীর। কিন্তু পাকিস্তানপন্থী ষড়যন্ত্রকারী মহল হত্যার হুমকি দিলে তাঁরা আর রাজশাহীতে আসেননি। পরে গীতা ও গৌরীকে আনা হয়। কোনরূপ প্রস্তুতি ছাড়া নাটোর থেকে আসা এই দু'বোনের অভিনয় সেদিন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তা বহুল প্রশংসিত হয়।

৩৩. যখন ভুবন মোহন পার্কে নাটকটি মঞ্চস্থ হচ্ছিলো তখন রাজশাহী তথা বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সেদিন অনেকেই নাট্যকার মোস্তাফিজুর রহমান গামাকে নাটকটির মঞ্চায়ন বন্ধ করে দিতে অনুরোধ করেন। কারণ যেকোনো সময় এই পার্কে পাকিস্তান বাহিনী হামলা চালাতে পারে এমন শঙ্কা ছিলো সেখানে উপস্থিত সবার মাঝে। তবে নাট্যকার দৃঢ়তার সাথে তাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'নাটক শুরু হয়েছে নাটক শেষ হবে। আপনারা নির্ভয়ে সাহসের সাথে নাটক দেখেন।' সেদিন পুরো নাটকটিই মঞ্চস্থ হয়। দ্র. *দৈনিক সোনালী সংবাদ*, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৪ এবং ১৩ মার্চ ২০০৬ ।

৩৪. *দৈনিক সোনালী সংবাদ*, ১৩ মার্চ ২০০৬ এবং ১৩ ডিসেম্বর ২০১০; এই নাটকের আরেকজন দর্শক এসম্পর্কে বলেন, 'ভুবনমোহন পার্কের স্টেজে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে গুরগম্ভির কণ্ঠে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কিছুটা বলা হচ্ছে। এত লোকের সমাগম দেখে কৌতূহল বশতঃ আমিও থেমে গেলাম। রিক্সার পাদানিতে দাঁড়িয়ে মাইকের কথা শুনতে পাইলাম। তিনি বললেন আপনারা সাহসের সাথে নাটক দেখুন ওরা যদি একটি মানুষকে হত্যা করে আমাদের অধিকার আছে পশুকে হত্যা করার। নাটক শেষ হবেনা। আমিও থাকব আপনারাও থাকবেন। নাটক আমরা শেষ করব। দ্র. *দৈনিক সোনালী সংবাদ*, ২০ ডিসেম্বর ২০০৩।

৩৫. *দৈনিক সোনালী সংবাদ*, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৩।

৩৬. মাহতাব উদ্দিন, 'বিশ্বাস করুন যুদ্ধ শুরুর আগেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়', অন্তর্গত, অনিক ইসলাম, *প্রজন্ম: ৭১ এর সাহিত্য পত্রিকা*, পৃ. ৭।

৩৭. *দৈনিক সোনালী সংবাদ*, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৪ এবং ১৩ মার্চ ২০০৬।

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

কাশ্মীর সংকট: প্রেক্ষাপট ও অগ্রগতি পর্যালোচনা

মো. সুলতান মাহমুদ*

Abstract: The paper is to explore by discussing the origins of the independence movement in Kashmir. It starts with an examination of Kashmir historical background then discusses the numerous factors contributing to the current situation. The article is to explore for resolving the crisis through cricket diplomacy between India and Pakistan regarding the Kashmir crisis. The paper considers why this region has been so hotly fought for so many years. This is also explore how many militants group and their member are active in Kashmir. Finally I would focus much more directly on about nine possible options which have been suggested variety of the possible resolution of the crisis. The paper is based on secondary sources of information like books, journals, research reports and newspapers. Relevant literatures have also been collected through internet browsing.

ভূ-স্বর্গ নামে পরিচিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপূর্ব লীলাভূমি কাশ্মীর অবিভক্ত ভারতের সর্ববৃহৎ দেশীয় রাজ্য। এর আয়তন প্রায় ২ লাখ ২২ হাজার ২৩৬ বর্গ কি.মি.। ১৯৫১ সালের হিসাব মতে এর লোকসংখ্যা ছিল ৪০ লাখ যা বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ। তার মধ্যে ৬৪% মুসলমান, ৩২% হিন্দু এবং অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্মানুসারী। কাশ্মীর মূলত দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগ নিয়ন্ত্রণ করে ভারত যা জম্মু-কাশ্মীর নামে পরিচিত এবং এর আয়তন মোট কাশ্মীরের তিন ভাগের দুই ভাগ। অপরভাগ নিয়ন্ত্রণ করে পাকিস্তান যা আজাদ কাশ্মীর নামে পরিচিত। জম্মু কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর ও আজাদ কাশ্মীরের রাজধানী মুজাফ্‌ফরাবাদ। এখানকার জনগণ উর্দ্দু, কাশ্মীরী, ডোগরি, লাদাখি ইত্যাদি ভাষায় কথা বলে।[১]

কাশ্মীর তিনটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকায় বিভক্ত। মুসলমান অধ্যুষিত উত্তরাঞ্চল, পূর্বে বৌদ্ধ প্রধান লাদাখ ও দক্ষিণে হিন্দু এলাকা জম্মু। আজাদ কাশ্মীরকে পাকিস্তান তাদের পঞ্চম রাজ্য হিসেবে মনে করে। প্রাক ইসলামী যুগে কাশ্মীর হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দু রাজণ্যবর্গ কর্তৃক শাসিত হয়। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধে এটি উত্তর ভারতের কুশান বংশের সুবিশাল রাজত্বের একটি অংশ ছিল বলে জানা যায়। খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে কাশ্মীর কুশান বংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের শাসনাধীন ছিল। এ সময় 'হুন' শাসকগণ কাশ্মীর দখল করে এবং এ অঞ্চলের নাম করেন 'কাশ্মীর'। এটি কাশির নাম থেকে উদ্ভূত। মুসলমানদের সিন্ধু জয়ের পর পরই কাশ্মীরে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা পাওয়া শুরু করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় কাশ্মীর কখনও দিল্লী নিয়ন্ত্রিত কখনও বা আঞ্চলিক শাসনকর্তা দ্বারা শাসিত হয়।

*প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৮৬৪ সালের ১৬ মার্চ অমৃতসর চুক্তি মোতাবেক তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ৭৫ লাখ টাকার বিনিময়ে গলাব সিংহ নামক জনৈক দেশীয় জেগরা গোষ্ঠীর হিন্দু জমিদারের নিকট বিক্রি করে। তখন থেকে কাশ্মীর স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা ভোগ করে আসছিল।[১] কাশ্মীরের অবস্থান, ভারত-পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক বিবেচনায় কাশ্মীর সংকট সংক্রান্ত আলোচনা রাজনীতি সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রে রূপায়িত হয়েছে। এমনই গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে সামনে রেখে কাশ্মীর সমস্যার একটি ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এ প্রবন্ধে কাশ্মীর সমস্যার উৎপত্তি, ইতিহাস, বিরাজিত সংকট ও সংকট সমাধানের অগ্রগতি পর্যালোচনা সাপেক্ষে কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

কাশ্মীর সমস্যার ইতিহাস

পৃথিবীর স্বর্গ হিসেবে খ্যাত কাশ্মীরে আজ বিরাজ করছে এক দুঃসহ নারকীয় পরিবেশ। মানবতার আর্তনাদ, লাশ আর বারুদের পোড়া গন্ধে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ এশীয় শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি সবচেয়ে তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে কাশ্মীর সমস্যা। ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক অবনতির পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে কাশ্মীর সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে চারটি যুদ্ধ (১৯৪৭, ৬৫, ৭১ ও ৯৯ সালে) সংঘটিত হয়েছে তার তিনটিই কাশ্মীর নিয়ে। এ সমস্যা উভয় দেশকেই আস্তে আস্তে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে ফেলছে। উভয় দেশই সীমান্তে সৈন্য ও অস্ত্রের মজুদ বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। উভয় দেশের বাজেটের বিরাট একটি অংশ বরাদ্দ করা হয় সামরিক খাতে যা দেশ দু'টির দারিদ্র্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। পর্যবেক্ষকগণ এ বিষয় নিয়ে আরও একটি যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন, যার ফলাফল অনেক ভয়াবহ হতে পারে। এ সমস্যার প্রকৃতি বুঝতে পেরে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এটাকে 'Pandora's Box' এবং জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব উথান্ট 'Time Bomb' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ১৯৯০ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ৪০ হাজারের অধিক নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।[১] নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হয়েছে হাজার হাজার নারী ও কিশোরী। তাই বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে এ সমস্যার সমাধান হওয়া একান্ত কাম্য।

পাকিস্তানি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর বিখ্যাত দ্বি-জাতিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা ধর্মের ওপর ভিত্তি করে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে পাকিস্তান এবং হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে হিন্দুস্থান বা ভারত গঠন করলেও মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা কাশ্মীরের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেয় নি। কাশ্মীরসহ দেশীয় রাজ্যগুলোকে স্বাধীনতা দেওয়ার পরিবর্তে তাদের ইচ্ছানুয়ারী ভারত অথবা পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিধান রাখা হয়েছিল। এ ব্যবস্থা অনুযায়ী অধিকাংশ রাজ্য ভারতের সাথে এবং কিছু কিছু পাকিস্তানের সাথে অঙ্গীভূত হয়। কিন্তু কাশ্মীরের তৎকালীন হিন্দু রাজা (গলাবসিং এর বংশধর) হরিসিং কাশ্মীরকে একটি নিরপেক্ষ স্বায়ত্বশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে নেহেরু ও জিন্নাহ উভয়ের বিরাগভাজন হন। ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই কাশ্মীরকে তাদের সাথে একীভূত হওয়ার জন্য মনোস্তাত্ত্বিক চাপের মধ্যে রাখে।[১]

কাশ্মীরের জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন খাদ্য সামগ্রী, লবণ, কেরোসিন, পেট্রোল, ভোজ্য তেল ইত্যাদি পূর্ব থেকেই পাকিস্তান থেকে সরবরাহ করা হত। কিন্তু পাকিস্তান হঠাৎ করে এরূপ জরুরী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কাশ্মীরে সরবরাহ বন্ধ করে দেয় এবং পাকিস্তানের সাথে একীভূত হওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। এমতাবস্থায় মহারাজা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে থাকে। বিপর্যয় কেটে ওঠার জন্য মহারাজা আস্তে আস্তে ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্তির দিকে আগাতে থাকে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীরের ইসলামী জাতীয়বাদী দলগুলো পাকিস্তানের সহায়তায় হিন্দু রাজা হরিসিং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করলে হিন্দু মহারাজা ভারত বন্ধু নামে কথিত শেখ আব্দুল্লাহর পরামর্শে ভারতের সামরিক সাহায্য কামনা করে। ভারত কাশ্মীরকে ভারতের সাথে একীভূত হওয়ার শর্তে সামরিক সাহায্য প্রদানে রাজি হয়। ১৯৪৭ সালের ২৪ অক্টোবর ভারত কাশ্মীরে হস্তক্ষেপ করলে ২৪-২৭ অক্টোবর ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে ভারত কাশ্মীরের দুই তৃতীয়াংশ (জম্মু কাশ্মীর) দখল করে এবং পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে আসে এক-তৃতীয়াংশ (আজাদ কাশ্মীর বা মুক্ত কাশ্মীর)। ১৯৪৮ সালের ১৭ জানুয়ারি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ পাক-ভারত বিরোধ নিরসনের প্রচেষ্টাস্বরূপ এক প্রস্তাব পাশ করে। এর তিন দিন পরে জানুয়ারির ২০ তারিখে ভারত ও পাকিস্তানের জন্য জাতিসংঘ কমিশন সৃষ্টি করে এবং যুদ্ধ বিরতির জন্য জাতিসংঘ বাহিনী গঠন করে। কিন্তু জাতিসংঘ বাহিনী গঠনে দীর্ঘ সময় নেয় এবং ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয় এবং সেখানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করা হয়।[২]

১৯৪৮ সালের ১৩ আগস্ট জাতিসংঘ ৪৭ নং প্রস্তাব এবং ১৯৪৯ সালের ৫ জানুয়ারি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে গঠিত শান্তি কমিশনের প্রস্তাবে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই কাশ্মীরের ভবিষ্যত কাশ্মীরের জনগণের মতামতের ওপর নির্ভর করবে বলে মেনে নিতে সম্মত হয়। কিন্তু ভারত কাশ্মীরী জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে ১৯৫৭ সালের ২৩ জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধানের ১নং ধারা মোতাবেক কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ৩৭০ নং ধারা মোতাবেক এ অঞ্চলকে কেন্দ্র শাসিত প্রদেশে পরিণত করে সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। স্বভাবত কারণেই পাকিস্তান কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের এ ভূমিকাকে মেনে নিতে পারে নি। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান পাশ্চাত্য সামরিক জোটে যোগ দিলে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির পাকিস্তান প্রীতি বেড়ে যায়।

১৯৫৫ সালে ভারত সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মৈত্রীচুক্তির পর নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারত-বিরোধী প্রস্তাব উঠলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তাতে একতরফাভাবে ভেটো দিত। সে কারণে ১৯৫২ ও ১৯৬২ সালে পাকিস্তান কাশ্মীর বিতর্ক জাতিসংঘে তুললে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এর বিরোধিতা করে। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সমস্যা উত্থাপন করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতকে শুধু সমর্থনই করে নি বরং কাশ্মীরকে ভারতের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ যা কাশ্মীরের জনগণ কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে বলে বর্ণনা করে।[১]

কাশ্মীরকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় ১৯৬৫ সালের পাক ভারত ২য় যুদ্ধ। সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ অঞ্চলটির অধিকার ভোগ করতে দুটি দেশই এক ইঞ্চি পরিমাণ জমি ছাড়তে নারাজ। তৎকালীন পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর পরামর্শে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের নির্দেশে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ ও ভারতের গুজরাটের সীমান্তবর্তী 'রান অব কচ্ছ' এর জলাভূমিতে পাকিস্তানের একটি ছোট্ট বিতর্কিত এলাকার মালিকানা নিয়ে পাক সেনাবাহিনী শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় এবং এলাকাটি অনায়াসে দখল করে নেয়।

ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে পাক-হস্তক্ষেপ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর কাশ্মীর ও লাদাখের যোগাযোগ পথের উপর কারগিল ঘাঁটি থেকে আক্রমণ করে ১৭ দিন ব্যাপী দ্বিতীয় পাক ভারত যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানের কারগিলের দু'টি ঘাঁটি দখল করে নেয়। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সো কোসিগানের আমন্ত্রণ ও মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে দুদেশের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে এক শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা শেষে ১৯৬৫ সালের ১০ জানুয়ারি উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ বিরতির একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা "তাসখন্দ চুক্তি" নামে পরিচিত।[৩]

এ চুক্তি অনুসারে উভয় রাষ্ট্র ১৯৬৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি উভয় পক্ষের সেনাবাহিনী আগের নির্ধারিত সীমানায় ফিরে নিয়ে যায় এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে পারস্পরিক স্বার্থের খাতিরে চুক্তি অনুসারে ভারত তার অধিকৃত কারগিলের দুটি ঘাঁটি পাকিস্তানকে ফেরত দেয়। কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে পাক ভারত তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী শুধুমাত্র বাংলাদেশেই পর্যদুস্ত হয় নি। পশ্চিম সীমান্তেও পর্যদুস্ত হয়।

১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাকিস্তান হেরে যায় ৬ ডিসেম্বর ভারত স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। অপরদিকে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্পষ্ট জানান পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারত কখনও স্বীকার করে না এবং তিনি পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে দখলমুক্ত করার চেষ্টা চালান। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হুঁশিয়ার করে দেয় যে, ভারত যদি কাশ্মীরকে মুক্ত করতে চায় তবে মার্কিন নৌবাহিনী ভারতের ওপর পাল্টা আঘাত হানবে। কারণ, ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকলে দক্ষিণ এশিয়ার সামরিক ক্ষমতা বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সাবেক সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগানের পরামর্শে ইন্দিরা গান্ধী তার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। তারপর ১৯৭২ সালে পুরীতে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যাবতীয় ভুল বুঝাবুঝি, বিবাদ দূর করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭২ সালের ৩ জুলাই ভারত ও পাকিস্তানের পক্ষে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ঐতিহাসিক 'সিমলা চুক্তি' নামে পরিচিত। ভারতের পক্ষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের পক্ষে জুলফিকার আলী ভুট্টো এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ঐতিহাসিক সিমলা চুক্তিতে বলা হয়েছিল-

> ভারত ও পাকিস্তান সরকার সংঘর্ষের ঘটনা, যা উভয় দেশের মধ্যে এতকালের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য, তার অবসান করে, সদিচ্ছা, সহযোগিতা, সম্পর্কের উন্নয়ন এবং স্থায়ী শান্তিপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক আপোস আলোচনার পদ্ধতিতে বা উভয়দের ঐক্যমত হলে অন্য কেনো শান্তিপূর্ণ পন্থায় মতানৈক্যের অবসান করবে। চুক্তি স্বাক্ষরের দু'যুগ অতিবাহিত হলেও দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততার অবসান আজও ঘটে নি। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কাশ্মীর সমস্যা কিছুটা স্তিমিত থাকলেও ৯০ এর দশকে কাশ্মীর পরিস্থিতি অহিংস রূপ ধারণ করে। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরবাসী একটি লং মার্চের আয়োজন করে সীমান্ত অতিক্রম করলে পাকসেনার গুলিতে কয়েকজন কাশ্মীরী মারা যায়।[৩]

তখন থেকে পাক-ভারত উত্তেজনা দেখা দেয়। ১৯৯৩ সালের ১৪ অক্টোবর শ্রীনগরের হযরত বাল মসজিদের জঙ্গি কাশ্মীরীরা আগমন করলে ১৫ অক্টোবর ১০ হাজার ভারতীয় সৈন্য সেটি ঘিরে ফেলে এবং তাদের ভীতি প্রদর্শন করে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। জম্মু ও কাশ্মীরের কারগিল ও দ্রাস সেক্টরকে কেন্দ্র করে ভারত পাকিস্তান চতুর্থ যুদ্ধ সংগঠিত হয় ১৯৯৯ সালের ৬ মে থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত যা কারগিল যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় ৩০০ জন অফিসার ও জওয়ান প্রাণ হারায় এবং আহত হয় প্রায় ৫০০ জন।[৩]

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মতে, পাকিস্তানের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান ২৫ মে, ১৯৯৯ এ সংঘর্ষ সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ২৭ মে, ১৯৯৯ কমনওয়েলথ মহাসচিবও একইভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এবং উভয় পক্ষকে আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে বলেছেন। কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখার মাধ্যমে প্রথম পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা খোলাখুলি কারগিল যুদ্ধে ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করেছে। গত ৫৩ বছরে ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষে ১৯৯৯ সালে বিশ্বের প্রধান দেশগুলো ভারতের অবস্থান সঠিক বলেছে।[৩]

৭২-এর সিমলা চুক্তির সময় চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ রেখা মেনে নেওয়ার জন্য পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ১৯৯৯ সালের ৫ জুলাই ওয়াশিংটনে আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে তিন ঘণ্টা আলোচনা হয় এবং এক ধরনের চাপের মাধ্যমে পাকিস্তানকে এ যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করানো হয়, যা ভারতের জন্য একটি বড় ধরনের সাফল্য হিসেবে বিবেচিত।[৩] এভাবেই কাশ্মীর সংকট শুরু কিন্তু আজও এর ফলপ্রসূ কোনো সমাধান হয় নি।

কাশ্মীরে মুজাহিদদের অনুপ্রবেশ

১৯৪৭ সালের পর কাশ্মীরবাসীর আন্দোলন কখনো জোরদার আবার কখনো স্তিমিত হয়েছে। তবে একেবারে নিষ্প্রভ হয় নি। পরবর্তীকালে মুক্তিকামী কাশ্মীরী জনগণের আজাদী লড়াইয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে পাকিস্তান, আফগানিস্তানসহ অনেক মুসলিম দেশের গোঁড়াপন্থী মুসলিম সংগঠনের সদস্যরা। তারা অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত। প্রকৃতপক্ষে ১৯৮৪ সাল থেকেই পাকিস্তানের সমর্থনপুষ্ট উগ্র মৌলবাদী

গ্রুপগুলো কাশ্মীরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। ১৯৮৪ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তাদের হাতে ২৩ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে।[৩] পাক-ভারত বাকযুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন 'হিজবুল মুজাহেদিন' গোষ্ঠীর বিবৃতি উভয় দেশের উত্তেজনক পরিস্থিতিকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে। অনুরূপ একটি বিচ্ছিনতাবাদী মুসলিম জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তাইয়েবা'র মুখপাত্র আব্দুল্লাহ মুনতাজির টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছিলেন 'গোটা বিশ্বের মুসলিম স্বেচ্ছাসেবীরা কাশ্মীরের ধর্মযুদ্ধে যোগদান করার জন্য আমাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন।' মুসলিম মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের অঘোষিত সম্রাট ওসামা বিন লাদেন আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে সুবিধা করতে না পেরে এখন নজর দিয়েছেন কাশ্মীর এর ওপর। ভারতের আউটলুক পত্রিকায় (৫ জুলাই ৯৯) কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে লাদেনের নতুন পরিকল্পনার একটি চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

ওসামা বিন লাদেন ১৯৯৮ এ সাংবাদিকদের বলেছিলেন পাকিস্তানের উচিত সীমান্ত উন্মুক্ত করে তাদের বাহিনীর প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপনের জন্য জায়গা দেয়া, যাতে মুজাহিদিনরা কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য জেহাদ করতে পারে। হরকাতুল মুজাহিদিনের প্রধান মাওলানা ফজলুর রহমান খলিল ১ জুন ৯৯ দাবি করেছেন কারগিল যুদ্ধের সূচনা তারাই করেছেন। লস্কর-ই-তৈয়বার প্রধান হাফিজ সাঈদ ও জড়িত ছিল। লন্ডনের একটি দৈনিক পত্রিকা থেকে জানা যায়, 'ইউনাইটেড জিহাদ' নামে একটি জোট গঠন করে ১৪ টি মুসলিম সংগঠন কাশ্মীরের লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা চালিয়েছেন।[৩] এভাবে এ সংগঠনটি কাশ্মীরেও তাদের প্রভাব বিস্তারে ব্যস্ত ছিল।

কাশ্মীরে জঙ্গী গ্রুপসমূহ[১]

হরকত-উল-আনসার: যার সদস্য সংখ্যা ১০০০ যার মধ্যে ৭৫০ জনই বহিরাগত। এরা পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীরের একত্রীকরণ চায়। **লস্কর ই-তাইয়েবা:** ৩০০ সদস্যের এ জঙ্গি গ্রুপটি পাকিস্তানি ও আফগানদের সমন্বয়ে গঠিত। এরা কুপবারা, বারামুল্লাহ এবং বাদগান অঞ্চলে কাজ করে। **হিজবুল মুজাহিদীন:** সবচেয়ে বড় জঙ্গিগ্রুপ। এদের সংখ্যা প্রায় ৪,০০০। এরাও পাকিস্তানপন্থী এবং ১,৫০০ বিদেশী সদস্য আছে। পুরো কাশ্মীর উপত্যকাতেই এদের প্রভাব লক্ষণীয়। **মুসলিম মুজাহিদীন:** এদের সদস্য সংখ্যা হাজার খানেক বারামুল্লাহ এবং অনন্ত নাগে এরা সক্রিয়। **আল-ফারান:** নবগঠিত, সদস্য সংখ্যা অজানা তবে খুব শক্ত ধাচের সংগঠন। **আল উমর:** এর সদস্য সংখ্যা ৬০০ হলেও কওমী এ্যাকশন কমিটি আছে এদের পিছনে। এরা স্বাধীনতাকামী। **আল বারাক:** হুরিয়াত কনফারেন্স এর অন্যতম নেতা আবদুল ঘানি লোমের জঙ্গি সংগঠন। এর সদস্য সংখ্যা ১০০ এর মতো। **মুসলিম জানবাজ ফোর্স:** ৩০০ সদস্য নিয়ে সাটির শাহ দলটি গড়েছেন। দোদাপুঞ্চ ও শ্রীনগরে এরা সক্রিয়। **ইখওয়ান-ই-মুস্যলিমুন:** কোকা পাটির নেতৃত্বাধীন আধাজঙ্গি একটা দল। **জেকেএল এফ:** রাজনৈতিক জঙ্গি সংগঠন, সারা কাশ্মীরে এদের প্রচুর সমর্থক। এরা স্বাধীনতাকামী।

কাশ্মীরী জনগণের জাগরণ

১৯৭০ দশকে কাশ্মীর সমস্যা কিছুটা স্তিমিত থাকলেও, ১৯৯০-র দশক তথা বর্তমান বছরগুলোতে এ সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কাশ্মীর জনগণের জাগরণ এমন পর্যায়ে

পৌঁছে যে, এটিকে পাকিস্তান ও ভারত উভয়কে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খেতে হয়। মুসলিম অধ্যুষিত মুসলিম জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রথম থেকেই সংগ্রাম করে আসছে। তাদের এ সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্যে দুটি। প্রথমত ভারতীয় শাসনের অবসান। দ্বিতীয়ত জম্মু ও কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ অবস্থা নির্ধারণ করার জন্য গণভোট অনুষ্ঠান। হিযবুল মুজাহিদীন পুরো কাশ্মীরকে পাকিস্তানের সাথে একীভূত হওয়ার পক্ষপাতি। যুগ যুগ ধরে বসবাস করলেও কাশ্মীরী মুসলমানগণ নিজেদের আলাদা সত্তা হিসেবে জানে তারা সহজে ভারতের সাথে কাশ্মীরকে একীভূত হওয়াকে মেনে নিতে পারে নি।[৪] আর তাদের বঞ্চনার এই অনুভূতিই বর্তমান বিস্ফোরনুখ পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সাহায্য করে। যেসব মূল কারণ এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সেগুলো হলো:

ভারতের বিভিন্ন মহলে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা দানকারী সংবিধানের ৩৭০ নং ধারা বিলোপের দাবি জোরদার হয়েছে। কাশ্মীরী মুসলমানরা আশংকা প্রকাশ করছে যে, উক্ত ধারার বিলোপের ফলে তাদের নিজস্ব পরিচিতি সংস্কৃতি এবং ভাষার প্রতি হুমকি সৃষ্টি হবে।

১. ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কখনো রাজ্য সরকার নির্বাচন অবাধ ও মুক্ত হতে দেয়না। ফলে সেখানে পুতুল শাসককে বসানো হয় যা প্রকৃতপক্ষে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না।
২. জম্মু ও কাশ্মীরে কেনো "সিভিল লিবার্টি" নেই।
৩. কেন্দ্রের সাহায্য স্থানীয় সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছায় না।
৪. জম্মু ও কাশ্মীরের শিল্প উন্নয়নের জন্যে কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নি।
৫. কাশ্মীরী মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু বেকারত্ব নিরসনে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। যদিও কাশ্মীরী মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ট। কিন্তু উচ্চতর পদে তাদের সংখ্যা ৬ ভাগের বেশি নয়।
৬. গত চার দশকে সরকারি খাতে জাতীয় বিনিয়োগের পরিমাণ ৮৬,০০০ কোটি রুপি। কাশ্মীর পেয়েছে এর মাত্র প্রায় ০.০৩ ভাগ ।
৭. ভারতীয় পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীদের দ্বারা নৃশংসতায় কাশ্মীরী মুসলমানগণ অতিষ্ঠ। মানবাধিকার লংঘন অহরহ ঘটছে।[৪]

বঞ্চনার এ অনুভূতি কাশ্মীরী জনগণকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের উৎসাহ যুগিয়েছে। সম্প্রতি এ আন্দোলন জোরদার হওয়ার পেছনে কয়েকটি উপাদান কাজ করছে।

প্রথমত: বিশ্বে কম্যুনিজম-এর পতন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনের ফলে পুরো আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও মুক্তিকামী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। **দ্বিতীয়ত:** রাম জন্মভূমি বাবরী মসজিদ বির্তক এবং ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু মৌলবাদী B.J.P এর উত্থানে কাশ্মীরীজনগণ উদ্বিগ্ন হয়। **তৃতীয়ত:** সম্প্রতি ভারতে যতগুলো সরকার গঠিত হয়েছে তাদের অধিকাংশই অস্থিতিশীল এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কাশ্মীরী জনগণ আন্দোলন করে।

চতুর্থত: কাশ্মীরী জনগণ বুঝতে পেরেছে যে, ভারত কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানে রাজি নয় এবং পাকিস্তান ও জাতিসংঘ এ ব্যাপারে ভারতকে বাধ্য করতে ইচ্ছুক নয়। তাই তারা নিজেরাই তাদের অধিকার আদায়ে নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কাশ্মীরী বিদ্রোহী গ্রুপগুলো নানা ধরণের কৌশল অবলম্বন করেছে এবং তাদের ব্যবহৃত কৌশলে কিছুটা সফলকাম হয়েছে। তবে বর্তমানে অবশ্য এ আন্দোলনে কিছুটা ভাটা পড়ে। কাশ্মীরী আন্দোলনে পাকিস্তানি সরাসরি সমর্থন হ্রাসই এর মূল কারণ।[৪] ৯/১১ এর ঘটনার পর ইসলামী জঙ্গী গোষ্ঠীগুলোর প্রতি মার্কিন কঠোর নীতির প্রেক্ষাপটেই পাকিস্তান এই সমর্থন হ্রাস করে।

পাক-ভারত কূটনীতি: ভারতের অবস্থান

কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তানের কূটনীতি সর্বদাই তৎপর। উভয় পক্ষই তাদের স্ব-স্ব অবস্থানকে তুলে ধরে এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। ভারত সর্বদাই কাশ্মীরকে তার নিজস্ব ভূখণ্ড হিসেবে দাবি করে। আর এই দাবির স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি ও অবস্থান উত্থাপন করে তার কূটনীতি চালিত করে।

প্রথমত: কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আর এটি আইনের দৃষ্টিতে বৈধ। কেননা, ১৯৪৭ সালে তৎকালীন হিন্দু মহারাজা কাশ্মীরকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত ইউনিয়নের সাথে একীভূত করেছে। **দ্বিতীয়ত:** গণভোট সংক্রান্ত জাতিসংঘের প্রস্তাব ভারতের পক্ষে মানা সম্ভব ছিল না। কেননা, তখন পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Client State এ পরিণত হয় অবশ্যগণভোট হলেও তা নিরপেক্ষ ও অবৈধ হতো না। **তৃতীয়ত:** কাশ্মীরকে ইস্যু করে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বিস্তৃত হতে পারে। ফলে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা এক বিশাল হুমকির মুখোমুখি হতে পারে। **চতুর্থত:** এদিকে গণভোট অনুষ্ঠিত হলে নির্বাচনের ফলাফল কাশ্মীরকে ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্তির বিপক্ষে যেতে পারে। **পঞ্চমত:** ভারতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হলো ১৯৭২ সালের। সিমলা চুক্তি। চুক্তি অনুসারে পাকিস্তান ও ভারতের সকল প্রকার দ্বি-পক্ষীয় সমস্যা দ্বি-পক্ষীয় আলাপ আলোচনার মধ্যদিয়ে সমাধানের কথা বলা হয়েছে। তাই কাশ্মীর সমস্যাকে আন্তর্জাতিকীকরণ করা যাবে না। **ষষ্ঠত:** কাশ্মীরে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ভারত পাকিস্তানকে দায়ী করে থাকে। ভারতের মতে ৬৩ টিরও বেশি জঙ্গি ক্যাম্পকে পাকিস্তান সরাসরি অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও সাহায্য দিয়ে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে। **সপ্তমত:** ভারত উল্টোভাবে পাকিস্তানকে আজাদ কাশ্মীরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে দখলদারী হিসেবে পরিগণিত করে আরবরা যেভাবে ইসরায়েলকে দেখে থাকে।

পাক-ভারত কূটনীতি: পাকিস্তান অবস্থান

কাশ্মীরী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় পাকিস্তানের কূটনীতিও সদা তৎপর। কাশ্মীর সম্পর্কে তার কূটনীতির অবস্থান নিম্নরূপ:

প্রথমত: পাকিস্তান কাশ্মীরে ভারত কর্তৃক প্রতিশ্রুতি গণভোট আয়োজনের পক্ষপাতি। পাকিস্তানের মতে। একটিমুক্ত ও অবাধ গণভোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই কাশ্মীরী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত: ১৯৪৭ সালের পাক-ভারত স্বাধীনতার মূলনীতি অনুসারে মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ার কারণে কাশ্মীর ভারতের অংশ হবে না। হয় স্বাধীন হবে, নয়তো পাকিস্তানের অংশহবে। **তৃতীয়ত:** পাকিস্তান কাশ্মীর প্রশ্নকে আন্তর্জাতিকীকরণ এর পক্ষপাতি। তার মতে, যেহেতু কাশ্মীরী জনগণ অধিকাংশই মুসলিম, সেহেতু তাদের দুর্দশা মুসলিম বিশ্বকেও প্রভাবিত করে। **চতুর্থত:** ইসলামাবাদ বলছে যে, ১৯৭২ সনের সিমলা চুক্তি কাশ্মীর প্রশ্নকে আন্তর্জাতিকীকরণের পথে বাধা নয়। তার মতে, সিমলা চুক্তির মাধ্যমে কাশ্মীরকে একটি অমীমাংসিত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। **পঞ্চমত:** পাকিস্তান কাশ্মীরী বিদ্রোহীদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দানের যে অভিযোগ ভারত করে থাকে তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। যতটুকু সমর্থন তা শুধুই রাজনীতিক, কূটনীতিক এবং নৈতিক। **ষষ্ঠত:** বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের মুক্তিকামী মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে। আর গণভোটের পক্ষে জাতিসংঘের অনুমোদন রয়েছে বলেই একে সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ বলা যায়। **সপ্তমত:** পাকিস্তান কাশ্মীরে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক নিপীড়ন ও নির্যাতনে উদ্বিগ্ন। কাশ্মীরে মানবাধিকার পদদলিত হওয়ায় পাকিস্তান ভারতকে দোষারোপও নিন্দা করে।[৪]

কাশ্মীর সমস্যার আন্তর্জাতিকীকরণ

মূলত কাশ্মীরকেন্দ্রিক বিবাদই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সর্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় এবং একে কেন্দ্র করেই মুহুর্মুহু উভয় দেশ সংঘাতমুখর পরিস্থিতিতে অবস্থান করছে। যা শুধু উভয় দেশকেই নয় বরং সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াকেই উত্তেজনায় রেখেছে। কাশ্মীর সমস্যাকে পাকিস্তান বরাবরই আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে কিন্তু ভারত তা প্রত্যাখান করে। পাকিস্তান এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতার কথা ভাবছে। কিন্তু ভারতের অনড় অবস্থানের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাকে সাড়া দিতে পারছে না। সমস্যাটি নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল ভারতের পক্ষে এবং কাশ্মীর বিভক্তি মেনে নেয় নি। ১৯৪৭ সালে অক্টোবরে কাশ্মীরের জনগণ বিদ্রোহে করে আজাদ কাশ্মীর গঠন করলে সোভিয়েত নেতাগণ এতে সাম্রাজ্যবাদীদের হাত রয়েছে বলে মনে করে। অন্যদিকে পরোক্ষভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৬২ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তান পুনরায় বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করলে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে কাশ্মীরকে বিরোধপূর্ণ ভূ-খণ্ড বলে উভয় দেশকে তা মিটিয়ে ফেলতে নিরপেক্ষ ভাবে উৎসাহিত করে।[৪]

ব্রিটিশ সমীক্ষা রিপোর্ট

সম্প্রতি একটি ব্রিটিশ সমীক্ষা রিপোর্ট হাতে পাওয়ায় ভারত কূটনৈতিক ভাবে পাকিস্তানকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। লন্ডনের মার্ক রিচার্স সংস্থা মোরি কাশ্মীরি জনগণের মধ্যে নেওয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যে সমীক্ষা পেশ করেছে তাতে কাশ্মীর রাজ্যের মানুষ ভারতের পক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন। সীমান্তপারের সন্ত্রাসকে কড়া ভাষায় ধমক দিয়ে ৯০ শতাংশ মানুষ বলেছে। এটা চিরদিনের জন্য বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। ৬৫ শতাংশ মানুষ মনে করে তাদের দাবি ও চাহিদার পথে সীমান্ত পারের সন্ত্রাস প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু মোরির সমীক্ষা রিপোর্ট অন্যকথা বলছে।

তারা জানিয়েছে, ৬১ শতাংশ কাশ্মীরী মনে করে ভারতের সঙ্গে থাকলে তাদের লাভই হবে। মাত্র ৬ শতাংশ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে নি। ৩৩ শতাংশ মানুষ কোনো মতামত জানাননি। রাজ্যের ৮৬ শতাংশ মানুষই মনে করেন সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি ফিরে আসবে। তবে ৫৫ শতাংশ কাশ্মীর জনগণ মনে করেন। রাজ্যবাসীর কাছে সবচেয়ে বড় উপহার হবে স্বশাসন ৬৩ শতাংশ কাশ্মীরী জনগণের কাছে যুদ্ধ একদমই পছন্দ না এভাবেই ভারত পাকিস্তান চিরস্থায়ী প্রায় সমস্যাটি নিয়ে নানাবিধ রিপোর্ট তৈরি হচ্ছে।[৪] কিন্তু এর শান্তিপূর্ণ কোনো সমাধান হচ্ছে না।

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে সাম্প্রতিক শান্তি উদ্যোগ

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশেষ করে ৯/১১ এর ঘটনার পরবর্তী সময়ের বাস্তবতায় ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে কার্যকর পন্থা বের করতে আগ্রহী। এ সমস্যা উভয়ের মধ্যে একটি রক্তাক্ত ক্ষত হিসেবে বিবেচিত। সম্প্রতি ভারতের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন। অন্যদিকে পাকিস্তানের পারভেজ মোশাররফ ৯/১১ এর পরবর্তী ঘটনার অনুবৃত্তিক্রমে এবং অভ্যন্তরীণ চাপের মুখে এই সমস্যা নিরসনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন।

কাশ্মীর সমস্যার কাঠামোগত সর্বশেষ যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেটি হলো মোশাররফের 'চার ধাপ' ফর্মুলা। এই ফর্মূলাটি অক্টোবর, ২০০৪ এ প্রেস ব্রিফিং এ প্রস্তাবনাটি প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়-

- পাকিস্তান কাশ্মীরে গণভোটের বিষয়টি নিয়ে চাপ দিবে না।
- যেহেতু ভারত কাশ্মীরকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চায় না, সেহেতু ভৌগোলিক অঞ্চলভিত্তিক সমাধানের বিবেচনা করা যেতে পারে।
- গোটা কাশ্মীরকে সাতভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে এর দু'টো পাকিস্তানের আর পাঁচটি ভারতের।
- ঐসব অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ জাতিসংঘের ম্যানডেটকে ভারত-পাকিস্তানের যৌথ উদ্যোগে করা যেতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়া ও বিশ্ব রাজনীতিতে পরিবর্তনের যে বাস্তবতা সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাব পড়েছে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের ওপর। ১৯৯৮ সালের মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ে পারমাণবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে এই অস্ত্র তৈরির ক্ষমতা অর্জন করেছে। আবার ৯/১১ এর ঘটনার পর মার্কিন নেতৃত্ব উভয় দেশের ওপর পড়েছে।[৫] এ শান্তি উদ্যোগগুলোও মেনে নিতে ভারত রাজি নয়। তারপরও দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি প্রচেষ্টায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

ক্রিকেট কূটনীতি

মূলত কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের তিক্ততার বরফ গলতে শুরু হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের "ক্রিকেট কূটনীতি" পাক-ভারত সম্পর্কের উন্নয়নের প্রচেষ্টা হিসেবে যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে 'দোস্তি' ক্রিকেট সিরিজের খেলা দেখার উদ্দেশ্যে পারভেজ মোশাররফ ১৬

এপ্রিল, ২০০৫, ৩ দিনের এক রাষ্ট্রীয় সফরে তিনি ভারতে এসেছিলেন। পাক-ভারত সম্পর্কের উন্নয়নের ব্যাপারে পারভেজ মোশাররফ বেশ আশাবাদী। তিনি বলেছেন–

> We have prayed that in the times to come, all differences between India and Pakistan are resolved and peace returns". তিনি আরও বলেন, "We have come here with a message of peace and unity he added." We want people in my country, Pakistan, and your country, India, to prosper. This can be only done through peace, I hope our prayers will be answered.[১]

উপলক্ষ ক্রিকেট হলেও অন্তর্নিহিত বিষয়ছিল পারস্পরিক সম্পর্ক। তা বোঝা যায়, ৭ এপ্রিল, ২০০৫ চালু হওয়া বাসের সংখ্যা বাড়ানো, বাণিজ্য সম্প্রসারণে একটি জয়েন্ট বিজনেস কাউন্সিলগঠন। রাজস্থান ও সিন্ধুর মধ্যে রেলযোগাযোগ স্থাপন। ভারতে আটক ১৫৬ জন পাকিস্তান জেলেকে মুক্তি প্রদান, কাশ্মীরের বিরোধপূর্ণ বালিঘার বাধা নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি। ১ জানুয়ারি ২০০৬ সালে রেল যোগাযোগ চালুসহ মুম্বাই, করাচি কনস্যুলেটগুলো খুলে দেওয়া এবং অমৃতসর ও লাহোরের মধ্যে বাস চলাচল শুরু।[৩] যৌথ বিবৃতিতে আরও বলা হয় ভারত ও পাকিস্তান চূড়ান্ত সমাধানের লক্ষ্যে গুরুত্বসহকারে কাশ্মীর আলোচনা অব্যাহত রাখবে।

বর্তমানে দিনে দিনে অস্ত্র মহড়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামরিক খাতের বাজেট বেড়ে গেছে। সার্বিকভাবে যুদ্ধের আশঙ্কা বিরাজ করছে, অর্থনৈতিক তথা শিক্ষা খাতে ব্যয় কমের ফলে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। তবুও জনগণ আশাবাদী, হুরিয়াত চেয়ারম্যান মিরভায়েজ ওমর ফারুক বলেছেন "আমরা আশা করছি কাশ্মীর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সাহসী রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।"[৪]

২৫ জুন ২০১০ (প্রথম আলোর) এক প্রতিবেদনে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব নিরূপম রাও ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব সালমান বশির এক আলোচনায়ে মিলিত হন।[১] এতে যদিও নির্দিষ্ট বিষয় উল্লেখ নেই তবুও বলা যায়, ভারত পাকিস্তানের বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ ইস্যুর সমঝোতা নিয়েই হয়তো আলোচনা এগিয়ে যাবে। যার মধ্যে কাশ্মীর সংকট অন্যতম ইস্যু। আশার কথা হলো ১৫ জুলাই ২০১০ ভারত-পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক হবে বলেও জানা যায়। তাই, আমরা বলতে পারি তৎক্ষণাৎ কোনো মীমাংসা না হলেও হয়তো অচিরেই ভারত পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সংকটগুলোর (কাশ্মীর সংকট) সমাধান হবে।[১]

এছাড়াও ২৯ এপ্রিল ২০১০ সার্ক সম্মেলেন ভুটানে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কাশ্মীরকে সংযুক্ত করে ইতিবাচক কিছু তথ্য প্রদান করেছেন।[৩]

অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময়ের প্রাচীন কাশ্মীর সমস্যা দুই প্রতিবেশি দেশ ভারত ও সমাধানে দুটি দেশকেই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। প্রয়োজনে জনমত গঠনের জন্য পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিতে হবে। তবে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। **প্রথমত:** অতীতের বিরোধে না গিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে গোটা বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হবে। যেহেতু উভয় এটিকে নিজস্ব অঙ্গ মনে করে তাই সমঝোতার মাধ্যমে মীমাংসা করা যাবে। **দ্বিতীয়ত:** আন্তর্জাতিক মহল মনে করছে ভারত ও

পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক অর্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বিশিষ্ট ইউনিয়ন গঠন করা যেতে পারে। ওই ইউনিয়নের মধ্যে কাশ্মীরকে দেয়া হবে ভারত-পাকিস্তানের সমতুল্য স্বীকৃতি। **তৃতীয়ত:** এ ব্যাপক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোই বিদেশ নীতি অর্থ ও নিরাপত্তা তিনটি বিষয় থাকবে। অপর দিকে পরোক্ষ বিষয়ের তালিকাভুক্ত হবে ধর্ম ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়ভিত্তিক বিচার। **চতুর্থত:** কাশ্মীরের রাজনীতির মধ্যমণি যেহেতু হুরিয়াত কনফারেন্স। সুতরাং ভারত-পাকিস্তান যদি এর সাথে সমঝোতায় বসে তাহলেও এই সমস্যার সমাধান হবে। **পঞ্চমত:** ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনে রাজী। ভারত ও পাকিস্তান যদি অখণ্ড কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনে রাজি হয় তাহলেও কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। **ষষ্ঠত:** এক শ্রেণীর রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পশ্রয় দিয়ে বলা যেতে পারে ব্যাপক অর্থে ভারত পাকিস্তান ও কাশ্মীরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা হলে একটি স্থায়ী মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে তার জীবন্তরূপ দিতে হবে। **সপ্তমত:** কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে ভারত ও পাকিস্তান দুটি দেশকেই অস্ত্রের কূটনীতি পরিত্যাগ করতে হবে। **অষ্টমত:** ভারত ও পাকিস্তানকে সঠিক ও নমনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং কাশ্মীর এলাকায় শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে হবে। **নবমত:** সর্বোপরি, কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে উভয় দেশকেই ত্যাগের রাজনীতি করতে হবে; জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং সকলপ্রকার হিংসাত্মক ও ধংসাত্মক কর্মকাণ্ড পরিহার করতে হবে। সুতরাং এভাবেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারত ও পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রধান প্রতিপাদ্য রাজনৈতিক ইস্যু হচ্ছে কাশ্মীর সমস্যা। উভয় সরকারের জন্যই এটি একটি সংবেদনশীল বিষয়। এই সমস্যাটি জটিল ও গুরুতর রূপ লাভ করেছে এবং উভয় দেশে ডেমোক্লেসের সোর্ড, এর মত ঝুলে আছে। এ সমস্যা নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে প্রায় উত্তেজনা দেখা দেয়। ১৯৯৮ থেকে শুরু করে ২০০০, ২০০২, ২০০৩, ২০০৭ এর সার্ক সম্মেলন এমনকি ২০১০ এর সার্কশীর্ষ সম্মেলন সহ বিভিন্ন বৈঠকে বিভিন্নবার সমঝোতার প্রশ্ন উঠছে কিন্তু আজও এ সমস্যার সমধান হয় নি। তবে সকলেরই প্রত্যাশা দ্বি-পক্ষীয় সমঝোতা, বিশ্বসংস্থা ও বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও মধ্যস্থতায় কাশ্মীর সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব। সর্বশেষ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও সংহতি স্থাপনের ক্ষেত্রে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত।

তথ্যসূচি:

১. Masud Hasan, "Incomplete Partition Process: Kashmir and Self Determination", *South Asian Studies,* Vol.12. No. 2, 1995, p.65.

২. Salman Khurshid, *Beyond Terrorism: New Hope for Kashmir* (New Delhi: UBPSD, 1994), p.44.

৩. মওদুদ আহমেদ, *দক্ষিণ এশিয়া: উন্নয়নের সংকট* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লি.,২০১০), পৃ. ৮৯-৯১

৪. *তদেব*

৫. Ahmed Izaz, *"Kashmir Disputeand US Security Concern in South Asia", South Asian Affiars,* Vo.1. No. 1 September 1996,Lahore.

৬. তারেক শামসুর রেহমান, *বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি* (ঢাকা:বুকস ফেয়ার, ২০১১) পৃ. ৯২-১০০

৭. Pandita, K.N., *"Kashmir Question"*, Kashmir Herald, Volume 2, No. 9 – February 2003, Featured Articles – h ttp: //www.kashmirherald.com/ featuredarticle/ kashmirquestion-prn.htm l (See Appendix J).

৮. Bamzai, *`Culture and Political History of Kashmir'* Vol- 3: *Modern Kashmir,* P.N.K. p. 666.

৯. তারেক শামসুর রেহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮-৭৯

১০. Omkar Razdan, *The Trauma of Kashmir: The Untold Reality(* New Delhi: Vikas Publishing House, 1999). p.92.

১১. Navnita Behera, *State, Identity & Violence*, (New Delhi: Rajkamal Electric Press, , 2000), pp.172-73.

১২. *Ibid.*

১৩. Omkar Razdan, *Op.cit.*p.127.

১৪. তারেক শামসুর রেহমান, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৮০

১৫. Sharma, Usha, *Cultural, Religious and Economic Life of Jammu, Kashmir and Ladakh* (New Delhi:Radha Publications, , 2001), p.144.

১৬. Masud Hasan, *Op.cit*p.23.

১৭. তারেক শামসুর রেহমান, *প্রাগুক্ত* পৃ.৭৯

১৮. Schofield, *Victoria, Kashmir in Conflict* (London: New York: I.B. Tauris, 2000), p.73.

১৯. S. M. Bark, *Pakistan Foreign Policy: A Historical Analysis* (London Oxford Univesy Press, 1973), p. 273

২০. Muhammad Zamir, *'Musharraff's Formula to Resolve the kashmir Issue*; *The Daily Star*, November 6, 2004.

২১. আহম্মেদ জামিল, *পাকভারত সম্পর্ক উন্নয়ন, আমার দেশ*, ২৪ এপ্রিল, ২০০৫

২২. Emam Hossain, *"Cricket Diplomacy", The Pakistan Relation*" in URL:// w.w.w.world news/uk.

২৩. *The Daily Star*, 3 January, 2006 .

২৪. *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১৪ জুন ২০১০

২৫. *দৈনিক প্রথম আলো* ২৫ জুন ২০১০

২৬. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ জুলাই ২০১০

২৭. URL://w.w.w.world news/uk.

ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৯

মিথ: একটি ইতিবৃত্তিক আবেক্ষণ

মোঃ তানভিরুল হক*
শামীম আহম্মেদ**

Abstract: A *myth* is a sacred narrative usually explaining how the world or humankind came to be in its present form, although, in a very broad sense, the word can refer to any traditional story. But the crucial idea is that *myth* is not simply a collection of stories permanently fixed to a particular time and place in history, but an ongoing social practice within every society. This article is an attempt to study the origins, nature, functions and theories of *myth*.

মিথ ইতিহাস-সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে মহাকালকে সংযোজিত করে। পুরাকালীন ও মধ্যযুগীয় মিথগুলো মানুষের কাছে বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে। মিথ, যা কালে নেই তাকে কালের ওপর প্রতিষ্ঠা করে। যার কোন প্রারম্ভ নেই তার আরম্ভ ঘটায়। যা কোন তল্লাটে বা সময়ে ঘটেছিল তাকে সার্বজনিক এবং সমকালীনতায় বিশিষ্টতা দান করে। দুর্জ্ঞেয় সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষমতা দিয়ে মিথ সত্য আর কথনকে সংযুক্ত করে। এভাবে মিথ পুরাতনকে নতুনে, বিগতকে বর্তমানে প্রতিষ্ঠা করে। মানুষের যুগযুগান্তরের প্রগতি, কৃষ্টি পুরাকথনে বিম্বিত হয়ে আছে। বিগত শতকে ভাবা হতো মিথ হলো কাল্পনিক ও অমূলক, কিন্তু নৃতত্ত্ববিদগণের চর্চা এ ধারণাকে বদলে দিয়েছে। মিথ প্রকৃতপক্ষে মানুষের বিগত সময়ের সংস্কৃতির ভিত্তি। তাই মিথকে অতীতের বুনিয়াদে নয়, দেখতে হবে ইদানীন্তনের ভিত্তিতে।

মিথের সংজ্ঞার্থ

মিথ (Myth) শব্দটির উৎস গ্রিক ধাতু *mu* বা *muth* থেকে *muthos*, এর অর্থ মুখের কথা। *Muthos* শব্দটির অনুষঙ্গে বোঝা যায় যে, এই ব্যাপারটি বস্তুতপক্ষে ছিল মৌখিকভাবে প্রচলিত কিছু কাহিনী; যা আদিমকাল থেকে মানুষের সমাজে ক্রমবিবর্তিত রূপে প্রচলিত হয়ে আসছে। মিথের মধ্যে একটি জাতির সামগ্রিক অস্তিত্বের হদিস মেলে, এমন কথা হয়তো অতিশয়োক্তি বলে মনে হবে, কিন্তু এটাও আবার ঠিক যে, মিথের মধ্যে একটি জাতির নিজস্ব ঐতিহ্যের পরিকাঠামোটি নিবিড়ভাবে মিশে থাকে।[১] দেবতা, জগৎ, মানুষ, প্রাণী, গাছপালা প্রভৃতির উৎপত্তির কাহিনী হল মিথ।[১] *Standard Dictionary of Folklore* মিথকে ব্যাখ্যা করেছে এভাবে-

> A story, presented as having actually occured in a previous age, explaining the cosmological and supernatural traditions of people, their gods, heroes, cultural traits, religious beliefs etc.[1]

আবার *Chambers 21st Century Dictionary* -এর মতে-

> An ancient story that deals with gods and heroes, expecially one used to explain some natural phenomenon.[1]

---

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী
** প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়. রাজশাহী

মিথ প্রসঙ্গে H.B. Franklin বলেন,

> Myths may be events of the mind as they are dramatized in narrative form that is, in terms of natural or historical events.[1]

তাই মিথ হলো ঐশ্বরিক কাহিনী যা সাধারণত ব্যাখ্যা করে কীভাবে জগৎ অথবা মানবজাতি বিদ্যমান অবয়বে প্রকটিত হয়েছে। গতানুগাতিকভাবে মিথ বলতে ঐতিহ্যবাহী কোন গল্পকে বুঝায়। আর মীমাংসাসূচক অভিপ্রায় থেকে বলা যেতে পারে, মিথ শুধুমাত্র ইতিহাসের নির্দিষ্ট কোন কালে বা স্থানে স্থায়ীভাবে অপরিবর্তিত কোন গল্পপুঞ্জ নয়, বরং সকল সমাজের অভ্যন্তরে বহমান এক সামাজিক চর্চা।

মিথ কী করে গড়ে উঠেছে আদিমকালে, সে সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানীরা নানা ধরনের অভিমত প্রকাশ করলেও একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে আদিম মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির অনেক দুর্বোধ্য (তাদের কাছে) বিষয় এবং ঘটনার অন্তরালে নানা ধরনের অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করত। এইসব শক্তির বিবর্তিত রূপই হল দেবতা, যাঁদের ক্রোধ নিরসন এবং মনস্তুষ্টির জন্যে বিভিন্ন ধরনের আচারবিধি পালন করা হতো। এরই সূত্রে যেসব গল্প কালক্রমে গড়ে উঠেছে, তাই রূপান্তরিত হয়েছে মিথে।[১] ঐতিহ্য পরম্পরায়, যে মিথগুলো আদিম যুগ ছাড়িয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেছে নানা রকম পুনর্গঠন ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে- এ যুগের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলে এর কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য নজরে পড়বে। যথা–

এক: মিথের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট কাহিনীর রেখা থাকবে।

দুই: লোক ঐতিহ্যের সামূহিক বৈশিষ্ট্য মিথে থাকে।

তিন: মিথের কাহিনীগুলোতে জগতের সৃষ্টি রহস্য ও নৈসর্গিক নানা বিষয়ের কল্পিত ব্যাখ্যাদানের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

চার: মানুষের মনে বিজ্ঞান চেতনা গড়ে ওঠার পূর্বে বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় মিথে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

পাঁচ: মিথে প্রাকৃতিক বা জাগতিক সমগ্র বিষয়ের উপর সর্বপ্রাণতার আরোপ করা হয়।

ছয়: মিথের সব কাহিনীর অন্তর-বাইরে, সদা-সর্বদা বিরাজ করেছে মানবজীবনের নিহিত অর্থের সন্ধান এবং আদিম জীবনের ধর্মীয় চেতনার পরিচয়।

সাত: মিথে দেবতা কিংবা মানুষ, দৈত্য কিংবা পশু-পাখি প্রত্যেকের আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক ও অভিন্ন হয়ে থাকে।[৩]

মিথ দেশ ও কালের অতীত, এর কোনো লেখক নেই। মিথের ঐতিহ্য মানব হৃদয়ে আজও বহমান। আবার দেশকালভেদে তফাতও আছে। একই সঙ্গে ব্যক্তি মানবের চোখে, তার বোধে, বিশেষ একটি মিথ বিশেষভাবে বিশ্লেষিত হয়ে বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে। মিথ একাধারে অব্যক্তিক ও ব্যক্তিক- সুবোধ্য ও দুর্বোধ্য।[৩] মিথের বিষয় বহুবিচিত্র। বিষয় স্বাতন্ত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে মিথকে কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। যথা-

ক) বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি সম্বন্ধীয় মিথ।

খ) মানুষ ও তার জাতি এবং জীবজন্তু সৃষ্টি সম্বন্ধীয় মিথ।

গ) দেবতা সম্বন্ধীয় মিথ।

ঘ) চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা সম্বন্ধীয় মিথ।

ঙ) ধ্বংস ও প্লাবন সম্বন্ধীয় মিথ।

চ) আগুনের অধিকার সম্বন্ধীয় মিথ।

ছ) মহৎ ব্যক্তি সম্বন্ধীয় মিথ।

জ) পশুপাখির আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধীয় মিথ।

ঝ) বিশ্বাস-সংস্কার-লোকাচার সম্বন্ধীয় মিথ।

ঞ) আত্মা সম্বন্ধীয় মিথ।

ট) দৈত্য-দানব সম্বন্ধীয় মিথ।

ঠ) স্বর্গ-নরক-পাপ-পুণ্য সম্বন্ধীয় মিথ।[৩]

মিথের প্রয়োজনকে বিচার করতে হয় এর কাজ দিয়ে। মিথের কাজ অনেক। একদিকে মিথ মানুষের ইচ্ছাপূরণের কাহিনী। অন্যদিকে তা অতীন্দ্রিয় রহস্যসৃষ্টি এবং তার সমাধানে রত। সৌরজগৎ, মহাকাল, মহাবিশ্বের সঙ্গে মানুষের দিনকে, দিনের অভিজ্ঞতার সংযোগ ঘটায় এই মিথই। মিথের সাহায্যে মানুষ যুক্ত হয় মহাজগতের সঙ্গে; নিজের ক্ষুদ্র ধর্ম, জাতিগোষ্ঠীর সীমানা উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে মানুষ বড় করে দেখতে শেখে। আবার নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিকের ভূমিকায় মিথ মানুষকে নিজ সম্প্রদায়ের দিকে চোখ ফেরাতে এবং সম্প্রদায়কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতেও শেখায়। নৈতিক শিক্ষক হিসেবেও মিথের রয়েছে অন্যরকম ভূমিকা। বৈরী বাতাবরণে কীভাবে মানবিক জীবনযাপন করতে হয়, মানিয়ে চলতে হয়-তাও শেখায় মিথই।[৩]

মিথ বিজ্ঞান নয়, তবে আজকের বিজ্ঞান পাঠে সে নিঃসন্দেহে অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান। আর রহস্যময় অলৌকিক, অযৌক্তিক হয়েও সে এক সার্বভৌম সত্য উপলব্ধির সূত্র দিতে পারে। কেননা সত্যান্বেষী মানুষই তো মিথের জন্ম দিয়েছে।[১] Emile Durkhem বলেছেন,

> All myths, even those which we find the most unreasonable, have been believed. Men have believed in them no less firmly than in their own sensations; they have based their conduct upon them.Õ[4]

মিথের প্রতি বিশ্বাস ও আগ্রহের সবচেয়ে বড় কারণ মানুষের মন সব সময় অলৌকিকের উপস্থিতি ও রহস্যময় বিষয়ের ব্যাখ্যা খুঁজেছে। এই অনুসন্ধানে বিজ্ঞান সব বিষয়ে সম্পূর্ণ উত্তর দিতে পারে নি। তাই কল্পনাপ্রবণতার ভিত্তিতে মানুষ মহাবিশ্বের এবং প্রাকৃতিক জগতের রহস্যকে সমাধান খোঁজার কৌতূহল অক্ষুণ্ন রেখেছে। অলৌকিকের ভূমিকা প্রাণী ও প্রাকৃতিক জগতের রহস্য উদঘাটনে সাহায্য করেছে। মিথ মানুষের মনের কল্পনা শক্তির সৃষ্টি বলেই মানুষ মননশীলতার অন্যান্য অভিব্যক্তির পাশাপাশি কোনো না কোনো ভাবে তার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। এই জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্ত্বেও মিথের জগৎ হারিয়ে যায় নি। মানুষের আত্ম পরিচিতি কেবল একটি ভৌগোলিক এলাকায় সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন দেশে তার উপকরণ ও ভিত্তি রয়েছে যার অন্যতম হলো মিথ। এই কারণে অন্য দেশের মিথও মানুষের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়। মানুষের মানস জগতের কল্পনাশক্তি যেমন চিরন্তন এবং বিশ্বজনীন মিথও একইভাবে চিরন্তনতার দাবি করে এবং বিশ্বজনীনতার আবেদন রাখে। বিশ্বরহস্য

জানার জন্য না হলেও নিজেকে চেনার তাগিদেই মানুষকে মিথের জগতে যেতে হয়।[৪] জওহরলাল নেহেরু তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Discovery of India*-তে বলেছেন,

> If people belived in the factual content of these stories (mythology), the whole thing was absurd and ridiculous. But as soon as one ceased believing in them, they appeared in a new light, a new beauty, a wonderful flowering of a richly endowed imagination, full of human lessons.[1]

মিথের স্বজন

মিথ একটি জাতির পরম্পরায় নির্মিত কল্পসৃষ্টি। এ সৃষ্টি যে উপলব্ধির জন্ম দেয় তা দিয়েই সে তা ব্যাখ্যা করে। এ কারণে এর ভাষা বার বার পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ নেয়। এভাবে ক্রমে ক্রমে মিথ সরে যায় তার আসল প্রাণশক্তির আধার থেকে। মিথের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে প্রাচীন ধর্মচিন্তার উপাদান। এ উপাদান মানবচিত্ত জয় করে নান্দনিক প্রতিকৃতি ধারণ করে আনুষ্ঠানিকতায় মিশতে পারলেই মিথ আর কল্পসৃষ্টি থাকে না। মিথের ভুবন মানুষের আপন ভুবনের আলেখ্য হয়ে ওঠে। মিথের শেকড় লোকবিশ্বাসের নিবিড়ে প্রোথিত হয়। অবশ্য লেভি-স্ট্রসের মতানুসারে, মিথ ও লোককাহিনী একই সময়ে পাশাপাশি অস্তিত্বশীল।

আলতামিরা আর লাসাউক্স-এর ভূগর্ভস্থ গুহাসমূহ অসাধারণ প্যালিওলিথিক আধ্যাত্মিকতার একটা ঝলক আজও ধারণ করে রেখেছে। হরিণ, বাইসন, লোমওয়ালা ঘোড়া আর বর্শা হাতে শিকারীদের ভক্তি উদ্রেককারী চিত্রগুলো নিখুঁত চমৎকারিত্বপূর্ণ যত্ন আর দক্ষতায় আন্তভৌম সুড়ঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে যেখানে পৌঁছানো খুবই কষ্টসাধ্য। ভূগর্ভস্থ এসব স্থানই সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম মন্দির আর গির্জা, এসব গুহার মানে জানতে অজস্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে; চিত্রগুলোয় সম্ভবত স্থানীয় লোককাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যা কখনও জানা যাবে না। কিন্তু তারা নিশ্চিতভাবে মানুষ আর ঈশ্বরদৃশ্য, আদিরূপ প্রাণীর মাঝে পরম সম্মিলনের একটা দৃশ্যকল্পে গুহার দেয়াল আর ছাদকে অলংকৃত করেছে। লাসাউক্সের মন্দিরের কৃত্যানুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা থেকে, শিকারীদের অভিজ্ঞতা থেকে, এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে নায়কদের জন্যই মিথের সৃষ্টি হয়েছে।[৫]

বীরোচিত অভিযান সম্পর্কে সব সংস্কৃতিতেই প্রায় একই ধরনের মিথ রয়েছে। নায়ক তার নিজের জীবনে বা সমাজে কোনো একটা উপাদানের ঘাটতি অনুভব করেন। পুরাতন যে মূল্যবোধ বংশপরম্পরায় তাঁর লোকদের আত্মিক উন্নতি সাধন করেছে সে সব তাঁর কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। তাই সে ঘর ছাড়ে এবং বিপদসঙ্কুল অভিজ্ঞতা সহ্য করে। সে দানবদের সাথে লড়াই করে। দূরতিক্রম্য পাহাড় টপকে যায়, নিকষ অন্ধকার জঙ্গল অতিক্রম করে এবং এই প্রক্রিয়ার মাঝে তার পুরাতন সত্তার বিলুপ্তি ঘটে এবং নতুন অন্তর্জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করে সে তার জনগোষ্ঠীর কাছে ফিরে আসে। আবার, মানুষ যখন তাদের গোত্রের বীরদের এসব গল্প অন্যদের বলে, শ্রোতার মনোরঞ্জনই কেবল তারা আশা করে না। মিথ বলে দেয় পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হতে চাইলে তাদের কী করতে হবে। মানুষকে জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে নায়কের ভূমিকা নিতে হবেই।[৫] Northrop Frye মন্তব্য করেছেন,

> The importance of god or hero in the myth lies in the fact that such eharacters, who are conceived in human likeness and yet have more power over nature, gradually build up the vision of an omnipotent personal community beyond and indifferent nature.[5]

মিথের সঙ্গে রূপকথার স্বপ্ন এবং লেজ্যাণ্ডের কাহিনী ও ইতিহাসমুখিতা জড়িয়ে থাকে, তবু এই তিনটির মধ্যে পার্থক্য বহু আগেই ধরা পড়েছে; মিথ হচ্ছে আদিম দর্শন, চিন্তার সরলতম রূপায়ণ, জগতকে বুঝবার বহুবিধ চেষ্টা, জীবনমৃত্যু ও ভাগ্যের ব্যাখ্যা, প্রকৃতি, ভগবান, কাল্ট সম্বন্ধে নতুন ভাবনা। লেজ্যাণ্ডের কারবার আদিম ইতিহাসকে নিয়ে, সরলভাবে প্রেম ও ঘৃণা এখানে রূপ পায়, সরলীকৃত হয় এবং অজান্তে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর রূপকথার মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য থাকে না আনন্দ দেওয়া ছাড়া। এই তিনেরই উৎপত্তি ফ্যান্টাসি থেকে। ফ্যান্টাসি ব্যক্তিগত স্বপ্নের ছবি। স্বপ্নের ছবি বলেই বাস্তবজগৎ থেকে পালিয়ে যায়, কখনো হারিয়ে যায়। ফ্যান্টাসির স্বপ্ন যখন ধারণা পায়, ভাবনায় বসে, ধর্মীয় বোধের মধ্যে ক্রমশ একতা লাভ করতে থাকে এবং প্রতীকের আলো দুলতে থাকে বস্তু ও কল্পনার চারধারে, তখনই সর্বজনীনতা ও ব্যাপ্তির দিকে সে এগোয়। রূপকথা ফ্যান্টাসির ব্যক্তিগত স্বপ্নের ছবির জগতে ইচ্ছা-পূরণের আনন্দ থেকে উন্নত স্তরে উঠতে পারে নি, তাই শিশুর মনোতোষণে এখনো সে নিয়োজিত। আর 'লেজ্যান্ড' ইতিহাসের বিশিষ্টতায় মাথা গুঁজে আছে, চরিত্রের অনিবার্য আবশ্যিকতা ও সম্ভাব্যতা তৈরি করতে পারে না বলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু সৃষ্টিশীল প্রতিভা এগুলোকে সংকেতের সাহায্যে মিথে রূপান্তরিত করতে পারে।[৫]

লোককথার অন্তর্গত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ রয়েছে সেগুলো হল, মিথ, টেল (কাহিনী) ও 'লেজ্যান্ড'। এদের মধ্যে মিথই হল প্রাচীনতম। প্রাচীন পূর্বপুরুষদের নানান অভিজ্ঞতার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছিল না সে যুগে। সেই অব্যাখ্যাত অভিজ্ঞতাগুলোর বর্ণনামূলক যে মৌখিক কাহিনীগুলো গড়ে উঠেছে সেগুলোই হল আদিম মিথ। এই কাহিনীগুলোর সঙ্গে প্রাচীনকালের ধর্মবিশ্বাসের সংযোগ ছিল গভীরভাবে। মিথ থেকেই সময়ের বিবর্তনে তৈরি হয়েছে টেল (কাহিনী), যাতে 'মিথ'-সম্পৃক্ত ধর্ম ও অলৌকিকতার ভাগ কমে এসে মুখ্য হয়ে উঠেছে প্রচলিত লোকজীবনের পরিচিত ছবিগুলো। তাই মিথের মূলভিত্তি ধর্ম ও দেবতা হলেও, তার বিবর্তিত রূপ 'টেল'- এ মানুষ ও তার সামাজিক সংস্কারই প্রধান। মানুষের মনের অবচেতনে পরবর্তীকালীন ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞান মনস্কতার যুগেও অলৌকিকের প্রতি আকর্ষণ ও আস্থা থেকেই গেছে, তাই ধর্ম-দেবতা প্রভৃতি থেকে মুক্ত 'টেল'- এর সঙ্গে আবারও যুক্ত হতে থাকে অলৌকিক ক্ষমতা, অসাধারণত্বের প্রতি বিশ্বাস অর্থাৎ একটি নতুনমাত্রার ঐশীভাব। কিন্তু এই ঐশীভাব 'মিথ'-এর মতো দেবতা বা ধর্মসম্পৃক্ত নয়– বরং কোন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের বা আপাতভাবে অব্যাখ্যাত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গড়ে তোলে টেল-এর বিবর্তিত রূপ 'লেজ্যান্ড' তথা কিংবদন্তী। অর্থাৎ এতে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী মানুষের ওপর আরোপিত হয় অলৌকিকত্ব। তাহলে মিথ>টেল>লেজ্যান্ড- এই বিবর্তনটিকে সূত্রাকারে এইভাবে দেখানো যায়:

$$\text{ম} - \text{দ}_১ = \text{ট}$$

$$\text{ট} + \text{দ}_২ = \text{ল}$$

অর্থাৎ 'ম' = মিথ তার থেকে দৈব নির্ভরতা (=$\text{দ}_১$) বিযুক্ত হলে তৈরি হয় 'ট'= টেল। আবার টেলের সঙ্গে নতুন মাত্রার দৈবভাব (=$\text{দ}_২$) সংযুক্ত হলে তৈরি হয় 'ল' 'লেজ্যান্ড'।[১] অতএব

লেজ্যাণ্ডের কাহিনীতে জাতির কোন বীর বা সাধক চরিত্রের ইতিবৃত্তি প্রকাশ পায়। এই বীরত্ব নিঃসন্দেহে কোনরূপ অপকর্ম দেখানোর জন্য নয়– সৎকাজে বীরত্ব প্রকাশ পায়।[৬]

মিথের পূর্ব-বৃত্তান্ত

মিথের জন্মের সময়কে মানুষ অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। মানুষের অতীত জীবনধারা, রীতি-প্রথা এ সময়ের নিরীক্ষণে অলীক বলে মনে হয়। সেই সময়ের আখ্যানসমূহ ক্রমাগত বৈচিত্র্যময় হাতের স্পর্শে তার আদিরূপ হারিয়েছে। মিথের আলোচনায় আদিম সমাজ ও মানুষ প্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গ। লুইস হেনরি মর্গান (১৮১৮-১৮৮১ খ্রি.) ১৮৭৭ সালে তাঁর প্রকাশিত *Ancient Society* গ্রন্থে মানব সভ্যতার বিবর্তন আলোচনা করেছেন। যার মাধ্যমে মর্গান আমাদের হারিয়ে যাওয়া অতীতকে পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন।[৬] মর্গানের ভাষায়,

> The latest of investigations respecting the rarely condition of the human race are tending to the conclusion that mankind commenced their careear at the bottom of the scale and worked their way up from savagery to civilization through the slow accumulations of experimental knowledge.[6]

মর্গানের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে কার্ল মার্কস নিজেই (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রি.) একটি বই লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তার এই ইচ্ছাকে পূর্ণ হতে দেয় নি। তবে তার সুহৃদ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫ খ্রি.) এই পুস্তক (*Ancient Society)* অবলম্বন করে লেখেন, *The Origin of the Family, Private property and the state*, প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে।[১] মর্গানের তত্ত্বের আলোকে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন মানুষের সংস্কৃতির বিবর্তনে আগুনের ব্যবহার সবচেয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। এরপর কৃষির আবিষ্কার এবং তারপর নগরসভ্যতার পত্তন। সংস্কৃতির এই বিবর্তনের ধারাতেই গড়ে উঠেছে মিথ। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে ব্যাখ্যাতীত ঘটনাগুলোকে সেই সময়ের মানুষ ধর্ম ও অলৌকিকতা দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে এবং সংযুক্ত করেছে । এভাবে মিথের ক্রমরূপান্তর ঘটে এসেছে হাজার হাজার বছর ধরে। জন্ম নিয়েছে আধুনিক মিথের, নানা মাত্রায়, নানা বাস্তবতায়। Emile Durkheim বলেছেন,

> Sometimes the myth attempts to explain how, by a series of nearly natural events and a sort of spontaneous evolution, the animal transformed himself little by little, and finally took a human form.[7]

নৃতাত্ত্বিক মর্গান, এঙ্গেলস, প্রমুখের উত্থাপিত মানুষের ক্রমিক বিবর্তন সম্পর্কিত ধারণাকে অবলম্বন করে বলা যায়, মানুষের বিবর্তনের প্রথম স্তর থেকে শুরু করে সভ্য হয়ে ওঠা পর্যন্ত কয়েকটি স্তর তাকে পেরোতে হয়েছে।[৭]

প্রত্নতত্ত্ববিদের দল নিয়ানডারথাল কবর খুঁড়ে পেয়েছেন অস্ত্র, যন্ত্রপাতি আর উৎসর্গীকৃত পশুর হাড়, যা তাদের নিজেদের জগতের মতোই ভবিষ্যৎ জগতের প্রতি এক ধরনের বিশ্বাসের কথা বলে। বহু প্রাচীন কাল থেকেই, সেজন্য এটা প্রতীয়মান হয় যে মানুষ তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অতীত কল্পনা করার শক্তির কারণে স্বতন্ত্র। মানুষের কল্পনা শক্তি,

এমন একটা ক্ষমতা যা তাৎক্ষণিকভাবে বর্তমান উপস্থিত না এমন কিছু ভাবতে তাদের সাহায্য করে এবং মানুষ প্রথম যখন সেটা কল্পনা করে তা তখন বাস্তবিক অস্তিত্বহীন। এই কল্পনা শক্তিই মিথ এবং ধর্মের সৃষ্টিকারী।[৭]

বিজ্ঞানীদের কল্পনা শক্তির বরাভয়ে মানুষ মহাশূন্যে ভ্রমণ করে চাঁদের বুকে হাঁটতে সক্ষম হয়েছে, যা একটা সময়ে কেবল পৌরাণিক আখ্যানের অংশ ছিল। বিজ্ঞান এবং মিথ উভয়েই মানুষের সম্ভাবনার সীমা বৃদ্ধি করেছে। অষ্টাদশ শতক থেকে ইতিহাস সম্পর্কে মানুষের একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে; আসলে কি ঘটেছিল সে বিষয় তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রাক-আধুনিক যুগে, মানুষ যখন অতীত সম্পর্কে কিছু লিপিবদ্ধ করত তখন তাদের কাছে গুরত্বপূর্ণ ছিল কোনো ঘটনার আসল তাৎপর্য কি তা জানা। মিথ তেমনই কোন ঘটনা, আপাতদৃষ্টিতে যা একদা সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু একই সাথে যা সবসময়েই ঘটে চলেছে।[৭]

সভ্যতার শুরুর দিকের কিছু মিথ, যা সম্ভবত প্যালিওলিথিক যুগের চেয়েও প্রাচীন, আকাশের সাথে সম্বন্ধিত, যা মানুষকে সম্ভবত পবিত্রতার প্রথম ধারণা দিয়েছিল। তারা যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো-তাদের ক্ষুদ্র প্রাণ থেকে বহুদূরে অনন্ত অসীমে বিরাজমান- তাদের মনের ভিতরে একটা ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হতো। তাই প্রায় প্রতিটি সর্বদেবতার মন্দিরের নিজস্ব আকাশ দেবতা রয়েছে। নৃতত্ত্ববিদেরা ফুজির আদিবাসী, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী এবং পিগমিদের মতো জনগোষ্ঠীর মাঝে তাঁর অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। নৃতত্ত্ববিদেরা আরো বলেছেন যে, আদিবাসী মানুষেরা পশুপাখিকে হরহামেশাই নিজের সমগোত্রীয় 'মানুষ' বলে অভিহিত করে। তারা মানুষের পশুতে পরিণত হবার বা বিপরীতটা সংঘটিত হবার গল্প বলে। তাদের কাছে পশু হত্যা একজন বন্ধুকে হত্যা করার মতোই, তাই আদিবাসী শিকারীর দল সফল শিকার অভিযান শেষে মনঃকষ্টে ভুগে থাকে। পবিত্র কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচিত হবার কারণে এবং উচ্চকোটির উদ্বেগ জড়িয়ে থাকার কারণে শিকারকে ভাবগম্ভীর আনুষ্ঠানিকতায় ভূষিত করা হয়েছে এবং একে কেন্দ্র করে নানা রীতিনীতি ও ট্যাবু গড়ে উঠেছে।[৭]

আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে মানুষ কৃষিকাজ রপ্ত করে। শিকার তখন আর খাদ্যের প্রধান উৎস নয়, কারণ তারা আবিষ্কার করেছে পৃথিবী নিজেই তাদের খাদ্যের অফুরন্ত উৎস। তখন কৃষিকাজও একটা পবিত্র সংস্কারে পরিণত হয়। জমি চাষ করার সময়ে বা শস্য কাটার সময়ে কৃষকদের রীতিমতো আচার অনুষ্ঠান পালন করে পবিত্র থাকতে হতো। ফসলের বীজকে তারা মাটির গভীরে প্রবেশ করতে দেখে এবং অনুধাবন করে যে অন্ধকারে খোলস ছেড়ে বীজ জীবনের ভিন্নমাত্রার চমকপ্রদ রূপ সামনে নিয়ে আসে, রোপয়িতা তখন অন্তরালে কর্মরত গোপন শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়। মাটি হলো নারী; বীজগুলো পবিত্র বীর্য; এবং বৃষ্টি হলো স্বর্গ আর মর্ত্যের মহামিলন। ফসল বোনার সময়ে নারী পুরুষের শারীরিক মিলনে নিয়োজিত হওয়া ছিল একটা সাধারণ আচার অনুষ্ঠান। তাদের নিজস্ব মিলন নিজেই একটা পবিত্র কর্ম, মাটির উৎপাদনী শক্তিকে যা জাগিয়ে তুলবে, কৃষকের কোদাল বা লাঙ্গল ঠিক যেন একটা সমুত্তেজিত পুরুষাঙ্গের প্রতীক যা পৃথিবীর উদর থেকে উন্মুক্ত করবে এবং বীজ দিয়ে, একে বড় করে তুলবে।[৭]

খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে মানুষ সামনের দিকে আরেকটা বড় পদক্ষেপ নেয়, এ সময়ে তারা বিভিন্ন নগরীর পত্তন করতে শুরু করে, প্রথমে পারস্যে এবং মিশরে, পরবর্তীকালে চিনে, ভারতে এবং ক্রিটে। শহুরে জীবন মিথকে বদলে দেয়। দেবতারা দূরবর্তী হতে শুরু করেন। দিব্য জগতে নারী ও পুরুষকে পৌঁছে দিতে পুরাতন আচার-অনুষ্ঠান আর গল্পজ্ঞানের প্রতি মানুষের মোহভঙ্গ হয় যা তাদের পূর্বপুরুষদের এক সময় মানসিক পুষ্টি জুগিয়েছে। একটা আধ্যাত্মিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়। সভ্য পৃথিবীর কোনো অংশে, পুরাতন আধ্যাত্মিকতা হ্রাস পায় এবং এর স্থান নিতে নতুন কিছু সামনে এগিয়ে আসে না। শেষ পর্যন্ত এই অস্থিরতা আরেকটা মহান রূপান্তরের জন্ম দেয়।[৭]

খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক নাগাদ, অস্থিরতা আরও ছড়িয়ে পড়ে এবং চারটি আলাদা অঞ্চলে দৈবজ্ঞ আর ঋষিদের একটা চিন্তাকর্ষক বিন্যাস নতুন সমাধান খুঁজতে শুরু করে। জার্মান দার্শনিক জ্যাসপার এই সময়কে *Axial Age* বলে অভিহিত করেছেন, কারণ মানবতার আধ্যাত্মিক উন্নতিতে এই সময় নিরতিশয় গুরত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে; এই সময়ে অর্জিত অন্তর্জ্ঞান আজও নারী পুরুষের আত্মিক পুষ্টি সাধন করছে। আজ ধর্ম বলতে যা বুঝায় এসব ছিল তারই সূচনাপর্ব। মানুষ নিজেদের প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং নিজেদের পরিস্থিতি আর সীমাবদ্ধতা নজিরবিহীন স্পষ্টতায় বুঝতে পারে। নতুন ধর্মীয় আর দার্শনিক পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটে: চিনে কনফুসিয়াজম, ভারতবর্ষে বৌদ্ধ আর হিন্দু ধর্ম, মধ্যপ্রাচ্যে একেশ্বরবাদ এবং ইউরোপে গ্রিক যুক্তিবাদ। ষষ্ঠ, সপ্তম আর অষ্টম শতকের মহান হিব্রু দৈবজ্ঞের মতো মানুষ এসব যুগান্তকারী প্রথার সাথে যুক্ত ছিলেন; উপনিষদের ঋষিমণ্ডলী আর বুদ্ধদেব (খ্রি: পূ: ৫৬৩-৪৮৩) ভারতবর্ষে; চিনের কনফুসিয়াস এবং গ্রিসের সক্রেটিস (খ্রি: পূ: ৪৬৯-৩৯৯), প্লেটো (খ্রি: পূ: ৪২৭-৩৪৭) এবং এরিস্টটলের (খ্রি: পূ: ৩৮৪-৩২২) মতো পঞ্চম শতকের ট্রাজেডি লেখকবর্গের কথাও উল্লেখযোগ্য। হিংস্র আচরণ সব ঋষিরাই বর্জন করেছিলেন এবং ন্যায়বিচার আর করুণাময় নীতিকথা প্রচার করেছেন। তারা তাদের শিষ্যদের শিখিয়েছেন সত্যের জন্য নিজের ভিতরে অনুসন্ধান করতে এবং পুরোহিত আর অন্যান্য ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের শিক্ষার উপর নির্ভর না করার জন্য। বিশ্বাস করে কোনো কিছু গ্রহণ করলে চলবে না, সবকিছুকে প্রশ্ন করতে হবে এবং পুরাতন মূল্যবোধ যাকে মেনে নেয়া হয়েছে তাকে সমালোচকের দৃষ্টিতে নিরীক্ষা করতে হবে। আর একটা ক্ষেত্র যার পূর্ণ মূল্যায়ন প্রয়োজন সেটা হলো অবশ্যই মিথলজি।[৭]

মিথের আদি মৌলিক পৃথিবীতে হিন্দু সম্প্রদায় অনেক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। বৌদ্ধ মতবাদ গভীর মনোবৈজ্ঞানিক ধর্ম, এবং মিথের মনোবিদ্যার প্রাচীন ধারা বলে মনে করে, দুটো বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ। কনফুসিয়াসের মতবাদে, মিথের ভাষ্যের চেয়ে আচার অনুষ্ঠানের গুরুত্ব সব সময় বেশি। কিন্তু খ্রিস্টান, ইহুদি আর মুসলমানেরা বিশ্বাস করে ইতিহাসে তাদের ঈশ্বরের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে এবং এই পৃথিবীর বাস্তব ঘটনায় তাকে অনুভব করা সম্ভব। তবুও ইহুদি, খ্রিস্টান আর মুসলমানেরা তাদের অন্তর্জ্ঞান ব্যাখ্যা করতে বা কোনো সংকটের সমাধান খুঁজে পেতে আজও মিথের দ্বারস্থ হয়। তাদের সব মরমীবাদীরাই মিথের শরণাপন্ন হয়েছেন। মরমীবাদ, মিথ এবং রহস্যময়তা সবই গ্রিক শব্দ *Musteion*-এর সাথে সম্পর্কিত যার অর্থ 'মুখ বা চোখ বন্ধ করে'।[৭]

উনিশ শতক নাগাদ, ইউরোপের কেউ কেউ ধর্মকে ক্ষতিকর হিসাবে ভাবতে শুরু করে। লুডউইগ ফয়েরবাখ (১৮০৪-৭২ খ্রি.) যুক্তি উপস্থাপন করেন যে এটা মানুষকে মানবতা

থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং কার্ল মার্কস (১৮১৮-৮৩ খ্রি.) ধর্মকে অসুস্থ সমাজের উপসর্গ হিসেবে বিবেচনা করেন। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ, লোগোস আর মিথোসের মাঝে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়। টমাস এইচ.হাক্সলির (১৮২৫-৯৫খ্রি.) মতো ধর্মযোদ্ধারা বিশ্বাস করতেন, মিথ আর যুক্তিবাদী বিজ্ঞানের মধ্যে থেকে একটা বেছে নিতে হবে এবং এতে কোনো আপোস চলবে না। যুক্তিই কেবল সত্যি আর ধর্মীয় মিথ সত্যরহিত।[৭]

মিথ তথ্যবিহীন হয়েও, ইতিহাসের প্রচলিত সংজ্ঞায় না পড়লেও ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছে। এর ফল হয়েছে এই যে অনেক ধর্মের কিছু বিশ্বাসপ্রবণ মানুষ লিখিত ইতিহাস আর মিথিক্যাল ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পারে না বা বুঝতে চায় না। যেমন, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে গোঁড়া ও অন্ধবিশ্বাসীরা *রামায়ণ* এবং *মহাভারত* এর চরিত্রসমূহকে সত্যি বলে মনে করে। এতে ভালো-মন্দ দুই-ই হয়েছে। মানুষের বিশ্বাসের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়ে তাকে তৃপ্তি দিয়েছে। অন্যদিকে অন্ধবিশ্বাসের জন্য ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতানৈক্য দেখা দিলে সহিংসতা ও সংঘর্ষ ঘটেছে। মিথ ইতিহাস নয়, এ কথার ওপর জোর দেওয়া হলেও প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা তথ্যবিহীন বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের অবশিষ্টাংশ আধুনিক ধর্মের হাত ধরে ইতিহাসের পাতায় ঢুকে পড়ায় এই পার্থক্য অক্ষরে অক্ষরে কোনো কোনো ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে মেনে চলা সম্ভব হয় নি। খ্রিস্টান ধর্মের গসপেলে মিথের ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু তার চেয়েও বেশি মিথ রয়েছে হিন্দু ধর্মে, কেননা হিন্দু ধর্ম আরো প্রাচীন। প্রাচীন বলেই হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মিথের যোগাযোগ ছিল অন্তরঙ্গ, কেননা সেই সময় বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সুযোগ ছিল না। ইসলাম ধর্মে এই সমস্যা নেই, কেননা এটি এসেছে সবশেষে এবং যখন এর প্রবর্তন হয় সেই সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান অনেক অগ্রসর হয়েছে, যার জন্য বিশ্বরহস্য, জন্মরহস্য, ইত্যাদির ব্যাখ্যার জন্য প্রাচীন মিথের শরণাপন্ন হতে হয় নি অথবা সে সবকে মানুষের বিশ্বাসের মধ্যে স্থান করে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে নি। বরং এই সব অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই ছিল ইসলামের অবস্থান। তাছাড়াও ইসলামে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং মানুষ সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা একই সঙ্গে বিজ্ঞানের সত্য বর্ণনা এবং বিশ্বাসভিত্তিক ধারণা। কোনো ধর্মই যুক্তি-তর্ক দিয়ে কিছু প্রমাণ করে না, সব ধর্মের ভিত্তি হলো বিশ্বাস। মিথেরও গ্রহণযোগ্যতার পেছনে ছিল আদিম মানুষের মনের বিশ্বাস। যখন আধুনিক ধর্ম ছিল না মিথ তার হয়ে ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রসঙ্গে Emile Durkheim বলেছেন,

> The belief in Zeus was religious in so far as the Greeks considered him the supreme God, but his marriages and his adventures, was only mythology.[7]

সেই জন্য মিথ যে শুধু কোনো কোনো ধর্মে অনুপ্রবেশ করেছে তাই নয়, লিখিত ইতিহাসের অংশ না হলেও পাদটীকার মর্যাদা পেয়েছে।[৭] Emile Durkheim আরো লেখেন,

> Religious thought does not come in contact with reality, except to cover it at once with a thick veil which conceals its real forms: this veil is the tissue of fabulous beliefs which mythology brought forth. Thus the believer, like the delirious man, lives in a world peopled with beings and things which have only a verbal

existence. Max Muller himself recognized this, for he regarded myths as the product of a disease of the intellect.[7]

মিথের চিন্তক

গ্রিক সভ্যতায় আর্কেয়িক পর্বে (৭৫০-৪৮০ খ্রি. পূ.) জেনোফেনেস মিথ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। পরের পর্বে, যাকে ক্ল্যাসিক্যাল পর্ব (৪৮০-৩২৩ খ্রি.পূ.) ধরা হচ্ছে, সে সময় মিথকে নিয়ে একাধিক ধারণার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যথা-

১. মিথ আসলে আমাদের শিক্ষা দেবার একটি মডেল (instructive model)| অ্যানাক্সগোরাস ছিলেন এর উদগাতা।

২. মিথকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে মন্তব্য করেন ইউরিপিডেস।

৩. মিথের নৈতিকতা নির্ণয়ে প্রশ্ন তোলেন সক্রেটিস।

৪. প্লেটোর কাছে মিথ ভয়ানক একটা ব্যাপার রূপে প্রতিভাত হয়েছিল।[৭]

গ্রিসে, যুগান্তকারী সময়টা লোগোস (যুক্তি) দ্বারা তাড়িত। আবেগ বা কোন প্রকার আচার অনুষ্ঠানের সহযোগিতা যেখানে প্রয়োজন হয় মিথের মানে বুঝতে সেখানে লোগোস সতর্কতার সাথে যাচাই করে সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, যার আবেদন কেবল সমালোচক বুদ্ধিবৃত্তির কাছেই আছে। চতুর্থ শতকে দর্শনের প্রতি আগ্রহ জোরালো হবার আগে, এথেন্সবাসীরা একটা নতুন ধরনের কৃত্যানুষ্ঠানের প্রচলন করে, বিয়োগান্তক নাট্যকল্প, ধর্মীয় উৎসবের আবহে প্রাচীন মিথের ভাবগম্ভীর উপস্থাপন কিন্তু একই সাথে গভীরভাবে তাকে খুঁটিয়ে দেখার প্রয়াস। একিলাস (খ্রিঃ পূঃ ৫২৫-৪৫৬), সফোক্লিস (খ্রিঃ পূঃ ৪৯৬-৪০৫) এবং ইউরেপিডিস (খ্রিঃ পূঃ ৪৮০-৪০৬) সবাই ঈশ্বরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন, আর দর্শকেরা বিচারকের ভূমিকায় আসীন। ট্রাজেডি অবশ্য সনাতন মিথ আর নিজের ভিতরে এক ধরনের দূরত্ব সৃষ্টি করে এবং কয়েকটা মৌলিক গ্রিক মূল্যবোধের বিষয় খতিয়ে দেখে।[১] পৌরাণিক চিন্তাভাবনা থেকে লোগোস সম্পূর্ণ আলাদা একটা ব্যাপার। যদিও প্রাক আধুনিক যুগে বেশির ভাগ মানুষ উপলব্ধি করে যে মিথ এবং যুক্তি একটা অন্যটার পরিপূরক; প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা মণ্ডল রয়েছে, প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যোগ্যতা রয়েছে এবং এই দুই ধরনের চিন্তা পদ্ধতির মানুষের প্রয়োজন আছে।[৮]

প্লেটো ট্রাজেডি অপছন্দ করতেন এর আবেগপ্রবণতার কারণে, তিনি বিশ্বাস করতেন আত্মার অযৌক্তিক অংশকে এটা পরিপূর্ণ করে এবং লোগোসের মাধ্যমেই মানুষ কেবল নিজের সম্পূর্ণ সম্ভাবনার উন্মেষ ঘটাতে পারবে। প্লেটো মনে করতেন মিথ বা আচার অনুষ্ঠানের অন্তর্জ্ঞান দ্বারা প্রেম, সৌন্দর্য, ন্যায়বিচার বা ভালোকে অনুধাবন বা হৃদয়াঙ্গম করা সম্ভব নয় সেটা কেবল মনের যুক্তিপাতের শক্তি দ্বারা সম্ভব। এরিস্টটলও প্লেটোর মতবাদ মানতেন।[১] তবে এরিস্টটলই প্রথমবারের মতো সকল বিজ্ঞানের ভিত্তি যৌক্তিক ব্যাখ্যাকরণের (Logical reasoning) গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি দুর্বলতা সত্ত্বেও প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি ছিল এরিস্টটলের; ধর্ম ও মিথের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তিনি। এই পণ্ডিতগণ একটি সাধারণ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, মানুষের জীবনে অত্যাবশ্যকীয় এক দুর্জ্ঞেয় উপাদান রয়েছে। তাঁরা এই দুর্জ্ঞেয়কে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার

বেলায় নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে একে গুরুত্বপূর্ণ বলে মেনে নিয়েছেন সকলেই। তাঁরা প্রাচীন মিথলজিগুলোকে পুরোপুরি বাতিল করে দেন নি, বরং নতুন করে ব্যাখ্যা করেছেন।[৯]

পরবর্তী সময়ে মিথের নিরিখে পৌরাণিকতা বিচারের একটি ধারা আমরা পাই জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্স মুলারের কাজে। মুলার প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যা করেছেন মিথ ও ধর্মের। এ সময়ে অপর একটি প্রবল ধারার জনক ছিলেন জেমস ফ্রেজার (১৮৫৪-১৯৪১ খ্রি.)। ইংরেজ নৃতাত্ত্বিক স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার বিবিধ মিথ, লোকগাথা, উপকথা, লোক বিশ্বাস, আচারবিচার, উপাচারের দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে মিল অনুসন্ধান করেন তাঁর ১২ খণ্ডে সমাপ্ত ভুবন বিখ্যাত বই *The Golden Bough: A study in magic and religion*-এ। ফ্রেজার মিথকে বলেছেন ধর্মীয় আচারেরই বহিঃপ্রকাশ। মিথের সঙ্গে অধিকরণ তথা যাদুবিদ্যার সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করেছেন ফ্রেজার। মিথ প্রসঙ্গে ব্রনিসল ম্যালিনস্কির বক্তব্য সমাজবিজ্ঞানে দীর্ঘদিন ধরে প্রাসঙ্গিক হয়ে থেকেছে। বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনস্কির বক্তব্য ছিল মিথ আসলে এক ধরনের সামাজিক সনদ (charter)।[9]

এরপর এলো গঠনবাদী চিন্তা। গঠনবাদী চিন্তার বীজকে প্রথম বপন করেন সুইজারল্যান্ডের প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর (১৮৫৭-১৯১৩ খ্রি.)। সোস্যুরের মতে, শব্দ হল মূলত চিহ্ন। ভাষাতত্ত্বই মূল চিহ্নবিজ্ঞান, যা দিয়ে অন্যসব চিহ্নকে পড়া সম্ভব।[৯]

বিশ শতকের ছয়ের দশকে পাঁচজন দিকপাল ফরাসি চিন্তাবিদ গঠনবাদী চিন্তাকে জনমানসে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করেন। এরা হলেন, নৃতাত্ত্বিক ক্লদ লেভিস্ট্রস, ভাবনার ইতিহাসের প্রণেতা মিশেল ফুকো, সাহিত্যতাত্ত্বিক রলাঁ বার্ত, ফ্রয়েডিক মনোবিশ্লেষণবিদ জাক লাকাঁ এবং মার্ক্সিয় তাত্ত্বিক লুই আলথুজ। কোনও কিছুর সংগঠক উপাদানগুলোর স্বতন্ত্র আলোচনা নয়, সমগ্রের ওপর ঝোঁক দিয়ে বিভিন্ন অংশের সম্পর্কসূত্রের পর্যালোচনাই হয়ে ওঠে গঠনবাদীদের মূল কথা। ১৯৫৮ সালে ক্লদ লেভিস্ট্রস তাঁর *Structural Anthropology* গ্রন্থে মিথতত্ত্ব বিশ্লেষণের পর থেকেই এই তত্ত্বের ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়। লেভিস্ট্রস তাঁর আলোচনায় মানবিক চিন্তার সার্বভৌম স্বভাবের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। লেভিস্ট্রস তাঁর মিথ চিন্তায় স্বপ্ন, অলৌকিকতা, অলীক কল্পনার চেয়ে বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে টোটেমের মধ্যে নিহিত থাকে মিথ। আখ্যানেরও repetation-এর মধ্যে থাকে myth, mythic structure।[৯] লেভিস্ট্রসের বক্তব্যের মূল কথা ছিল:

১. মনের বিভাজনের বৈপরীত্য (binary opposition) সৃষ্টিকারী যে ক্রিয়া মিথ তাকে প্রতিফলিত করে।

২. মানুষ তার জগতকে নিজের দেহগত ও বৌদ্ধিক সত্তার প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে দেখতে চায়। মিথও সেভাবেই গড়ে ওঠে।

৩. স্বাভাবিক অবস্থায় ডান/বাম, কাঁচা/রান্না করা, সাদা/কালো এইরূপ বিভাজন মিথের গঠন কাঠামোয় ধরা পড়ে।

4. মিথ বিবিধ প্রকার বৈপরীত্যের একরকম অবধারণ (perception) এবং সমন্বয় (reconciliation) ঘটায়। একে এক কথায় বৈপরীত্যের মধ্যস্থতাকরণ (mediation of contradiction) বলা যায়।[৯]

মিথের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন রলাঁ বার্তের (১৯১৫-৮০ খ্রি.) *মিথলজি* (১৯৫৭)। বার্ত তাঁর *মিথলজি, এলিমেন্টস অব সেমিওলজি, রাইটিং ডিগ্রি জিরো* প্রভৃতি গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বিভিন্ন বস্তু-সন্নিবেশের মধ্যে পার্থক্যমূলক সম্পর্কই সাধারণভাবে সমস্ত মানবিক প্রক্রিয়ার পূর্বশর্ত।[৮] রলাঁ বার্ত মিথলজি গ্রন্থে চিহ্নবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মিথের বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়,

> এ গ্রন্থ দাঁড়িয়ে আছে দুই পায়ে, দু'টি তাত্ত্বিক কাঠামো নিয়ে; এক ধরা যাক যাকে বলা হয় 'মাস কালচার', তার ভাষার ভাবাদর্শগত বিচার। অপরটি হলো এ ধরনের ভাষাকে চিহ্নবিজ্ঞানের কৌশল খাটিয়ে বিশ্লেষণ করা'। এখনও মিথকে আমি সনাতন অর্থেই ব্যবহার করি। তবে এ নিয়েও নিশ্চিত ছিলাম, পরে যা সমস্ত পরিণাম জড়ো করে দেখাতে চেয়েছি তা হলো: মিথ এক বাচন।[৯]

ফরাসি গঠনবাদের ধারায় বার্ত ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ দ্য স্যসুর-এর অনুসরণে চিহ্নতত্ত্বের প্রয়োজনে দৈনন্দিন জীবনে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের অন্তর্গত বিষয়বস্তু, প্রসঙ্গ রাশিকে মিথ হিসেবেও ব্যাখ্যা করেন। নানারূপ ও রূপান্তর বার্ত প্রত্যক্ষ করেছেন গণ সংস্কৃতির (mass culture) মধ্যে। সিনেমা, বিজ্ঞাপন, সংবাদমাধ্যম, সার্কাস থেকে শুরু করে জনপ্রিয় সাহিত্যের মধ্যে মিথ তার নতুন ভাষা নির্মাণ করেছে।[৯]

সাহিত্য মিথ চর্চার যে ধারার দ্বারা সবচেয়ে উপকৃত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে মিথ ব্যাখ্যার মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা দুই ভুবনজোড়া প্রতিভা- একজন সিগমুন্ড ফ্রয়েড, অন্যজন সি.জি. ইয়ুং। মিথ আলোচনার ক্রিয়াবাদী ধারাটির পাশাপাশি বিশ শতকের প্রথম পর্বেই মনস্তাত্ত্বিক ধারা দেখা যায় যা মূলত ফ্রয়েড এবং ইয়ুং-এর কাজকর্মের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে।[১] মনস্তত্ত্ব দিয়ে ফ্রয়েড যতটা না সাহিত্য পাঠে আগ্রহী, তার চেয়ে ঢের বেশি আগ্রহ সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে থেকে 'স্বপ্ন' কিংবা 'যৌনতা'-র আদিরূপের সন্ধান চালিয়ে মানবমনের জটিল রূপের একটা সাধারণ তত্ত্বের ভিত্তি গড়ায়। যদিও ছাত্র ইয়ুং অচিরেই মিথ ভাবনার অন্যপথের সন্ধান দেন। ব্যক্তি-মনস্তত্ত্বের জায়গায় যৌথ অবচেতনা (Collectibe Unconscious) বা জাতির স্মৃত পরম্পরা (Racial Memories) কে গুরুত্ব দিলেন তিনি। জন্ম নিল আর্কিটাইপ-এর তত্ত্ব। ফ্রয়েড যেখানে মূলত আগ্রহী ছিলেন যৌন উৎকণ্ঠা ও তার বিরোধের জায়গাগুলি থেকে মিথকে দেখতে এবং দেখাতে, ইয়ুং সেখানে চিহ্নের ভেতর লুকানো অর্থের দ্যোতনার থেকে মিথকে দেখেন। ফ্রয়েডের ব্যাখ্যায় বারবার ঘুরে ফিরে আসে ব্যক্তি মানুষের 'Childhood trauma'-র কথা, কিন্তু ইয়ুর-এর আগ্রহ পরিণত মানুষকে নিয়ে।[১০] ইয়ুং বলেন,

> The unconscious mind is capable at times of assuming an intelligence and purapsiveness which are superior to actual consceious insight.[10]

তবে একথা ঠিক মিথের শিকড়টা খুব গভীরে প্রবিষ্ট হোক বা না হোক, তার প্রত্নপ্রতিমার (আর্কিটাইপ) অনুধ্যানটি লেখকদের চিরকালই আবিষ্ট করে রাখে। মনোবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন (ফ্রয়েড, ইয়ুং) যে, ঐতিহ্যগতভাবে যেসব কাহিনী মানুষের মনের মধ্যে সমাদৃত হয়ে থাকে তাদের অবস্থানটি ত্রি-স্তরিক:

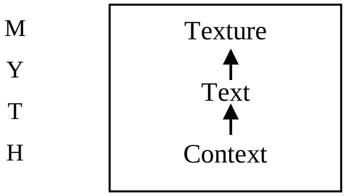

এই ছকটি অনুধাবন করলেই একটি সংস্কৃতিবলয়ে মিথকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে নতুন বিন্যাসের মাধ্যমে কাহিনীধারা কেমনভাবে বিবর্তিত হয়, তার পরিচয়টা সুন্দরভাবে পাওয়া যায়। মিথের যে প্রতিমার কথা এখনি বলা হয়েছে, তা মেলে ওই *Context* এর 'শিকড়'-এ; সেই প্রত্নপ্রতিমার ওপরে যে কাহিনী গড়ে ওঠে, তার অবস্থান হল *এবীঃ* তথা 'উপজীব্য' পর্যায়ে। আর সেই কাহিনীকে ভেঙে গড়ে নতুন কাহিনী যখন সৃষ্টি করা হয়, তখনই সেটা হয় *Textur* বা 'বিন্যাস'-এর স্তরভুক্ত।[১০] এই ব্যাপারটিই অন্যতম ফরাসি বৌদ্ধিক মনীষী রলাঁ বার্ত-এর ব্যাখ্যায় এইভাবে এসেছে,

> বর্ণিত এই ত্রিমাত্রিক বিন্যাস মিথের ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে: চিহ্নায়ক, চিহ্নায়িত এবং চিহ্ন।[১]

মিথের প্রয়োগ

মিথ মানুষের মধ্যে ভাবনা আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। কতগুলো ধারণা ও বিশ্বাস মিথ দিয়েই বর্ণনা করা যায়। মিথের এই বর্ণনাশক্তির সঙ্গে মানুষের ভাষার সম্পর্ক রয়েছে। মিথ মানুষকে সমৃদ্ধ করেছে তার ব্যবহারের মাধ্যমে। এই জন্য সাহিত্য সৃষ্টিতে মিথের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে অনেক লেখকের কাছে। চিত্রশিল্প সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। বলা যায়, দৃশ্যকল্প থেকে (চিত্রশিল্প, সিনেমা) অথবা লিখিত গ্রন্থ উভয় ক্ষেত্রেই মিথ ভাষাকে নতুন মাত্রা দেয়। ব্যবহৃত ভাষায় গভীরতা যোগ করে। বাক্যের ভেতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে।[১১]

কবি সাহিত্যিকরা বিগতকালকে অধুনা দৃষ্টিতে উপলব্ধি করবার মানসে মিথের দ্বারস্ত হন। সমান্তরাল ভাবে মেলে ধরেন তার অতীত ও বর্তমান। মিথ ব্যবহারের অর্থ বর্তমান থেকে সরে যাওয়া নয়, বা কোনো নিশ্চলতায় আটকে থাকা নয়। মিথ অতীতের সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে, সংলগ্ন থেকেও উপস্থিত কালকে বিজ্ঞাত করে তাকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। তাই নিরন্তন ব্যবহারেও শিল্পি-কবি-সাহিত্যেকের কাছে মিথ নামক আয়ুধটির প্রাখর্য কখনো অতীক্ষ্ণ হয় না, আর দর্শক-পাঠক শ্রোতার কাছেও মিথের আকর্ষণ কখনো মলিন হয় না। বরং তা সতত নতুন দ্যোতনা সৃষ্টি করে অমিত সম্ভাবনা নিয়ে। এ প্রসঙ্গে J.A. Cuddon বলেছেন,

> Myth is always concerned with creation. Myth explains how something came into exist.[1]

গ্রীক মিথের কাহিনীগুলোর সঙ্গে এক সময় ধর্মাচার যুক্ত থাকলেও দীর্ঘকাল আগেই তা অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে পরবর্তীকালে আধুনিক কবি-সাহিত্যিকের কলমে গ্রিক মিথের বিষয় গৃহীত হলেও ধর্মাচার লুপ্ত হওয়ার কারণে সাহিত্যিকেরা ইচ্ছে মতো নতুন কাঠামো, নতুন পরিবেশে মানানসই করে তুলতে পেরেছেন বা পারছেন। কিন্তু প্রতীচ্যের ধর্মীয়

ভাবনার জগত থেকে প্রাচ্যের ধ্যান-ধারণার জগত অনেক পরিমাণে সংকীর্ণ। এই কারণেই এক সময় ইউরোপের জয়েস, এলিয়ট, কাম্যু প্রমুখ শিল্পীরা মিথের কাহিনীকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে পেরেছেন। কিন্তু এ অঞ্চলের জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে এদেরকে তাদের দেশীয় ঘরানার মধ্যে থেকেই রিভার্স মিথ নির্মাণে অগ্রসর হতে হয়েছে। মূলত সামাজিক বিভাজনই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিথমূলক ধারণা রূপান্তরের ক্ষেত্রে বেশি প্রভাব ফেলেছে। অদূর ভবিষ্যতে কঠোর ধর্মীয়ভাবনা মুছে গিয়ে নতুন ঘরানার মিথ তৈরি হবে কি-না সময়ই তার উত্তর দেবে।[১২]

প্রতীচ্যে প্রাচীন মিথ সমস্ত রকম ধর্মীয় আবেগ বর্জন করে এখন নিছক সৃষ্টি উপকরণ বলেই গণ্য হয়, পক্ষান্তরে ভারতীয় প্রাচীন পুরাণকথা- যা মূলত *রামায়ণ* ও *মহাভারত* এর মধ্যে প্রথিত। তাই এ অঞ্চলে সাহিত্য স্রষ্টাদের লেখার মধ্যে সেই স্বচ্ছন্দ পরিবেশটিকে সব সময় পেতে দেয় না। ফলে একই সঙ্গে ভারতবর্ষের ভক্তিমান পাঠক তুলসীদাসের *রামচরিতমানস* কিংবা *কৃত্তিবাসী রামায়ণ* পড়েন আর ভক্তিহীন পাঠক পাঠ করেন মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্য*। এই সামাজিক বিভাজনের কারণেই ইউরোপীয় অর্থে মিথের সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের চরিত্রগত হেরফের হয়ে আছে। ভারতীয় পুরাণের মধ্যে মিথ, ইতিহাস, কিংবদন্তী এবং লোককথা এমনভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে রয়েছে যে, বহুক্ষেত্রেই পুরোদস্তুর ভাবে যাকে মিথ বলা যায়, তাকে আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। আসলে পুরাণকে এখনো এ অঞ্চলে বহু সময়েই সামজিক মূল্যবোধের মাপকাঠি বলে মনে করা হয়। সেই জন্যেই সীতার মতো আনুগত্য, লক্ষণের মতো ভ্রাতৃভক্তি, বীভিষণের মতো বিশ্বাসঘাতকতা, শকুনির মতো ধূর্ততা, যুধিষ্টিরের মতো সত্যবাদিতা, ভীমের মতো প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ইত্যাদি ভাবনা বিশিষ্ট ধরনের তাৎপর্য বহন করে।[১২] তাই পাশ্চাত্যে জেমস জয়েস, টমাস ম্যান, টি এস এলিয়ট, জোসেফ কনরাড, কাম্যু, সার্ত্র যখন প্রাচীন গ্রিক মিথের আধুনিক রূপায়ণ করেছেন, এ কারণেই তখন তার মধ্যে সেই শিকড়ের টানটা অনুভব করা যায় না, যেটা করা যায় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মধুসূদন, সুধীনন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, তারাশঙ্কর, শামসুর রাহমান, সমরেশ বসু প্রমুখের লেখায়।

বিষয় ও মাধ্যম ভেদে শিল্প-সাহিত্যে মিথের ব্যবহারে পার্থক্য দেখা যায়। জয়েসের *ইউলিসিস* উপন্যাসে হোমারের *ওডেসি* মিথের ব্যবহার করা হয়েছে মোটা দাগে, শিরোনামসহ অধ্যায়ের ও চরিত্রের নাম এবং ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। তুলনায় এলিয়টের *The Waste Land* -এ মিথ মোটা দাগে কিংবা বিশুদ্ধভাবে আসে নি কেবল মাঝে মাঝে মিথভিত্তিক শব্দের ব্যবহারেই তার ব্যবহার দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, উপন্যাস এবং নাটকে ব্যবহৃত মিথ সবই ভারতের পৌরাণিক ইতিহাস কাহিনী থেকে নেওয়া। তিনি কোথাও মিথের ব্যবহার করেছেন খুব বিশুদ্ধভাবে যেমন *চিত্রাঙ্গদা* নৃত্যনাট্য। আবার *রক্তকরবী* নাটকে মিথের ব্যবহার দেখা যায় বেশ প্রচ্ছন্ন। শামসুর রাহমানের প্রথম পর্বের কবিতায় গ্রিক মিথের বেশ ব্যবহার দেখা যায়, তবে তিনি বিশুদ্ধভাবে মিথের কাহিনী বলেন নি পাঠকের ওপরই তার অর্থ উদ্ধারের ভার রেখেছেন।[১২]

ধর্মীয় নেতাদের চাইতে লেখক আর শিল্পীর দলই শূন্যতায় অবগাহন করে মানুষের অতীতের পৌরাণিক প্রজ্ঞার সাথে পুনরায় পরিচয় করাতে চেষ্ঠা করেছে। ১৯৩৭ সালের ২৬ এপ্রিল, স্পেনের গৃহযুদ্ধ যখন তুমুল আকার ধারণ করেছে, নাজী যুদ্ধবিমান, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সরাসরি নির্দেশে গুয়েরনিকায় হাটবারে আক্রমণ করে ৭০০০ অধিবাসীর ১৬৫৪

জনকে হত্যা করে। কয়েক মাস পরে, প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে পাবলো পিকাসো তার *গুয়েরনিকা* চিত্রকর্মটি প্রদর্শন করেন। এই আধুনিক লোকায়ত ক্রুশবিদ্ধকরণ তার সমসাময়িকদের চমকে দেয় এবং *The Waste Land* এর মতো এটাও ছিল ভাবী সূচক একটা বক্তব্য এবং নতুন বিশ্বের কাছে এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে নব জাগরণের প্রয়াস। পুরোপুরি লৌকিক প্রেক্ষাপটে কোনো মিথকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। প্রাত্যহিক জীবন থেকে ভিন্ন বিধিবদ্ধ ছকেই কেবল একে বোঝা সম্ভব; নিজস্ব রূপান্তরের প্রক্রিয়ার একটা অংশ হিসেবে তা অনুভব করতে হবে।[১২]

মিথের একাল

মানুষ হয়তো বৈষয়িক দিকে অনেক বেশি পরিশীলিত হয়েছে, কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে তারা এখনও অ্যাক্সিয়াল যুগের ঊর্ধ্বে যেতে পারে নি; মিথোসের অবদমনের ফলে হয়তো তাদের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। মানুষের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতের ঊর্ধ্বে উঠতে এবং পুরোপুরি আরও প্রবল, পরিপূর্ণ অস্তিত্বে প্রবেশ করতে দেরি আছে। চিত্রকলা, রক সঙ্গীত বা চলচ্চিত্রের জীবনের চেয়ে বড় দৃষ্টান্তরূপে প্রবেশ করে মানুষ এই মাত্রায় বিলীন হতে চায়। মানুষ আজও বীরের পূজারী। প্রিন্সেস ডায়ানা আর এলভিস প্রিসলি তাই সাথে সাথে পৌরাণিক সত্তায় পরিণত হয় এমনকি ধর্মীয় প্রার্থনা সভার কাল্টের বিষয়ে পরিণত হয়। মানুষ মিথ সৃষ্টিকারী প্রাণী এবং বিংশ শতাব্দী জুড়ে তারা কিছু অতীব ধ্বংসাত্মক আধুনিক মিথ দেখেছে, যার শেষ হয়েছে রক্তপাত আর গণহত্যার ভিতর দিয়ে।[১২]

আধুনিক মিথ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষমতার অভিসন্ধি নিয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সম্প্রতিকালে ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের পৌরাণিক চরিত্রসমূহের পুনঃচর্চার পশ্চাতে রয়েছে রাজনীতি। *রামায়ণ-মহাভারতের* চরিত্র থেকে রানা প্রতাপ বা শিবাজির মিথগুলোকে রাজনৈতিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করার কারণ মিথ। জাতীয়তাবাদ অথবা বিপব। লাল অথবা অন্যকোনো রঙ। সব কিছুতেই থাকে মিথ। আসলে মিথ ছাড়া মানুষ বাঁচে না। তাই নিউইয়র্কে স্বাধীনতার যে স্মারক মূর্তিটি প্রদীপ্ত মশাল হাতে গণতন্ত্রের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা একটি মিথিক চরিত্রে পরিণত হয়। গণতন্ত্র শব্দটিও বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে ক্রমশ মিথিক হয়ে ওঠে। তাই আক্রমণ চলে গণতন্ত্রের নামে ইরাকে, আফগানিস্তানে। গণতন্ত্রের মিথকে অস্ত্র করে চলে মরণাস্ত্রের প্রদশর্নী। সমাজতন্ত্র শব্দের পরিণতিও আলাদা নয়। তাই হিটলারের দলের নাম হয়ে যায়, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দল।

আজকের মানুষ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ড্রয়িং রুমে বসেই মঙ্গলগ্রহের ছবি দর্শন করছে, আদিম যুগে একেবারেই যা ছিল কল্পনার বাইরে। তাহলে কী আধুনিক মোবাইল স্যাটেলাইটের উন্নত প্রযুক্তির যুগে পুরানো মিথগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে? এমন প্রশ্ন উঠতেই পারে। লোক ঐতিহ্যের প্রত্যেকটি উপাদান যেমন আজকের দিনেও টিকে থেকে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। তবে তা গাত্র বদল করে পুনর্গঠনের মাধ্যমে; মিথও তেমনিভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল, নমনীয়। মিথের কাহিনীর বাইরের রূপ পাল্টে গেলেও মূল স্ট্রাকচারটি অপরিবর্তিতই থেকে যায়।[১২]

যখন ধর্মের প্রবর্তন হয় নি, মিথ ধর্মের ভূমিকা পালন করেছে। তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ছিল, দার্শনিকতাও ছিল। সৃষ্টি রহস্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মিথই প্রথম 'বৈজ্ঞানিক' পদক্ষেপ নিয়েছিল বলা যায়। কালের যাত্রায় মিথের এই সব ভূমিকা ও দায়িত্ব হয়

নিঃশেষিত হয়েছে অথবা পুরনো বলে এখন ব্যবহারের অযোগ্য। তবুও মিথের কাহিনি বলা হয়, কবিতা– উপন্যাসে থাকে এবং রূপান্তরের মাধ্যমে তার পুনরাবির্ভাব ঘটে। কেন এমন হয়? উত্তর, এর একটাই। মিথের পেছনে যে কল্পনা তা মানুষের মনের কাছে আবেদন রাখে, মনের জগতে প্রতিধ্বনি তোলো। মিথ মানুষের মনের সৃষ্টি বলেই তাকে ত্যাগ সম্ভব হয় না। মিথ মানুষের মনের অন্য সব সৃষ্টির সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা হয়ে থাকে। কখনো এই ঐক্য সূত্র স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়, বেশির ভাগ সময়ই এর উপস্থিতি অবচেতন থাকে। মিথের জগৎ কখনই হারিয়ে যায় না, তা সদা প্রস্তুত থাকে আধুনিক মানুষের মনের সঙ্গী হবার জন্য। মিথ মানুষকে সত্যের সন্ধান দেয় না, কিন্তু সত্য কীভাবে খুঁজতে হবে তার ইঙ্গিত দেয়। সেই পন্থাটি কল্পনার ওপর দাঁড়িয়ে আর আধুনিক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের যাত্রাও শুরু করতে হয় কল্পনা দিয়েই।[১২]

মিথ মানে কুসংস্কারাচ্ছন্নতা বা পশ্চাদ্‌গামিতা নয়। এ ধরনের মিথ নিশ্চয়ই রয়েছে যেগুলো ক্ষমতাশালীদের নিজেদের স্বার্থে তৈরি করা, যার মাধ্যমে তারা মানুষকে নানা বিশ্বাসের মধ্যে আটকে রেখে নিজেদের ক্ষমতা ও বৈভব নিরাপদ করে। মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করে, অনুগত করে এবং তাদের অবদমিত রাখে। কিন্তু ইতিহাসের সূচনা থেকে তৈরি হওয়া অসংখ্য মিথ প্রবাহিত হয়েছে কাল থেকে কালে, সম্প্রসারিত হয়েছে, রূপান্তরিত হয়েছে। সেগুলো মানুষের সবলতা, দুর্বলতা, সংকট আর সর্বোপরি তার অন্তর্নিহিত শক্তিকেই উপস্থাপিত করে। মিথের মধ্যে আছে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের সংঘাত, আছে মানুষের অতিমানুষে পরিণত হওয়া, বিশ্বাসের আধ্যাত্মিক বা অশরীরী শক্তিকে মানুষের মাঝে প্রতিস্থাপন করা। মিথ মানে প্রকৃতির সাথে মানুষের, সকল জীবজগতের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য সম্পর্কের অপূর্ব গাথা। মানবসভ্যতার অনুভূতির অতীত কাঠামোগুলো জীবাশ্মের মতো অবস্থান করছে মিথের মধ্যে। একথা অবশ্যস্বীকার্য মানুষ সবসময় সমকাল দ্বারাই আচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত। মিথ চর্চার মধ্যদিয়ে মানুষ বস্তুত এই আচ্ছন্নতাকেই ক্রমশ অতিক্রম করতে চায়।

তথ্যসন্ধান:

১. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, *মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ০১
২. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, *"মিথ প্রসঙ্গ; সংজ্ঞা ও স্বরূপ"*, *দোতারা*, ১ম বর্ষ , ১ম সংখ্যা, সম্পা. কুন্তল মিত্র, কলকাতা, মার্চ ২০১২ পৃ. ৯
৩. *Standred dictionary of folklore*, Vol.11, 1949, p. 778
৪. *Chambers 21st century Dictionary*, Alhied ChambersLimited, New Delhi, 2007, p. 905
৫. H.B. Franklin, *The wake of the Gods: Melville's Mythology*, 1963, p. 56
৬. প্রাগুক্ত, চন্দ্রমল্লী, পৃ. ০২
৭. প্রাগুক্ত, প্রসেনজিৎ, *"লোক ঐতিহ্যে 'মিথ' আর মিথের ঘনিষ্ঠরা," দোতারা*, ১ম বর্ষ, ১সংখ্যা, সম্পা. কুন্ত ল মিত্র, কলকাতা, মার্চ ২০১২, পৃ. ৫৪
৮. প্রাগুক্ত, জয়ন্তী, *"মিথ সৃজনের মনস্তত্ত্ব," দোতারা*, ১ম বর্ষ, ১ সংখ্যা, সম্পা. কুন্তল মিত্র, কলকাতা, মার্চ ২০১২, পৃ. ৪৫
৯. দ্র., প্রাগুক্ত, প্রসেনজিৎ, পৃ. ৫৫-৫৮
১০. খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, *"মিথ ও কবিতায় মিথের ব্যবহার"*, *আবহমান*, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, সম্পা. আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১১

১১. প্রাগুক্ত, গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট *"সাহিত্য ও মিথ সম্পর্কের সূলুক সন্ধান"*, *দোতারা*, ১বর্ষ ১ সংখ্যা, সম্পা. কুন্তল মিত্র, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ২৩
১২. Ibid, Emile Durkheim, *The Elementary forms of the religious life*, The free press, New York, 1969, p. 101-102
১৩. দ্র., হাসনাত আবদুল হাই, "*ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং মিথ*", সম্পাদক ওবায়েদ আকাশ, *শালুক*, বর্ষ ১৩,সংখ্যা ১৪, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩৬-৩৭
১৪. Jawaharlal Nehru, *The Discovery of India*, Oxford University Press, New Delhi, 2001, p. 78
১৫. দ্র., প্রাগুক্ত, ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *পুরাণ : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, অনুবাদ : সাদেকুল আহসান, সন্দেশ, ঢাকা-১১০০ পৃ. ২৪-২৫
১৬. দ্র., প্রাগুক্ত, ক্যারেন আর্মস্ট্রং, পৃ. ২৫-২৬
১৭. Northrop Frye, *"The Archetypes of literature," In Twentieth century criticism: The major statements,"* Editor W.S Handy and M. Westbrook, New Delhi, 1974, p. 242
১৮. বার্নিক রায়. *কবিতায় মিথ*, পুস্তকবিপণি, কলিকাতা, ১৯৯৪,পৃ. ১১
১৯. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, "*লোকসাহিত্য"*, সম্পা. সুধীর চক্রবর্তী, *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৪২০-৪২১
২০. প্রাগুক্ত, প্রসেনজিৎ সরকার, পৃ. ৬০
২১. লুইস হেরনি মর্গান, *আদিম সমাজ*, অনু. বুলবন ওসমান, অবসর, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩৪৮
২২. Lewis Henry morgan, *Ancient Society*, K.P.B. Calculte 1996, P.03
২৩. প্রাগুক্ত, লুইস হেনরি মর্গান (ভূমিকাংশ), পৃ. ৩৪
২৪. Emile Durkheim, p.158
২৫. প্রাগুক্ত, প্রসেনজিৎ সরকার, পৃ. ৪৭
২৬. দ্র., প্রাগুক্ত, ক্যারেন আর্মস্ট্রং, পৃ. ৯-১০
২৭. দ্র., প্রাগুক্ত, ক্যারেন আর্মস্ট্রং, পৃ. ১০-১২
২৮. দ্র., প্রাগুক্ত, ক্যারেন আর্মস্ট্রং, পৃ ১৭-২২
২৯. দ্র., প্রাগুক্ত, ক্যারেন আর্মস্ট্রং, পৃ. ২৮-২৯
৩০. দ্র., প্রাগুক্ত, ক্যারেন আর্মস্ট্রং, পৃ ৩৬-৪৫
৩১. দ্র., প্রাগুক্ত, ক্যারেন আর্মস্ট্রং, পৃ. ৪৬-৪৭
৩২. দ্র., প্রাগুক্ত, ক্যারেন আর্মস্ট্রং, পৃ. ৫৭-৫৯
৩৩. দ্র., প্রাগুক্ত, ক্যারেন আর্মস্ট্রং, পৃ. ৬৯-৭০
৩৪. Ibid, Emile Durkheim, p.100
৩৫. দ্র., প্রাগুক্ত, হাসনাত আবদুল হাই, পৃ. ৩০-৩১
৩৬. Ibid, Emile Durkheim, p.99-100
৩৭. প্রাগুক্ত, সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১১
৩৮. দ্র., প্রাগুক্ত, ক্যারেন আর্মস্ট্রং, পৃ. ৫৪-৫৫
৩৯. দ্র., প্রাগুক্ত, ক্যারেন আর্মস্ট্রং, পৃ. ২৩-২৪
৪০. দ্র., প্রাগুক্ত, ক্যারেন আর্মস্ট্রং, পৃ. ৫৫-৫৬
৪১. দ্র., ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *স্রষ্টার ইতিবৃত্ত*, অনু: শওকত হোসেন, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৬৭-৭২
৪২. দ্র., প্রাগুক্ত, সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১২-১৩
৪৩. রাহুল দাসগুপ্ত, *"গঠনবাদ"*, সম্পা.সুধীর চক্রবর্তী, *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৫১-১৫২
৪৪. প্রাগুক্ত, গৌরঙ্গ দণ্ডপাট, পৃ. ২৬
৪৫. দ্র., প্রাগুক্ত, সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৩-১৪
৪৬. প্রাগুক্ত, রাহুল, পৃ. ১৫২
৪৭. দ্র., রলাঁ বার্ত, *মিথলজি*, অনু. শামসুদ্দিন চৌধুরী, বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১১-১৩

৪৮. প্রাগুক্ত, সুমহান, পৃ. ১৬-১৭
৪৯. প্রাগুক্ত, সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৩
৫০. দ্র., প্রাগুক্ত, গৌরঙ্গ, পৃ. ২৪-২৫
৫১. Carl Jung, *Modern man in search of a soul*, New York, 1933, p. 15
৫২. প্রাগুক্ত,চন্দ্রমল্লী, পৃ. ০৬
৫৩. প্রাগুক্ত, রলাঁ বার্ত, পৃ. ১০৩
৫৪. প্রাগুক্ত, হাসনাত আবদুল হাই, পৃ. ৩৭
৫৫. J.A Cuddon, ed. *Literary terms and Literary Criticism*, Penguin, 1999, p. 526
৫৬. প্রাগুক্ত, প্রসেনজিৎ, পৃ. ৬৩
৫৭. প্রাগুক্ত, চন্দ্রমল্লী, পৃ. ৪
৫৮. প্রাগুক্ত, হাসনাত আবদুল হাই, পৃ. ৪০
৫৯. দ্র., প্রাগুক্ত, ক্যারেন আর্মস্ট্রং, পৃ. ৭৩-৭৬
৬০. প্রাগুক্ত, ক্যারেন আর্মস্ট্রং, পৃ. ৭১
৬১. প্রাগুক্ত, প্রসেনজিৎ, পৃ. ৬২
৬২. দ্র., প্রাগুক্ত, হাসনাত আবদুল হাই, পৃ. ৩৪-৩৫